ISSN 1813-0402

গবেষণা পত্রিকা

২৯তম সংখ্যা ■ জুন ২০২০

কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

A Research Journal
Faculty of Arts
University of Rajshahi

গবেষণা পত্রিকা
২৯তম সংখ্যা ■ জুন ২০২০
কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা পত্রিকা

২৯তম সংখ্যা ❑ জুন ২০২০

A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

Vol. 29
June 2020

Published by
Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

Cover Design
Rashed Sukhon

Printed by
Uttoran Offset Printing Press
Greater Road, Rajshahi - 6100

Price : Tk. 400.00 $ 6

Contact Address
Chief Editor, A Research Journal (Faculty of Arts)
Deans Complex
Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh

E-mail: dean.arts@ru.ac.bd
www.ru.ac.bd/arts

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
Rajshahi University

Members

Professor Shamima Akter
Chairman
Department of Philosophy

Professor Mortuza Khaled
Chairman
Department of History

Professor Abdullah Al Mamun
Chairman
Department of English

Professor Sarker Sujit Kumar
Chairman
Department of Bengali

Professor Md. Fazlul Haque
Chairman
Dept. of Islamic History & Culture

Professor Md. Nizam Uddin
Chairman
Department of Arabic

Professor Muhammad Mahbubur Rahman
Chairman
Department of Islamic Studies

Dr. Dino Bandhu Pal
Chairman
Department of Music

Professor SM Faruque Hossine
Chairman
Department of Theater

Professor Md. Osman Goni
Chairman
Department of Persian Language and Literature

Professor Juely Biswas
Chairman
Department of Sanskrit

Professor Md. Nasir Uddin
Chairman
Department of Urdu

Message from the Chief Editor

The 29^{th} volume of the Research Journal of the Faculty of Arts is published with 23 research articles contributed by the faculty members of the Departments of Bengali, Islamic History & Culture, Arabic, Islamic Studies, Music, Theater, Persian Language & Literature, Sanskrit and Urdu. The articles are of diverse characters and will come to the use of the students and researchers of various disciplines, specially of the Faculty of Arts.

The publication of the journal is the result of collective efforts of all the scholar members of the editorial board. They have ungrudgingly helped me in its publication. I am grateful to them for their cooperation. I thank the officers of the faculty for their assistance and also the employees of the Uttoran Offset Printing Press for their support.

Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Chief Editor and Dean
Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

সূচিপত্র

ড. সৈয়দ তৌফিক জুহরী	সমর সেনের কবিতা : জীবনবোধ	১
শৈবাল রায়	কবি শ্রীমধুসূদনের সীতা	১১
ড. মো. আরিফুর রহমান	৬২'এর সংবিধানবিরোধী আন্দোলন	২৩
ড. মুহা. বিলাল হুসাইন	লাবীদ ইবন রাবী'আর জীবনী ও তাঁর কাব্য প্রতিভা	৩৩
ড. মো. সেতাউর রহমান	অর্থোপার্জনে কবি বাশ্‌শার ইবন বুর্‌দ-এর স্তুতিগাথা	৪৩
ড. মুহা. বারকুল্লাহ্ বিন-দুর	সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপনে মাসজিদের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা	৫৭
Dr. A N M Masudur Rahman	Duties of Human Being to Environment and Nature in Islam: An Analysis	৭৩
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	'উমরার বিধানাবলী: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	৮৩
বজলুর রশীদ	ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ ও প্রকৃতি	১০৩
মো. আশরাফুল ইসলাম	আল-কুরআনে বর্ণিত যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	১২৩
ড. দীনবন্ধু পাল	যন্ত্রসংগীতের নান্দনিকতা ও তবলা সংগতবাদন	১৫৯
মো. ইমরুল আসাদ	শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি : একটি সমীক্ষণ	১৭৩
আশরাফিয়া ইসলাম তোশিবা	জীবনী-নাটক : *আরজ চরিতামৃত*	১৮৩
মুহম্মদ আলমগীর পিএইচডি	গম্ভীরা উৎসবের নাট্যিক পরিবেশনা: ছদ্মবেশী	১৯৫
ড. সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ	কবি হাকিম সানায়ির *হাদিকাতুল হাকিকাহ :* একটি পর্যালোচনা	২২১
ড. মো. শফিউল্লাহ	পারস্য কবি দাকীকী : কাব্য ও শিল্পরূপ	২৩৫
ড. মো. রশিদুল আলম	উর্দু নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ: একটি পর্যালোচনা	২৪৭
ড. মো. মোকাররম হোসেন মন্ডল	আধুনিক উর্দু গদ্যসাহিত্যের বিবিধ শাখা: প্রাথমিক অনুসন্ধান	২৫৯
ড. মো. আতাউর রহমান	ইকবাল সাহিত্যে সূফী মতবাদের প্রভাব : একটি পর্যালোচনা	২৭৩
ড. জয়শ্রী দাষ	মনুসংহিতায় নারীর সম্পত্তির অধিকার : একটি পর্যালোচনা	২৮৯
ড. সেরিনা সুলতানা	মহাভারত ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা	২৯৯
ড. বেবী বিশ্বাস	সংস্কৃত ব্যাকরণে কৃৎ প্রত্যয়: একটি পর্যালোচনা	৩১১
ড. হোসনে আরা আরজু ড. মোহাম্মদ আলী	*মুদ্রারাক্ষস* নাটকে গৌণচরিত্রের ভূমিকা	৩২৫

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

সমর সেনের কবিতা : জীবনবোধ

ড. সৈয়দ তৌফিক জুহরী*

Abstract: A great poet Samar Sen, led the Bengali poetry in 1940. He has enlightened himself in diverse experiences. His original identity is that his main subject of his poetry is city life, middle-class movements and Progress awareness. Characteristics of poetry in the 40s are found in his poems. He speaks against capitalism, distorted civilization, and hypocrisy; among his literary works and political awareness. He wrote for the working people. The middle class mentality issues are also seen in his poetry. In this current article, we have described his poetic senses, where we try to find out his cognition about moving forward by conquering personal weaknesses.

বাংলা সাহিত্যের চল্লিশের দশক সাহিত্য আন্দোলন, যুদ্ধ-গৃহযুদ্ধ, বিদ্রোহ ও বিপ্লবে অনুরণিত। ১৯৩৭-এ জাপান আক্রমণ করেছে চীনে। চুক্তিভঙ্গকারী আগ্রাসী হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ধাবমান। উত্তাল ভারতবর্ষ বিবিধ রাজনৈতিক আন্দোলনে আলোড়িত। মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, নৌ-সেনা বিদ্রোহ ও ডাক-তার কর্মীদের হরতাল সম্পন্ন হয়ে চলছে। কবিতাচর্চাও এ থেকে দূরে নয়। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কাব্য-ভাষা দায়বদ্ধ। এমন বিরুদ্ধ প্রতিবেশে প্রগতিপন্থী কবি সমর সেনের (১৯১৬-১৯৮৭) কাব্যচর্চা শুরু। তিনি উত্তররৈবিক আধুনিক বাংলা কাব্যচর্চায় চল্লিশের দশকের প্রধান কবি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *কয়েকটি কবিতা* (১৯৩৭) প্রকাশিত হবার পর, কাব্যসৃষ্টি চলে ১৯৪৬ পর্যন্ত। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়- কবিতাসংগ্রহ *সমর সেনের কবিতা*। কাব্যচর্চায় সমর সেন আত্মপ্রচারবিরোধী এবং স্পষ্টবাদী, ব্যক্তিগত জীবনেও সাহসী বটে। জানতেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণির সহজাত দোদুল্যমানতা, কায়িক শ্রমে আলস্য, সুবিধাবাদী মানসিকতার বিষয়ে। এ-সম্পর্কে সচেতন কবির বিনয়ী উক্তি, 'জনগণের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিলনা, পরিধি ও পরিবেশ ছিল মধ্যবিত্ত। আমার ছাত্রাবস্থায় বাবা বলতেন আমার বন্ধুবান্ধব সবাই সচ্ছল। কথাটা ঠিক। আমাকে কেউ বিপ্লবী বললে মনে হতো – এবং এখনো হয় যে, বিপ্লবকে হেয় করা হচ্ছে। চিন্তায় ও কর্মে সমন্বয় আনতে না পারলে বড় জোর 'বিপ্লবী' সাপ্তাহিক চালানো যায়, কিন্তু বিপ্লবী হওয়া যায় না।'[১] তবে পারিবারিকভাবে তিনি সাহিত্যচর্চার এক উদার পরিবেশ পেয়েছেন।

পিতামহ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের প্রজ্ঞা, শ্রমনিষ্ঠা, গবেষণা ও ত্যাগী মানসিকতায় কবি প্রভাবিত হন। এ-কারণে যৌবনে পিতামহ সম্পর্কে এক ধরনের নাক-উঁচু ভাব[২] ছিল। এছাড়া সমর সেনের পিতা অরুণ চন্দ্র সেন কর্মজীবনে অধ্যাপক। কিন্তু অত্যন্ত আড্ডাপ্রিয় ও বন্ধুবৎসল। তিনি দীনেশ চন্দ্র সেনের মধ্যম পুত্র। পিতা ও পিতামহকর্তৃক সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের স্পর্শে, স্কুলে পড়ার সময় বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নিজেকেও গড়ে তোলেন মননধর্মী কবিরূপে। কবি হিসেবে তিনি যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রভাব-বলয় ভেঙেছেন নিপুণ দক্ষতায়, ঠিক তেমনভাবেই রচনারীতি ও প্রকাশভঙ্গীতে হয়েছেন ভিন্নতর। কবি বুদ্ধদেব বসু এ-কারণে মন্তব্য করেছেন, 'এই যুবক কবি যেন রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কখনই পড়েননি, সেটা আমার আশ্চর্য লাগে।'[৩] সমর সেন বহুবিধ পেশায় উপার্জনে সচেষ্ট হয়ে, অবশেষে সাংবাদিকতায় স্থির হয়েছেন। সম্পাদনা করেছেন– *Hindusthan Standard* (১৯৬২-১৯৬৪); *Now* (১৯৬৪-১৯৬৮); *Frontier* (১৯৬৮-১৯৮৭) প্রভৃতি পত্রিকা। তিনি *Frontier* পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২.

প্রথম কাব্যগ্রন্থ *কয়েকটি কবিতা* (১৯৩৭) গ্রন্থে প্রকাশ পায় ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ কালপর্বে রচিত কবিতাসমূহ। সমস্ত কবিতায় মূলত নাগরিক যন্ত্রণা, বণিকসভ্যতার অন্তসারশূন্যতা, মধ্যবিত্তের ভণ্ডামি, বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি প্রকাশ পেয়েছে। আর এই সমস্ত অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে রোমান্টিকতার আবহে। যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকার নিকট প্রেম বড় কথা নয়। শরীরী সম্মোহনই প্রবলতর। বিচ্ছিন্ন-বিপন্ন মানুষ আলোক-প্রত্যাশায় হতবিহ্বল। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *গ্রহণ* (১৯৪০)-এ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ কালপর্বের কবিতাবলী। যেখানে সমর সেনের নাগরিক কবি-পরিচয়ই প্রধান। পাশাপাশি কবিতা-পঙ্‌ক্তিতে মার্কসবাদ পেয়ে নতুন বিশ্বদৃষ্টি এবং আশাবাদ। *নানাকথা* (১৯৪২) সমর সেনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। এখানে স্থান পেয়েছে ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে রচিত কবিতাসমূহ। এ-সমস্ত কবিতায় বিচ্ছিন্নতা আক্রান্ত অন্ধকার-হতাশা-ক্লান্তি আরও গাঢ় হয়েছে। মধ্যবিত্তের অবক্ষয়িত চিত্র, বৈশ্বিক অস্থিরতা, মার্কসবাদ, সমকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উপজীব্য হয়েছে। *খোলা চিঠি* (১৯৪৩) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৩ কালপর্বে রচিত কবিতাগুলো। এটি কবির চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা চিত্রিত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে কবির আশাবাদ ও হতাশা সমানতালে চলমান। কখনও কবি বিশ্বাসের ভাঙনে হতবিহ্বল, আবার কখনও আশার আলো দেখে আলোড়িত। অন্ধকার ঝেড়ে ফেলে আলোর দিকে তৃষিত কবি যাত্রা করেছেন। *তিন পুরুষ* কবির পঞ্চম ও সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থে কবির ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৪ কালপর্বে রচনা করা কবিতাসমূহ স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যত নিয়ে ভাবিত হয়েছেন। আসলে *কবিতা* পত্রিকায় যখন *কয়েকটি কবিতা*-এর কবিতাসমূহ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তখনই সমর সেনের প্রতিভা বুঝতে পেরেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তখন *বন্দীর বন্দনা* (১৯৩০) কাব্যগ্রন্থকে তুলনায় রেখে, সমর সেন প্রসঙ্গে লিখলেন 'নবযৌবনের কবিতা' প্রবন্ধটি। সেটি পরবর্তীতে *কালের পুতুল* (১৯৪৬) গ্রন্থে স্থান পায়। সেখানে আমাদের জানালেন, *বন্দীর বন্দনা* ও *কয়েকটি কবিতা*- গ্রন্থ দুটি রচনাকালে, তাঁর ও সমর সেনের বয়স প্রায় সমান হলেও কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সমর সেন 'কিছু বেশি আধুনিক'। এখানে বিশেষণযোগে বুদ্ধদেব বসু জানাচ্ছেন, সমর সেন 'বেশি আধুনিক'। সেটি কীরূপ? কবি নিজেই যুক্তি দিয়ে বলেছেন, 'ইতিমধ্যে আট-দশ বছর কেটে গেছে, দেশের হাওয়া আরো কিছু বদলেছে; তুলনা করলে এইটেই দেখা যাবে যে 'কয়েকটি কবিতা' কালপ্রভাবে কিছু বেশি 'আধুনিক'. . . । *বন্দীর বন্দনা*-র বিদ্রোহ ছিল ব্যক্তিগত বা মানবিক। 'কয়েকটি কবিতা'-র বিদ্রোহের উৎস সামাজিক বিরোধ ও শ্রেণী-সংঘর্ষ।'[৪] বুদ্ধদেব বসু কবি সমর সেনের 'বেশি আধুনিক' হওয়ার প্রসঙ্গে তুলেছেন 'কালপ্রবাহের' কথা। সুতরাং কালপ্রবাহের হিসেবে আমরা দেখি, ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৪-এর সময়টা সমর সেন ভুগেছেন বয়ঃসন্ধিজনিত অস্থিরতা ও যন্ত্রণায়। তাঁর আত্মকথা থেকে জানা যায়, পিতার সাথে মত-বিরোধের জের ধরে বাড়ি ছেড়ে হোস্টোলে চলে গিয়েছেন। আত্মহত্যার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে কিনেছেন পটাসিয়াম সায়ানাইড। কিন্তু শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা না করে, ১৯৩৪ সালে গেছেন কবি বুদ্ধদেব বসুর কাছে। *বন্দীর বন্দনা* কাব্যের কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর ইংরেজিতে দখল ও কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁকে কাছে টেনে নিচ্ছেন। সুতরাং ১৯৩৫ সালে যখন *কবিতা* পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, দুজনার ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। *কবিতা* পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, নিয়মিত কবি ও কাব্যসমালোচক রূপে সমর সেনের আর্বিভাব ঘটেছে। পৃথিবীব্যাপী যদিও তখন মার্কসবাদী ও অমার্কসবাদীদের দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়ে নি, তবুও বহুবিচিত্র ঘটনার স্পর্শে ভারতবর্ষ স্ফুরিত। জার্মানিতে ১৯৩৩ সালে হিটলারের অভ্যুত্থান ঘটেছে। তখন সমগ্র পৃথিবীর লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দ ফ্যাসিস্ট বিরোধী। জাতীয় কংগ্রেস-এরও একই অবস্থা। ১৯৩৬ সালে *নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের* প্রতিষ্ঠা ঘটছে লখনৌ-তে। সে-সময় দুটি সংকলন *Towards Progressive Literature* ও *প্রগতি* প্রকাশিত হচ্ছে *প্রগতি লেখক সংঘ* দ্বারা। '*প্রগতির*

কবিদের মধ্যে ছিলেন সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) ও বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ; আরো ছিলেন অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০) ও সমর সেন।'[৫] পরে 'বেশি আধুনিক' শব্দটি আরও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, সমর সেনের আধুনিকতাকে সংশয়াচ্ছন্ন অন্ধকারকে ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার লড়াই হিসেবে অভিহিত করলেন। তুলনা করলেন, বিদ্রোহের সঙ্গে। এটি এমন এক বিদ্রোহ, যে বিদ্রোহের বাস্তবতা চিত্রিত হয় পারিপার্শ্বিক জীবনে ও সমাজের অশুভ-কুৎসিত-নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে জেগে ওঠার মধ্যে। সমাজের, ধর্মের ও সাহিত্যের অন্ধ-সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার মাধ্যমে। কিংবা প্রচলিত কাব্যরীতি ভেঙে নতুন রূপ ও রচনা-রীতির অনুশীলনের মাধ্যমে। বললেন, 'বর্তমান সময়ের সংশয়াচ্ছন্ন অন্ধকার যে-তরুণ চিত্তকে আবিষ্ট করেছে, সমর সেন তারই প্রতিনিধি'।[৬] অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করা এবং আপন স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সকলে ব্যস্ত। নীতিকথা ও নৈতিক শিক্ষার আড়ালে অনাচার-অবিচার-অত্যাচারের শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটছে। যৌবন-বাসনা বিকৃত; অবমাননাকর ও নিরানন্দ যান্ত্রিক কাজের নিষ্পেষণে মানুষের দেহ-মন সতেজতা হারিয়েছে। মানুষে-মানুষে স্বাভাবিক সম্পর্ক আর নেই।

৩.

আমরা জানি, মানুষের জীবনযাপনের পথ প্রধানত বৈষয়িক– তাই আলস্য, শ্রমবিমুখ মানসিকতা, বিষণ্নতা, ক্ষয় ও ক্লান্তির গ্রাস সর্বত্র। আসলে কবি সমর সেনের শৈশব-কৈশোর-যৌবন অতিবাহিত হয়েছে কলকাতায়। সে-কারণে নিকটে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন কলকাতাবাসীর জীবন। নাগরিক জীবন যেন কেবল কোনওমতে বেঁচে থাকার উপলক্ষ্য। শহুরে মানুষ বসবাস করছে খুপরি-ঘরে। সর্বত্র নিরেট স্বার্থচিন্তা। তাছাড়া পুঁজিবাদী সভ্যতার বিষফোঁড়া উৎপাদন করছে বিকৃতি ও বিকলাঙ্গতা। এ-সভ্যতা মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশে সহায়ক নয়। কারণ একটি সহমর্মিতাপ্রবণ সমাজ গড়ে ওঠে সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে। একমাত্র শ্রেণিহীন সমাজই পারে সামষ্টিক কল্যাণ দিতে। চল্লিশের দশকের কবিরা তাঁদের কাব্যফ্রেমে শ্রেণিহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে প্রত্যয়দীপ্ত হন। কবি সমর সেনও আশাদীপ্ত হয়ে, এই স্বপ্নকল্পনায় নিমগ্ন হয়েছেন। সেজন্য নগরকেন্দ্রিক নানা প্রবণতা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে তাঁর কবিতায়। যদিও কবিতা-কণ্ঠ অনুচ্চ, তবে তার প্রভাব অন্তর্ভেদী ও প্রগাঢ়। সেখানে আবেগ দূরীভূত হয়ে ঠাঁই নিয়েছে ব্যক্তিমনের সঙ্গে ব্যক্তিমনের সংঘাত। কারণ জীবন-যাপন তো কেবলমাত্র দিন-রত্রির আবর্তন নয়। তাতে রয়েছে পরবর্তী দিনের শ্রমক্লান্ত প্রস্তুতি আর হতাশার জটাজাল। এই হতাশা হল ক্লান্তির নিয়ামক। এর ফলে জীবনে আসে স্থবিরতা। নগর জীবনের দগ্ধ-স্রোত দমবন্ধ প্রতিবেশ সৃষ্টি করে। একটা কিছু না পাবার বেদনা ঘটায় দুঃখবোধের অতিশায়ন। রাত্রের অন্ধকারে স্নিগ্ধ সুগন্ধী রজনীগন্ধাও অনুরণন জাগায় না। চারিদিকের বয়ে যাওয়া হওয়ার ভেতরে অনুভব হয় অপ্রাপ্তির দীর্ঘশ্বাস:

> আজকের আকাশে কোথা থেকে দিয়েছে হাওয়া,
> সমস্ত গা শিরশির করে ওঠে;
> হাওয়ায় এলোমেলো ফুলের গন্ধ,
> আর দীর্ঘ রাত্রি ভরে তীব্র, নিঃশব্দ কীসের হাহাকার।[৭]

ব্যক্তিজীবনে যেকোনও মুহূর্তে জীবনে আঁধার নেমে আসতে পারে। তখন অপ্রাপ্তির বেদনায় জীবন-যাপন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তমসাচ্ছন্ন সেই পরিবদ্ধ পরিবেশ একাকীত্ববোধকে আরও গাঢ় করে। সৃজনশীল মানুষও এই বিরূপ প্রতিবেশের রিরংসা থেকে মুক্ত নন। এই একা হবার ভীতি প্রতিনিয়ত পোড়ায়। কবিতায় এমন বিরুদ্ধ ও একাকীত্বের বেদনামাখা প্রতিবেশ বর্ণনায় কবি দেখান, 'আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকার'। অন্যদিকে যার সান্নিধ্য-প্রত্যাশায় কবি ঘুমহীন সেই নারীও ভাষাহীন, নির্বাক, নিঃশব্দ পাথরের মতন তাকিয়ে

আছেন। এ-যেন স্পর্শসুখহীন লালসা। প্রেম যেখানে মিলনপ্রত্যাশী উভয়ের সম্মুখেই আছে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল। তখন কবিচিত্ত নির্মম প্রশ্নজালে বিহ্বল। আবার সে-সবের জবাবও তিনি নিজেই খুঁজে নেন :

দিনের পরে কেন রাত আসে,
আর তারারা কাঁপে আপন মনে,
কেন অন্ধকার
মাটির পৃথিবীতে আসে সবুজ প্রাণ,
চপল, তীব্র, নিঃশব্দ প্রাণ–
বুঝতে পারি কেন
স্তব্ধ অর্ধরাত্রে আমাকে তুমি ছেড়ে যাও
মিলনের মুহূর্ত থেকে বিরহের স্তব্ধতায়।[৮]

কর্মব্যস্ত জীবনের গ্লানি-ধূসর দিনপ্রান্তে মানুষ ঘরে ফেরে। এই ফিরে আসাটা শ্রান্তি দূরীকরণের উপায়। তখন মানুষ প্রেয়সীর সান্নিধ্য কামনা করে। কিন্তু নাগরিক জীবনে প্রশান্তি নেই। তাই এক সুগভীর বেদনা নিয়ে মধ্যরাত্রে কবির ঘুম ভাঙে। বেহিসেবি জীবনের হিসেব মেলে না। কবি দেখেন, বিপুল আকাশের কোথাও নীল নেই। আকাশ 'বর্ণহীন'। হাওয়া 'বিপুল শূন্যতা' বয়ে বেড়াচ্ছে। ঘুমের পরম প্রাপ্তি যে সুখস্বপ্ন, তাকেও প্রতিমুহূর্তেই গ্রাস করছে দুঃস্বপ্ন। অচেতনতা, ঘোর, ক্রন্দন গ্রাস করে কবির সর্বস্ব। বিষণ্নতায় ছেয়ে যায় চতুর্দিক:

মাঝে-মাঝে ঘুম ভেঙে যায়
মধ্যরাত্রে।–
বাইরে এসে দেখি
তারায় ছেয়েছে বর্ণহীন আকাশ–
আর হাওয়া দিয়েছে বিপুল শূন্যতা থেকে;
সে-হাওয়ায় শুধু যেন শুনি,
কান পেতে শুনি–
কোন্ সুদূর দিগন্তের কান্না;
সে-কান্না যেন আমার ক্লান্তি,
আর তোমার চোখের বিষণ্ন অন্ধকার।[৯]

প্রকৃতির মমতাভাণ্ডারকে পরিত্যাগ করে নগর পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেখানে মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি, ত্যাগ-তিতিক্ষা মূল্যহীন। তাই-তো কলকাতার বাস-ট্রামের ভীড়, মানুষের ক্লেদময় হাহাকারের গল্পকথা কবিতার অনুষঙ্গ। সেখানে নগরের প্রকৃত রূপটিই প্রস্ফুটিত হয়েছে। আসলে কবি-কথিত কলকাতা শহর তো রোমান্টিক নয়। শহুরে মানুষের মাঝে রয়েছে শ্রমনিষ্ঠ শ্রমিক শ্রেণি। তাদের সম্বল উদয়াস্ত খাটুনি। সমালোচকের মতে, 'কলকাতা শহরের চারিপাশে শুধু ক্ষয় আর ক্ষয়, বিকৃতি কবির কলমে মূর্ত হয়।'[১০] পেট্রোল আর কেরোসিনের তীব্র গন্ধে রাজপথ ধাঁধাঁশীল। রাত্রের আলো-ঝলমলে চতুর্দিক যেন নিষ্ঠুর বিভ্রম। দিনগুলি কবির দৃষ্টিতে 'বিবর্ণ', আর রাত্রি 'আলকাতরার মতো'। সমস্ত দিনের শেষে ক্লান্তিমগ্ন মানুষগুলোর নেই মাথা গুঁজবার অবলম্বন। কারণ শহর কলকাতা কবির কাছে 'কলেরা আর কলের বাঁশি', 'গণোরিয়া আর বসন্ত', 'বন্যা আর দুর্ভিক্ষ' দিয়ে ঘেরা। রাত্রির দুঃস্বপ্ন থেকে ভোরবেলাতেও মুক্তিলাভ অসম্ভব। প্রতিটি ভোর শুরু হয় নিতান্তই যান্ত্রিকভাবে :

দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড় ;

কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে !
কলেরা আর কলের বাঁশি আর গণোরিয়া আর বসন্ত
বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ[১১]

কবিতার 'এই কথাগুলিতে আছে শহরের উচ্ছৃঙ্খল তোলপাড়ের প্রতিধ্বনি, আছে ব্যঙ্গ ও বিক্ষোভ ... নিরক্ত মানুষের ক্লান্তি, আর আছে দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদের ইঙ্গিত – সেটাও অগ্রাহ্য নয়।'[১২] রাতের বর্ণনায় কবি মুন্সীয়ানার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কারণ রাতের কলকাতা ভিন্ন রূপ নিয়ে কবির সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। কিংবা যখন সবেমাত্র রাত শেষ হয়েছে, তখন ধাবমান মোটরের ধুলোয় মলিন হয় রাজপথ। চতুর্দিকে 'ব্লিচিং পাউডারের' কটুগন্ধ ভেসে বেড়ায়। নর্দমার দুর্গন্ধ যেন মানুষের পাপের ফসিল। দিনের পর দিন নগরের পাপ বাড়তে থাকে। রাতে সেই পাপের ফসিল ঢেকে রেখে পরবর্তী দিনের প্রস্তুতি চলে। শ্বাসরোধী এই অপরিচ্ছন্নতা গ্রাস করে চেতনাকে। জীবনযাপনের জন্য নেই কোনও শান্ত-স্নিগ্ধ আবাস। এমন মুহূর্তে নারীসঙ্গও কবির নিকট প্রেমহীন। যেন 'একসঙ্গে রাত্রে শোবার দুর্লভ সুযোগ' ছাড়া আর কিছু নয় :

রাত্রির শেষে
রাস্তার ধুলোকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে
ধাবমান মোটরের উদ্ধত বেগ:–
চারিদিকে ব্লিচিং পাউডারের তীক্ষ্ণ গন্ধ।
'তুমি কি আজ আসবে?'
– নীল, নীল চোখে শরীরের শেষহীন প্রশ্ন,
ভিজে ফুলের মতো নরম প্রেম–
'নিশ্চয় আসব'–
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তা-ছাড়া একসঙ্গে রাত্রে শোবার
দুর্লভ সুযোগ![১৩]

অবশেষে রাতের আঁধার দূরীভূত হয়ে ভেরের আলো প্রকাশিত হল। কিন্তু কলকাতা শহর জঞ্জালে ঢাকা। শ্বাসরোধী অপরিচ্ছন্ন প্রতিবেশে তা বসবাসের অনুপযোগী। ধর্মঘটে বেহাল হয়েছে কর্পোরেশন। অগণিত মানুষ ছুটছে কাজের খোঁজে। মানুষের কর্মচাঞ্চল্য, কর্কশ কোলাহল, অফিস-আদালতের পথে ছুটন্ত বাস-ট্রাম বৃদ্ধি করছে যানজট। মানুষের আত্মিক তৃপ্তির সাথে তার কর্মের রয়েছে অমিল। এসব দেখে কবি দগ্ধ হৃদয়ে উচ্চারণ করেন :

কত ধূসর চোখে অশ্লীল, নাগরিক আনন্দ,
পিচের পথে
অগণিত মানুষের ক্লান্ত পদক্ষেপ।[১৪]

৪.

পুঁজিবাদের নিগ্রহে শহুরে মানুষের জীবন যান্ত্রিক হয়ে গেছে। স্বার্থচিন্তা তাদের দিয়েছে নির্মম আত্মসমর্পণের মানসিকতা। পুঁজিবাদী সভ্যতার জন্ম ঘটেছে বণিকতন্ত্রের যন্ত্রযাত্রায়। মানবতার সুনিশ্চিত সম্ভাবনাকে সে প্রতিনিয়ত গলা টিপে হত্যা করছে। অহোরাত্র চলছে পুঁজিশক্তির দাম্ভিক লেহন ও লালসা। চলছে রাষ্ট্রযন্ত্র দখলের হীন পাঁয়তারা। একমাত্র উদ্দেশ্য, নিজের কারখানায় উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের নিত্য-নতুন পন্থা উদ্ভাবনের। সমর সেনের অন্তরে বহন করছেন এই জড়যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আগ্রহ। সে-প্রচেষ্টা কাব্যদেহেও ঝংকৃত হয়েছে। শোষণ, নিষ্পেষণে জর্জরিত আত্মার হাহাকারকে কাব্যবন্দী করবার প্রচেষ্টা এই সময়ে

আরো প্রগাঢ় হয়েছে। আশাভঙ্গের বেদনায় মানুষ যখন পলায়নমুখী, কবি তখন আস্থা ও বিশ্বাসের খোঁজে নিমগ্ন। অবশেষে তা খুঁজে না পেয়ে, অসহায় বাকরুদ্ধ কবি 'অখ্যাত নায়ক' কবিতায় শহরের বির্বণ চিত্রপটে চিত্রিত করেন মানুষের হতাশার প্রতিধ্বনি। কবি দেখেন মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীর আত্মিক সম্পর্কের পরিসীমা জুড়ে রয়েছে শূন্যতা। কবির কাছে এই ঘটনাটি এমন– যেন 'গম্ভীর শব্দে' আকাশ কাঁপছে। আর মানুষের বসতিটিও 'বিবর্ণ'। মাঠ ঢেকে আছে 'হলুদ ঘাসে'। তাই কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে:

তবু বারেবারে মনে হয়–
এখানে হাওয়া নেই,
মাটির উপরে গ্রীষ্মের পাতাগুলি কঠিন পাথর।[১৫]

এর পরপরই 'পুনরুজ্জীবন' কবিতাতে কবিহৃদয় আরও অধিক বিপন্ন-বিষন্নতায় কাতর। কিন্তু মুক্তির পথ কী খুঁজে পাওয়া সম্ভব ? প্রকৃতপক্ষে এ-পর্যায়ে ব্যক্তিমানুষটি হয় যায় আরও অধিক জনবিচ্ছিন্ন। কবি সমর সেনও এই বিচ্ছিন্নতার উর্ধ্বে নন। শোষণের কুটিল কালচক্রে ভাঙ্গন না ধরলে মুক্তির পথ নেই। যে ভিত্তিভূমি বর্তমান সভ্যতাকে ধারণ করে রয়েছে, তার উৎসমূলে পচন ধরেছে। ধনতন্ত্রের নগ্ন-নিষ্ঠুরতায়– তা অন্তঃসারশূন্য, জরাগ্রস্থ। কর্মক্লান্তিময় মুমূর্ষু জীবনকে কবি প্রকাশ করেছেন এভাবে:

ক. শান্ত-নীল চোখে জীবনের ক্লান্তি,
সেই পুরাতন স্পন্দমান বাসনা আর নেই,
সেই স্বাধিকারপ্রমত্ত রক্তের অন্ধ জয়গান।[১৬]
খ. আর মাঝে-মাঝে উদ্যত যমদূত ক্লান্ত হতাশা আঁকে
দিনরাত্রির নরকের সিংহদ্বারে।[১৭]
গ. বৃষ্টিহীন আকাশের গ্রীষ্মে
ছায়ালোকে প্রতীক্ষার
পুঞ্জীভূত ক্লান্তি ![১৮]

মুক্তির প্রত্যাশায় যেসকল মানুষ বিপন্ন, তাঁদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির খাতা শূন্য থাকে। সেই সাথে তাঁদেও জীবন থেকে শুভবোধেরও অপমৃত্যু ঘটে। তাঁর জনারণ্যেও নিঃসঙ্গ পথিক। সমস্যাসংকুল জীবন হতাশাপূর্ণ। বিশৃঙ্খলায়, অবক্ষয়ে, হাহাকারে জন্ম দেয় সন্দেহ এবং হতাশা। দিবা-রাত্রির কর্মমুখর গ্লানি থেকে মুক্তিপথ খুঁজতে গিয়ে আরও অধিক বিচ্ছিন্নতা এসে গ্রাস করে। এভাবে প্রতিটি দিন গ্লানি বয়ে-বয়ে মানুষ ঘরে ফেরে। কিন্তু সেখানেও অন্ধকার ঠাঁই নেয়। পুঞ্জীভূত গ্লানিবাষ্পে আরও গাঢ় অন্ধকারের বোঝা এসে উপস্থিত হয় :

ক. ঘরে ফিরি, আলো জ্বেলে কুলুঙ্গিতে রাখি,
এ-অন্ধকারে আরো আরো অনেক অন্ধকার জমে।[১৯]
খ. ধূসর পথে অন্ধকার, দীর্ঘ গাড়ি
মন্দিরের বিবর্ণ দুঃস্বপ্ন,
লজ্জাহীন গণিকার সলজ্জ প্রণয়[২০]
গ. নীলচে চোখ, তুঙ্গ বুক, উরুর নিরুদ্দেশ অন্ধকার,
দেহস্বার্থের স্বর্গে আস্থা হারাই,
ও নিবুদ্বেগ উদ্দাম বিলাস
নতুন মানুষের জন্মে
আবার জন্মমৃত্যুপ্রেমের কারাগার রচে,[২১]

জীবনকে সমর সেন স্বচ্ছভাবে বুঝতে পেরেছিলেন বহুবিচিত্রভাবে কলকাতার সাথে তাঁর সংযোগসূত্রের কারণে। এই সংযোগ সম্পর্কে 'বলা যেতে পারে, সমর সেন কলকাতাকে যে ভালো বেসেছিলেন তা ঠিক নয়– তেমনি আবার মনেপ্রাণে, শহরকে ঘৃণাও করতে পারেননি।'[২২] আসলে কবির বেড়ে ওঠার নিয়ামক হয়েছিল শহরের নানান অনুষঙ্গ। তাছাড়া কলেজে পাঠকালেই নিমগ্ন হয়েছেন নিত্য-নতুন উদ্ভাবনে। গ্রহণ করেছেন দুঃসাহসী পদক্ষেপ। সহপাঠিদের সাহচর্যে প্রকাশ করেছেন *Today* নামে একটি ইংরেজি দ্বিমাসিক পত্রিকা। সেখানে পরিবার পরিকল্পনা প্রসঙ্গে প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় বিব্রত হয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ। এ-সময়েই বয়ঃসন্ধিকালীন অস্থিরতায় পিতার সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় গৃহত্যাগ করেছেন। 'উঠেছিলেন হোস্টেলে এবং আত্মহত্যার চেষ্টায় পটাসিয়াম সায়ানাইডও সংগ্রহ করেছিলেন।'[২৩] তখন কলকাতার নগরজীবনে লেগেছে নব-চেতনার ঢেউ। বাঙালির উনিশ শতকীয় জীবনযাত্রা, বিশ্বাস, ভাবচিত্তে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। শিক্ষিত বাঙালিরা হয়ে পড়েছেন কলকাতাকেন্দ্রিক। সমর সেন এই অস্থির সময়প্রবাহকে অস্বীকার করতে সক্ষম হন নি। কারণ এই বিকৃত লালসাপূর্ণ জীবন থেকে যেন মুক্তির পথ নেই। কবি স্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখেন, প্রতিটি নতুন দিন কোনো সুখস্বপ্নের বীজ বয়ে আনে না:

ট্রামবাসের শব্দে, সিগারেটের গন্ধে,
নরম বুকের মোহে,
একবার ভেবে দেখো–
পিছনে আর সামনে কত ধূসর প্রান্তর,
কত মুখর মরুভূমি, কত কঠিন কঙ্কাল।[২৪]

নতুন দিনটি পুরতান গ্লানিকে পেছনে রেখে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয় না। কারণ মানুষ তো পূর্ব-পরিকল্পিত ভিত্তিভূমিতে ভবিষ্যতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সুতরাং ভবিষ্যত দৃশ্যতঃ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেক্ষেত্রে কাব্যপ্রত্যয় হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত :

ক. নতুন দিনের গন্ধে হানা দেয় পুরনো দিন
মনে রেখো[২৫]
খ. রক্তের অন্ধকারে নতুন জীবনের স্বপ্ন[২৬]
গ. আমাদের রক্তে আজ
কত পুরনো স্মৃতির বিষাক্ত সাপ[২৭]
ঘ. আজো জ্বলন্ত খড়্গের মতো আকাশ
চাঁদ ওঠে,
আজো সামনে
মৃত্যুর মতো মন্থর জীবন।[২৮]

কবি দেখছেন কলকাতা নগরী পরিণত হয়েছে উৎকোচের নগরীতে। জনগণের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের মধ্যেই অনুপ্রবেশ ঘটেছে এই পাপাচারের। পোস্ট অফিস থেকে পুলিশ বাহিনী পর্যন্ত সকলেই এই অন্ধকারে নিমজ্জিত। মানবিক চেতনা মূল্যহীন। এক্ষেত্রে কবি একটি ঘটনার বর্ণনা করেছেন। তা হল– ১৯৬৮ সালের ১৪ই এপ্রিল 'ফ্রন্টিয়ারের' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সাধারণত পত্রিকার কাটতি ভাল হলে, পত্রিকা-প্রকাশের ক্লান্তি অনেকাংশে লাঘব হয়। কিন্তু অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদকদের নিকট পত্রিকা পাঠানোর প্রক্রিয়াটা সহজসাধ্য ছিল না। নিয়ম ছিল, নাম রেজিস্ট্রেশন করা থাকলে কোথাও পত্রিকা পাঠাতে দুই পয়সা লাগবে। নয়তো লাগবে বিশ পয়সা। কবি গ্রাহক তালিকা নিয়ে দেখা করেছেন বেশ কয়েকজন বড় কর্তার সঙ্গে। কিন্তু উৎকোচ ছাড়া কাজটি যে সহজসাধ্য নয়, সেটি সহজে বোধগম্য হয় নি। অন্য পত্রিকাসমূহ

সময়মত গ্রাহকসমীপে পৌঁছুলেও তাঁর ক্ষেত্রে ভিন্ন চিত্র দৃশ্যমান হল। তিন সপ্তাহের বেশি লেগে গেল। সময়মত উৎকোচ দিলে এমন হত না। উৎকোচ প্রসঙ্গে সমর সেনের উক্তিটি বিশেষ স্মরণযোগ্য, 'উৎকোচের কথা ঠিক কী করে তোলা যায় জানতাম না, সঙ্কোচ হতো– এখনো হয়।'[২৯] এছাড়া নগরজীবনের আরেক ইমেজে কবি চিত্রিত করেছেন গণিকার সাজসজ্জা। কারণ গণিকার মত অবক্ষয়মথিত এই নগরজীবন, যেখানে রয়েছে প্রসাধনচর্চার হিড়িক। প্রসাধনচর্চা লক্ষ্য করা যায় রাত্রির আলোকসজ্জায়, বর্নিল পোস্টারে আর কৃত্রিম রঙয়ের প্রতাপে :

কামনার বিশাল ইশার!
ট্যাঁকে টাকা নেই,
রঙিন গণিকার দিন হলো শেষ,
আজ জীবনের কুঁজ দেখি তোমার গর্ভে,[৩০]

এখানে 'কামনার বিশাল ইশার' কথাটি উচ্চারণ করে, কবি গণিকা ও কলকাতা নগরীকে একই ফ্রেমে চিত্রিত করেছেন। যেখানে কলকাতা নগরী পরিণত হয়েছে বহুভোগ্য পণ্যে। জীবন নয় 'জীবনের কুঁজ' মাতৃগর্ভে শায়িত। বিকৃত এই মানবদেহ ভূমিষ্ঠ হলে, পৃথিবীকে গড়বার কাজে ব্যপৃত হতে পারবে না। সুতরাং এমন কর্মনিষ্ঠ মানুষ পাওয়া যাবে না, যে বস্তুবিশ্বকে জীবনজগতে রূপান্তরিত করবে। তাছাড়া নাগরিক মানুষের বিষয়বুদ্ধির কাছে মার খায় হৃদয়বোধ ও প্রীতি। তাই নগরজীবনের বর্ণনায়, কবির রোমান্টিক অনুভব কখনওই পূর্ণতা পায় নি। এই অনুভূতি নৈঃসঙ্গে, হতাশায়, আলস্যে– হয়েছে আরও গভীর। অপ্রাপ্তির গ্লানি, ব্যস্ততা ও অস্থিরতা নিয়ে গেছে বস্তুময় জগতের পতনভূমিতে। কবিতার ভাষায় এই মেকি নগরের বৃথা আস্ফালনের মুখে কবি তাই এঁকে দিয়েছেন চপেটাঘাত। আমাদের দেখিয়েছেন, চাকচিক্যময় এই নাগরিক জীবনের লাবণ্যপূর্ণ, ঝকঝকে ও ঝলমলে পর্দার পেছনেই লুকানো রয়েছে বিপর্যস্ত জীবনযন্ত্রণা।

৫. উপসংহার

বিনষ্ট জীবনের জটাজাল থেকে মুক্তিলাভের আকুতি ছড়িয়ে আছে সমর সেনের কবিতার পঙ্‌ক্তিতে। কিন্তু আমরা জানি, গড্ডল-প্রবাহে নিমজ্জিত জীবন নির্জীব, নিষ্ফল, কুৎসিত ও নিরর্থক। যা থেকে আধুনিক মানুষের মুক্তি অসম্ভব। তবুও এই গ্লানিধূসর জীবনধারা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে হবে। পরাজিত হওয়া যাবে না। এই স্বপ্ন-প্রত্যাশাকে বক্ষে ধারণ করে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিষ্ক্রিয়-দুর্বল-অক্ষম অবস্থানকে পুঁজি করেও কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছেন সমর সেন। সচেতনভাবে তাঁর কাব্যে যেমন এসেছে সাম্যচিন্তা, আবার ঠিক সেভাবেই প্রবলতর হয়েছে বৃত্ত ভাঙ্গার দুঃসাহসী প্রত্যয়। বলাবাহুল্য, ভেতরে-ভেতরে তিনি বিপন্ন। তবুও জীবনব্যাপী নিবিষ্ট থেকেছেন মানবতার শ্রেয়শীল সন্ধানে। স্বপ্ন ও সম্ভাবনায়, বিশ্বাস ও আর্দশে এই প্রচেষ্টা ছিল নিরন্তর। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, তিরিশ-চল্লিশের দশকের কাব্যপ্রবাহে সমর সেনের কাব্যচর্চা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

তথ্যনির্দেশ

১ সমর সেন, *বাবুবৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক* (পুলক চন্দ সম্পা.), (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯১, ৩য় সং.), পৃ.৫৬

২ তদেব, পৃ.১৫

৩ সমর সেন, 'নবযৌবনের কবিতা', *কয়েকটি কবিতা* (পরিশিষ্ট : প্রবন্ধ), (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ৩য় সং, ২০১২), পৃ.৭৯

[৪] তদেব, পৃ.৮০

[৫] সুমিতা চক্রবর্তী, 'কবি সমর সেন ও মননের সংকট', *সমর সেন* (খালেদ হোসাইন ও সাজ্জাদ আরেফিন সম্পা.), (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০২), পৃ. ২৭৭

[৬] সমর সেন, *কয়েকটি কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

[৭] সমর সেন, 'গোধূলি', *কয়েকটি কবিতা*, পূর্বোক্ত,পৃ. ১১

[৮] সমর সেন, 'নিঃশব্দতার ছন্দ', *কয়েকটি কবিতা*, পূর্বোক্ত,পৃ. ১২

[৯] সমর সেন, 'দুঃস্বপ্ন', *কয়েকটি কবিতা*, পূর্বোক্ত,পৃ. ২৩

[১০] বৃন্দাবন কর্মকার, *সমর সেন : কবির জীবন ও কবিতায় জীবন*, পূর্বোক্ত,পৃ. ১৬৭

[১১] সমর সেন, 'নাগরিক', *কয়েকটি কবিতা*, পূর্বোক্ত,পৃ. ৪৭

[১২] সমর সেন, 'নবযৌবনের কবিতা'(পরিশিষ্ঠঃ প্রবন্ধ), *কয়েকটি কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৩

[১৩] সমর সেন, 'আমন্ত্রণ', *কয়েকটি কবিতা*, পূর্বোক্ত,পৃ. ৪১

[১৪] সমর সেন, 'ভোরের কলকাতা', *কয়েকটি কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

[১৫] সমর সেন, 'অখ্যাত নায়ক', *গ্রহণ* (কলকাতা : অনুষ্টুপ , ২০১২ , ৩য় সং.) ,পৃ. ১১

[১৬] সমর সেন, 'পুনরুজ্জীবন', *গ্রহণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

[১৭] সমর সেন, 'ঘরে বাইরে', *গ্রহণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

[১৮] সমর সেন, 'যাত্রা', *গ্রহণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

[১৯] সমর সেন, 'নববর্ষের প্রস্তাব', *নানাকথা* (কলকাতা : অনুষ্টুপ , ২০১২ ,৩য় সং.) ,পৃ. ৪৭

[২০] সমর সেন, 'মৃত্যু',*কয়েকটি কবিতা*, পূর্বোক্ত,পৃ. ৪৩

[২১] সমর সেন, *নানাকথা*, 'নববর্ষের প্রস্তাব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

[২২] বৃন্দাবন কর্মকার, *সমর সেন : কবির জীবন ও কবিতায় জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

[২৩] তদেব, পৃ.২১

[২৪] সমর সেন, '১৯৩৭', *কয়েকটি কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

[২৫] তদেব

[২৬] সমর সেন, 'পোস্ট গ্রাজুয়েট', *কয়েকটি কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

[২৭] সমর সেন, 'বসন্ত', *কয়েকটি কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

[২৮] সমর সেন, 'রামগিরিতে কতদিন', *কয়েকটি কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৯

[২৯] সমর সেন, *বাবুবৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক* (পুলক চন্দ সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

[৩০] সমর সেন, 'ঘরে বাইরে', *গ্রহণ*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

কবি শ্রীমধুসূদনের সীতা

শৈবাল রায়*

Abstract: In view of this article, it is nothing but just a mind set up that Madhusudan had introduced a revolutionary attitude towards Ramayana studies. Rather we believe that at least in case of Sita, he took the same policy like Balmiki, that the character should remain within the comfort zone of AamAadmi as well as reach a new horizon of intellectuality. Here we have to admit that Madhusudan never placed a word on Sita's monologue which could discomfort old mentallited. His Sita had very traditional approaches to Rama. On the other hand It is very significant that Madhusudan made a room for Sita that She could speak Her own. She experienced that nobody, including Her mother, are not interested to save Her. All the so called good parties waited badly to create a rape condition just to fulfil their political ambition. It knocked Sita in deep and She committed an alternative modernity. The Lady realised that Her love to the spouse, Her deepest feelings for all in the world, are not going to be considered by the men of Her own, more over an insecurity over powered, Madhusudan's Sita started to realise that Rama had no more concern with her. The battle is being fought to satisfy egos. She found that the rest was just dark. It was quite possible that the character may conclude in European alienation, specially when the poet promised to maintain the Western structure. But it was Madhusudan's subconscious. His Sita took a very Indian approach. Instead of all the rough She never lost Her deep personalised peace, never blamed anybody, even enemies. She lived for love and had tried to overpowering the evil by love. She had the sense that SATITYA is not just a practice but a life to enjoy. Here we tried to locate the sprite of the lady as directed by Madhusudan- in direct words or through sensibility.

বাংলা সাহিত্যের একটা প্রকাণ্ড মিথ– মধুসূদন মিথ ভাঙার, ভেঙে গড়ার সওদাগর। আর ঠিক এই জায়গাটিতেই বুদ্ধদেব বসুর ছিল প্রবল আপত্তি।

> মেঘনাদবধ কাব্যের পদে-পদে দেখা যায় যে রাম-সীতার লোকশ্রুত মহিমায় কবি অভিভূত, এবং রাবণের দুশ্চরিত্রতার ধারণাও তার মনে বদ্ধমূল, তা-ই যদি না হতো, তাহলে ওই সুদীর্ঘ কাব্যে এই অদ্ভুত রহস্যময় প্রশ্ন উত্থাপিত না হয়েই পারতো না যে রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন কেন? সম্ভোগের জন্য? কিন্তু সম্ভোগ কোথায় ? সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে এসেই রাবণ যে তাকে একাকিনী অশোককাননে রেখে দিলেন, রাবণ চরিত্রের এই মৌল দ্বন্দ্ব কারো চোখেই ধরা পড়েনি, যতদিন না রবীন্দ্রনাথ সন্দীপের মুখ দিয়ে কথাটা বলিয়েছিলেন। ... তিনি (মধুসূদন) সেই চিরাচরিত জনরবকেই মেনে নিয়েছিলেন যে রাবণের সীতাহরণ তার আত্মহত্যার উপলক্ষ এবং উপায় ছাড়া কিছু নয়, মনে-মনে তিনি রামেরই প্রেমিক, রামের হাতে মৃত্যুতেই তার শেষ।[১]

বুদ্ধদেবের আলোচনায় *ঘরে-বাইরের* সন্দীপের কথাটুকু উদ্ধৃত নয়, আমরা প্রসঙ্গত সেটি স্মরণ করে নিতে পারি:

> আমি জানি দু'তিনবার এক-একটা মুহূর্ত এসেছে যখন আমি ছুটে গিয়ে বিমলার হাত চেপে ধরে তাকে আমার বুকের উপর টেনে আনলে সে একটি কথাও বলতে পারত না, কিন্তু সেই মুহূর্তগুলিকে বয়ে যেতে দিয়েছি; নিঃসংকোচ বলের সঙ্গে নিশ্চিতপ্রায়কে এক নিমেষে নিশ্চিত হয়ে উঠতে দিইনি। যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে শ্রদ্ধা করি সেও এমনি করেই মরেছিল। এই সংকোচটুকু না থাকলে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পুজো করত!...[২]

---

* পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বুদ্ধদেবের সমালোচনা এটা স্পষ্ট করে দেয় যে মধুসূদন অন্তত সীতাকে নিয়ে আমাদের চিরায়ত জনরবকে চৈতন্যের নতুন কোন বিপন্ন সীমান্তে দাঁড় করিয়ে দিতে চান না, বরং কোথাও একটা যেন সীতাকেই রাম-রাবণের যুদ্ধের কারণ হিসেবে দেখতে চাওয়া হয়। আমাদের শেষোক্ত বাক্যে যে অভিযোগের সুর লাগে তা যথার্থ সময় মতো পর্যাপ্ত বিস্তার নিয়ে বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু তার আগে রাবণ এবং সীতার পারস্পরিকতার মধ্যে সীতার দুর্বলতার অবকাশ মাত্র না দেখিয়েও কীভাবে ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যাকে, প্রাতিষ্ঠানিক ভাষ্যকে চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় তার একটা চমৎকার নিদর্শন দেখে নেবো– এবং সেই সূত্রে ভাবতে চেষ্টা করব মধুসূদনের উনিশ শতকের সীতার মনে এসব প্রশ্ন জাগে না কেন? তবে কি এই না জাগার মধ্যেই গড়পড়তা নারীর জীবন সংকটের প্রত্যক্ষ স্পর্শ বাঁচিয়ে, মধুসূদন সীতার মধ্য দিয়ে নতুন কোন অস্তিত্বের তাৎপর্যের, জীবনের মানে খোঁজার, নতুন কোন দিশা দিতে চেয়েছেন বাঙালিকে?

অন্ধ্রপ্রদেশের মেয়ে রঙ্গনায়কাম্মার সাড়া জাগানো তিন খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থ *রামায়ণ বিষবৃক্ষম* (১৯৭৪-৭৬)। গবেষক নবনীতা দেব সেন সেই রচনা প্রসঙ্গে আলোচনায় মূল গ্রন্থের যে অংশবিশেষের অনুবাদ প্রদান করেছেন তার প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হল: 'ভাগ্যিস, সর্বসমক্ষে আমি রাবণকে কোনও অভিশাপ দিয়ে ফেলিনি? তারপর সেই অভিশাপ সবার সামনেই যদি বিফল হত! উঃ –সে বড়ই লজ্জার ব্যাপার হত!'[৩]

রামায়ণ বিষবৃক্ষম-এর শতাধিক বৎসর পূর্বের কাব্যে মধুসূদনের পক্ষে এতখানি বৈপ্লবিক হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তার আধুনিকতার অভীপ্সা ভিন্ন পথে প্রবাহিত। সেখানে তিনি দেখাতে চান, একজন নারী হিসেবে-সাধারণ নারী হিসেবে, কীভাবে সীতাকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহৃত হতে হচ্ছে অথচ তার উল্টোদিকে এক প্রবল আত্মগত সৌন্দর্যবোধে সীতা সে সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে গিয়ে তুলে ধরছেন সুখী ও সুন্দর জীবনের এক স্বপ্ন– যে স্বপ্ন লালন করা সম্ভব এমন কী আমাদের মতো অতি সাধারণ প্রত্যেক মানুষের। আদি কবির মতো তিনিও অতিমানবদের মধ্যে সীতাকে রাখছেন আমাদের স্পর্শসীমার মধ্যে।

সীতাকে লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছেন রাবণ। পথিমধ্যে বৃদ্ধ জটায়ু পথরোধ করেছেন তার। বেধে গেছে দ্বৈরথ। তারই মাঝে সহসা সীতা হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন মাটিতে। মাটিই যে তাঁর মা। সহসা সে স্পর্শে সীতা যেন আশা দেখলেন; আকুল হয়ে বলে উঠলেন: 'কেমনে সহিছ।/দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা? এস শীঘ্র করি!'[৪]

কিন্তু অন্ত্যজ মানুষের প্রতীকরূপ বৃদ্ধ জটায়ুর যে স্বাভাবিক মূল্যবোধ, মা বসুন্ধরা ঈশ্বরিত হতে গিয়ে সেটুকুও দেখাতে পারলেন না। মাতৃহৃদয়ের নিদারুণ পরাভবের চিত্র মধুসূদন আঁকলেন এ প্রসঙ্গে, নিষ্করুণ লেখনীতে: 'ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে!'[৫]

চিরদিন জননীর স্নেহক্রোড়ের জন্য যে কবির ব্যক্তিসত্তা পরম লালায়িত তাঁর পক্ষে কথাগুলো বলা আদৌ সহজ ছিল না। উল্লেখ্য যে 'ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে!'–এ জাতীয় উচ্চারণ রামায়ণ-এর বিবর্তনের ধারাতে আকস্মিক নয়। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তার বিদগ্ধ আলোচনায় দেখিয়েছেন কীভাবে বাল্মীকি সহ বহু প্রাদেশিক ও বিদেশী রামকথায় সীতার জন্মকে কেন্দ্র করে রাবণের মৃত্যুর সুযোগ সন্ধানের গুঠি সাজানো হয়েছে।[৬] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চন্দ্রাবতীর *রামায়ণ*-এও এ বিষয়টি বিস্তারিত।

রাবণের শক্তিতে দেবতাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল মর্ত্যবাসীর প্রতি অকারণ কর্তৃত্ব ফলানো। সুতরাং ইন্দ্র যে সর্বদা এমন কোন অজুহাত খুঁজবেন, যাতে করে কৈলাশের শক্তিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাবণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাই সীতাকে যখন হরণ করা হচ্ছে, সেই মুহূর্তে ওপর থেকে কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন না। একটা ধর্ষণের পরিস্থিতিকে পূর্ণতা পেতে দেন– তারপর সেই সূত্রে রাজনীতি করেন। ইন্দ্র তাই উমাকে গিয়ে বলেন:

পরম অধর্মাচারী নিশাচর—পতি

দেবদ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্রনন্দিনি,
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত মাতঃ ?[৭]

ইন্দ্রের বয়ানে এটা স্পষ্ট যে রাবণের মূল অপরাধ তিনি দেবদ্রোহী। কিন্তু সে কথাটা যে কতকটা অসহায় স্বার্থপরতার মতো শোনায়। তাই সে কথাটা বলে ফেলেও যোগ করে দেন, যেহেতু রাবণ দরিদ্রের ধন হরণ করেছে তাই তাকে আর ক্ষমা করা চলে না। চলে কিনা সেটা ভিন্ন প্রশ্ন, কিন্তু সেই সূত্রে ইন্দ্র যা চাইছেন সেটা কোনো বধূর প্রতি অপমানের দণ্ড বিধান নয়; নিজের ক্ষমতা ও কৃতিত্বকে নিষ্কণ্টক করে নেওয়া। সমস্ত *মেঘনাদবধ কাব্য*তে শিবকেও কিন্তু কখনো ভক্ত রাবণের পক্ষ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে সেভাবে দ্বিধান্বিত হতে দেখা যায় নি বরং সমর্থন প্রত্যাহারের প্রশ্ন উঠতে না উঠতেই যে অসম্ভব দ্রুততায় তিনি তা স্বীকার করে নিয়েছেন; তাতে সন্দেহ হয় তিনি নিজেই বোধহয় এমন কোনো অবকাশ খুঁজছিলেন যাতে করে রাবণের মতো দেবদ্রোহীকে প্রশ্রয় দেওয়ার কলঙ্ক গায়ে না লাগে। 'পরমভকত মম নিকষানন্দন; / কিন্তু নিজকর্মফলে মজে দুষ্টমতি।'[৮]

এক্ষেত্রে রাবণ নিজেও যদি সীতা হরণকে নিজের সর্বনাশের চূড়ান্ত কারণ হিসেবে স্বীকার করে নিতেন; তবে বসুন্ধরা, ইন্দ্র বা শিবের মতো মানুষের সীতাকে নিয়ে নিজেদের জন্য রাজনীতি করাটা একজাতীয় বৈধতা পেয়ে যেতো। কিন্তু মধুসূদন সে অবকাশ দেন নি।

হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে![৯]

রাবণের এহেন উচ্চারণ প্রসঙ্গে আলোচক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার মন্তব্য করেছেন: 'এই উচ্চারণের মধ্যে রাবণের নিজকর্ম দোষের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ছিল, সর্বনাশের কারণটিকে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলেন, এবং মনের জ্বালায় তিনি যে নৈতিক দিক থেকে ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।'[১০] রাবণ কোনোভাবে নৈতিক দিক থেকে বিক্ষুব্ধ ছিলেন একথা আমরা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারি না। কেনোনা প্রথম সর্গের পর রাবণ আর কখনো সীতাহরণকে নিজের পতনের কারণ হিসেবে দেখতে চান নি। বারে বারে কেবল নিয়তিকে দায়ী করেছেন। এমনকী কাব্যের একেবারে শেষে, শ্মশান-শয্যায় পুত্র-পুত্রবধূকে প্রত্যক্ষ করে যে বিলাপ করেছেন রাবণ, সেখানেও বলছেন পূর্বজন্মফলের কথা:

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;—
বৃথা আশা ! পূর্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে এ কাল-আসনে![১১]

এ প্রসঙ্গে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার পূর্বোক্ত প্রবন্ধের উদ্ধৃতির অব্যবহিত পরেই বলেছেন, 'পূর্বজন্মফল– নিছক বিধি নয়, নিজ কর্মদোষও নয়।'[১২] আমাদের কিন্তু মনে হয় রাবণ কথিত এই পূর্বজন্মফল 'বিধি'-রই সমতুল্য। অবশ্যই আভিধানিকভাবে নয় *মেঘনাদবধ কাব্যর* প্রেক্ষিতে। একথা বলছি কারণ 'বিধি' আর 'পূর্বজন্মফল'-এ দুটোই আসলে রাবণের বোধশক্তির অনধিগম্য। দুটোর ক্ষেত্রেই তার অভিব্যক্তি–'বুঝিতে নারিনু'।

তবু বিশেষ একটা শব্দের পরিবর্তন নিশ্চয় কিছু না কিছু মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার ভিন্নতাকে ফুটিয়ে তোলে। আর সেটা বুঝে নেওয়ার জন্য তাকানো দরকার কাব্যের সূচনায় কেনো রাবণ সীতাহরণরূপ অপরাধকে বারেকের জন্যও উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছেন সেই দিকে।

রামায়ণে (বাল্মীকি প্রণীত) রক্ষযোদ্ধমণ্ডলে বীরবাহু কেউ নন। কিন্তু *মেঘনাদবধ কাব্যে*তে তার মৃত্যুকে, কবি রাবণের কাছে এমন বড় একটা বিপর্যয় হিসেবে তুলে ধরেন, যার প্রতিক্রিয়ায় রাবণ প্রায় অসহায় হয়ে উঠেছিল। বলা যায় *মেঘনাদবধ কাব্যের* প্লট অনুসারে বীরবাহুর মৃত্যুই রাবণকে প্রথম পরাভবের আশঙ্কায় দোলায়িত করেছে। তাই সেই মুহূর্তে একবারের জন্য হলেও তার মনে হচ্ছে কাজটা না করলেই হতো, খামোখা একটা ঝঞ্ঝাট। ইচ্ছে করে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যেতে। রাবণের কথাগুলো আর একবার দেখে নেওয়া যাক:

হায় সূর্পনখা
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজঙ্গে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবকশিখারূপিনী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে
ছাড়িয়া কনন লঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে?[১৩]

সীতাকে একবার রাবণ বললেন 'বিষধর সাপ' আরেকবার 'অগ্নিশিখা'। উভয়ই হানিকারক কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোথাও একটা সম্ভ্রমের ভাব থাকে। চূড়ান্তভাবে সীতাকে নিজের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করতে পারেন না প্রেমিক রাবণ। তবু প্রিয় পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু এত বড় আঘাত যে তাতে মনে হয় সীতাকে না আনলেই হতো। ঠিক যেমন রাবণের শক্তিশেলের আঘাতে মৃতবৎ লক্ষ্মণকে দেখে রামের মনে হয় যুদ্ধটা না করলেই চলত! এটা তাই রাবণের স্বাভাবিক মানব সম্ভব চিত্তবিক্ষেপ, তার নৈতিক দিক থেকে জাত কোন বিপন্নতা নয়। আর তা নয় বলেই তিনি বারে বারে বিধাতাকে দায়ী করলেন। এমনকী শেষ বিলাপেও সীতার উল্লেখ না করে বললেন পূর্বজন্মফলের কথা। তখন 'বিধি' না বলে 'পূর্বজন্মফল' কথাটি বলার মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে রাবণ ভাবতে পারছেন না সম্পূর্ণ অকারণে বিধাতা তার এতখানি সর্বনাশ করতে পারেন।

আমরা পুনরায় আমাদের মূল প্রসঙ্গে ফিরতে পারি। আমাদের বক্তব্য ছিল ইন্দ্র বা শিব (লক্ষ্মী এমন কি লক্ষ্মণও) সীতা হরণকে যখন নিজেদের আচরণের কারণ হিসেবে তুলে ধরছেন তখন যদি রাবণও সীতাহরণকেই তার বিনাশের মূল বলে চিহ্নিত করেন তবে ইন্দ্রাদির প্রতারণা একপ্রকার বৈধতা পেয়ে যায়। কিন্তু মধুসূদন তা না করে বসুন্ধরার মাতৃত্বও কীভাবে নির্লজ্জের মতো সীতাকে ব্যবহার করতে চেয়েছে সেটা তুলে ধরেন। এবং তারই মধ্য দিয়ে নারী জীবনের এক প্রাত্যহিক অবমাননার চরিত্রটিও পরিপূর্ণতা পেয়ে যায়।

অতঃপর আমরা সরাসরি সীতার দিকেই নজর দেবো। দেখতে চাইব সীতাকে মধুসূদন এমন কোনো চারিত্র্য প্রদান করেন যার দ্বারা *মেঘনাদবধ* কাব্য-এ সীতার ব্যক্তিত্বের একান্ত কোন অনন্যতা ফুটে ওঠে। যদি তেমন কিছু পাওয়া যায় তবে এটাও বিশ্লেষণ করা জরুরী হয়ে পড়বে যে, সীতা চরিত্রের সেই বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য মধুসূদনের কবিসত্ত্বা ও সমকাল চেতনার ক্ষেত্রে নতুন কোন মাত্রা যোগ করে কি না।

মেঘনাদবধ কাব্যের 'সীতা' চরিত্রকে নিয়ে দুটি অনন্য ভাবনা যথাক্রমে মোহিতলাল মজুমদার প্রণীত *কবি শ্রীমধুসূদন* এবং ক্ষেত্র গুপ্ত প্রণীত *মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প* গ্রন্থ দুটিতে বিধৃত। এই দুই

আলোচকেরই প্রাজ্ঞ সহৃদয়তা সীতার যে সকল স্বভাব বিষয়ে আলোকপাত করেছে তার যৌক্তিকতা প্রশ্নাতীত। প্রথমে মোহিতলাল মজুমদারের আলোচনার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা যাক:

> প্রমীলার প্রেমে কবি যেমন দেখিয়েছেন মিলনকে– প্রথম হইতে শেষপর্যন্ত তাহার কাহিনী প্রখর মিলনের কাহিনী, তেমনই সীতার প্রেমে কবি দেখিয়াছেন, প্রশান্ত বিরহকে। সীতার মুখে আমরা প্রিয়-মিলনের যে সুখস্মৃতি-কাহিনী শুনিতে পাই, তাহা প্রখর মিলনের মত নয়; সে সুখে উন্মাদনা নাই, প্রাণের পরিতৃপ্তি আছে– ...কিন্তু সীতা-চরিত্রে কবি যে প্রেমের ধ্যান করিয়াছেন তাহা শুধুই দাম্পত্য প্রেম নয়– সেইখানেই তাহার শেষ নয়। ইহা সেই প্রেম যাহা নরনারীর যুগল-হৃদয়ে জন্মলাভ করিয়া, শেষে করুণা বা মৈত্রীর মধ্যে চরম সার্থকতা লাভ করে। বিহারীলালের সারদা– প্রেমে আমরা যে– প্রীতির সাধনায় বিশ্বাত্মীয়তা বোধের আভাস পাই, মধুসূদনের সীতা চরিত্রে আমরা সেই করুণাকেই প্রেমের পরিণতি রূপে দেখিতে পাই। সীতাও যেন মূর্তিমতী করুণা– সেই করুণার মূলে আছে এই পতি-প্রেম। মনে হয়, ইহাই স্বাভাবিক; যে-প্রেম ব্যক্তির সমগ্র সত্তায় পুষ্পিত হইয়া উঠে, তাহা বিশ্বাত্মীয়তায় পর্যবসিত না হইয়া পারে না; যাহাতে আত্মার আনন্দ, তাহার অনুকম্পার সীমা নাই।[১৪]

বলা বাহুল্য এর পরই মোহিতলাল উদ্ধৃত করেছেন নবম সর্গের সেই পঙক্তিগুলো। করুণা যেখানে আত্মপর শত্রুমিত্র ভেদজ্ঞানকে একেবারে দূর করে দিয়েছে।

> মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে
> মরিবে দানব-বালা অতুলা এ ভবে[১৫]

লক্ষণীয় যে মোহিতলাল মজুমদারের আলোচনায় কবিকল্পনার সৌন্দর্য যতখানি বিশ্লেষিত তার অভিনবত্বের প্রতি তেমন কোনো সজাগ অনুসন্ধিৎসা নেই। অনেক পরে গবেষক ক্ষেত্র গুপ্ত সে সম্পর্কে আমাদের দূরন্ত কিছু ইঙ্গিত দান করেছেন, দুটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি গ্রহণ করা যাক :

> (ক) মোহিতলাল কথিত মধ্যযুগের গার্হস্থ্যাশ্রমের আদর্শ ঘরণী নয় সীতা; সেবায় শান্তিতে, কারণ্যে যার চরম পরিচয়! ... মধুসূদনের সীতার প্রেমে কিশোরীর চাঞ্চল্য আছে:
>
> নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
> তরু সহ, চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে দম্পতি
>
> সীতার এ-জাতীয় আচরণ দেখে বিরক্ত হয়ে রাজনারায়ণ বসু তাকে উন্মাদ রোগগ্রস্ত বলে ভর্ৎসনা করেছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে সীতা চরিত্রের প্রগল্ভতা প্রকাশিত। এ প্রগল্ভতা তাকে একবারে তরল করে ফেলেনি, তার প্রশান্তি তথা কল্যাণমূর্তিকে অস্বীকার করেনি, একটি অতিরিক্ত প্রাণময়তা সীতাচরিত্রে সঞ্চারিত করেছে।[১৬]
>
> (খ) সীতার এই শুভদা–বরদা মূর্তি বিস্ময়কর। এই কারুণ্যধারায় সে আপন বেদনার কারণকেও অভিশপ্ত করেনি, অভিযুক্ত করেনি; সর্ব অকল্যাণের জন্য নিজেকেই দায়ী করে বসেছে। জননী বসুন্ধরার কন্যা সীতা, মানুষ তাকে যে আঘাত করেছে সে আঘাত বুক পেতে গ্রহণ করে আঘাতকারীর দেহে মানুষের আপন হাতে ক্ষত দেখে সীতা অশ্রু-বিসর্জন করেছে।[১৭]

সমালোচকদ্বয়ের এ সকল আলোচনাকে শিরোধার্য করেই সীতার চরিত্রকল্পনায় মধুসূদনের আর একটি বিশিষ্টতার দিকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সীতা তার আত্মকথায় বলেছেন:

> ... ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
> কপোত-কপোতী যথা উচ্চ, বৃক্ষ-চূড়ে
> বাঁধি নীড়, থাকে সুখে, ছিনু ঘোর বনে।[১৮]

মেঘনাদবধ কাব্য-এ এই অত্যন্ত পরিচিত পঙক্তিগুলোর অলঙ্কার নির্ণয়ের সূত্রে আমাদের জিজ্ঞাসা একটা বিশেষ সংকটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। উপমাটির সামান্য ধর্ম 'সুখে থাকা'-এ পর্যন্ত গাণিতিকভাবে নির্ণয় করাটা দুরূহ কিছু নয়, কিন্তু সমস্যা হয় যখন সৌন্দর্যের পরিচয় চিহ্নিত করতে হয়। উচ্চবৃক্ষচূড়ায়

বাসা বেঁধে থাকার এমন কী সুখ যা সীতার অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে ? যতদূর মনে হয়, সীতা এখানে সেই সুখের প্রতি ইঙ্গিত করছেন যা সাংসারিক জটিলতা মুক্ত। 'উচ্চবৃক্ষচূড়' বোধহয় মর্ত্যপৃথিবীর বেঁচে থাকার কূটকৌশল নিরপেক্ষতার দ্যোতক। ফিউডাল যৌথ পরিবার-ভাবনা থেকে মুক্ত সীতা, পরিবর্তে ব্যক্তি কেন্দ্রিক বুর্জোয়া মূল্যবোধের উদ্ভাস দেখি তার মধ্যে। এবং সম্ভবত একমাত্র সীতার মধ্যেই প্রকৃত প্রস্তাবে বুর্জোয়া মূল্যবোধের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। মধুসূদনের প্রমীলাকেও বলতে হয়–'কি করি, বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শ্বাশুড়ি।' *মেঘনাদবধ কাব্য*তে কবির ফিউডিয়াল মূল্যবোধ থেকে বুর্জোয়া চেতনায় উত্তরণের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট।

ভালোমন্দের প্রশ্নটা অবান্তর, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে সীতা কোনোদিনই সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতি বা পরিবার সংগঠনকে আমল দেন নি। দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করে রাম যখন ঋষিদের প্রতি উপদ্রবকারী রাক্ষসদের দমনোদ্যত হয়ে নতুন করে নিজেকে রাজনীতিতে জড়াচ্ছেন তখন সীতা সাধ্যমত বাধা দেন:

> স্বামিন্! তুমি কোন ক্রমে বিনাশতায় ধনু ধরিয়া দণ্ডকারণ্যস্থ
> রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিও না;...
> কোথায় ক্ষত্রিধর্ম্ম আর কোথায় তপস্যা;
> অতএব আমাদিগের অনুষ্ঠানের বিষয় পরস্পর–
> বিরোধী হইয়াছে; সুতরাং তপোবনানুষ্ঠেয় ধর্ম্মেরই
> অনুষ্ঠান করা উচিত।[১৯]

লক্ষণীয় একজন নারী হিসেবে, সীতা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কর্তৃত্ববাদকে নস্যাৎ করে দিচ্ছেন। জন্মগতভাবে ক্ষত্রিয় বলেই রামকে সর্বদা সেই অনুসারে প্রথা পালন করে যেতে হবে এটা সীতা মানেন না। আরো উল্লেখযোগ্য যে প্রকৃতিকন্যা সীতা অরণ্যের আদিম নিবাসী মানুষগুলোকে এক কথায় রাক্ষসজ্ঞানে সর্ববিধ দোষে দুষ্ট-বর্বর বলে মেনে নিচ্ছেন না। আর মধুসূদনের সীতা যেভাবে যতখানি আকুলতায় রাজনীতি নিরপেক্ষ জীবনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তাতে তাঁকে চূড়ান্তভাবে মূল উৎসের সাথে বিরোধী ভাবা যায় না।।

এখানে আর একটি জিজ্ঞাসার সমাধান হওয়া জরুরী। আমরা লক্ষ করি *মেঘনাদবধ কাব্য*র চতুর্থ সর্গে সীতার স্মৃতিচারণ আর স্বপ্ন-দর্শনের মধ্য দিয়ে কবি যে আমাদের মূল ঘটনা পরম্পরার সাথে পরিচিত করে তুলেছেন সেখানে পঞ্চবটি বাস বর্ণনায় সীতার যে উৎসাহ, তাঁর বাচনে যে জাতীয় প্রাণ, রামের লঙ্কা অবরোধ অথবা যুদ্ধাদি বর্ণনায় তেমনটা নয়। ঐ সকল অংশ প্রাণকে স্পর্শ করে না, তা নিছকই বিবৃতি হয়ে যায়। কিন্তু কেনো কবির প্যাশন এখানে থমকে থাকে?

> বরিষার কালে, সখি, প্লাবন পীড়নে
> কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি।
> বারি রাশি দুইপাশে; তেমতি যে মনঃ
> দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।[২০]

এই চিত্রকল্পে হৃদয় উপচে পড়া ভাবের কথা আসে– কিন্তু সেটা শুকিয়ে যায় অচিরেই। সীতা বলতে থাকেন:

> জয়রথ ধ্বনি
> শুনিনু হরষে, সই! কাঁদিল রাবণ!
> কাঁদিল কনক লঙ্কা হাহাকার রবে![২১]

সীতা বলছেন 'জয় রাম' ধ্বনি তাকে হরষিত করছে; রাবণ কাঁদছে– এতে তো তার সুখ হওয়ার কথা। কিন্তু হচ্ছে কই তিনি বরং আকুল হয়ে বসুন্ধরার প্রতি বলছেন: 'রক্ষঃ কুল দুঃখে বুক ফাটে মা আমার!'[২২] কেবল তাকেই উপলক্ষ করে এত বড় ধ্বংসের প্রচণ্ডতাকে মেনে নিতে পারছেন না সীতা। আর সে কারণেই আসন্ন মুক্তি ইঙ্গিতেও তিনি পুরোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেন না। পাঠকের কল্পনাকে মুক্ত করে দিলে আমাদের বোধ হবে সীতা বুঝি অস্পষ্টভাবে কোথাও অনুভব করছেন লঙ্কাযুদ্ধে তিনি ক্রমশ গভীরতর স্তরে গৌণ হয়ে যাচ্ছেন। সেখানে প্রবল হয়ে উঠছে কূট রাজনীতি, দাক্ষিণাত্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই। আর তাই বোধহয় তিনি রামের সাথে বিচ্ছেদ আশঙ্কাতেও ব্যাকুল।

> পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
> পদযুগ, সুবদনে! জাগিনু অমনি।–
> সহসা, স্বজনি যথা নিবিলে দেউটি
> ঘোর অন্ধকার ঘর, ঘটিল সে দশা
> আমার,–আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে।[২৩]

এরপর থেকে চতুর্থ সর্গে নামতে থাকে এক স্তব্ধতা, নেমে আসে গাঢ় বেদনা। শেষ দুই পংক্তিতে কবি লিখেছেন:

> ... বসিলা দেবী সে বিজন বনে,
> একটি কুসুমমাত্র অরণ্যে যেমতি।[২৪]

থমকে দাঁড়াতে হয় পাঠককে! নিঃসন্দেহে ঘনীভূত হয়ে ওঠে এক অনির্দেশ্য চাপ। আর তাই চতুর্থ সর্গকে মাত্র একটা রিলিফ হিসেবে ভাবতে দ্বিধা হয়। মনে হয় চতুর্থ সর্গই সেই মূল্যবোধের ধারক, যার মধ্যে দাঁড়িয়ে, উগ্র বিদ্বেষ বা প্রকাণ্ড অন্ধকার থেকে বিশ্লিষ্টভাবে, সমগ্র কাব্যের ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্নটির সমাধান খোঁজা সম্ভব।

উল্লেখ্য যে, গোটা *মেঘনাদবধ কাব্যে* সীতা রাম সম্পর্কে টিপিক্যাল ধারণার বশবর্তী। 'দয়ার সাগর নাথ বিদিত জগতে' অথবা 'হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে'-এর বাইরে আর সীতার যাওয়া হয় নি। মধুসূদনের প্রমীলা বা মন্দোদরীর মধ্যেও স্বামী সংক্রান্ত ধারণার কোন বিনির্মাণ নেই। এমনকী *বীরাঙ্গনা কাব্যের* তারাও সোমদেবকে যে প্রেমদান করতে চান সেখানেও স্বামীবিষয়ক টিপিক্যাল ভাবনাটা প্রকট। পরকীয়া প্রণয়ের সুতীব্র প্যাশনের অনেকখানি অভাব রয়েছে সেখানে। আমরা বলতে চাই মধুসূদনের পৌরাণিক রমনীগণ কখনো এমন কোনো যৌবন বাসনা ব্যক্ত করেন না যাতে পুরুষতন্ত্র বিপন্ন বোধ করতে পারে। কিন্তু সীতার যে জাতীয় জীবনভাবনা আমরা চতুর্থ সর্গে প্রত্যক্ষ করি তাতে খুব সম্ভব ছিল, তা পুরুষের জীবনবোধের একটা বিকল্প হয়ে উঠবে চূড়ান্তভাবে, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত হয় নি।

এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে আমাদের মনে হয় সীতাকে নিয়ে মধুসূদনের কবিসত্তার সচেতন স্তরে কোনো প্রকার বৈপ্লবিক ভাবনা ছিল না। *মেঘনাদবধ কাব্যের* বাইরে সীতাকে আমরা আরো দু-একটি স্থানে দেখতে পাই। *বীরাঙ্গনা কাব্যতে* দ্রৌপদী তার পুর্বরাগ বয়ান করতে গিয়ে সীতার পূর্বরাগের কথা স্মরণ করেছেন:

> বৈদেহীর সু কাহিনী শুনে লোকমুখে
> শিবের মন্দিরে পশি কৃতাঞ্জলি দিয়া
> পুজিতাম শিবধনু। কহিতাম সাধে,
> ঋষিবেশে স্বপ্ন আশু দেখাও জনকে
> (জানি কামরূপ তুমি!) দিতে এ দাসীরে

সে পুরুষোত্তমে, যিনি দুই খণ্ড করি,
হে কোদণ্ড, ভাঙিবেন তোমায় স্ববলে!
তা হলে পাইব নাথে, বলীশ্রেষ্ঠ তিনি![২৫]

স্পষ্ট এখানে দ্রৌপদী সীতার কাহিনীর সাথে একাত্ম বোধ করছেন সেখানে, যেখানে পুরুষ তার পরাক্রান্ততায় জয় করে নিয়ে যায় নারীকে। একজন নারীর এমন একজন পুরুষকে ভালো লাগবে কিনা সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। এখানে মুখ্য বক্তব্য এই যে পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি নারীর সামনে একজাতীয় যুযুৎসাকে বড় করে তুলতে চায় ঐতিহ্য কাহিনীর মধ্য দিয়ে। দ্রৌপদীর কাছেও সীতা-রামের স্বয়ংবর সেই সূত্রেই প্রাণলাভ করেছে।

*চতুর্দশপদী কবিতাবলী*র একটির শিরোনাম 'সীতাদেবী'। সেখানে মধুসূদন কী বলছেন দেখে নেওয়া যাক:

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তবে কথা,
বৈদেহী ! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি; অশোক কাননে,
চারিদিকে চেড়ীবৃন্দ চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে!
রাহু-গ্রহ-রূপ ধরি বিপত্তি আঁধারে
জ্ঞান রবি যবে বিধি বিড়ম্বন করে
মজিবে এ রক্ষোবংশ খ্যাত ত্রিসংসারে
ভুকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে।[২৬]

কবিতাটির বক্তব্য কবি সীতা দেবীর বন্দিনী দশার প্রতি করুণায় আবেগ-আপ্লুত। সেই পরিস্থিতিতে কেবল সীতার বিষণ্নতার কথাই মনে আসে মধুসূদনের। কিন্তু অশোক কাননে সীতার বিষণ্নতার পাশাপাশি তার লড়াইটাও তো বড় বিষয়। আত্মশক্তির চূড়ান্ততা স্পর্শ করে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে না জানলে লঙ্কাপুরে সীতার পক্ষে নিজেকে রক্ষা করা আদৌ সম্ভব ছিল না। কিন্তু তেমন কোনো কিছুই লক্ষ্য করলেন না কবি বরং বললেন এতেই রাবণ মরবে। সেই পুরোনো কথা–নারীই ধ্বংসের বীজ বপন করে।

'রামায়ণ' শীর্ষক সনেটে মধুসূদনের সীতা সম্পর্কে মূল্যায়ন:

কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহী সুন্দরি,
নাহি কাঁদে মনঃ যার– তব কথাস্মরি[২৭]

সীতা এখানে মধুসূদনের কাছে 'সিমপ্যাথী'র আকর্ষক মাত্র। এখানে লক্ষণীয় সীতাকে ঘিরে কবি যে সব বিশেষণ প্রয়োগ করছেন সেখানে নতুনতর অভিজ্ঞতার কোনো স্পর্শ নেই। সবই মধ্যযুগীয়।

'সীতা বনবাসে'–এই সাধারণ শিরোনামে দুটি সনেট রয়েছে। প্রথমটিতে অরণ্যে লক্ষ্মণ-কতৃক বর্জনের পর সীতার অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া:

কহিলা সতী শোকের বিহ্বলে,–
'ত্যজিলা কি রঘুরাজ, আজি এই ছলে
চিরজন্যে জানকীরে? হে নাথ! কেমনে -
কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ বিরহে?

কে কহ, বারিদ রূপে, স্নেহবারি দানে
(দাবানল রূপে যবে দুখানল দহে)
জুড়াবে, হে রঘুচূড়া, এ পোড়া পরাণে?
নীরবিলা ধীরে সাধ্বী, ধীরে যথা রহে
বাহ্যজ্ঞান শূন্যমূর্তি নির্মিত পাষাণে![২৮]

গোটা কবিতাটিতে অষ্টম পঙক্তির শেষে আর নবম পঙক্তির সূচনায় 'কেমনে' শব্দটির পুনরাবর্তনে অবরুদ্ধ ক্রন্দনের হৃদয় ছাপিয়ে ওঠা ব্যতীত আর কোথাও প্রাণ নেই। কতকগুলো বহুব্যবহৃত প্রতিক্রিয়া নিয়ে কবি কেনো যে নাড়াচাড়া করেন তা দুর্বোধ্য। হয়তো সম্ভব যে এই পরিত্যাগের কথা রচনায় কবির মনে কখনো উঁকি দিয়েছে তার ব্যক্তিজীবন, প্রথমা পত্নীকে পরিত্যাগের কথা। মাদ্রাজে কবি তাদের রেখে এসেছিলেন প্রচণ্ড অসহায়তার মধ্যে। হয়তো তাই সীতার ক্ষেত্রেও অসহায়তা ছাড়া আর কিছু এখানে দেখানোর তাগিদ বোধ করছেন না। আর যাই হোক *মেঘনাদবধ* রচনাকালে কবির যে প্রকার সৃষ্টি মগ্নতা, যে জাতীয় শিল্পিত উত্তরণ, সনেট সম্ভারের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নেই। 'সীতা বনবাসে' শীর্ষক দ্বিতীয় সনেটটিতেও সেই অসহায়ত্বটাই প্রকট:

কতক্ষণে কাদি পুনঃ কহিলা সুন্দরী;
নিদ্রায় কি দেখি, সত্য ভাবি কুস্বপনে ?
হে রাঘব পতি,
এ দশা দাসীর আজি এ সংসার জলে।
ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তার গতি!'–
মূর্ছায় পড়িলা সতী সহসা ভূতলে,
পাষান নির্মিত মূর্ত কাননে যেমতি
পড়ে, বহে ঝড় যবে প্রলয়ের কালে।[২৯]

'সংসার জলে'– থৈ পাচ্ছেন না সীতা। প্রতিমুহূর্তে ভয় পাচ্ছেন কঠিন সংসারের আঘাত তাকে ধ্বস্ত করবে। সংগত ভাবনা, *রামায়ণ*– এও এ জাতীয় বিলাপ বর্তমান। কিন্তু *রামায়ণ* দীর্ঘ কাব্য। প্রাথমিক বিহ্বলতা অতিক্রম করে সীতা সেখানে প্রমাণ করেছেন তার আত্মগত শক্তিকে। চূড়ান্ত অবমাননার পর ঠিকই নিঃশব্দে সন্তানদের নিজের মতো করে মানুষ করেছেন ক্ষত্রিয়তার চেনা ছকের বাইরে। তারপর পতির কাছে সন্তানদের সমর্পন করে আত্মহত্যা করেছেন। এবং এটা তিনি করে দেখিয়েছেন বার বার– স্বাধীন সিদ্ধান্তে স্বামীর সঙ্গে বনে এসেছেন– ষড় রিপুকে জয় করে প্রতিহত করেছেন রাবণকে। কিন্তু মধুসূদনের সনেটের বিস্তৃতি এতখানি নয়। এও ঠিক হয়তো প্রত্যাখ্যানের প্রাথমিক বিহ্বলতাকেই তিনি ধরতে চেয়েছেন। তথাপি যখন কোনো মিথিক্যাল চরিত্রের কোনো মুহুর্তকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র কবিতাও রচনা করা হচ্ছে, তখন সেই রচনাটির সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে মিথিক্যাল চরিত্রটির সামগ্রিক ভাবনা বিশেষভাবে নির্বাচিত মুহূর্তেও কীভাবে চকিতে নিজের ছাপ রেখে যাচ্ছে। সীতার বিলাপের এ জাতীয়তা বজায় রেখেও প্রতিবেশ নির্মাণে, চিত্রকল্পের গূঢ় প্রয়োগে, সীতার লড়াকু মানসিকতাকে দেখানো নিতান্ত অসম্ভব কিছু ছিল না। কিন্তু তার পরিবর্তে বারবার সীতাকে দিয়ে কেনো বলানো হবে 'ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তার গতি'। *বীরাঙ্গনা কাব্যের* মতো কাব্যেও বারবার নারীরা এত নিজেদের 'দাসী' বলে উল্লেখ করেন যে তা আধুনিক পাঠককে বিব্রত করে।

তবু *মেঘনাদবধ কাব্য* থাকে, এবং এক মহৎ বিকল্প আধুনিকতা থাকে সেখানে সীতাকে ঘিরে। বিকল্প আধুনিকতার চাইতে অবশ্য 'আধুনিকতার বিকল্প' বলাটাই বাঞ্চনীয় হবে। মধুসূদনের *মেঘনাদবধ*-এর 'সীতা' আমাদের শেখান কীভাবে শান্তি পেতে হয়। সীতার দুঃখ আছে। হয়তো তা, হয়তো কেনো, তা অবশ্যই মরণাতীত দুঃখ কিন্তু তার আত্মগত শান্তি কখনো বিচলিত নয়। সীতা সেই ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক রূপ হয়ে ওঠেন মহাকবির হাতে। যে জাতীয় জীবনবোধের মধ্য থেকে সারদাদেবী বলেন– শান্তি চাস তো অন্যের দোষ দেখিস না।

তবে কি বলতে হবে মধুসদন সীতাকে নিয়ে ভাবনায় মিথকে ভাঙেন নি! প্রথাগত থেকে গেছেন ? আমাদের সিদ্ধান্ত আদৌ তা নয়। মিথিক্যালি আমরা সীতাকে সর্বংসহা বলে জানতাম যার মূলে মূক সহিষ্ণুতা। কিন্তু মধুসূদনের সীতা তেমন নন তিনি নিরূপায় হয়ে সহ্য করে চলেছেন এ মত নয়– তিনি সামাজিক জটিলতাকে প্রত্যাখ্যান করে ব্যক্তিগত হতে চেয়েছেন। রাবণ রাক্ষস বলেই তার প্রতি বিদ্বেষী হন নি। বরং ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে বিস্মৃত হয়ে নতুন প্রেমের কথা ভাবছেন। তাঁকে ব্যবহার করা হচ্ছে বুঝেও ভালোবাসায় জয় করতে চাইছেন সকলকে। তাঁর কাছে হিংসার বিপরীতে প্রেমই হয়ে উঠছে অস্ত্রস্বরূপ। এটা সীতার প্রথাগত ধারণায় ছিল, ছিল ভারতীয় জীবন-দর্শনে।

চৈতন্য থেকে গান্ধীজী যার সামাজিক রূপকার। *মেঘনাদবধ*-এর সীতা নারীর নিজস্ব বাস্তবতায় নিজের জীবনে তার প্রয়োগ করেছেন। আর এইখানেই মধুসূদনের শক্তি যা হয়তো কবি নিজেও সচেতনভাবে অনুভব করেন নি।

এ সব কিছুর পরেও আর একটি কথা থাকে। মধুসূদনের সীতা রামকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ চেয়েছেন– তার অন্যায়কে আপন জীবনানুভবে উপেক্ষা করে হৃদয়ের বিক্ষুব্ধতাকে অতিক্রম করে গেছেন। কিন্তু তিনি কখনোই মর্ত্য অনুভবের প্রতি শীতল হয়ে যান নি। সীতা সব সহ্য করতে পারেন কিন্তু আপন স্বামীর প্রেমভাগিনীকে নয়। তাই সূর্পণখার প্রতি তার তীব্র বিষোদগারঃ

> ননদিনী তব, দুষ্টা সূর্পণখা,
> বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইলো শেষে!
> শরমে, সরমা সই, মরিলো স্মরিলে
> তার কথা ! ধিক্ তারে! নারী-কুল কালি।
> চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী
> রঘুবরে ![৩০]

সীতার চরিত্র-কল্পনায় এই প্রেমজ ঈর্ষার সংস্থাপনও তাকে পূর্ণতা প্রদান করেছে। এরই মধ্যে লুকিয়ে থাকে সেই সত্য যা সতীত্ব নামক কোন আদর্শ নয়– প্রেম নামক জীবনবোধ।

তথ্যনির্দেশ

[১] বুদ্ধদেব বসু, *মাইকেল: সাহিত্যচর্চা* (কলকাতা: দেজ, ২০০২), পৃ. ২৩

[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী : ৪র্থ খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ১৪০২ ব.), পৃ. ৫১৯

[৩] নবনীতা দেব সেন, *এক পোস্টমডার্ন নারীবাদী উপন্যাস* (কলকাতা: দেশ, ১৯৯৮), পৃ. ১২২

[৪] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ‘মেঘনাদবধ কাব্য: ৪র্থ সর্গ’, *মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী* (কলকাতা: কামিনী, ১৪১০ ব.), পৃ. ৮৩

[৫] তদেব, পৃ. ৮৩

[৬] নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, *বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮), পৃ. ২২-২৪

[৭] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ‘মেঘনাদবধ কাব্য: ২য় সর্গ’, *মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

[৮] তদেব, পৃ. ৬৬ ৯

[৯] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, , ‘মেঘনাদবধ কাব্য: ১ম সর্গ’ *মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

[১০] উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, *বিধি বন্দী রাবণ: মধুসূদন–সাহিত্যপ্রতিভা ও শিল্প ব্যক্তিত্ব*, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ (সম্পা.) (কলকাতা: দেজ: ১৯৮৬), পৃ. ৮৫

[১১] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ‘মেঘনাদবধ কাব্য: নবম সর্গ’, *মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

[১২] উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

[১৩] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ‘মেঘনাদবধ কাব্য: প্রথম সর্গ’, *মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

[১৪] মোহিতলাল মজুমদার, *কবি শ্রী মধুসূদন* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ১০৬

[১৫] মাইকেল মদুসূদন দত্ত, ‘মেঘনাদবধ কাব্য: নবম সর্গ’, *মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

[১৬] ক্ষেত্র গুপ্ত, *মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প* (কলকাতা: এ.কে. সরকার এন্ড কো, ১৩৯১ ব.), পৃ. ২৩৮

[১৭] তদেব, পৃ. ২৪০-২৪২

[১৮] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ‘মেঘনাদবধ কাব্য: চতুর্থ সর্গ’ *মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

[১৯] পঞ্চানন তর্করত্ন, *রামায়ণম্: অরণ্যকাণ্ড*, ‘নবম সর্গ’, (কলকাতা: বেণীমাধব শীল লাইব্রেরী, ১৪০৭ ব.), পৃ. ৪২০

[২০] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ‘মেঘনাদবধ কাব্য: চতুর্থ সর্গ’, *মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

[২১] তদেব, পৃ. ৮৪

[২২] তদেব, পৃ. ৮৪

[২৩] তদেব, পৃ. ৮৫

[২৪] তদেব, পৃ. ৮৬

[২৫] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ‘বীরাঙ্গনাকাব্য: ষষ্ঠ সর্গ’, *মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯

[২৬] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, “সীতাদেবী”, ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’, মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯

[২৭] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, “রামায়ণ”, ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩

[২৮] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, “সীতা বনবাসে”, ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪

[২৯] তদেব

[৩০] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ‘মেঘনাদবধ কাব্য: চতুর্থ সর্গ’ *মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

৬২'এর সংবিধানবিরোধী আন্দোলন

ড. মো. আরিফুর রহমান*

Abstract: The anti constitutional movement of 1962 was an important stage of Bangladesh independence movement. The language and cultural movements of the 1950's got momentum in the student movement of 1962. General Ayub Khan started military rule and dictatorship since 1958. He enforced constitution on 1st March of 1962 which was made effective on 8th June of that year. Just after the enforcement of the constitution, the students of East Pakistan started agitation and refrained from attending their classes. They started strike for an indefinite period demanding the annulment of the constitution, to introduce democracy and to free all of the political prisoners. Government started massive student repression and arrested many of them. The political leaders supported the student movement, though the politics was prohibited then. As a result, anti constitutional movement of 1962 turned to an important issue in East Pakistan.

ভূমিকা

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বকীয়তা অন্বেষণের যাত্রারম্ভ। পূর্বপাকিস্তানে বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অতিক্রান্ত হয় ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে। তবে ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন আইয়ুবশাহী সামরিক শাসনের ভীত কাঁপিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের স্বাধিকার আন্দোলনের মধ্যে সমন্বয়ক হিসেবে ১৯৬২ সালের আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের পর থেকে রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা বা জনমত গড়ে তোলা সে সময় ছিল এক দুঃসাহসিক কাজ। তবে ১৯৬২ সালের ছাত্রদের আন্দোলন স্থবির রাজনীতিকে পুনরায় চাঙ্গা করে তোলে। ছাত্রদের এ আন্দোলন ছিল সরকারের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির দ্বার উন্মোচনের একটি প্রচেষ্টা। বাষট্টির আন্দোলন তিনটি পর্যায়ে গড়ে উঠেছিল। ১৯৬২ সালের সংবিধানবিরোধী আন্দোলন ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানবিরোধী এ আন্দোলনে ছাত্রসমাজ ও রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণও শামিল হয়েছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে সংবিধানবিরোধী (১৯৬২) আন্দোলন কিভাবে পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রভাব ফেলেছিল তা আলোচনা করা হবে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

ভৌগোলিকভাবে প্রায় বার'শ মাইল দূরত্বের দু'টি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের ভাষা-সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও মানুষের সার্বিক জীবনাচরণে বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুই অঞ্চল মিলে একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।[১] দীর্ঘ ৯ বছর পর পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয়। আর প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রায় ২৩ বছর পর। তবু পাকিস্তানে এক প্রকার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো টিকে ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরুতেই দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যমূলকনীতি পরিলক্ষিত হয়। পূর্বপাকিস্তানের মানুষ বাঙালি জাতিসত্ত্বা বিলোপের ষড়যন্ত্র ঠেকাতে ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখান থেকে শুরু হয়েছিল বাঙালি জাতীযতাবাদী আন্দোলন। ধর্মের দোহাই দিয়ে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। বাংলা ভাষাকে ইসলামীকরণ, সংস্কৃত ও আদি বাংলা শব্দমালাকে বাতিল করে আরবি ও

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটানো, মূল বাংলা বর্ণমালা বাতিল, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙ্গে দেয়া, উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার নামে চাপিয়ে দিয়ে বাংলা ভাষার সামাজিক ভিত্তির উপর আঘাত- প্রভৃতি ছিল পাকিস্তানি শাসকদের মূল উদ্দেশ্য।[২] কিন্তু পূর্বপাকিস্তানের মানুষ সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এরই চূড়ান্ত রূপ পরিলক্ষিত হয় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। অবশেষে বাধ্য হয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পাকিস্তান আমলে পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষার অবকাঠামো ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি, বরং সেগুলোর কাঠামো আরো ভেঙে পড়ে। সেসময় স্কুল-কলেজ বন্ধ হতে থাকে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকরা ছাঁটাই হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে সমগ্র দেশব্যাপী ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে। এমতাবস্থায় ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে ছাত্র বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়।[৩] সেসময় ছাত্রদের পক্ষ থেকে ১৬ দফা শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি পেশ করা হয়।

রাষ্ট্রজন্মের ৭ বছর পর ১৯৫৪ সালে প্রথম নির্বাচন (পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ) অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যিকারের ব্যালট যুদ্ধ হলো ১৯৫৪ সালের নির্বাচন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয় পাকিস্তানের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বপাকিস্তানের জনগণ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং শুধু ধর্মের নামে তাদের সাথে প্রতারণা করা যায় না। এই বিজয় আরো প্রমাণ করে যে, পূর্বপাকিস্তানের জনগণ পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ এবং তাদের ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।[৪] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি। ২১ দফা কর্মসূচি বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার মানুষের সার্বিক দাবিসমূহ এবং পাকিস্তানি শাসন-শোষণের অবসান নির্দেশিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী পাকিস্তানের নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ গঠনের কথা বলা হয়। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত যে সকল সদস্য পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে পড়েছিল তাদের ভোটে গণপরিষদ সদস্য মনোনীত হয়। দশ লক্ষ লোকের জন্য একজন সদস্য- এই হিসেবে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ছিল ৬৯ জন।[৫] প্রথম গণপরিষদ সেভাবে কাজ করতে পারেনি। ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর পেশকৃত রিপোর্টটি অসম্পূর্ণ থাকায় সমালোচনার মুখে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।[৬] পরবর্তীকালে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালের ৮ জানুয়ারি খসড়া সংবিধান প্রকাশ করা হয়। ৯ জানুয়ারি আইনমন্ত্রী আই.আই. চুন্দ্রীগড় সংবিধানটি গণপরিষদে উত্থাপন করেন। কিন্তু সংবিধানে পূর্ববাংলার অধিকতর স্বায়ত্তশাসনসহ আরো অনেক বিষয় না থাকায় আওয়ামী লীগসহ সাধারণ জনগণ এটির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে।[৭] ১৯৫৫ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান গণপরিষদের বিতর্কে অংশগ্রহণ করে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি, বাংলা ভাষা এবং বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও স্বদেশ প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখান।

অবশেষে ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে সংবিধান কার্যকরী হয়।[৮] ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ফিরোজ খান নুনের সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে। পরবর্তীতে ২৭ অক্টোবর (১৯৫৮) জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট মীর্জাকে উৎখাত করে দেশত্যাগে বাধ্য করেন।[৯] ২৮ অক্টোবর আইয়ুব খান এক ঘোষণা জারির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং নিজে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সামরিক আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহ এবং

শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয়। রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়। ১২ অক্টোবর (১৯৫৮) রাতে বেশ কয়েকজন রাজনীতিবিদকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- আবুল মনসুর আহমেদ, শেখ মুজিবুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, আসগর আলী শাহ ও আমিনুল ইসলাম চৌধুরী উল্লেখযোগ্য।[১০] সেসময় আবুল মনসুর আহমদ ও শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করে তাদের কারাগারে আটক করে রাখা হয়। তখন সকল দল ও রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। ব্যাপকহারে নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। আইয়ুব খান বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতিতে রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলগুলোকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করে তাদের অযোগ্যতা ও দুর্নীতিকে দায়ী করেন। তাঁর মতে রাজনৈতিক দল আর নেতাদেরকে নির্মূল না করলে পাকিস্তানে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে না। রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি তখন প্রকাশ্যে ছাত্র সংগঠনের নামে রাজনীতি বা আন্দোলন পরিচালনা কিংবা নির্বাচনে অংশ নেয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেই শুধু নয়, নির্বাচনেও তারা সাংস্কৃতিক নাম নিয়ে আসরে নামলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতি সংসদ, শিল্পসাহিত্য সংঘ, অগ্রদূত, প্রগতি, অগ্রগামী, যাত্রিক ও দিশারী বিভিন্ন নামের ব্যানারে ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো কার্যক্রম পরিচালনা করতো।[১১] আইয়ুব খানের সময় শরীফ শিক্ষা কমিশন রোমান হরফে বাংলা লেখার সুপরিশ করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৫৯ সালে বুদ্ধিজীবী মহলসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়।

বস্তুত ছাত্রসমাজসহ সাধারণ জনগণও কিছুদিনের মধ্যে আইয়ুবের বিরুদ্ধে প্রবল আকার ধারণ করে বিস্ফোরিত হয়। সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী প্রচারণা শুরু হয়ে যায়। আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালে মৌলিক বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র[১২] নামে দেশে নতুন এক ব্যবস্থা চালু করেন। আইয়ুবের অনুরোধে আমেরিকান কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক বুনিয়াদী গণতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন।[১৩] এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি থাকবেন সর্বোচ্চ স্তরে। এ ধরনের ব্যবস্থা মূলত প্রেসিডেন্টের এককেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো। তাই জনগণ এটিকে ভালভাবে গ্রহণ করেনি। যদিও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আইয়ুব খান ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

আইয়ুব খান পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হয়েই ১৯৬০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এগারো সদস্য বিশিষ্ট একটি সংবিধান কমিশন গঠন করেন।[১৪] এই কমিশনের দায়িত্ব ছিল ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ব্যর্থতার কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা এবং পাকিস্তানের জন্য ভবিষ্যৎ সংবিধানের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা। এছাড়া নিম্নলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিভাবে অর্জন করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের দায়িত্বও কমিশনকে দেয়া হয়:[১৫]

ক. পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির উপযোগী এবং ইসলামিক ন্যায়-নীতি, সাম্য ও সহনশীলতার ওপর ভিত্তি করে গণতন্ত্র কিভাবে অর্জন করা যায়;

খ. কিভাবে জাতীয় সংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং স্থিতিশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায়;

গ. কমিশনের সুপারিশকৃত প্রস্তাব সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচির আলোকে কীভাবে এবং কখন বাস্তবায়ন করা যায়।

৬২' এর আন্দোলন

সাধারণভাবে কোন রাষ্ট্রের সংবিধান বলতে সেই সকল লিখিত বা অলিখিত মৌলিক নিয়মাবলীকে বুঝায় যা কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহারের ও বন্টনের নীতি নির্ধারণ করে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করে। কোন রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি কিরূপ তা সংবিধান হতে জানা যায়।[১৬] যে কোন রাষ্ট্রের

সংবিধান প্রণয়নের কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা লক্ষ করা যায়। কিন্তু ১৯৬২ সালের সংবিধান প্রণয়নের জন্য কমিশন গঠিত হলেও মূলত আইয়ুব খান যেভাবে বলেছেন সেভাবে সংবিধান রচনা করা হয়েছে। ৬২' সালের সংবিধানকে অনেকে আইয়ুবীয় সংবিধান হিসেবেও আখ্যায়িত করে থাকে। আইয়ুব খানের এই সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ছিল:[১৭]

ক. চরম এককেন্দ্রিকতা। প্রাদেশিক ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কোন বিধান এতে ছিল না;

খ. একনায়কতন্ত্র। প্রেসিডেন্ট সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের কোন ব্যবস্থাই এখানে রাখা হয়নি;

গ. পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি। আইয়ুবের 'মৌলিক গণতন্ত্রের' নীতিই এখন সংবিধান সন্নিবিষ্ট হলো। দেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রীমণ্ডলী, সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করার কোন অধিকার জনগণের থাকলো না;

ঘ. সংসদ ক্ষমতাহীন। সংসদের ক্ষমতা বলতে কিছু থাকলো না। সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদ দুই-ই ঠুঁটো প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো।

সংবিধান কমিশন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার পদ্ধতির এবং শক্তিশালী আইন পরিষদ এবং শাসনবিভাগের উপর আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ রাখার সুপারিশ করে। সুপারিশমালায় পাকিস্তানকে ফেডারেশন রাষ্ট্র করার এবং একই সঙ্গে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ দেন। কমিশন এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পাকিস্তানের জনগণ সে দেশের প্রেসিডেন্ট ও আইন সভার সদস্য নির্বাচন করার উপযুক্ত নন। অতএব, উচ্চপদসমূহের নির্বাচনে ভোটদান ক্ষমতা সংকুচিত করা উচিত। কমিশন মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থাকে দৃঢ় সমর্থন প্রদান করে।[১৮] কমিশনের মতে, পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থা ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কমিশনের মতে ব্যর্থতার কারণ ছিল নিম্নরূপ:[১৯]

ক. ১৯৫৬ সালের সংবিধানের আওতায় কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া;

খ. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কর্মকাণ্ডে প্রেসিডেন্টের অহেতুক হস্তক্ষেপ;

গ. সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দলের অভাব, রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি এবং প্রশাসনের অন্যায় হস্তক্ষেপ ইত্যাদি।

নতুন সংবিধানের অধীনে এপ্রিল (১৯৬২) মাসে জাতীয় সংসদ ও মে মাসে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দলবিহীন এই নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীলরা সহজেই জয়লাভ করলেন। নতুন সংবিধান চালু এবং সেই সংবিধানের অধীনে গঠিত নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় আইয়ুব খানের স্বৈরাচারের নতুন পর্যায়।

১৯৬২ সালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত, সংবিধানসম্মত ও সংসদ সমর্থিত প্রেসিডেন্ট ভেবে নিয়ে আইয়ুব খান আগের চেয়ে বেশি অপ্রতিরোধ্য কর্তৃত্বের সাথে ইচ্ছামত দেশ শাসন করতে লাগলো। ধীরে ধীরে আইয়ুব খান আমলাতন্ত্রের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ সময় পূর্ববাংলার সাধারণ জনগণ ও ছাত্রসমাজ আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। সংবিধান প্রশ্নে আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান ব্যাপকভাবে গ্রেফতার করা শুরু করে। এ প্রেক্ষিতে হামিদুল হক চৌধুরী, নূরুল আমীন, আতাউর রহমান খান, সৈয়দ আজিজুল হক এবং মোহসেন উদ্দিন আহমেদ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দাবি করেন। তারা বলেন- বহুসংখ্যক ছাত্রসহ দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে রাখা শুধু অযৌক্তিকই নয়, অন্যায়ও

বটে।[২০] তারা বলেন- মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া না হলেও তারা এমন কোন সহিংস বা অসাংবিধানিক কাজ করেনি, যা সরকারের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে।

১৯৬১ সালের শেষ দিকে শেখ মুজিব, মানিক মিয়া, মনিসিংহ ও খোকা রায়ের মধ্যে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় আইয়ুব খান কর্তৃক শাসনতন্ত্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করবে এবং ক্রমে ক্রমে তা সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে।[২১] ছাত্র সমাজ সামনে থেকে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সংবিধান প্রশ্নে ছাত্ররাও ব্যাপক আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৬২ সালে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিনটি পর্যায় ছিল। যথা:[২২]

ক. শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানাতে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের সূচনা (পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত);

খ. আইয়ুব খান প্রবর্তিত সংবিধানবিরোধী আন্দোলন (মার্চ থেকে এপ্রিল);

গ. আইয়ুব প্রবর্তিত শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন (সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর)।

আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন একত্রিতভাবে কাজ শুরু করে। ১৯৬১ সালের ৩০ ডিসেম্বর উক্ত দুই সংগঠনের প্রায় ৩০/৩৫ জন নেতাকর্মী বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠক থেকে রাজনৈতিক নেতাদের ও জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৬২ সালের ২৪ জানুয়ারি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কয়েকজন নেতা আতাউর রহমান খানের বাসভবনে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন- শেখ মুজিবুর রহমান, তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), আবু হোসেন সরকার, ইউসুফ আলী চৌধুরী প্রমুখ।[২৩] ফলশ্রুতিতে ৩০শে জানুয়ারি (১৯৬২) সরকার সোহরাওয়ার্দীকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে। সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতারের খবর ৩১ জানুয়ারি ঢাকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে দাবানলের মতো তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভ সঞ্চারিত হতে থাকে পূর্বপাকিস্তানের মানুষের কাছে। ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সামরিক আইনের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো। সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬২) ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয়। দীর্ঘদিন পর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্যে রাস্তায় বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হলো। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোর ও হলগুলো প্রতিবাদী ছাত্রদের পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় ৫ ফেব্রুয়ারি রাতে হঠাৎ করেই ঘোষণা করা হয়, ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। প্রতিবাদে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। এদিন রাতে নগরীর বড় বড় দেয়ালগুলিতে গভীররাতে চিকামারা হয়।[২৪] ঐদিন (৬ ফেব্রুয়ারি) জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। তারা হলেন- শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), ফণীভূষণ মজুমদার প্রমুখ।[২৫] সেসময় সংবাদপত্রের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা আরো কঠোর করা হলো। ৭ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সরকারি বাহিনীর সাথে জনগণের সংঘর্ষ হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা বিভিন্ন স্থানে সরকারি স্থাপনায় হামলা চালায়। ১৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবিধানবিরোধী ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পুনরায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করলো তিনটি মূল দাবি নিয়ে:[২৬]

ক. নতুন সংবিধান বাতিল করতে হবে;

খ. পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

গ. সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি দিতে হবে।

সে সময় আইয়ুব খান শাসনতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে চরম নির্যাতন ও অত্যাচারে শুরু হয়। কিন্তু আন্দোলনকারীরা এতে দমে যায়নি বরং আরো বেশি উজ্জীবিত হয়েছে। আন্দোলনকে আরো বেগবান করতে ছাত্ররা এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে 'শপথ দিবস' পালন করে।[২৭] দেশের বিভিন্ন স্থানেও শপথ দিবস পালন করা হয়। শাসনতন্ত্রবিরোধী আন্দোলন তখন এতটাই বেগবান হয়েছিল যে, ২৮ এপ্রিলের জাতীয় পরিষদে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্যরাও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেছিল।[২৮] ছাত্ররা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের কাছে ১৫ দফা দাবিনামা দিয়েছিল। ছাত্রদের ১৫ দফার মধ্যে ছিল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার, সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মুক্তি, রাজনৈতিক কর্মী ও বন্দিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ প্রত্যাহার, কোন সরকারি পদ বা মন্ত্রিত্ব না গ্রহণ, বাক স্বাধীনতা ও সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা ইত্যাদি।[২৯] উপরোক্ত দাবিসমূহ ছাড়াও ছাত্রদের স্বার্থ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কিছু দাবি এ ১৫ দফায় ছিল।

ছাত্ররা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে এ সকল বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন ও পাসের দাবি করে। সে সময় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আইয়ুবীয় শাসনতন্ত্রের অগণতান্ত্রিক দিকসমূহ উল্লেখ করে তাকে প্রতিহত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।[৩০] রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতাদের চাপের মুখে জাতীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দের অনেকেই আইয়ুব বিরোধী অবস্থান নেয়।

ইতোমধ্যে জুন মাসের প্রথমদিকে সংবিধান জারি করা হয় এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়। রাজনৈতিক দল পুনর্গঠনের ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু পাকিস্তানের নয়জন শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা আইয়ুবের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র প্রত্যাখান করে বিবৃতি দেন। তারা শাসনতন্ত্রকে 'অকেজো' বলে ঘোষণা করেন। নয় নেতার বিবৃতিতে বলা হয়:[৩১]

> পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবস্থাকে দূরীভূত করার বিষয়টি শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজনীয়। গণতন্ত্রের প্রাক প্রস্তুতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর থেকেও বিভিন্ন বাধা দূর করা প্রয়োজন। রাজবন্দিদের ডিটেনশনও প্রত্যাহার করা উচিত।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন হামিদুল হক চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান, নূরুল আমীন, আবু হোসেন সরকার, আতাউর রহমান খান, মাহমুদ আলী, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া) ও পীর মোহসেন উদ্দিন (দুদু মিয়া)। উপরোক্ত বিবৃতির ফলে অনেক ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতা মুক্তি পায়। কিন্তু সকল ছাত্রের মুক্তি না মেলায় আবারও আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্য মোনায়েম খান রাজবন্দিদের 'দেশদ্রোহী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং সরকারের কাছে তাদের মুক্তি না দিতে আবেদন করেন। ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিকভাবেই আইয়ুবের কারাগারে বন্দি প্রায় তিন হাজার রাজবন্দিদের বিরুদ্ধে এই ধরনের বিষোদগার করায় ছাত্র সমাজ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে।[৩২] তখন ছাত্ররা মোনায়েম খানের সাক্ষাতের চেষ্টা করলেও তিনি দেখা দেননি। কিন্তু পরবর্তীতে বিমানবন্দরে মোনায়েম খান ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত হন। পরবর্তী কয়েক মাসপর আইয়ুব খান পূর্বপাকিস্তানের জনগণের উপর শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের ষ্টীম রোলা চালাবার জন্য মোনায়েম খানকে পূর্বপাকিস্তানের গভর্ণর করে পাঠান। শাসনতন্ত্র ঘোষণার পর পূর্বপাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলনের এই পর্যায়ের অবস্থা কী দাঁড়াতে পারে তা সরকারের উচ্চ মহল আগেই টের পেয়েছিল। পূর্বপাকিস্তান স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি গোপন চিঠি থেকে সম্ভাব্য এই ছাত্র আন্দোলনের গতি প্রকৃতি পর্যালোচনা ও আন্দোলন মোকাবেলায় গোয়েন্দাদের পরামর্শ কৌশল নির্ণয়ে বিষয়টি অনুধাবন করা সম্ভব হয়। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়:[৩৩]

> ঢাকার সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে ভালোই উপলব্ধি হচ্ছে যে সংবিধান ঘোষণার সাথে সাথে কী অবস্থা দাঁড়াবে।...

> কিছু নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা বিশেষত কমিউনিস্টরা এবং অন্যান্য উগ্রপন্থীরা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে গুরুতরভাবে ঘোলাটে করার জন্যে বদ্ধপরিকর...সংবিধানের বিষয়ে লেশমাত্র ধারণা না থাকা সত্ত্বেও কমিউনিস্টরা এবং আওয়ামী লীগের সেই অংশবিশেষ দাবি আরম্ভ করেছে যে, সংবিধান একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়, তা বাদ দিতে হবে। মনে হয় যে, তাদের কর্মপন্থা হবে ছাত্রদের উস্কিয়ে দিয়ে তাদের মাধ্যমে মিছিল বের করা, রাষ্ট্রপতির ছবি পুড়িয়ে নষ্ট করে তাকে অপমান করা, অর্থাৎ প্রকৃত সরকারী কর্মকর্তাদের এতদূর খানি উত্যক্ত করা যে শেষ অবধি তারা যাতে শক্তি ব্যবহারে বাধ্য হয় এবং তখন সেই শক্তিপ্রয়োগের ঘটনাকে ভিত্তি করে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা।...
>
> ঢাকার ঘটনাসমূহের বিষয়ে অবশ্য এটা বলা যেতে পারে যে, ঢাকায় যেসব মিছিল বের হয়, শহরের সাধারণ মানুষ সে ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। তাতে সাধারণত অংশগ্রহণ করে থাকে কিছুসংখ্যক ছাত্র এবং বেশিরভাগ গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক, যারা লুটতরাজ অগ্নিসংযোগের দ্বারা সৃষ্ট গোলযোগের মাঝে লাভবান হওয়ার আশায় প্রলোভিত হয়ে আসে। ইতোমধ্যেই ঢাকায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আরম্ভ হয়েছে, যার ফলে নিশ্চিতভাবে এই সমস্ত গোলযোগের হোতাদের ডিটেনশনে রেখে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সামরিক আইনের অধীনে বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।...
>
> ...তারা একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে আন্দোলন শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং আসন্ন শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ যাতে একটি গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট হয়।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অন্ধকার যুগে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও রাজনীতিকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছিল। তখন ১৯৬২ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে সংবিধান বিরোধী আন্দোলনে জনগণ নির্ভীকভাবে শাসকশ্রেণির রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে। ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে (১৯৬২) স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ছাত্রসমাজও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারির ছাত্র আন্দোলনের দাবিগুলি ছিল মূলত রাজনৈতিক।[৩৪] তবে সংবিধান বিরোধী বা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়ার ফলে তা প্রবল আকার ধারণ করে।

উপসংহার

বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের উত্তরসূরী ছাত্র-সমাজ প্রথম থেকেই আইয়ুবের সামরিক শাসনকে মেনে নিতে পারেনি। পাকিস্তানকে সামরিক শাসনের যাঁতাকলে আটকে রেখে আইয়ুব গণতন্ত্রের নামে সেখানে রোপণ করেন 'মৌলিক গণতন্ত্র'। অবশ্য সামরিক শাসনের পূর্বেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পশ্চিমপাকিস্তানি শাসকদের মধ্যে গণতন্ত্র বিমুখতা লক্ষ করা যায়। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান (১৯৫৬) রচনা করতে লেগে যায় প্রায় ৯ বছর। পাকিস্তানে এই গণতন্ত্র বিরোধী ঐতিহ্যের পথ ধরেই আবির্ভাব ঘটেছিল আইয়ুব খানের। ষাটের দশকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের মূল ইস্যু ছিল গণতন্ত্র। পূর্বপাকিস্তানি জনগণের অধিকতর রাজনীতি-সচেতনতা এবং গণতন্ত্রপ্রিয়তা আইয়ুব খানের জন্য একটা মস্ত অসুবিধার সৃষ্টি করে। ১৯৬২ সালে আইয়ুবশাহী সংবিধানের লাগাম ছাড়া স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানিরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ১৯৬২ সালে আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কয়েকটি পর্যায় লক্ষ করা গেলেও, মূলত সংবিধান প্রশ্নে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত ছিল। বস্তুত সংবিধান ও শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন এক পর্যায়ে অভিন্ন রূপধারণ করে। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণ সকলেই আইয়ুব বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাই ১৯৬২ সালের আন্দোলনকে শুধুমাত্র সংকীর্ণ অর্থে সংবিধান বা শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন না বলে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতিগত নিপীড়ন ও শোষণের অবসানের আন্দোলন বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

তথ্যনির্দেশ

[১] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ১৬।

[২] ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৫৮*, সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯০), পৃ. ৩৬।

[৩] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯৯৫), পৃ. ৬০।

[৪] আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৮৮।

[৫] S.A. Akanda, 'Was Parliamentary system of government of falure in Pakistan? A case study of constitutional debate in Pakistan during Martial law, 1958-62', *IBS Journal*, Vol. VI (Rajshahi University : Institute of Bangladesh Studies, 1982-1982), pp. 158-159.

[৬] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২), পৃ. ২০৫।

[৭] মো.মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ৬৪

[৮] A.M.A. Muhith, *Bangladesh : Emergence of a Nation* (Dhaka: University Press Ltd., 1992), p. 83.

[৯] S.A. Akanda, "The 1962 constitution of Pakistan and the Reaction of the people of Bangladesh", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. III (1978), p. 71.

[১০] তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর* (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক্স ইন্টারন্যাশনাল লি:, ১৯৮১), পৃ. ১১৬।

[১১] মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২), পৃ. ১০২।

[১২] মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা আইয়ুব খানের অভিনব সৃষ্টি। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল 'জনগণের ইচ্ছাকে সরকারের কাছাকাছি এবং সরকারি কর্মকর্তাদেরকে জনগণের কাছাকাছি এনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ'-এর ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থায়চারটি স্তর ছিল: ক. ইউনিয়ন কাউন্সিল খ. থানা কাউন্সিল গ. জেলা কাউন্সিল ঘ. বিভাগীয় কাউন্সিল। তবে বাস্তবে আইয়ুবের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল পর্যায়ে তাঁর সমর্থকগোষ্ঠী সৃষ্টি করা। আইয়ুব সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা চালু করে।

[১৩] মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ২০১।

[১৪] S.A. Akanda, 'Was Parliamentary system of government of falure in Pakistan?, *op.cit.*, p. 163.

[১৫] মো.মাহবুবর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৭।

[১৬] ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা* (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ১৯৯৪), পৃ. ৩৩৫।

[১৭] প্রীতি কুমার মিত্র, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৫৮-১৯৬৬*, সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ৯৫।

[১৮] মো.মাহবুবর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৮।

[১৯] *ঐ*।

[২০] আবুল কাশেম, 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন : প্রকৃতি ও পরিধি', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৩-২৪ (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ১৯৯৬), পৃ. ২৮।

[২১] মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৫), পৃ. ২১।

[২২] ড. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৩০ থেকে ১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ২৩৫।

---

[২৩] প্রীতি কুমার মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৭।

[২৪] দেয়ালে রং দিয়ে শ্লোগান লেখাকে রাজনৈতিক মহলে চিকামারা বলা হয়ে থাকে। ৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৬২) রাতে পূর্ব বাংলায় প্রথম দেয়াল লিখনটি ছিল- 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক', 'Down Ayub', ইত্যাদি। সেদিন মোহাম্মদ ফরহাদ, রেজা আলী, হায়দার আকবর রনো, এ.কে. বদরুল হক, সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গভীর রাতে দেয়ালে শ্লোগান লিখছিলেন। পুলিশ যখন আসতো, তখন ছাত্র নেতৃবৃন্দ লাঠি-ইট নিয়ে ছুটাছুটি শুরু করে দিতেন। এতরাতে তারা কী করছে পুলিশ জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তর দিতেন- 'চিকা মারছি'। এভাবে চিকামারা কথাটি চালু হয়। উৎসঃ ড. মোহাম্মদ হান্নান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪২।

[২৫] প্রীতি কুমার মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮।

[২৬] *ঐ*।

[২৭] কাজী জাফর আহমদ, 'বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন', *বিচিত্রা*, ঈদ সংখ্যা, ১৯৭৭, পৃ. ৪৪-৪৭।

[২৮] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫ থেকে ৭৫* (ঢাকাঃ বর্ণরূপা), পৃ. ৩১৪।

[২৯] আবুল কাশেম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০।

[৩০] কাজী জাফর আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫।

[৩১] *পাকিস্তান অবজারভার*, ২৫ জুন ১৯৬২।

[৩২] কাজী জাফর আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬।

[৩৩] ড. মোহাম্মদ হান্নান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৬-২৪৭।

[৩৪] *ঐ*, পৃ.২৬৪।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

লাবীদ ইবন রাবী'আর জীবনী ও তাঁর কাব্য প্রতিভা

ড. মুহা. বিলাল হুসাইন*

Abstract: Labid Ibn Rabi'ah is one of those dedicated poets who have enriched the Arabic Literature with their extraordinary contributions. He was a famous poet of not only the Islamic era but also in the pre-Islamic age. In the age of ignorance, Labid was born into an aristocratic traditional family. From the very beginning of his childhood, the poet was deeply influenced by the ideals of his family's age-old heritage of generosity and valour. Consequently, the sparkle of incredible poetic talent began to flourish from his early childhood. During the pre-Islamic era, he wrote countless poems on, appreciation and hatred, on Arabic warfare, valour, charity, bravery, on the noble deeds and charity of family and so on. In his later poems written in Islamic age, Al-Quran, oneness of Allah, Salah, heaven and hell, the hereafter and so on got supreme priority. He was a man of unbelievable poetic talent. Labid as a poet, became tremendously successful in portarying the emotions of enduring sorrow stricken individuals through his unique choice of words and creative brilliancy. In this way, he permanently gained immortality in the ever-changing poetic wod. This legendary person passed away just during the dawn of Hazrat Muyabia's reign. His life and poetic talents are the most discussed topic in Arabic literary criticism. So, this is an importand topic for teachers, students and reserchers of Arabic literature. A brief discussion upon the biography and poetic genius of Labid Ibn Rabi'ah is depicted in this essay.

ভূমিকা

আসহাবে রাসূলের মধ্যে যারা আরবী কাব্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে লাবীদ ইবন রাবী'আ অন্যতম। তিনি অনন্য প্রতিভা অধিকারী ছিলেন। তিনি মুখাদরাম কবিদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। জাহিলী এবং ইসলামী উভয় যুগেই তিনি বিখ্যাত কবি ছিলেন। তবে মু'আল্লাকায় তাঁর কবিতা অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর তিনি আরবী কাব্য জগতে খ্যাতি লাভ করেন। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় উপস্থিত হয়ে মুহাম্মাদ (সা.) এর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সেসময় তার কবিতা রচনার ধারা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। তিনি আল কুরআন ও হাদীছের মর্মানুবাদে কবিতা রচনা করতেন। যা ইসলামী জীবনে রচিত কাসীদাসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে কবি লাবীদ ইবন রাবী'আ (রা.) এর জীবনী ও তাঁর কাব্য প্রতিভা এ প্রবন্ধে চিত্রিত হয়েছে।

নাম ও বংশ পরিচয়

তাঁর পুরো নাম লাবীদ ইবন রাবী'আ আল-'আমিরী। পারিবারিক ডাকনাম (أبو عقيل) আবূ 'আকীল, উপাধি হলো তায়্যান।[১] তবে আরবী সাহিত্যে লাবীদ নামেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন।[২] কবির পিতার নাম রাবী'আ ইবন মালিক আল 'আমিরী। তিনি আরবের ঐতিহ্যবাহী হাওয়াযিন গোত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উদার ও দানশীল ধনী ব্যক্তি। দানশীলতার কারণে তিনি জাহিলী আরবে (ربيعة المقترين) 'রাবী'আতুল মুকতিরীন' বা অসহায়দের বসন্ত হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[৩] তাঁর মাতার নাম তামির বিন্ত যুনবা।[৪] তিনি ছিলেন 'আবস গোত্রের একজন স্বনামধন্য রমনী। লাবীদের কুলজি পরম্পরা অতি দীর্ঘ। তাঁর বংশানুক্রম নিম্নরূপ: লাবীদ ইবন রাবী'আ ইবন মালিক ইবন জা'ফর ইবন কিলাব ইবন রাবী'আ ইবন

---

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

'আমির ইবন সা'আসা'আ ইবন মা'আবিয়া ইবন বাকর ইবন হাওয়াযিন ইবন মানসূর ইবন 'ইকরামা ইবন খাসাফা ইবন কায়স ইবন 'আয়লান ইবন মুদার।[৫]

জন্ম ও শৈশবকাল

লাবীদ ইবন রাবী'আর জন্মসন নিয়ে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। ইবন হাজার 'আসকালানীর মতে, ইনতিকালের সময় কবির বয়স হয়েছিল ১২০ বছর; তখন কবির জন্মসন দাঁড়াবে ৫৪০ খ্রিস্টাব্দ।[৬] অনেকের ধারণা খ্রিস্টাব্দ ৫৪০ থেকে ৫৪৫ সনের মধ্যবর্তী কোন এক সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[৭] খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইবন আবদ রাব্বীহির ইকদুল ফরীদ গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, তাঁর জন্ম হয়েছিল ৫০৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগের কোন এক সময়ে।[৮] আবূ হাতিম আস সিজিস্তানী তাঁর 'আল-মু'আম্মারূন' (দীর্ঘায়ু ব্যক্তিবর্গ) গ্রন্থে লাবীদ ইবন রাবী'আর বয়স ১২০ বছর বলেই উল্লেখ করেছেন এবং এটিই বিশুদ্ধ মত বলে অনুমিত হয়।[৯]

কবি লাবীদ অভিজাত ও ঐতিহ্যবাহী পরিবারের মধ্যে বেড়ে ওঠেন। চাচাদের তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত পালিতকে আরো শানিত করে। 'মুলা'ইবুল আসিন্নাহ' (বর্শাবিদ) নামে পরিচিত তাঁর চাচা আবূ বারা ছিলেন মুদার গোষ্ঠীর একজন প্রখ্যাত অশ্বরোহী বীর ও দানশীল ব্যক্তি। তাই কবি পারিবারিক ঐতিহ্যের দিক থেকেই দানশীলতা ও বীরত্বের গুণে গুণান্বিত।[১০] পরবর্তীতে পারিবারিক বদান্যতা ও শৌর্য-বীর্যের আদর্শ তাঁর মনের মণি কোঠায় গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। জীবন্ত কবি অনুকূল পরিবেশ পেয়ে অল্প দিনের মধ্যেই হলেন প্রাণবন্ত। বীরত্বে, কবিত্বে, অশ্বারোহণে, অসি চালনায় এবং মসী আল্পনায় হয়ে উঠেছিলেন সিদ্ধহস্ত।[১১]

বাল্যকালে কবি প্রতিভার উন্মেষ

লাবীদ ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন বালক। তাঁর গোত্রীয় লোকেরাও ছিলেন সেকালে সৎগুণাবলীতে ভূষিত এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। বংশের ঐতিহ্যে তিনি অনুকূল পরিবেশে অতি অল্প দিনের মধ্যেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। বাল্যকাল হতেই তিনি ছিলেন ভাব-গম্ভীর ও চিন্তাশীল। সে চিন্তা ছিল একজন শিল্পীর এবং ভাব ছিল একজন স্বভাব কবির। কৈশরেই তিনি কবিতা রচনা করেন ফলে অল্প বয়সেই তাঁর কবি প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে।[১২] লাবীদ যে অনাগত ভবিষ্যতে বুদ্ধিমান একজন বিখ্যাত কবি হবেন তাঁর বাল্যকালের একটি ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি গোত্র বানূ 'আমিরী এবং 'আবস গোত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে বৈরীতামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সময়ের সন্ধিক্ষণে সুযোগ পেলেই তুমুল যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। এ সময়ে হিরা অঞ্চলের সম্রাট ছিলেন নু'মান ইবন মুনযির।[১৩]

তিনি ছিলেন কাব্যানুরাগী। কবি সাহিত্যিকদের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করতেন। লাবীদের মাতুল গোত্র 'আবসের নেতা রবী' ইবন যিয়াদ[১৪] সম্রাটের দরবারে যাওয়া আসা করত। ফলে সম্রাটের সাথে সুসম্পর্ক ও নৈকট্যতা গড়ে ওঠে। এ সুযোগের সৎব্যবহার করে তিনি 'আমিরীদের বিরুদ্ধে সম্রাটের নিকট উসকানীমূলক মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেন। ফলে সম্রাট তাদের উপর রাগান্বিত হলেন।[১৫] একবার গোত্রের অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যাবলী আলোচনার জন্য বানূ 'আমিরী গোত্রের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হলেন। অল্প বয়স্ক হেতু লাবীদকে দলে অন্তর্ভূক্ত করেননি। তাঁরা দরবারে পৌঁছে রবী' ইবন যিয়াদ তাদের নিন্দা করায় রাজা তাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন হতে বিরত থাকলেন। ফলে প্রতিনিধিবর্গ অপমানিত হয়ে প্রত্যার্বতন করলেন।[১৬] সম্রাটের দরবারে সংঘটিত অপমানজনক ও বেদনাদায়ক খবর শুনে লাবীদ মর্মাহত হলেন এবং রবী' ইবন যিয়াদকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার মানসে গোত্রীয় নেতাকে অনুরোধ জানালেন যে, আমাকে সুযোগ দিলে আমি বিষয়টি এমনি বুদ্ধিমত্তার সাথে দেখবো যাতে তিনি রবী' ইবন যিয়াদকে কৌশলে রাজদরবার থেকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করতে পারেন।[১৭]

বালক লাবীদের উক্তি অনুযায়ী ‘আমেরী গোত্রীয় নেতা লাবীদকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে লক্ষ্য করলেন যে, যিয়াদ সেখানে বসে আছেন যথাযথ মর্যাদায়। আর সম্রাট তাদের প্রতি গুরুত্ব সহকারে দৃষ্টিপাত না করায় লাবীদ রাগান্বিত হয়ে কাব্যাকারে বললেন-

هذه التربة لا تذكى نارا * ولا تؤهل دارا

ولا تسر جارا * خيرها قليل-[১৮]

[এ তৃণ পারে না কভু জ্বালাতে আগুন, ঘর বাঁধিবার এর নাই কোন গুণ। পড়শীকে পারে না দিতে আনন্দ দান এর মধ্যে এতটুকু নাই কল্যাণ।]

এ ব্যঙ্গ রচনা শ্রবণ করত তাঁর কবি প্রতিভার পরিচয় পেয়ে পিতৃব্য ‘আবু বারা’ অত্যন্ত খুশী হয়ে কবির মস্তকের কেশ কর্তন করত গোসলান্তে মূল্যবান জামা কাপড়ে ভূষিত করে আনন্দিত চিত্তে তাঁকে নিয়ে রাজ দরবারে উপস্থিত হলেন। দরবার সভাষদে পরিপূর্ণ, আর স্বয়ং বাদশাহ রবী‘ ইবন যিয়াদকে নিয়ে নাস্তা করেছেন। বানূ ‘আমীরের প্রতিনিধিবর্গকে দর্শন করেই রবী‘ ইবন যিয়াদ তাদের বিরুদ্ধে নিন্দবাদ করতে লাগলেন।[১৯] এ অবস্থা অবলোকন করে বালক লাবীদ সম্রাটের উদ্দেশ্যে বলেন, সম্রাটের নীতি হল দয়ার্দ্র হৃদয়ে সবাইকে সমান চোখে দেখা। যে ব্যক্তি একটা সম্ভ্রান্ত বংশের দূর্ণাম করে আপনাকে প্রভাবিত করে, সে যে আপনার বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে আপনার মহান চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করবে না তাতে বিস্ময়ের কি বা অবকাশ থাকতে পারে। বালক লাবীদের কথায় সম্রাট চৈতন্যের উদয় হল। তিনি লাবীদের উদ্যমতা, অসীম সাহস এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন। আর যিয়াদকে শাস্তি হিসেবে চিরদিনের মত রাজদরবার থেকে তাড়িয়ে দিলেন।[২০]

কবিদের সাহচর্যে কাব্য প্রেরণা লাভ

কবি ছিলেন দীর্ঘজীবি। ফলে অনেক কিছু দেখেছেন, লাভ করেছেন। প্রায় দেড়শত বৎসর জীবিত থাকায় অনেক কবির সাহচর্য পেয়েছেন এবং তাঁর উত্তরসূরী অনেকের সাথে সাক্ষাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বানূ তাগলিব গোত্রের মুহালহিল ইবন রাবী‘আ[২১] ‘সাজ’ ছন্দে যে কাসীদা রচনা করেন সে ছন্দরীতি উমাইয়া আমলের ৭১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গতিশীল ছিল। প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ইবন আব্দ রাব্বীহির আল-ইকদুল ফরীদ গ্রন্থানুসারে জানা যায় যে, ৫৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাসূস এর সংঘটিত যুদ্ধে তাঁর অন্যতম সহযোগী মুহালহিল এবং লাবীদ উভয়েই অংশগ্রহণ করেছিলেন। কাজেই শুধু কাব্যিক জগতেই নয় বরং জীবন পরিক্রমায় যুদ্ধের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে লাবীদ কবি মহালহিলের অনুসারী ছিলেন।[২২] তিনি গাস্সানীদের পক্ষ থেকে প্রসিদ্ধ হালিমার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এ সম্পর্কে P.K. Hitti বলেন- "Labid the youngest of the seven poets who composed the famous 'Muallaqat' fought on Gassanid side in the Battle of Halima." [২৩]

কবি লাবীদ নযদ অঞ্চলের কবি শানফারা এবং তাব্বাতা শাররার সাহচর্য লাভেও সমর্থ হয়েছিলেন। প্রথম মু‘আল্লাকা রচয়িতা ইমরু‘উল কায়সের ৪৮০-৫৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত থাকায় লাবীদ তার সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। এছাড়া ত্বরাফা ইবন আবদ, যুহায়র ইবন আবী সুলমা, ‘আমর ইবন কুলসুম, আনতারা ইবন সাদ্দাদ ও হারিছ ইবন হিল্লিযা প্রমুখের সাথে লাবীদ উঠাবসা করতেন ও তাদের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এছাড়া তাদের সাথে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে ও অসংখ্য সাহিত্যিক সমাবেশে যোগদান করেছেন।[২৪]

ইসলাম গ্রহণ এবং মানুষিক প্রতিক্রিয়া

ইসলাম পূর্ব যুগে তিনি ছিলেন আদর্শ বেদুঈন এবং বিখ্যাত কবি। এমনি সুখ্যাতি আর সম্মানের মাঝে প্রতিষ্ঠিত লাবীদের কর্মময় জীবন। পরিবর্তন হয় ইসলামী জীবনে; যেটি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় হিজরতের পর ইসলামের প্রচার-প্রসার আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। লাবীদের গোত্রেও তার ছোয়া লাগে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সাক্ষাৎ এর সিদ্ধান্ত নেন। গোত্রের প্রতিনিধিদের সাথে এসে রাসূল (সা.) এর সহচার্য পেয়ে ইসলামের অমীয় সুধা পান করেন এবং গোত্রের লোকেরাও তাঁর অনুসরণ করেন।[২৫] এ সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিবেদন করে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন-

أتينا يا خيرا البرية كلها * لترحمنا مما لقينا من الأزل
أتيناك والعذراء يدمى لبانها * وقد ذهلت أم الصبى عن الطفل
وليس لنا الا إليك فرارنا * وأين يفر الناس إلا إلى الرُسُلِ-[২৬]

[ওহে সকল সৃষ্টি সেরা! আমরা নিপতিত সঙ্কট হতে উত্তরণের জন্য আশায় বুক বেঁধে তোমার দরবারে হাজির হয়েছি। তোমার দরবারে আগমন এমন এক সঙ্কটময় মুহূর্তে যখন সতীসাধবী কুমারী নারীর বক্ষ শুকিয়ে গিয়েছে এবং শিশুর জননী নিজ সন্তানকে ভুলে গিয়েছে। তোমার কাছে আশ্রয় নেয়া ছাড়া আমাদের আর কোন গত্যন্তর ছিল না। রাসূল ছাড়া আর কার কাছেই বা মানুষ ঠাঁই নেবে।]

লাবীদ মদীনায় ইসলাম গ্রহণের পর বেশকিছু দিন সেখানে অবস্থান করে মদীনায় নিজ গোত্রের কাছে ফিরে আসেন। বেশীর ভাগ বর্ণনাতে পাওয়া যায়, তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হতে পেরেছিলেন। ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী বলেছেন- তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত মুসলমান এবং সত্যের নিষ্ঠাবান অনুসারী।[২৭]

ইসলামের ছায়াতলে আসার পর তিনি খুব কমই কাব্যচর্চা করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তাঁর মানুষিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আমি কাব্য ত্যাগ করে কুরআন পেয়েছি। কুরআনের অপূর্ব রচনাশৈলী ও রূপ সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। কুরআনের কাছে আমার কাব্য প্রতিভা ম্লান হয়ে গেছে। তাই আমি কবিতা লিখতে পারি না। আর এজন্যই ইসলাম গ্রহণের পর দীর্ঘদিন জীবিত থাকলেও তাঁকে জাহিলী যুগের কবিদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[২৮] কারো মতে, এরপর তিনি একটি মাত্র বায়াত ছাড়া আর কোন কবিতা রচনা করেননি। আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত ও আবুল য়াকযানের মতে, সেই বায়াতটি নিম্নরূপ:

الحمد لله إذ لم يأتنى أجلى * حتى كسانى من الإسلام سربالا-[২৯]

[সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যই, যিনি আমাকে ইসলামী জীবনের পরিচ্ছদ পরিধান করার আগে মৃত্যু দেননি।]

তবে এ মতটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়নি। এ ব্যাপারে আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী তাঁর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ কিতাবুল আগানীতে উল্লেখ করেছেন-

ما عاتب المرء الكريم كنفسه * والمرء يصلحه الجليس الصالح-[৩০]

[সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি (কখনও) নিজেকে ভর্ৎসনা দেয় না, আর সৎসঙ্গ মানুষকে পরিশুদ্ধ করে।]

তবে উপরোক্ত মন্তব্যের সাথে অনেকে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা বলেন- লাবীদ ইসলামী জীবনে এসেও প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন, দীওয়ানে তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারাকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ তিনি কুরআন পড়তেন, কুরআন বোঝার চেষ্টা করতেন, আলংকারিক দিকগুলি বের করে তার উপর কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় করতেন। লাবীদের জীবনীকারকগণ

প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে, তাঁর ইসলামী জীবন ছিল সবচেয়ে মধুময়। ইসলামী আদর্শে রচিত কবিতা মহানবী (সা.) শ্রবণ করেছেন এবং কবিতার রচনাশৈলীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হাদীছ শরীফে এসেছে-

عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شئ ما خلا الله باطل- وكل نعيم لا محالة زائل-[৩১]

[হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: সবচেয়ে সত্য কথা হলো কবি লাবীদের নিম্নোক্ত কথা: জেনে রেখো আল্লাহ ছাড়া সবই নশ্বর এবং প্রত্যেক মূল্যবান বস্তুই অস্থায়ী ও বিলীয়মান।]

কবি লাবীদের ইন্তিকাল

কবি লাবীদের মৃত্যুসন নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও তিনি যে সুদীর্ঘ জীবন উপভোগ করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর নিম্নোক্ত কবিতায় বয়সের ভারে ন্যুজের চিত্র ফুটে উঠে। কবি বলেন-

ولقد سئمت من الحياة وطولها * وسؤال هذا الناس كيف لبيد-[৩২]

[আমি দীর্ঘজীবন অতিক্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর বিরক্ত হয়ে পড়েছি মানুষের এই প্রশ্নে-'লাবীদ কেমন আছো'?]

ইবন সাদ বলেছেন- মু'আবিয়া (রা.) যে দিন হাসান ইবন 'আলী (রা.) এর সাথে আপোস সীমাংসার জন্য 'নুখায়লা' যান, সেই রাতেই লাবীদ মারা যান।[৩৩] ইবন কুতায়বা (হি. ২৭৬/ খ্রি. ৮৮৯) বলেছেন- তিনি মু'আবিয়া (রা.) এর খিলাফতকালে ৪১ হিজরী মোতাবেক ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ১৫৭ বছর বয়সে কুফাতে মারা যান। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৩৪]

কাব্য প্রতিভার মূল্যায়ন

কবি লাবীদ যুগ সংক্রান্তকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তবে জাহিলী এবং ইসলামী উভয় যুগেরই তিনি বিখ্যাত কবি। এজন্য তাকে মুখাদরাম কবি বলা হয়। তিনি পরষ্পর বিরোধী ও সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর দুটি সভ্যতা অবলোকন করেছেন। ফলে অনেকে তাকে জাহিলী ও ইসলামী যুগের সেতুবন্ধন রচনাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৩৫] প্রাক-ইসলামী যুগে তাঁর খ্যাতির কষ্টি পাথর হচ্ছে স্বীয় মু'আল্লাকা। তাঁর রচিত মু'আল্লাকায় বেদুঈন জীবনের চিত্র অসাধারণরূপে চিত্রিত হয়েছে। বেদুঈন চরিত্রের সাহস, বাদান্যতা, নির্ভীকতা, দুধর্ষতা প্রভৃতি গুণের সমারোহ লাবীদের চরিত্রে লক্ষ্য করা যায় এবং এ সবের সুস্পষ্ট প্রভাব তাঁর জাহিলী কবিতায় পরিদৃষ্ট হয়।[৩৬]

কবি কল্পনার চিত্র অংকনে, বর্ণনার সাবলীল গতিশীলতায়, প্রকাশ ভঙ্গির অসীম ক্ষমতার সবতাতেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কবি তাঁর প্রিয়ার বিদায়ের দৃশ্যে যে নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি বলেন-

شاقتك ظعن الحى حين تحملوا * فتكنسو قطنا تصر خيامها-[৩৭]

[গোত্রের শিবিকারোহনী যুবতীগণ তোমাকে উদাস প্রেমিক বানিয়েছে। তাদের কবীলা যাত্রাকালে যখন তারা সাওয়ার হল এবং নবনির্মিত পালকিতে গিয়ে আসন নিল তখন সেগুলো মর্মর আওয়াজের সুর ধ্বনিতে যেন মুখরিত হয়ে উঠছিল।]

শোকগাথা রচনায় তিনি জাহিলী যুগের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। এগুলিকে তিনি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় অবলিলায় ব্যক্ত করেছেন। প্রিয়ার বিরহকালে প্রেমিকার আঁচলসিক্ত করা মায়া কান্নার দৃশ্য কবিতায়

সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি পালা বদলের এ বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন দ্বিধাহীনচিত্তে। পৃথিবীতে কোন মানুষ চিরকাল ধরে চিরঞ্জীবি নয়। ফলে কাউকে ভালবাসলে তাকে হারাতে হয়। এতে দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। মৃত্যু প্রিয় পৃথিবীর কোমল বন্ধন থেকে মানুষকে পৃথক করে দেয়। কবি বলেন-

أو لم تكن تدرى نوار بأننى * وصال عقد حبائل جذامها-[৩৮]

[হে মোর প্রেয়সী 'নাওয়ার'! আমার প্রণয় রীতি কি তোমার জানা নেই? প্রীতি ডোরে বাঁধার সময় তো বাঁধি কঠিন হাতে। কিন্তু আবার ছিঁড়ার সময় কোন পরোয়াই করি না, আর ক্ষিপ্র হাতে আমি সে ডোর ছিন্নও করি বটে।]

কবি লাবীদ ইসলামী যুগে যে সমস্ত কবিতা রচনা করেছেন এর ধারা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাঁর কবিতায় পবিত্র কুরআন ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষনীয়। এসব কবিতার ভাষা প্রাঞ্জল ও আকর্ষণীয়। তিনি কুরআনের হাফিয ছিলেন। ফলে কুরআন গবেষণা করে তাওহীদ, নামায, জান্নাত, জাহান্নাম, আখিরাত ও হিসাব নিকাশ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন এবং আল-কুরআন ও হাদীছের মর্মানুবাদে কবিতা রচনা করতেন।[৩৯] যেমন কবি বলেন-

وكل أناس سوف تدخل بينهم * دويهية يصفر منها الأنال-[৪০]

[সকল মানুষ অতি শীঘ্র তাদের মধ্যে মৃত্যুর প্রবেশ ঘটবে। আর তাতে আঙ্গুলের আগাসমূহ হলুদ বর্ণ ধারণ করবে।]

তাঁর কবিতায় ধর্মীয় 'আকীদা, বিশ্বাস এবং তাকদীর শুধু নয়, অধিকন্তু তা আল্লাহ ভীতির চেতনায় পরিপূর্ণ। বিধায় তিনি তার কাসীদায় আসমান ও যমীনে সৃষ্টির কথা বলেছেন। এ পৃথিবীর অতীতের বলদর্পী রাজন্যবর্গ লুকমান, তাঁর শকুন, আবরাহা, হীরা ও গাসসানীয় রাজন্যবর্গ প্রমূখের পরিণাম ও পরিণতির কথা বলে মানুষকে উপদেশ দান করেছেন। তাঁর কুরআনের মর্মবানী তিনি গভীরভাবে উপলদ্ধি করেন। ইসলামী জীবনে রচিত কাসীদাসমূহে তিনি তা প্রকাশ করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট কাসীদাটি হল সেই লামিয়াটি যাতে নিম্নের শ্লোকগুলো আছে-

إن تقوى ربنا خير نفل * وبإذن الله ريثى وعجل

أحمد الله فلا ندله * بيديه الخير ما شاء فعل-[৪১]

[নিশ্চয় আমাদের মহান প্রভুর ভীতি সর্বোত্তম দান। আমার ধীরগতি ও দ্রুততা আল্লাহরই ইচ্ছায়। আমি প্রশংসা করি আল্লাহর যার কোন শরীক নেই। মঙ্গল ও কল্যাণ যার ক্ষমতায় এবং তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।]

কবি লাবীদের কাব্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ড. হান্না নাসর আল হিত্তী বলেন: লাবীদ জাহিলী যুগে স্বীয় গোত্রের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। আব্বাসীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বাশশার ইবন বুরদকে একবার বলা হলো আরব কবিদের রচিত সর্বোত্তম দুটি চরণ শোনাতে তিনি লাবীদের কাব্য থেকে দুইটি চরণ আবৃত্তি করেন। কাব্য চর্চার অন্যতম স্থান কুফায় কবি লাবীদের কাছে শ্রেষ্ঠ কবি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি প্রথমে ইমরু'উল কায়েস এরপর তারাফা এবং তৃতীয় স্থানে নিজের নামের দিকে ইঙ্গিত করেন।

লাবীদ রচিত মু'আল্লাকার বিষয়বস্তু

কবি লাবীদের রচিত মু'আল্লাকার স্বাতন্ত্র্য কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রেমগত কারণে হোক কিংবা কাসীদার নিয়ম রক্ষার্থে হোক মু'আল্লাকা প্রণেতাগণ আপন আপন প্রেয়সীকে স্মরণ ও প্রেম নিবেদন করেই কাব্য রচনার সূত্রপাত করেন।[৪২] কিন্তু লাবীদ এখানে কিছু ব্যতিক্রমী দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। তিনি প্রেয়সী নাওয়ারার চলে যাওয়ায় মনে ভিতর অব্যক্ত শূন্যতা প্রথমেই কবিতায় প্রকাশ করেছেন। তিনি জনশূন্য আবাসভূমি, মরুর প্রাকৃতিক দৃশ্য নানা উপমা ও রূপকের আশ্রয় নিয়ে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। বর্ষার বারিপাত, বজ্রপাত ও হেমন্তের বাদল ধারার ফলে সেই প্রিয় বাস্তুভিটা আজ ঝোপজঙ্গলে আবৃত। সেখানে এখন বন্যচামরী উটপাখির দল বাসা বাঁধে। তাই তাঁর কবিতার প্রারম্ভে চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাসভূমির বিলুপ্তপ্রায় চিহ্নগুলোর স্মৃতিচারণ করেছেন। কবি যথার্থই বলেছেন-

عفت الديار محلها فمقامها *بمنى تأبد غولها فرجامها-[৪৩]

[মিনায় অবস্থিত আমার ক্ষণস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী আবাসসমূহ বিলীন হয়ে গেছে। একইভাবে 'গাওল' ও 'রিজাম' পর্বতদ্বয়ে অবস্থিত মনোরম বাসভূমিও উজাড় এবং বিরান হয়ে পড়ে রয়েছে।]

বাস্তুভিটার বর্ণনা

প্রিয়ার বিরহ ব্যথায় কবির মনে অনুশোচনা এসেছে। কারণ তার প্রিয় হিজাজের পার্শ্ববর্তী ফিদা নামক স্থানে চলে গেছেন। ফলে প্রিয়ার সঙ্গে তার আর সাক্ষাতের কোন আশাই নেই। প্রিয়ার বাস্তুভিটা এখন তার মনের অব্যক্ত শূন্যতা গ্রাস করেছে। প্রেয়সী ও তার বাস্তুভিটাকে তিনি বিষাদ এবং হতাশার শোক হিসেবে দেখেছেন। কবির ভাষায়-

فوقفت اسألها، وكيف سؤالنا * صما خوالد مايبين كلامها-[৪৪]

[(আমার স্মৃতিমুখর এই বস্তুভিটাকে) আমি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, অথচ আশ্চর্য! নির্বাক, নিথর পাষানের নিকট এ কেমন ধারা প্রশ্ন আমার?]

মরু জীবনের বর্ণনা

জীবনাচার ও মরু প্রকৃতির বর্ণনায় কবি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মরু জাহাজ উটের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি একে তুলনা করেছেন কখনো তাড়িত গর্দভ-গর্দভীর সাথে, আবার কখনো শাবক হারা বন্যগাভীর সাথে যে নিজ শাবকের সন্ধানে হন্যে হয়ে ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে বেড়ায়। কবির ভাষায়-

أو ملمع وسقت لاحقب لاحه * طرد الفحول، وضربها وكدامها-[৪৫]

[কিংবা (সে উষ্ট্রী) গাভিন হওয়া বন্যগর্দভীর ন্যায় (ক্ষিত্রগতি সম্পন্ন) যে সাদা কোমর বিশিষ্ট বন্য গাধা কর্তৃক গর্ভিত হয়েছে। যাকে অপরাপর বন্যগাধার ধাওয়া, আক্রমন ও দন্তাঘাত ক্ষতবিক্ষত করেছে।]

কবি লাবীদের উদারতা ও হিংসার কুফল বর্ণনা

কবি লাবীদের মানবতা, উদারতা, বদান্যতা. দানশীলতা, আমানতদারিতার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে নিজ গৌরব ও বংশগৌরবের কথা তুলে ধরেন। তিনি স্বজন এবং প্রতিবেশীর প্রতি পুরোপুরি সজাগ ছিলেন। তিনি দানে ছিলেন অকৃপণ। কবি বলেন-

فضلا، وذو كرم يعين على الندى * سمح كسوب رغائب غنامها-[৪৬]

[এটি সে করে অনুগ্রহের খাতিরে। আর আমাদের মধ্যে রয়েছে উদার ব্যক্তিত্ব যিনি দান-দক্ষিণায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং তিনি নিজেও ধনাঢ্য দানবীর।]

কবি লাবীদের হিংসার কুফল সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি ছিল। একজন সাধু ও সৎ ব্যক্তির জীবনে হিংসা বিদ্যমান থাকা অনুচিত। কারণ হিংসা করা সর্বযুগে সকলের নিকট লাঞ্চিত, অপমানিত, ধিকৃত, ঘৃণিত ও ভর্ৎসিত। যেমন কবি বলেন-

فاقنع بما قسم المليك فإنما * قسم الخلائق بيننا وعلامها-[৪৭]

[সুতরাং হে হিংসুটের দল! সর্বশক্তিমান আল্লাহর বন্টন নীতির উপর তোমরা সন্তুষ্ট থাক। কেননা তিনি আমাদের ভাগ্যে যে চরিত্র নির্ধারণ করেছেন তদ্বিষয়ে তিনিই অধিক পরিজ্ঞাত।]

পরিশেষে বলা যায় কবি লাবীদ তাঁর কাব্য প্রতিভা বলে ইসলাম পূর্ব ও পরবর্তী যুগে একজন চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর উন্নত চিন্তা-চেতনা দ্বারা উভয় যুগের আরবী সাহিত্যে তৎকালীন আধুনিকতার উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর কবিতা, নৈতিকতা, সদাচরণ, উদারতা এবং ইসলামী শাশ্বতবোধ পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় অম্লান ও চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

১ আহমাদ আল-হাশিমী, *জাওয়াহিরুল আদাব*, ২য় খণ্ড (মিসর: মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ২৫৭; জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ* (বৈরূত: মানশুরাতু দারু মাকতাবাতুল হায়াহ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১৭০; ইবন কুতায়বা, *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ২৭৪।

২ ইকবাল সাইলো, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকায় রোমান্টিসিজম* (ঢাকা: সবুজ পাতা প্রকাশনী, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৮৪।

৩ আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, *কিতাবুল আগানী*, ১৫শ খণ্ড (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৫৯ খ্রি.), পৃ.৩৬১; ইয়াহইয়া আল-জাবুরী, *লাবীদ ইবন রাবী'আ আল-'আমিরী* (বাগদাদা: মাতবা'আহ আল-মা'আরিফ, ১৯৬২ খ্রি.), পৃ. ২৯।

৪ ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ২য় খণ্ড (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ৮৯; *ইয়াহইয়া আল-জাবুরী*, পৃ. ২১।

৫ A. J. Arberry, *The Seven odes* (New york: The Macmillan Company, 1967), p. 121; *আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী*, ১৫ খণ্ড, পৃ. ৩৫০।

৬ ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবি কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন* (চট্টগ্রাম: আহমদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ২৪০।

৭ ড. 'উমার ফাররুখ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২৩১।

৮ আব্দুস সাত্তার, *কবি সাহাবা লাবীদ* (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৫।

৯ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পা. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৩ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৮৪; *প্রাচীন আরবি কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ২৪০।

১০ *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা*, পৃ. ১২৪; আহমদ আল-ইসকান্দী ও মোস্তফা 'আনানী, *আল-ওয়াসীত ফিল আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারীখিহী* (মিসর: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ৮৫।

১১ মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা* (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৭৪; *জাওয়াহিরুল আদাব*, পৃ. ২৫৮।

[১২] *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকায় রোমান্টিসিজম*, পৃ. ৮৪; *সপ্ত ঝুলপ্ত গীতিকা*, পৃ. ১৭৪।

[১৩] নু'মান ইবন মুনযির হিরার রাজা ছিলেন। Cf. K. A. Fariq, *History of Arabic Literature* (Delhi: Vikas publications, 1972), p. 84-85; মোঃ আবুল কাশেম ভূঞা, *সাহাবীদের (রা.) কাব্যচর্চা* (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১২৩।

[১৪] রবী' ইবন যিয়াদ ছিলেন বনূ আবস গোত্রের একজন প্রভাবশালী নেতা। তাছাড়া তিনি হিরার রাজা নু'মান ইবন মুনযিরের সভাসদ ছিলেন। দ্র. *মোঃ আবুল কাশেম ভূঞা*, পৃ. ১২৩।

[১৫] *আব্দুস সাত্তার*, পৃ. ৭।

[১৬] *K. A. Fariq*, p. 84-85; *আব্দুস সাত্তার*, পৃ. ৯।

[১৭] *তদেব*, পৃ. ৯।

[১৮] আহমাদ হাসান আয্ যাইয়াত, *তারীখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরূতঃ দারুল মা'আরিফাহ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৫৪; *আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী*, পৃ. ৩৬৪।

[১৯] বতরুস আল-বুসতানী, *'উদাবা আল-আরাব* (বৈরূতঃ দারু নাযীর আবদু, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ১৪৫; *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকায় রোমান্টিসজম*, পৃ. ৩২।

[২০] *আব্দুস সাত্তার*, পৃ. ৯-১০।

[২১] মুহালহিল ইবন রাবী'আ ছিলেন তাঘলিব গোত্রের প্রধান কুলাইবের ভাই। জাহিলী যুগের কবিদের মধ্যে মুহালহিল সর্বপ্রথম কাসীদা রচনা করেছেন। তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর দীওয়ান সংকলন করা হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু সে সংকলন এখনও পাওয়া যায়নি। দ্র. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৮২।

[২২] *আব্দুস সাত্তার*, পৃ. ৯-১০।

[২৩] P. K. Hitti, *History of the Arabs* (London: The Macmillan press, 1961), p. 8.

[২৪] *আব্দুস সাত্তার*, পৃ. ১১।

[২৫] *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫; *আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা*, পৃ. ৯৮; *K. A. Fariq*, p. 86.

[২৬] ড. 'উমার ফারূক আত তাব্বা' সম্পাদিত, *দীওয়ানু লাবীদ ইবন রাবী'আ* (বৈরূতঃ দারুল আরকাম, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১২৫; *লাবীদ ইবন রাবী'আ আল-'আমিরী*, পৃ. ৩৯-৪০।

[২৭] ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী, *তাবাকাত আশ-শু'আরা* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৪৯।

[২৮] *আহমাদ হাসান আয্ যাইয়াত*, পৃ. ৬৯।

[২৯] ড. হান্না নাসর আল হিত্তী, *দীওয়ান লাবীদ ইবন রাবী'আহ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৫; *কিতাবুল আগানী*, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯।

[৩০] *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫; *আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী*, পৃ. ৩৬৯; ইবন হাজার আল-আসকালানী, *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড (মিসরঃ প্রকাশনালয়ের নাম বিহীন, ১৩২৮ হি.), পৃ. ৩২৬।

[৩১] মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, ৩য় খণ্ড (দেওবন্দঃ আল-মাকতাবা আর রাহীমিয়া, ১৩৮৪ হি.), পৃ. ৯০৮; *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকায় রোমান্টিসিজম* (ঢাকাঃ সবুজ পাতা প্রকাশনী, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৩৪০।

[৩২] আল-কুরতুবী, *আল-ইসতী'আব*, টীকাঃ *আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা*, ৩য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিক্র, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ৩২৮; *আল-আগানী*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩২৫।

[৩৩] *আত-তাবাকাত আল-কুবরা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরূতঃ দারু সাদির, ১৯৫৭ খ্রি.), পৃ. ৩৩।

[৩৪] *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা*, পৃ. ১২৩; *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা*, পৃ. ১৮২।

[৩৫] *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা*, পৃ. ১৮২।

[৩৬] *প্রাচীন আরবী কবিতাঃ ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ২৪৪।

[৩৭] *ড. হান্না নাসর আল হিত্তী*, পৃ. ২০৫।

[৩৮] *তদেব*, পৃ. ২২৬।

[৩৯] ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ২য় খণ্ড (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ৯০।

[৪০] *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা*, পৃ. ১২৪।

[৪১] *তদেব*, পৃ. ১২৬।

[৪২] *প্রাচীন আরবী কবিতাঃ ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ২৪৭।

[৪৩] ড. হান্না নাসর আল হিত্তী, পৃ. ১৯৯।

[৪৪] *তদেব*, পৃ. ২০৪।

[৪৫] *প্রাচীন আরবী কবিতাঃ ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ২৫৩।

[৪৬] *তদেব*, পৃ. ২৬১।

[৪৭] ড. হান্না নাসর আল হিত্তী, পৃ. ১৯৯।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

অর্থোপার্জনে কবি বাশ্‌শার ইবন বুর্‌দ-এর স্তুতিগাথা

ড. মো. সেতাউর রহমান*

Abstract: Bashshar ibn Burd was a renowned and prolific poet of the Umayyad and Abbasid periods. He came from a rich cultural family of Basra and showed his poetic talent at an early age. He earned his fame as a court-poet of Abbasid Caliphs. After the establishment of Baghdad by the Abbasids, Bashshar moved there from Basra in 762. He became associated with Khalid Barmaki-the finance minister of the first Caliph Abul Abbas as-Saffah, the Caliph Abu Jafar al-Mansur and the Caliph al-Mahdi. He had free space and access to the royal residence of Caliphs. He wrote a lot of commendable poetry in praise of them and received from them special position, dignity and honour with huge money and wealth. He is considered as one of the pioneers of badi' in Arabic literature. The poet has a great influence on the next generation of Arabic poets. Within the paper the researcher is trying to demonstrate the special position of poet Bashshar ibn Burd to the Abbasid Caliphs. So, the main objective of this study is to provide a clear idea about the glorious position of poet Bashshar and his earning money from the Abbasid Caliphs.

ভূমিকা

কবি বাশ্‌শার ইবন বুর্‌দ (৯৫ হি./৭১৪ খ্রি.-১৬৭ হি./৭৮৪ খ্রি.) আব্বাসীয় যুগের অন্যতম প্রথিতযশা কবি ছিলেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সে সময় থেকেই তাঁর কবিতার মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে উদ্দিপ্ত করতে সক্ষম হন। স্বল্প সময়েই তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি প্রথমত খলীফা আবুল আব্বাস আস-সাফ্‌ফাহর অর্থমন্ত্রী খালিদ বার্মাকী এবং পরে আব্বাসীয় যুগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলীফা আবূ জা'ফর আল-মানসূর ও আল-মাহদীর প্রশংসাগীতি রচনা করে প্রচুর উপঢৌকন লাভ করেন। তিনি তাঁদের একান্ত বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হন এবং রাজকবির মর্যাদা লাভ করেন। তিনি খলীফাগণের প্রশংসায় অসংখ্য কবিতা রচনা করেন, যা আরবী কাব্য-সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ দলীল হিসেবে পরিগণিত। আব্বাসীয় যুগের কবিতায় তিনি নতুনত্ব আনয়ন করেছেন। জাহিলী যুগের কাব্যে ইমরুউল ক্বায়সের যে স্থান, আব্বাসীয় যুগের কবিদের মাঝে বাশ্‌শারেরও সে স্থান। কবিতার গঠন ও আকৃতির দিক থেকে তিনি জাহিলী কবিদের অনুসারী হলেও বিষয়বস্তু, ভাব ও মর্মে তিনি এক নতুন পথের পথিকৃত হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর কবিতাকে প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার সেতুবন্ধন মনে করা হয়।

বাশ্‌শার ইবন বুর্‌দ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

কবির প্রকৃত নাম বাশ্‌শার।[১] পুরোনাম বাশ্‌শার ইবন বুরদ্ ইবন ইয়ারজুখ আল-আকীলী।[২] তাঁর দাদা ইয়ারজুখ পূর্ব ইরানের অধিবাসী ছিলেন। সেখান থেকে খুরাসানের শাসক আল-মুহাল্লাব ইবন আবি সুকয়াহ (৭৯-৮১ হি.) কোন এক যুদ্ধে তাদেরকে বন্দী করে খুরাসানে নিয়ে আসেন। তিনি ৭১৪ খ্রি./৯৫ হি. মতান্তরে ৯৬ হিজরীতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন।[৩] কবির পিতা প্রকৃতপক্ষে পারস্যের এবং মাতা রোমের অধিবাসী ছিলেন। তাই বাশ্‌শার নিজেকে পিতার দিক থেকে পারসীয় এবং মাতার দিক থেকে রোমীয় বলে পরিচয় দিতেন। যেমন তিনি মাতৃ বংশের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন,

وقيصر خالى اذا عددت يوما نسبى[৪]

---

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

"যেদিন আমার বংশ হিসেব করেছি সেদিনই জেনেছি কায়সার আমার মামা।"

বানূ উকাইল গোত্রে প্রতিপালিত হওয়ায় তিনি সহজেই আরবী ভাষা আয়ত্ব করেন এবং বসরার শহরতলীতে আগত বেদুঈনদের সাথে মেলামেশা করার ফলে তাঁর ভাষা বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত হয়। কবি বাশ্‌শার ইবন বুর্‌দ জন্মান্ধ ছিলেন বিধায় পৃথিবীর রূপ, রস, সৌন্দর্যাবলি অবলোকন করার সুযোগ পাননি। নিজের অন্ধত্বের কথা প্রকাশ করে তিনি বলেন,

عميت جنينا والذكاء من العمى * فجئت عجيب الظن للعلم موئلا[৫]

"জন্ম থেকেই আমি অন্ধ। আর বুদ্ধিমত্তা অন্ধত্ব থেকেই এসেছে। অতঃপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আশ্চর্য ধ্যান-ধারণা নিয়ে এগুলোর ধারক ও বাহকরূপে আবির্ভূত হয়েছি।"

কাব্যচর্চায় অবদান

দশ বছর বয়সেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। তাঁর কবিতা আরব জাতির মাঝে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে দিত। অনেকে তাঁর পিতার নিকটে এ ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলে পিতা তাঁকে বেদম প্রহার করতেন। তবে মাতা সব সময় তাঁর প্রতি দয়াপরবশ ছিলেন। তিনি স্বামীকে প্রহার থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করতেন। পিতা বলতেন আমি তাঁকে প্রহার করতে চাই না; কিন্তু জনগণ তার ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলে আমি প্রহার করতে বাধ্য হই। এ কথা শুনে কবি তাঁর পিতাকে বলতেন- 'আপনি তাদেরকে আল্লাহর বাণী শুনিয়ে দিন',

ليس على الأعمى حرج[৬]

"অন্ধের ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই।"

তৎকালীন কাব্যজগতের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁর সহজ পদচারণা ছিল। তবে প্রশংসাগীতি ও ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। যেমন তিনি খলীফা আল-মাহদীর প্রশংসায় বলেন,

اذا غدا المهدى فى جنده * او راح فى ال الرسول الغضاب
بدا لك المعروف فى وجهه * كالظلم يجرى فى ثنايا الكعاب[৭]

তিনি আব্বাসীয় যুগের কবিতায় নতুনত্ব আনয়নে অগ্রজ পথিকের ভূমিকা পালন করেছেন। জাহিলী যুগের কবিদের মধ্যে যেমন ইমরু'উল ক্বায়সের শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান, আব্বাসীয় যুগের কবিদের মাঝেও তেমনি বাশ্‌শারের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কবিতার গঠন ও আকৃতির দিক থেকে তিনি জাহিলী কবিদের অনুসারী ছিলেন। তবে বিষয়বস্তু, ভাব ও মর্মে তিনি এক নতুন গতিধারা সঞ্চার করেন। তাঁর কবিতাকে প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার মাঝে সেতুবন্ধন মনে করা হয়। যেমন আহমাদ হাসান আয্‌-যাইয়্যাত বলেন,

وإن شعره هو الحد الأوسط بين الشعر القديم والحديث-[৮]

"তাঁর কবিতা প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে স্বীকৃত।"

তিনিই আব্বাসীয় যুগের একমাত্র কবি যাঁর কবিতাকে ব্যাকরণবিদগণ উদাহরণ হিসেবে পেশ করে থাকেন। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি এবং সে যুগের শ্রেষ্ঠ। যেমন আল-জাহিয বলেন,

وهو من المطبوعين أصحاب الإبداع والاختراع المتفننين فى الشعر-[৯]

"তিনি ছিলেন স্বভাব কবিদের অন্যতম। তিনি কবিতায় আধুনিক ভাবধারার প্রবর্তনকারী।"

আল-জাহিয আরও বলেন,

المطبوعون على الشعر بشار والسيد الحميرى وابو العتاهية وابن ابى عيينة ولكن بشارا أطبعهم[১০]

"স্বভাবকবিগণ হলেন, বাশ্‌শার, আস-সাইয়্যেদুল হুমায়রী, আবূল 'আতাহিয়াহ এবং ইবন আবি উ'আইনাহ। তবে বাশ্‌শার হলেন তাঁদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্বভাবকবি।"

অনেকে তাঁর ব্যাপারে নাস্তিকতার অভিযোগ পেশ করলেও আমরা তাঁর থেকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলীর বর্ণনা সম্বলিত কবিতা লক্ষ্য করি। যেমন তিনি বলেন,

مولاك أكرم من تميم كلها * أهل الفعال ومن قريش المشعر
فارجع إلى مولاك، غير مدافع * سبحان مولاك الأجل الأكبر[১১]

"তোমার প্রভু তামীম গোত্রের কর্তাব্যক্তিদের সকলের চেয়ে সম্মানী এবং কুরায়শ দলের সকলের চাইতেও। তাই তুমি কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তোমার প্রভূর দিকে ফিরে যাও। তোমার প্রভূ পবিত্র, সম্মানিত মহান।"

কবি বাশ্‌শার ইবন বুরদের ন্যায় এত অধিক সংখ্যক কবিতা সমসাময়িক খুব কম কবিই রচনা করেছেন। শুধু তাঁর কাসীদার সংখ্যা ১২ হাজার। আব্বাসীয় যুগের পরবর্তী কবিগণ তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর কবিতার একটি সংকলন কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ইন্তেকাল

একদা কবি বাশ্‌শার ইবন বুরদ্ খলীফা আল-মাহদীর প্রশংসাগীতি রচনা করেন। কিন্তু খলীফা বিনিময়ে কবিকে পুরস্কার প্রদান না করায় তিনি কাব্যের ভাব ও ভাষা পরিবর্তন করে নিম্নোক্ত ভাষায় খলীফার কুৎসা রচনা করেন,

بنى أمية هبوا أطال نومكم * ان الخليفة يعقوب بن داود
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا * خليفة الله بين الزق و العود[১২]

'হে উমাইয়্যা গোত্রের লোকেরা! তোমরা তোমাদের প্রলম্বিত ঘুম থেকে জেগে ওঠ। নিশ্চয় খলীফাতো ই'য়াকুব ইবন দাউদ (খলীফা আল-মাহদীর উজির)। তোমাদের খিলাফত (সাম্রাজ্য) ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অতএব হে জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহর খলীফা (খলীফা আল-মাহদী) কে মদ (মদের পাত্র) ও গান-বাজনার মাঝে অন্বেষণ কর।'

উক্ত সংবাদ খলীফার নিকটে পৌঁছলে তিনি কবিকে রাজ-দরবারে ডেকে পাঠান। কবি সেখানে উপস্থিত হলে খলীফার নিদের্শে পুলিশ তাঁকে বেদম প্রহার করে। উক্ত আঘাতেই তিনি ৭০ বছর বয়সে ৭৮৪ খ্রি./১৬৭ হি. মতান্তরে ১৬৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[১৩]

অর্থোপার্জনে কবির স্তুতিগাথা

আব্বাসীয় যুগের প্রথিতযশা কবি বাশ্‌শার ইবন বুর্‌দ (মৃ. ১৬৭ হি.) খলীফা আবুল আব্বাস আস-সাফ্‌ফাহ্‌র অর্থমন্ত্রী খালিদ ইবন বার্মাকীর প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেন। ফলশ্রুতিতে খালিদ ইবন বার্মাকী কবি বাশ্‌শারকে যথার্থভাবে অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। কবি যখনই তাঁর দরবারে যেতেন তিনি কবিকে পাঁচ হাজার দিরহাম প্রদান করতেন। পরে তিনি এর পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেন।[১৪]

প্রাচীন যুগ থেকে আব্বাসীয় যুগের সূচনা পর্যন্ত রাজ-দরবারে আগন্তুকদের السّوال বা যাচনাকারী বলা হত। খালিদ বার্মাকী এ শব্দটি সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ করাকে পছন্দ করতেন না। কারণ যারা রাজ-দরাবরে আগমন করতেন তাদের মধ্যে অনেকে সম্ভ্রান্ত ও স্বচ্ছল পরিবারেরও লোক থাকতেন। সেজন্য তিনি আগন্তুকদের الزوار বা ভ্রমণকারী বলা পছন্দ করতেন। কবি বাশ্‌শার ইবন বুর্‌দ তাঁর এ মনোভাবের প্রশংসা করে বলেন,

حذا خالد فى فعله حذو برمكٍ * فمجد له مستطرف وأصيلُ
وكان ذوو الامال يدعون قبلَه * بلفظٍ على الاعدام فيه دليل
يسمّون بالسوال فى كل موطنٍ * وإن كان فيهم نابة وجليلُ
فسمّاهم الزّوار سترا عليهم * فأستاره فى المجتدين سدول[১৫]

- "খালিদ তাঁর কর্মকাণ্ডে বার্মাকের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। ফলে তাঁর জন্য উৎকৃষ্ট ও মৌলিক মর্যাদা।

- তাঁর পূর্বে (কোন বিষয়ে) আশা-আকাঙ্খা পোষণকারীদেরকে এমন শব্দের দ্বারা আহ্বান করা হতো যাতে দারিদ্র্যের প্রমাণ নিহিত থাকত।

- প্রত্যেক স্থানে তারা যাচনাকারী রূপে আহূত হত। যদিও তাদের মাঝে বিখ্যাত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি থাকত।

- অতঃপর তিনি তাদেরকে (এ নাম থেকে) আড়াল করার জন্য الزوار বা ভ্রমণকারী বা আগন্তুক রূপে নামকরণ করলেন। ফলে উপঢৌকন প্রার্থীদের মধ্যে তার পর্দা পড়ে গেল (তাদের কাছে দাতা হিসেবে পরিগণিত হলেন)।"

এ কবিতা শুনে খালিদ বার্মাকী কবিকে প্রতিটি ছত্রের জন্য এক হাজার দিরহাম প্রদান করেন।

খালিদ ইবন বার্মাকী পারস্যে অবস্থানকালে কবি বাশ্‌শার ইবন বুরদ তাঁর প্রশংসা করলে খালিদ কবিকে অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করে তা প্রদানে বিলম্ব করলেন। ফলে খালিদ বার্মাকী মসজিদে যাত্রাকালে কবি তাঁর খচ্চরের লাগাম টেনে ধরে নিম্নোক্ত ছত্রটি আবৃত্তি করলেন,

اظلت علينا منك يوما سحابةً * أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشها
فلا غيمها يجلى فييسأس طامع * ولا غيثها يأتى فيروى عطاشها[১৬]

-"আপনার পক্ষ থেকে মেঘমালা একদিন আমাদেরকে ছায়াদান করেছিল। ফলে আমাদের জন্য (আশার) বাতি প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল এবং তার ফোটা (দান) বিলম্বিত হয়েছিল।

- মেঘ দূরীভূতও হচ্ছিল না যে আকাঙ্খী ব্যক্তি নিরাশ হবে এবং বৃদ্ধিও হচ্ছিল না যে তার তৃষ্ঞা মিটিয়ে দিবে।"

এ লাইন দুটি শুনে খালিদ কবিকে দশ হাজার দিরহাম প্রদান করলেন।

খালিদ ইবন বার্মাকীর সাহচর্য লাভের আশায় একদিন কবি বাশ্‌শার ইবন বুরদ নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর প্রশংসাগীতি রচনা করেন,

لعمرى لقد اجدى على ابن برمك * وما كل من كان الغنى عنده يجدى
اخالد ان الحمد يبقى لاهله * جملا ولا تبقى الكنوز على الكد
فاطعم وكل من عارة مستردة * ولا تبقها، ان العوارى للرد[১৭]

-"আমার জীবনের শপথ। ইবন বার্মাকী আমাকে উপহার প্রদান করেছেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁর নিকট প্রয়োজন নিয়ে যায় তিনি তাঁদের সকলকে দান করেন না।

- হে খালিদ! প্রশংসাতো প্রশংসিত ব্যক্তির সৌন্দর্যকে অম্লান রাখে। কিন্তু কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ (সব সময়) অবশিষ্ট থাকে না।

- অতএব তুমি অন্যকে আহার করাও এবং ধারকৃত পাত্র থেকেও প্রত্যাশা কর। কখনো তা জমিয়ে রেখ না। ধার করা বস্তুতো তাদেরই দেয়ার জন্য।"

উক্ত ছত্রগুলো শ্রবণ করে খালিদ কবিকে ত্রিশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন এবং তিনি যে কক্ষে বসতেন তার সম্মুখভাবে শেষোক্ত লাইন দু'টি লিখে রাখার নির্দেশ প্রদান করেন।

একদা কবি বাশ্‌শার খালিদ বার্মাকীর সাহচর্যে আসলেন। সে সময়ে খালিদ ঘোড়ার পৃষ্ঠে উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন। কবি তাঁর প্রশংসায় নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করলেনঃ

أخالد لم أخبط اليك بذمة * سوى اننى عاف وانت جواد
أخالد بين الاجر والحمد حاجتى * فايهما تاتى فانت عماد[১৮]

-"হে খালিদ! আমি আপনার নিকট আমার কোন দায়িত্ব অর্পণ করিনি। তবে এটি ব্যতিত যে, আমি যাচনাকারী আর আপনি দানকারী।

- হে খালিদ! প্রশংসা ও প্রতিদানের মধ্যে আমার প্রয়োজন আবর্তিত। এ দু'টির যে কোন একটি আসলে সে ব্যাপারে আপনি আমার ভরসার প্রতীক।"

অতঃপর খালিদ চারটি ব্যাগে চার হাজার দীনার পুরে কবি বাশ্‌শার ইবন বুরদকে উপহার প্রদান করলেন।

আবুল আব্বাস আস্ সাফফাহ আব্বাসীয়দের প্রথম খলীফা। উমাইয়্যা খিলাফতের ধ্বংস স্তুপের উপর আব্বাসীয় খিলাফতের তখন সূচনাকাল। খিলাফত এবং রাষ্ট্রকে সুসংহত করার বিস্তর দায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে। শত ব্যস্ততার মাঝেও কবি এবং কাব্যের মূল্যায়ন করতে তিনি ভোলেননি। তাঁর অর্থমন্ত্রী খালিদ বার্মাকী কবিকে যথার্থ সম্মান দানে অগ্রগামী ছিলেন। আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি তিনি রাজ কবিদেরকে সম্মানিত অতিথির মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন।

যাহার ইবন হিসন বর্ণনা করেন, খলীফা আবূ জা'ফর আল-মানসূর হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলে আমরা তাঁকে কুফা শহরের সন্নিকটে যুবালা ও আশ-শুকুক এর মধ্যবর্তী আর-রাযাম নামক স্থানে স্বাগত জানালাম। দ্বিপ্রহরে তিনি আশ-শুকুক থেকে প্রস্থানকালে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি একটি কবিতার লাইন বলব, ভাবের সাথে সংগতি রেখে যে পরবর্তী লাইন বলতে পারবে, তাকে আমি আমার জুব্বাটি প্রদান করব।' এরপর খলিফা এ লাইন আবৃত্তি করলেন,

وهاجرة نصبت لها جبينى * يقطع ظهرها ظهر العظاية

"দ্বিপ্রহরে আমি তার জন্য আমার মনটাকে স্থাপন করলাম যার পিঠ টিকটিকির পিঠের ন্যায় কর্তন করছে।"

এ লাইন শুনে বাশ্‌শার বললেন,

وقفت بها القلوص ففاض دمعى * على خدى واقصر واعظايه

"আমি তার দ্বারা সংকুচিত হয়ে কাটালাম। অতঃপর আমার গালে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। কত ছোটই না ছিল সেই টিকটিকি।"

কবির এ লাইন শুনে খলীফা মুগ্ধ হয়ে তার জুব্বাটি কবিকে খুলে দিলেন।[১৯]

আব্বাসীয় যুগের অন্যতম প্রথিতযশা কবি বাশ্শার ইবন বুর্দ খলীফা আবূ জা'ফর আল-মানসূর কর্তৃক নিয়োগকৃত বসরার গভর্নর 'উকবা ইবন সাল্‌ম এর প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেন এবং তাঁর নিকট থেকে প্রচুর উপঢৌকন লাভ করেন।বসরার গভর্নর জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা আরবী কবিতার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনিও কবিকে যথার্থভাবে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করেন। নিম্নে তাঁর বর্ণনা প্রদত্ত হল:

একদা 'উকবা ইবন সাল্‌ম-এর প্রশংসায় কবি বাশ্শার ইবন বুরদ কবিতা রচনা করলে গভর্নর কবিকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করেন। বাশ্শার গভর্নরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে প্রশংসার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেন। বর্ণিত আছে যে, 'উকবার ব্যাপারে রচিত বাশ্শারের কবিতাসমূহই কবির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসাগাথা।[২০]

কবি বাশ্শার একদা 'উকবা ইবন সালমের দরবারে গিয়ে তাঁর প্রশংসায় কিছু কবিতা রচনা করেন। তখন সেখানে কবি উকবা ইবন রুবা উপস্থিত ছিলেন। কবি রুবা গভর্নরের প্রশংসা করে অনেকগুলো কবিতা রচনা করেন। বাশ্শার কবিতা শ্রবণ করে তাঁর কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কবিতা আবৃত্তি শেষে উকবা ইবন রুবা বাশ্শারকে বলেন, হে আবূ মুয়ায (কবি বাশ্শারের কুনিয়্যাত)! তুমি এ জাতীয় কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত নও। বাশ্শার তখন তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমাকে উদ্দেশ্য করে তুমি একথা বলছ? আল্লাহর কসম আমি তোমার বাবার ও দাদার চেয়ে رجز রচনায় বেশি পারদর্শী।' উকবা তখন বাশ্শারকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি ও আমার বাবা মানুষের জন্য غريب(বিস্ময়কর কবিতা) ও رجز (ছন্দ কবিতা) রচনার দ্বার উন্মুক্ত করেছি। আমি তাদের জন্য সেই দ্বার বন্ধ করে দিতে সক্ষম।' বাশ্শার তখন বললেন, 'তুমি তাদের প্রতি দয়া কর। আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করবেন।' উকবা বললেন, 'তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করছ? অথচ আমি ও আমার বাবা উভয়েই কবি পুত্র। অর্থাৎ আমি, আমার বাবা আমার দাদা সকলেই কবি।' বাশ্শার তাকে বললেন, 'তুমি তো তাহলে আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যাদেরকে অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করে পুত-পবিত্র রেখেছেন।' একথা শ্রবণ করে উকবা সেখানে থেকে ক্রুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে গেলেন। পরের দিন বাশ্শার আবার গভর্নর উকবা ইবন সালমের দরবারের গেলেন। সেখানে ইবাবা ইবন রূশও উপস্থিত ছিলেন। বাশ্শার গভর্নরের প্রশংসা করে নিম্নোক্ত রাজায রচনা করেন,

كل امرىء رهن بما يودى * ورب ذى تاج حجريم الجد
كال كسرى وكال برد * انكب جاف عن سبيل القصد
فضلته عن ماله والولد [২১]

"প্রত্যেক ব্যক্তিই যা পরিশোধ করে তার অধীন হয় এবং অনেক মুকুটধারী ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত বংশের অধিকারী হয়। যেমন কিসরা ও বুরদ বংশের লোকেরা। একজন কঠোর ব্যক্তি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হলে আপনি তাকে তার সম্পদ ও সম্মানের জন্য উপঢৌকন প্রদান করেছেন।"

এ কবিতা শুনে গভর্নর 'উকবা ইবন সালম খুশী হয়ে কবিকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করেন।[২২]

একদা কবি আবূ শামাকমাক (ابو شمقمق)[২৩] কবি বাশ্শার ইবন বুরদের নিকটে গিয়ে তার দুরাবস্থার কথা জানান এবং কসম করে বলেন যে, তার কাছে অর্থ কড়ি কিছুই নেই। বাশ্শার তাঁকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমার কাছেও এমন কিছু নেই যা তোমার কাছে থাকতে পারে। তবে চল, 'উকবা ইবন সালমের নিকটে যাওয়া যাক।' বাশ্শার তাঁকে সাথে নিয়ে গভর্নরের দরবারে গিয়ে আবূ শামাকমাকের অবস্থা বর্ণনা করেন। সবকিছু শ্রবণ করে গভর্নর তাঁকে পাঁচশত দিরহাম প্রদান করলেন। এমতাবস্থায় বাশ্শার গভর্নরের প্রশংসায় বলেন,

يا واحد العرب الذى * امسى وليس له نظير

لو كان مثلك اخر * مكان فى الدنيا فقير[২৪]

-"হে 'আরবের অনন্য ব্যক্তিত্ব যার কোন তুলনা নেই।

-যদি আপনার মত আর কেউ থাকত তাহলে দুনিয়ায় কোন নি:স্ব ব্যক্তি থাকত না।"

এ কবিতা শ্রবণ করে গভর্নর কবিকে দুই হাজার দিরহাম প্রদান করলেন।[২৫]

একদা কবি বাশ্‌শার ইবন বুরদ رجز ছন্দে নিম্নোক্ত খণ্ড কবিতা আবৃত্তি করলেন,

يطلل الحى بذات الصمد

-"হে উঁচু ভূমিবিশিষ্ট জীবন্ত বাস্তুভিটা।"

এতদশ্রবণে বসরার গভর্নর 'উকবা ইবন সাল্‌ম কবিকে পঞ্চাম হাজার দিরহাম প্রদান করতে অধীনস্ত কর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি সে অর্থ প্রদানে তিনদিন বিলম্ব করলে কবি নিম্নোক্ত কবিতার লাইনটি 'উকবার দরজার ডান পার্শ্বস্থ পাল্লায় লিখে রাখতে তাঁর চাকরকে নির্দেশ দিলেন,

مازال ما منيتى من همى * والوعد غم فازح من غمى
ان لم ترد حمدى فراقب ذمي[২৬]

"সারাক্ষণ আমার চিন্তা আমার মৃত্যুকে নিয়ে। আর অঙ্গীকার চিন্তা সদৃশ, সুতরাং আমার চিন্তা দূর করো। যদি আপনি আমার প্রশংসা না চান তাহলে আমার নিন্দার অপেক্ষা করুন।"

'উকবা দরজার বাইরে বেরিয়ে লাইনটি লক্ষ্য করতেই বললেন, এটি বাশ্‌শারের কাজ। অতঃপর তিনি তাঁর প্রতিনিধি কাহারামানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি বাশ্‌শারকে যে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তুমি কি তাঁকে তা পৌঁছে দিয়েছ?' প্রতিনিধি বললেন, 'আমরা সমস্যায় ছিলাম, আগামীকাল তা পৌঁছে দিব।' তখন 'উকবা বললেন, আরো অতিরিক্ত দশ হাজার দিরহাম যোগ করে তা বাশ্‌শারের নিকট এখনই পৌঁছে দাও। তাঁর প্রতিনিধি তৎক্ষণাৎ তা কবির নিকটে পৌঁছে দিলেন।[২৭]

একদা কবি বাশ্‌শার বসরার গভর্নর 'উকবা ইবন সালমের দরবারে গিয়ে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন,

وانما لذة الجواد ابن سلم * فى عطاء ومركب للقاء
ليس يعطيك للردجاء ولا الخو * ف ولكن يلذ طعم العطاء[২৮]

-"দান করা ও যানবাহন প্রদানের মধ্যেই দাতা ইবন সালমের মানসিক প্রশান্তি নিহিত।

-তিনি তোমাকে কোন কিছুর প্রত্যাশায় বা ভয়ে ভীত হয়ে দান করেন না। কিন্তু তিনি দানের স্বাদ আস্বাদন করেন।"

এ লাইনগুলো শুনে গভর্নর তাকে দশ হাজার দিরহাম প্রদান করলেন।[২৯]

একদিন এক লোক বাশ্‌শারকে বললেন, 'উকবা ইবন সালমের প্রশংসায় রচিত তোমার কবিতাগুলো সর্বশ্রেষ্ঠ।' তখন কবি বললেন, 'তাঁর দানগুলোও সবার চাইতে বেশি। আমি একদিন তাঁর দরবারে নিম্নোক্ত কবিতাগুলো আবৃত্তি করলে তিনি আমাকে তিন হাজার দীনার প্রদান করেন।'[৩০]

حرم الله ان ترى كابن سلم * عقبة الخير مطعم الفقراء
ليس يعطيك للرجاء ولا الخو * ف ولكن يلذ طعم العطاء
يسقط الطير حيث بتتثر الحـ * ب وتغشى منازل الكرماء

-"কল্যাণকামী ও দরিদ্রদেরকে আহার প্রদানকারী ইবন সালমের মত অন্য কাউকে দেখা আল্লাহ তোমার জন্য হারাম করেছেন।

-তিনি তোমাকে কোন কিছুর প্রত্যাশায় বা ভয়ে ভীত হয়ে দান করেন না। কিন্তু তিনি দানের স্বাদ আস্বাদন করেন।

-শস্যদানা যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, সেখানেই পক্ষীকুল গিয়ে বসে এবং দানশীল (সম্মানিত) ব্যক্তিদের গৃহ অতিথি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।"

একবার 'উকবা ইবন সাল্ম কবি হাম্মাদ আজরাদ[৩১], বাশ্শার ও আ'শা বাহেলাকে ডেকে পাঠালেন। কবি বাশ্শার বলেন, আমরা তাঁর নিকটে একত্রিত হলে তিনি বললেন, গতকাল আমার মনে একটি উপমার উদয় হয়েছে। যেটি দ্বারা মানুষ উপমা প্রদান করে থাকে।

উপমাটি হচ্ছে,

ذهب الحمار يطلب قرنين' فجاء بلا اذنين

'গাধা দুই শিং খুঁজতে গিয়ে দুই কান হারিয়ে ফিরে এল।"

তোমরা কবিতায় এ উপমার প্রয়োগ দেখাও। যে এটা পারবে তাঁকে পাঁচ হাজার দিরহাম প্রদান করা হবে। আর না পারলে পাঁচশ করে বেত্রাঘাত করা হবে। হাম্মাদ বললেন, 'আমাকে একমাস সময় দিন।' আ'শা বললেন, 'আমাকে দুই সপ্তাহ সময় দিন।' বাশ্শারকে নিরব দেখে 'উকবা বললেন, 'হে অন্ধ! তুমি নিরব কেন?' বাশ্শার বললেন, 'আমার মাথায় কিছু পঙ্ক্তি এসেছে। আপনি চাইলে আমি এখনই বলতে পারি।' 'উকবা কবিকে বলার আদেশ দিলে তিনি বলতে শুরু করলেন,

شط بسلمى عاجل البين * وجاورت أسد بنى القين
ورنت النفس لهارنة * كادت لها تنشق نسفين
يابنة من اشتهى ذكره * اخشى عليه علق الشين
والله لو القاك لا اتقى * عينا لقبلك الفين
طالبتها دبنى فراغتبه * وعلقت قلبى مع الدين
فسرت كالعبر عذا طاليا * قرنا فلم يرجع باذنين [৩২]

-"দ্রুত প্রস্থান সালমাকে দুরে সরিয়ে দিয়েছে এবং সে বনু কাউনের হিংস্র লোকদের প্রতিবেশি হয়েছে।

-তার জন্য মন এমনভাবে বিলাপ করছে যে, তা যেন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে।

-আমি সেই মেয়ের নাম উল্লেখ করতে চাচ্ছিনা, আমি তার ব্যাপারে লাঞ্ছিত জীবনের আশংকা করছি।

-আল্লাহর কসম! যদি আমি তার সাথে সাক্ষাত করতাম তাহলে আমার চক্ষুকে সংবরণ করতে পারতাম না এবং তাকে দুই হাজারবার চুমু খেতাম।

-আমি তাকে আমার ঋণ পরিশোধের আহবান জানালে সে চাতুর্যতার আশ্রয় নিল এবং আমার অন্তরকে ঋণের সাথে ঝুলিয়ে দিল।

-ফলে আমি ঐ বন্য গাধার মত হয়ে গেলাম, যে সকাল বেলায় তার একটি শিং অন্বেষণ করতে গিয়ে দুই কান খুইয়ে আসল।"

এ কবিতাগুলো রচনা করে কবি বাশ্শার গভর্নরের ঘোষিত পুরস্কার নিয়ে ফিরে গেলেন।[৩৩]

উপর্যুক্ত ঘটনাসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খলীফা আবূ-জা'ফর আল-মানসূর কর্তৃক নিয়োগকৃত বসরার গভর্নর 'উকবা ইবন সালম কবিতার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে গিয়ে নানাভাবে কবিদের অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করেছেন এবং বিভিন্নভাবে কবিদেরকে কাব্যচর্চায় উৎসাহিত করেছেন। তাছাড়া কবিতার প্রতি গভীর অনুরাগ থাকার কারণে তিনি কখনও কখনও নিজেও কবিতা রচনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

খলীফা আল-মাহ্‌দী খিলাফতে অধিষ্ঠিত হলে কবি বাশ্‌শার ইবন বুরদ গভীরভাবে খলীফার সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ লাভ করেন। খলীফা মেয়েদের ব্যাপারে প্রচণ্ড রকমের নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন। তাই কবি বাশ্‌শার রচিত প্রেমমূলক কবিতার কয়েকটি লাইন খলীফার নিকটে পৌঁছালে তিনি কবির উপর প্রচন্ডভাবে রাগান্বিত হন এবং প্রেমমূলক কবিতা ব্যতীত অন্য বিষয়ে কবিতা রচনা করতে কবিকে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি কবিকে লক্ষ্য করে বলেন,

ويلك اتحض الناس على الفجور وتقذف المحصنات المخبات! والله لئن قلت بعد هذا بيتا فى نسيب لاتين على روحك[৩৪]

-"তুমি ধবংস হও! মানুষদেরকে তুমি পাপের দিকে উদ্বুদ্ধ করছ এবং সতী ও বিনয়ী মহিলাদের প্রতি তুমি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ। আল্লাহর কসম! যদি তুমি এরপরে প্রেমমূলক কবিতার একটি লাইনও রচনা কর; তবে আমি অবশ্যই তোমার রূহকে বের করে আনব।"

এরপর থেকে কবি খলীফার আদেশ মান্য করে চলতেন। তাই তিনি প্রেমমূলক কবিতা রচনা পরিত্যাগ করে প্রশংসামূলক কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

كانما جئته أبشره * ولم أجئ راغبا ومحتلبا
يزين المنبر الاشم بعط * فيه واقواله إذا خطبا[৩৫]

-"আমি যেন তার কাছে সুসংবাদ প্রদানের জন্য এসেছি। কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ বা কিছু লাভের জন্য আসিনি।

-যখন তিনি বক্তব্য প্রদান করেন তখন যেন তিনি তার দেহ সৌন্দর্য ও বক্তব্যের মাধ্যমে সুউচ্চ মিম্বরকে সুসজ্জিত করেন।"

অতঃপর খলীফা কবিকে পাঁচ হাজার দিরহাম প্রদান করেন, তাঁকে পোষাক পরিচ্ছদ দান করেন, খচ্চরের পিঠে কবিকে আরোহন করান এবং প্রতি বছর তার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।[৩৬]

খলীফা কর্তৃক প্রেমমূলক কবিতা রচনা নিষিদ্ধের তৃতীয় বছরে কবি একদিন প্রশংসামূলক দীর্ঘ এক কবিতা আবৃত্তি করতে করতে খলীফার দরবারে প্রবেশ করলেন, যার খণ্ডাংশ নিম্নরূপ:

فرب ثقال الردف هبت تلومنى * ولو شهدت قبرى لصلت على قبرى
تركت لمهدى الانام وصالها * وراعيت عهدا بيننا ليس بالختر
ولولا امير المؤمنين محمد * لقبلت فاها و لكان بها فطرى
لعمرى لقد أوقرت نفسى خطية * فما انا بالمزداد وقرا على وقر[৩৭]

-"বাহনের কতক বোঝা যেন আমাকে তিরস্কার করছে। যদি সে আমার কবর দর্শন করত তাহলে আমার কবরে নামায পড়ত।

-আমি মাহ্‌দীর জন্য জগতের সম্পদ রেখে গেলাম এবং আমাদের মাঝে এমন অঙ্গীকার লক্ষ্য করলাম যা ভঙ্গ করার নয়।

- যদি আমীরুল মুমিনীন মুহাম্মাদ না থাকত তাহলে আমি তার মুখে চুম্বন করতাম অথবা তার প্রদানকৃত উপঢৌকন দ্বারা আমার জীবিকা নির্বাহ হত।

- আমার জীবনের শপথ! পাপের দ্বারা আমি আমার অন্তরকে পরিপূর্ণ করেছি। ফলে আমি আর সেই বোঝাকে বাড়াতে চাচ্ছি না।"

উক্ত কবিতা শ্রবণ করে খলীফা কবিকে এত বিপুল পরিমাণে উপঢৌকন প্রদান করেন, যা তিনি ইতোপূর্বে কখনও কবিকে প্রদান করেননি।[৩৮]

একদা কবি খলীফার দরবারে গিয়ে তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনা করলেন। এতে খলীফা কবির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দশ হাজার দিরহাম, একজন দাস ও একজন দাসী এবং অনেক পোশাক প্রদান করলেন।[৩৯]

খলীফা মাহদী তাঁর দূত মারফত কবি বাশ্‌শার ইবন বুরদকে প্রেম সম্পর্কে এমন একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা রচনা করতে নির্দেশ দিলেন, যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে প্রেমকে-ফয়সালাকারী নির্ধারণ করতে হবে, অথচ সেখানে কারোরই নাম উল্লেখ থাকবে না। এ সংবাদ পেয়ে বাশ্‌শার নিম্নোক্ত কবিতাগুলো রচনা করে খলীফার নিকট প্রেরণ করেন:

اجعل الحب بين حبى وبينى* قاضيا اننى به اليوم راضى
فاجتمعنا فقلت يا حب نفسى * ان عينى قليلة الاغماض
انت عذبتنى وأنحلت جسمى * فارحم اليوم دائم الامراض
قال لى لا يحل حكمى عليها * انت اولى بالشقم والاحراض
قلت لما اجابنى بهواها * شمل الجور فى الهوى كل قاضى[৪০]

-"আমার ও আমার প্রেয়সীর মাঝে ভালবাসাকে বিচারক নির্ধারণ কর।

- আজ আমি এতে সন্তুষ্ট। আমরা একত্রিত হয়ে বললাম, হে আমার প্রাণের প্রেয়সী! আমার চোখ দুটো খুব কমই বন্ধ হয় (নিদ্রা যায়)।

- তুমি আমাকে আকর্ষণ করেছ এবং আমার শরীরকে জীর্ণশীর্ণ করে দিয়েছ। সুতরাং আজ চিরস্থায়ী রোগের জন্য আমার প্রতি করুণা কর।

- সে আমাকে বলল, আমার ফয়সালা তার উপর প্রযোজ্য নয়। তুমি রোগ ও প্রেম-বিরহে ভোগার অধিক যোগ্য।

-যখন তার ভালবাসা দ্বারা আমার প্রস্তাবে সাড়া দিল তখন আমি বললাম, ভালবাসার ব্যাপারে প্রত্যেক বিচারককে অন্যায় পেয়ে বসে।"

খলীফা খুশী হয়ে কবিকে এক হাজার দীনার উপহার প্রদান করেন।[৪১]

উপসংহার

কবি বাশ্‌শার বিন বুরদ আব্বাসীয় যুগের খ্যাতনামা কবি। তিনি আব্বাসীয় যুগের প্রথম কয়েকজন খলীফা ও তাঁদের অধীনস্ত মন্ত্রীবর্গের প্রশংসাগীতি রচনা করে প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জন করেন। খলীফাগণ কবিকে সমাদৃত ও পুরস্কৃত করেন। তাঁদের সাহচর্যে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অতিবাহিত করে তিনি কাব্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ লাভ করেন। তিনি খলীফাগণের ব্যক্তিত্ব, দয়া, বদান্যতা ইত্যাদির বর্ণনা প্রদান করে সাবলীল ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। কবির ছন্দোময় যাদুকরী বাক্যবিন্যাসে তাঁরা মুগ্ধ ও বিমোহিত হয়েছেন। বিনিময়ে তিনি কখনও মাসিক বা বাৎসরিক আনুতোষিক প্রাপ্ত হয়েছেন। কখনও বা

তাৎক্ষণিকভাবে স্বর্ণমুদ্রা, মুক্তার দানা কিংবা রাজকীয় পোশাকসহ নানারূপ উপহার সামগ্রী লাভ করেছেন। তিনি রাজদরবারে সম্মানিত অতিথি হিসেবে সমাদৃত হয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি তাঁর কাব্যিক শক্তি প্রয়োগ করে হৃদয় উৎসারিত ভাব-কল্পনাকে ছন্দোমালায় রূপান্তরিত করে কৃতজ্ঞতার ভাষা আবিষ্কার করেছেন। এভাবেই খলীফাগণের প্রশংসায় কবির এক বিশাল কাব্যসম্ভার সৃষ্টি হয়, যা আরবী কাব্য সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। তিনি আরবী সাহিত্য জগতে চির স্বরণীয় হয়ে থাকবেন।

তথ্যনির্দেশ

[১] ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ৪র্থ খণ্ড (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ২০১।

[২] আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৯১।

[৩] হান্না আল-ফাখূরী, হান্না আল-ফাখুরী, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (আল-মাতবা'আতুল বুলসিয়া, ৩য় সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৩৭১।

[৪] ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখ*, পৃ.২০১; *দীওয়ানে বাশ্‌শার*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৭।

[৫] *আল-আগানী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪২।

[৬] সুরা আন-নূর, আয়াতঃ ৪১।

[৭] ড. হাশেম মান্না', *বাশ্‌শার ইবনবুর্‌দ হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু* (বৈরূতঃ দালুল ফিকরীল 'আরাবী, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৯২।

[৮] আহমদ হাসান আয-যাইয়্যাত, *তারীখ*, পৃ. ১৯৩।

[৯] *আল-আগানী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯।

[১০] জুরজী যায়দান, *তারিখুল আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ*, ২য় খণ্ড (বৈরূতঃ মাকতাবাতুল হায়াহ্‌, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৩৬৩-৩৬৪।

[১১] *দীওয়ানে বাশ্‌শার ইবন বুর্‌দ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৬২; *আল-আগানী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯।

[১২] আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, *তারীখ*, পৃ. ১৯২।

[১৩] *তদেব*; হান্না আল-ফাখূরী, *তারীখ*, পৃ.৩৭২; *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৭২।

[১৪] আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, *কিতাবুল আগানী*, ৩য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারু সাদির, ২০০৫ খ্রি.) পৃ. ১৩৩; জুরজী যায়দান, *তারীখ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫।

[১৫] *আল-আগানী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৯-১২০।

[১৬] *তদেব*, পৃ. ১২৮।

[১৭] *তদেব*, পৃ.১৩৩; জুরজী যায়দান, *তারীখ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫।

[১৮] *তদেব*, পৃ. ১৪১।

[১৯] *আল-আগানী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩-১২৪।

[২০] বুতরুসুল বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব*, পৃ. ৫১।

[২১] *দীওয়ানে বাশ্‌শার*, পৃ. ৮৪-৮৫।

[২২] *আল-আগানী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২০-১২২।

---

[২৩] **আবূ শামাকমাক (মৃ. ১৮০ হি./৭৯১ খ্রি.):** তিনি আব্বাসীয় যুগের প্রথম শতাব্দীর কবি। তাঁর প্রকৃত নাম মারওয়ান ইবন মুহাম্মদ। তিনি খুবই দরিদ্র ও বঞ্চিত জীবন যাপন করেন। খলীফা হারুনুর রশীদ ও বার্মাকীদের আমলে তিনি বাগদাদ আগমন করেন। কিন্তু তারা তাঁকে খুব একটা পাত্তা দিত না। এ কারণেই তিনি আল-ফাযল ইবন ইয়াহইয়া বার্মাকী, হারুনুর-রশীদের সচিব মানসূর ইবন যিয়াদ প্রমুখের নিন্দাবাদ করে কবিতা রচনা করেন। বহু কবিতার মধ্যে তিনি তাঁর দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনার বেশির ভাগই নিন্দাবাদমূলক কবিতা। ইবনুল-মু'তায এর বর্ণনামতে তিনি ১৮০ হি./৭৯১ খ্রিস্টাব্দে অথবা এর কাছাকাছি সময়ে ইন্তিকাল করেন। ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৬-৪০; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৫; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ১৩ খণ্ড, পৃ. ১৬৪-৪৭।

[২৪] *দীওয়ানে বাশ্‌শার*, পৃ. ১০৪; ইবনখাল্লিকান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৬২।

[২৫] *আল-আগানী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩।

[২৬] তদেব, পৃ. ২১১।

[২৭] *তদেব*, পৃ. ১২৬।

[২৮] *দীওয়ানে বাশ্‌শার*, পৃ. ১৪।

[২৯] *আল-আগানী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩১।

[৩০] *তদেব*, পৃ. ১৩৫।

[৩১] **হাম্মাদ আজরাদ (মৃ. ১৬১ হি./৭৭৮ খ্রি.):** তিনি আব্বাসীয় যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁর পুরোনাম আবূ 'উমার হাম্মাদ ইবন 'উমার ইবন ইউনুস। তিনি কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে লালিত পালিত হন। পরে তিনি ওয়াসেত শহরে চলে আসেন। তিনি বনূ সূয়াতের আযাদকৃত ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি উমাইয়্যা যুগে জন্মগ্রহণ করলেও আব্বাসীয় খলীফাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তাঁদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। তিনি ১৬১ হিজরীতে অসুস্থ হয়ে বসরা ও আহওয়াজ শহরের মধ্যবর্তী স্থানে মৃত্যুবরন করেন। দ্রঃ ড. 'উমার ফাররুখ ২য় খণ্ড, *তারীখ*, পৃ. ৭৮; *আল-আগানী*, ১৪শ খণ্ড, পৃ.৩৮১; মু'জামুল উদাবা, ১০ম খণ্ড, পৃ.২৪৯; জুরজী যায়দান, *তারীখ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪।

[৩২] *দীওয়ানে বাশ্‌শার*, পৃ. ২৩৮-২৩৯।

[৩৩] *আল-আগানী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩।

[৩৪] বুতরুসুল বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব ফিল আ' সরিল 'আব্বাসিয়া* (প্রকাশনা স্থানের উল্লেখ নেই, দারু মারুন 'আবুদ, ১৯৭৯ খ্রি). পৃ. ৪১; ড. হাশিম মান্না, বাশ্‌শার ইবন বুরদ, *হায়াতুহু ওয়া শি' রুহু* (বৈরূতঃ দারুল *কিবারিক* 'আরাবী, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৮।

[৩৫] *দীওয়ানে বাশ্‌শার*, পৃ. ২৫-২৬।

[৩৬] *আল-আগানী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫২-১৫৩।

[৩৭] *দীওয়ানে বাশ্‌শার*, পৃ. ২৫-২৬।

[৩৮] *আল-আগানী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩।

[৩৯] *তদেব* পৃ. ১৪৮।

[৪০] *দীওয়ানে বাশ্‌শার*, পৃ. ১৪৮-১৪৯।

[৪১] *আল-আগানী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপনে মাসজিদের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা

ড. মুহা. বারকুল্লাহ্ বিন-দুর*

Abstract: A mosque is one of the best place of worship and attaining closeness to Allah. Arriving at Madinah, Prophet Muhammad (PBUH) at first built a mosque to establish a consolidated and prosperous society. The role and importance of a mosque in social life is unbounded. A mosque is not a place of worship or prayer only rather it is the centre for all activities for the Muslim. A mosque plays a central role in an Islamic society starting from Iman-Akidah, worshipping of the Muslim, their education, exercise of their knowledge, discussion, assessment, adoption of administrative line of action, execution of planning along with research methodology. Especially a mosque has an immense role in strengthening social ties and amity. This article endeavors to discuss the role of mosque in creating and promoting peace, equity, amity, co-operation, solidarity, unity, and raising morality in a society.

ভূমিকা

মাসজিদ আল্লাহর ঘর। এটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উত্তম স্থান। মাসজিদে মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচবার নামায আদায় করে থাকে। দ্বীনের মূলভিত্তি আদায়ের স্থান বিধায় দ্বীনের অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনেও মাসজিদের ভূমিকা অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। মাসজিদ ইসলামী সমাজের প্রাণকেন্দ্র এবং পবিত্রতম স্থান। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মাসজিদ একাধারে ইবাদাত-বন্দেগীর স্থান, সামাজিক ও ধর্মীয় মিলনায়তন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বিচার ও সম্প্রীতি লেন-দেনের মাধ্যম, নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সূতিকাগার। এটি মুসলমানদের মিলনমেলা, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ এক কাতারে দাঁড়ানোর মাধ্যমে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটে, সালাম, কুশল ও শ্রদ্ধা বিনিময় হয়। বৈষম্য দূরীভূত হয়। এতে পারস্পরিক আন্তরিকতা, স্নেহ ও ভালোবাসা জন্মায়। তাই মানুষের মধ্যে সাম্য ও একতা সৃষ্টিতে আমাদের সমাজে মাসজিদের ভূমিকা এক ও অনন্য। সমাজে মানুষের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসা ও সম্প্রীতি স্থাপনে এবং সমৃদ্ধ ও সুশীল সমাজ গঠনে মাসজিদের ভূমিকা অপরিসীম। মাসজিদ নির্মাণের বিনিময়ে পুরস্কার স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (স.) জান্নাতে ঘর নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন। জাবের বিন ‘আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

‘যে ব্যক্তি পাখির ডিম পাড়ার স্থান বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র পরিমাণ মাসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।[১]

মাসজিদের পরিচয়

مسجد শব্দটির س বর্ণে সুকূন ও ج বর্ণে যের দিয়ে একবচন হিসেবে পঠিত হয়। এর বহুবচন **مساجد**। শব্দটি **سجد يسجد** থেকে বাবে **نصر ينصر** এর ইসমে যারফ এর সীগাহ। আভিধানিক অর্থ ‘সিজদার স্থান, সিজদার জায়গা, ইবাদতখানা, **الموضع الذي يسجد فيه** ‘যে স্থানে সিজদাহ করা হয়।’[২] পরবর্তীতে এ শব্দের অর্থ ব্যাপকতা লাভ করে এর অর্থ হয়, ঐ ঘর যে ঘরকে মুসলিমদের নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে একত্র হওয়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। বদরুদ্দীন আয্-যারকাশী (রহ.) বলেন,

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة، لقرب العبد من ربه، اشتق اسم المكان منه فقيل: مسجد، ولم يقولوا: مركع، ثم إن العُرف خصص المسجد بالمكان المهيّأ للصلوات الخمس، حتى يخرج المُصلّى المجتمع فيه للأعياد ونحوها، فلا يُعطى حكمه

'নামাযের কর্মসমূহের মধ্যে সিজদাহ আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হওয়াতে নামায আদায়ের স্থানের নামকে সিজদাহ থেকেই নেয়া হয়েছে। এ কারণেই মাসজিদকে মাসজিদ مسجد বলা হয়ে থাকে, মারকা' (مركع) বলা হয় না। তারপর বর্তমানে মাসজিদ শব্দটি নামাযের জন্য নির্মিত স্থানের সাথেই খাস। এ কারণেই লোকেরা ঈদের সময় নামায আদায়ের জন্য একসঙ্গে একত্র হয়; কিন্তু তাকে মাসজিদ বলে না।'[৩] এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Mosque।[8]

মু'জামুল ওয়াফী প্রণেতা বলেন, السُّجُود الْجَبْهَة حَيْثُ يكون ندب 'কপাল যেখানে সিজদার ক্ষতচিহ্ন হয়।'[৫]

নাশওয়াদ বিন সা'ঈদ আল-হুমায়রী বলেন, موضع السجود من الأرض 'জমিনে সিজদার স্থান।'[৬]

মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান (রহ.) বলেন, الموضعُ الذي يسجد منها وبيت الصلاة 'যে স্থানে সিজদাহ করা হয় ও নামাযের ঘর।'[৭]

পরিভাষায় মাসজিদ বলা হয়, المكان الذي أعد للصلاة فيه على الدوام 'স্থায়ীভাবে যে স্থানকে নামায আদায় করার জন্য নির্ধারণ করা হয়।'[৮] আর শারঈভাবে মৌলিক মাসজিদ হলো, জমিনের প্রত্যেক ঐ স্থান যেখানে একমাত্র আল্লাহর জন্য সিজদাহ করা হয়।[৯] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

... وجُعِلَت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيُّما رجل من أمّتي أدركته الصلاة، فليصلِّ

'আর জমিনকে আমার জন্য মাসজিদ ও পবিত্র হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মাতের যে কেউ যে কোন স্থানে নামাযের সময় হয় তখন সে স্থানেই নামায আদায় কর।'[১০] এটা উম্মাতে মুহাম্মাদীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অপর হাদীসে আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

... وأينما أدركتك الصلاة فصلِّ، فهو مسجد

'যেখানেই তুমি নামাযের সময় পাবে, সেখানেই তুমি নামায আদায় করবে। কেননা, সেটাই মাসজিদ (যেখানে তুমি নামায আদায় করেছ)।'[১১]

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, শরী'আত যে সমস্ত স্থানে নামায আদায় করার অনুমোদন দিয়েছে কেবল সেখানেই নামায আদায় করা বৈধ। তবে শরী'আত কর্তৃক যে সমস্ত স্থানে নামায পড়া নিষিদ্ধ যেমন, কবরস্থান, অপবিত্র জায়গা, রাস্তা, গোসলখানা প্রভৃতি স্থান ব্যতিত সকল স্থানে নামায পড়া বৈধ।[১২]

মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান (রহ.) বলেন,

الأرضُ التي جعلها المالك مسجداً وأفْرَزَ طريقه وأذِن بالصلاة فيه فإن صلَّى واحدٌ زال ملكه

'জায়গার মালিক যে স্থানকে মাসজিদের জন্য নির্ধারণ করে দেন ও মাসজিদের রাস্তা পৃথক করে দেন অতঃপর নামায আদায়ের অনুমতি দেন তারপর সে স্থানে একজন ব্যক্তিও নামায আদায় করলে জায়গা দানকারীর কর্তৃত্ব বাতিল হয়ে যাবে।'[১৩]

সুতরাং ব্যবহারিক ও বাস্তবতার দৃষ্টিতে মাসজিদ বলতে বুঝায়, যেখানে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য যে ঘর নির্মাণ করা হয়।

মাসজিদের গুরুত্ব ও ফযীলত

মাসজিদের গুরুত্ব, সম্মান ও ফযীলত বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের আঠারো স্থানে মাসজিদের আলোচনা করেছেন।[১৪] আল্লাহ তা'আলা মাসজিদসমূহকে তার নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন যা সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ বলে বিবেচিত।[১৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا

"আর তার চেয়ে অধিক জালেম কে, যে আল্লাহর মাসজিদসমূহে তার নাম স্মরণ করা থেকে বাধা প্রদান করে এবং তা বিরান করতে চেষ্টা করে?"[১৬] অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"একমাত্র তারাই আল্লাহর মাসজিদসমূহ আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে।"[১৭] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

"আর নিশ্চয় মাসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।"[১৮]

সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি ধুলা-কণার মালিক, খালিক ও নিয়ন্ত্রক আল্লাহ হওয়া সত্ত্বেও, মাসজিদের বিশেষ মর্যাদা ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কারণ, মাসজিদ ইবাদাত-বন্দেগী ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নির্মাণ করা হয়। মাসজিদ আল্লাহর জন্য; আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নয়। যেমনিভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার বান্দাদের যেসব ইবাদাত তার জন্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, সে ইবাদাতগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা বৈধ নয়, অনুরূপভাবে মাসজিদও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য বানানো বৈধ নয়।[১৯] রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাণী দ্বারা এমনটিই প্রমাণিত হয়, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর ঘরের সম্মান। যেমন তিনি বলেন,

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

'আল্লাহর ঘরসমূহ হতে কোন ঘরে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করা ও শিক্ষা করার জন্য যখন কোন সম্প্রদায় একত্র হয়, তাদের উপর শান্তি নাযিল হয়, রহমত তাদের ঢেকে ফেলে এবং আল্লাহ তা'আলা তার যে সব ফেরেশতা আছে, তাদের নিকট তাদের আলোচনা করেন।'[২০]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মাসজিদের ভূমিকা

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সমাজ পরিবর্তনে মাসজিদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। মাসজিদ ছিল একই সাথে দাওয়াতী কাজের প্রাণকেন্দ্র এবং রাষ্ট্রীয় ভবন। দাওয়াতী কার্যক্রম এখান থেকেই পরিচালনা করা হতো। বিভিন্ন বিষয়ের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখানেই সম্পাদন করা হতো। বিভিন্ন দেশ ও এলাকা থেকে আগত প্রতিনিধি ও মেহমানদেরকে রাসূলুল্লাহ (স.) মাসজিদেই স্বাগত জানাতেন। সাহাবায়ে কিরামের সাথে

মাসজিদেই তিনি মিলিত হতেন এবং তাদের শিক্ষাদান করতেন। এককথায় মাসজিদ ছিল তৎকালীন মুসলিম সমাজের যাবতীয় কাজের কেন্দ্রস্থল।

ইসলামী সমাজে মাসজিদের ভূমিকা

একটি মাসজিদ ইসলামী সমাজে বিভিন্নভাবে অবদান রাখতে পারে। 'সাতজন ব্যক্তির আরশের ছায়া লাভ' সম্বলিত হাদীসে বলা হয়েছে, "মুসলিম সমাজে কিছু মানুষ (বিশেষত যুবক) আছে যারা আল্লাহর আনুগত্য করে। এসব যুবকের অন্যতম গুণ হচ্ছে তারা দৈনিক পাঁচবার মাসজিদে গিয়ে নামায আদায় করার কারণে তাদের হৃদয়টা মাসজিদের সাথে মিশে যায়, এ সকল মুসল্লী স্বাভাবতই মাসজিদের অভ্যন্তরে পারস্পরিক পরিচিত হয় এবং কখনো কারো অবর্তমানে তার খোঁজ-খবর জানতে অভ্যস্ত হয়। এভাবে বারংবার সাক্ষাৎ ও খোঁজ-খবরের মাধ্যমে তাদের মাঝে এক প্রকার ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, যা শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির নিমিত্তেই। মাসজিদে জামাতবদ্ধভাবে নামায আদায় আর মুসল্লীদের পারস্পরিক ভালোবাসার একটা ইতিবাচক প্রভাব সমাজে প্রতিফলিত হয়। তাদের মধ্যকার ভালোবাসার কারণেই সামাজিক কর্মকাণ্ডে হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ ইত্যাদি দূর হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ব্যক্তিগত জীবনেও অপরাধ প্রবণতা কমে যায়। কেননা যে রবের নির্দেশ পালনার্থে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যস্ততাকে এড়িয়ে দৈনিক পাঁচবার মাসজিদে যেতে সক্ষম সেই রবের সন্তুষ্টির জন্যই অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার মানসিকতা তার অন্তরে জাগ্রত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

'নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।'[২১]

ব্যক্তিগত জীবনে মাসজিদের প্রভাব

(ক) আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতার প্রতি প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ প্রদান: যখন কেউ মাসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে আল্লাহর ভীতি ও অন্তরে প্রশান্তি উপলব্ধি করে। এটি এমন একটি আধ্যাত্মিক শিক্ষা, যা মাসজিদে প্রবেশ না করলে এমন অনুভূত হয় না। আবার নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করণে মাসজিদ একজন ব্যক্তিকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে। কেননা, যখন একজন মুসলিম মাসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে তার জীবনে যা আছে তার সবকিছুই ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে আর সে অন্তরে এ অনুভূতি জাগ্রত করে যে, তার সবকিছুই সৃষ্টিকর্তার হাতে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'তুমি আল্লাহর ইবাদত কর এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি দেখতে না পাও তাহলে তুমি অন্তরে কল্পনা কর তিনি (আল্লাহ) তোমাকে দেখছেন।'[২২]

(খ) দায়িত্ব পালন ও প্রতিশ্রুতির প্রতি যত্নবান: যদি একজন মুসলিম ব্যক্তি মাসজিদে দৈনিক পাঁচ বার নামায প্রতিষ্ঠার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তাহলে তাকে তার জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলিতেও প্রতিশ্রুতিদ্ধ ও দায়িত্ববান ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

'নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের উপর নামাযকে সময়মত আদায় করা ফরয করেছেন।'[২৩]

(গ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ: যখন কেউ মাসজিদগামী হন, তখন শরীর সুগন্ধযুক্ত করে, তার মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধ মুক্ত রাখে এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার ও পবিত্র রাখে এবং সর্বদা রাখতে উদগ্রীব হয়, যা তার ব্যক্তিগত জীবনে তার স্বাস্থ্যের উপর যেমন ইতিবাচক প্রভাব পড়বে অনুরূপভাবে সমাজের সমগ্র মানুষের উপর তার প্রভাব পড়বে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তওবাকারীগণকে ও পাক-পবিত্রতা অর্জনকারীগণকে পছন্দ করেন।'[২৪]

সামাজিক জীবনে মাসজিদের প্রভাব

(ক) ঐক্যের বন্ধন ও বিভ্রান্তি বর্জন: মাসজিদ সবার একত্রিত হওয়ার বিশেষ স্থান, যেখানে সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ছোট-বড়, রাজা-প্রজা প্রত্যেকের মান-মর্যাদা ও সম্মান সমান। কারো উপর কারো মর্যাদায় পার্থক্য নেই। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

'হে মানব সকল! সাবধান নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক। জেনে রাখ আরব অনারবের উপর, অনারব আরবের উপর, লাল কালোর উপর, কালো লালের উপর কেউ কারো উপরে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ নয়; বরং তোমাদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে তাকওয়া বা আল্লাহভীতির উপর।'[২৫] সুতরাং সমাজের প্রত্যেক সদস্যের মর্যাদা পরস্পর সমান। এমন সমাজে একের অধিকার অন্যের অধিকারকে অতিক্রম করে না বা হরণ করা হয় না। তাই বর্তমানে এটিকে এখন মানবাধিকার বলে। যেখানে প্রত্যেকের অধিকার আদায় করা হয়। তাই মানবাধিকারপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে মাসজিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

(খ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: মাসজিদ এমন একটি স্থান, যেখানে ধর্মীয় বিষয়াবলীর ব্যাপারে সমাজের ব্যক্তিদের পরস্পরের মাঝে পরামর্শ করা এবং সঠিক ও সত্যনিষ্ঠ বিষয়ে রায় বা মতামত প্রদান করার বিশেষ প্রশিক্ষণ পাওয়া যায়। ফলশ্রুতিতে, সমাজে অবস্থিত প্রতিটি মানুষের মাঝে পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ সংঘটিত হয়, ঘনিষ্ঠতা থেকে আরো অধিকতর ঘনিষ্ঠ করে তোলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

'আর তোমরা কাজের ক্ষেত্রে পরস্পরে পরামর্শ কর। সুতরাং তোমরা শুধু আল্লাহর উপর ভরসা কর। কেননা আল্লাহ (তাঁর) উপর ভরসাকারীগণকে ভালোবাসেন।'[২৬]

(গ) দারিদ্র্য বিমোচন: মাসজিদ এমন এক মিলন কেন্দ্র, যেখানে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা দরিদ্র লোকদের খুব সহজে চিনতে পারে এবং তাদেরকে সহায়তা প্রদান করে অথবা মাসজিদে অবস্থিত যাকাত তহবিল থেকে সমাজের দারিদ্র দূরীভূত করা হয়। সুতরাং সমাজ থেকে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বিমোচনে ইসলামী সমাজে মাসজিদের ভূমিকা অপরিসীম।

(ঘ) শিক্ষালয়/শিক্ষাকেন্দ্র: মাসজিদ ধর্মীয় বিষয়াবলীর পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক ও জীবন ঘনিষ্ঠপূর্ণ বিষয়াবলী উপস্থাপন করার বিশেষ একটি প্লাটফর্ম, যা একটি সু-সভ্য, মার্জিত ও শিক্ষাবান্ধব সমাজ গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপনে মাসজিদের ভূমিকা

সমাজ জীবনে মাসজিদের গুরুত্ব ও ভূমিকা অসামান্য। মাসজিদ শুধু ইবাদাত উপাসনার স্থান নয়; বরং তা মুসলমানদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্রও বটে। এটি ইসলামী সমাজের সাংস্কৃতিক ঐক্য-সংহতির কেন্দ্রবিন্দু। মুসলিম মিল্লাতের ঈমান-আক্বীদা, ইবাদাত-বন্দেগী হতে আরম্ভ করে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানচর্চা, শাসন সংস্কার, রাষ্ট্রপরিচালনা, অর্থনীতি, সমাজনীতি, চিকিৎসা ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী, যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করে সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও কার্যকরী করার কেন্দ্ররূপে ইসলামী সমাজে মাসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে সামাজিক বন্ধন ও সম্প্রীতি সুদৃঢ় করণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। নিম্নে তার কতিপয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।

১. আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে: মাসজিদ মহান আল্লাহর ঘর। একাগ্রচিত্তে করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় ও অন্যান্য ইবাদাত বন্দেগীতে মশগুল থাকার উপযুক্ত স্থান। এতে ইবাদাত বন্দেগীতে অধিক সাওয়াব অর্জিত হয়। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

أَحَبُّ البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها

"আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় স্থান মাসজিদসমূহ আর আল্লাহর নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট স্থান বাজারসমূহ।"[২৭]

ইমাম নববী (রহ.) أحبّ البلاد إلى الله مساجدها হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন, কারণ মাসজিদগুলো হলো আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীর ঘর এবং এগুলোর বুনিয়াদ হল তাকওয়া নির্ভর। আর وأبغض البلاد إلى الله أسواقها বলার কারণ, বাজার হলো ধোঁকা, প্রতারণা, সুদ-ঘুষ, মিথ্যাচার, মারামারি, হানাহানি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, আল্লাহর যিক্‌র হতে বিরত রাখা ইত্যাদির স্থান।[২৮] ইমাম কুরতুবী (রহ.) হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন, শহরের ঘরসমূহ হতে সর্বাধিক প্রিয় ঘর এবং সর্বাধিক প্রিয় ভূ-খণ্ড মাসজিদসমূহ। কারণ মাসজিদসমূহকে ইবাদাত বন্দেগী, যিক্‌র-আযকার, মুসলিমদের মিলনকেন্দ্র ও ফেরেশতাগণের একত্র হওয়ার স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর বাজার আল্লাহর নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট হওয়ার কারণ, বাজারকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে দুনিয়া উপার্জনের জন্য, মানুষের পার্থিব উদ্দেশ্য লাভের জন্য এবং আল্লাহর যিক্‌র হতে উদাসীন রাখার জন্য। কারণ, বাজার হলো, মিথ্যাচারের স্থান, শয়তানের রণক্ষেত্র। শয়তান এখানেই তার ঝাণ্ডা স্থাপন করে ওঁৎ পেতে আছে।[২৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মাসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য, আল্লাহর সাথে অপর কাউকে ডেকো না এবং শরীক করো না।'[৩০] বস্তুত মাসজিদ হচ্ছে মুসলিম জাতির ইবাদাত এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের স্থান। কাজেই জামাআতে ফরয নামায কায়েমের জন্য মাসজিদে গমন করা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ।

২. সামাজিক-সাংস্কৃতিক মিলনায়তন: মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনায়তন হলো মাসজিদ। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আমীর-ফকীর, সাদা-কালো নির্বিশেষে সকল মুসলমান মাসজিদে আগমনে করে আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী করার সাথে সাথে সেখানে ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা, ওয়াজ-নসীহত প্রভৃতির জন্যও মিলিত হয়। ধর্মীয় আইন কানুন, মাসআলা ও খুতবা শোনার মাধ্যমে মুসলিমগণ জ্ঞানের প্রসারতা লাভ করে। মাসজিদ সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চারও উপযুক্ত স্থান। এতে যুদ্ধের বিজয়গাঁথা গাওয়া হতো। হযরত হাস্‌সান বিন ছাবিত (রা.) মাসজিদে নববীতে কবিতা আবৃত্তি করতেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (স.) তাকে নিষেধ করেননি। সহীহুল-বুখারীতে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,

مَرَّ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ.

'একদিন উমার (রা.) হাস্‌সান (রা.) কে মাসজিদে কবিতা পাঠরত অবস্থায় পেয়ে তার দিকে অসন্তুষ্টি ভাব নিয়ে দৃষ্টি করলেন। ফলে হাস্‌সান (রা.) তাঁকে বললেন, এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতেও আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম।'[৩১] মাসজিদ মুসলমানদের সামাজিক কার্যক্রমের কেন্দ্র। এতে মুসলিমগণ একে অপরের সাথে মিলিত হয়। ফলে মাসজিদ মিলনকেন্দ্রের কাজ করে। সমাজের অন্যান্য মিলন কেন্দ্রের মতই মাসজিদ একই ভূমিকা পালন করে। মাসজিদ ঈদোৎসব এবং বিভিন্ন দ্বীনী ও ধর্মীয় উৎসব পালন কেন্দ্র হিসেবেও ভূমিকা পালন করে।

৩. ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণ: মাসজিদে সমাজের মুসলিমগণ দৈনিক পাঁচবার সমবেত হয় কেবল আল্লাহর নির্দেশে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُم خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ

'হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখন আল্লাহ্‌র স্মরণের দিকে শীঘ্র ধাবিত হও, ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে!'[৩২] যখন তারা যাবতীয় কার্যক্রম ছেড়ে মাসজিদে মিলিত হয় তখন তারা পরস্পরকে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে তোলে। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ সৃষ্টিতে মাসজিদের ভূমিকা অসাধারণ। মাসজিদে এসে একই সাথে নামায আদায়, আলাপ-পরিচয়, দেখা-সাক্ষাৎ ও মত-বিনিময়েরে মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতা এবং ভ্রাতৃত্বভাব জাগ্রত হয়। একে অপরের বিপদ আপদে ভ্রাতৃত্বের দরদ নিয়ে এগিয়ে আসে। অতএব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের ক্ষেত্রে মাসজিদের ভূমিকা অতুলনীয়।

৪. সাম্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টি: সমাজের আমীর-ফকীর, ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু সবাই দৈনিক পাঁচবার মাসজিদে মিলিত হয়ে এক কাতারে একই ইমামের পেছনে সকল ভেদাভেদ ও বৈষম্য ভুলে গিয়ে অপূর্ব সাম্যের নিদর্শন স্থাপন করে। কাজেই মানুষের মধ্যে ইসলামী সাম্য-সম্প্রীতি সৃষ্টিতে মাসজিদের ভূমিকা অনবদ্য। এছাড়াও মাসজিদে দৈনিক পাঁচবার আসার ফলে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পূর্ণ মুমিন হওয়ার বিশেষ সুযোগের সৃষ্টি হয়। কারণ মাসজিদের মুসল্লীদের সাথে বারবার সাক্ষাতের সুযোগে পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটে। ফলশ্রুতিতে মহব্বত ও সৌহার্দপূর্ণ জাতি সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বলা হয়েছে,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ

"আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতক্ষণ না তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা গড়ে উঠবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলে দেব না, যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে থাকবে? (তা হচ্ছে) তোমরা পরস্পর মধ্যে সালাম ছড়িয়ে দাও।"[৩৩] আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত,

أَنَّهُ جَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

"এক ব্যক্তি এসে নামায পড়ল। অতঃপর নবী করীম (স.)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম দিল। তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, "ফিরে যাও, এবং নামায আদায় কর। কেননা, তোমার নামায আদায় হয়নি।" কাজেই সে ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়ল। তারপর পুনরায় এসে নবী করীম (স.)-কে সালাম

দিল। এভাবে সে তিনবার করল।”[৩৪] অত্র হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দৈনিক পাঁচবার মাসজিদে আগমনের ফলে পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটার কারণে ইসলামী সমাজে সম্প্রীতির পরিধি বেড়ে ওঠে।

৫. পারস্পরিক খোঁজ-খবর: মানুষ কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিমগ্ন থাকার কারণে অনেক সময় সমাজের মানুষের খোঁজ-খবর নিতে পারে না। মাসজিদে বিভিন্ন শ্রেণির লোক একত্রে নামায আদায় করতে সমবেত হয়। আর এ কারণেই পাড়া-প্রতিবেশীদের খোঁজ-খবর, পারস্পরিক পরিচিতির সুযোগ পায়। যেমনভাবে তৎকালীন মদীনার রাষ্ট্রপতি রাসূলুল্লাহ (স.) মদীনায় অবস্থানরত এক ব্যক্তি বা মহিলার অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিলেন যিনি রাতে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। সহীহুল বুখারীতে ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ مَتَى دُفِنَ هَذَا. قَالُوا الْبَارِحَةَ. قَالَ أَفَلاَ آذَنْتُمُونِى. قَالُوا دَفَنَّاهُ فِى ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ. فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

‘আল্লাহর রাসূল (স.) এক (ব্যক্তির) ক্ববরের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাকে রাতের বেলা দাফন করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একে কখন দাফন করা হল? সাহাবীগণ বললেন, গত রাতে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানালে না কেন? তাঁরা বললেন, আমরা তাঁকে রাতের আঁধারে দাফন করেছিলাম, তাই আপনাকে জাগানো পছন্দ করিনি। তখন তিনি (সেখানে) দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। ইবনু ‘আব্বাস (রা.) বলেন, আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম। তিনি তাঁর জানাযার নামায আদায় করলেন।”[৩৫]

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কালো এক পুরুষ বা এক মহিলা মাসজিদে ঝাড়ু দিত। সে মারা গেল। কিন্তু নবী করীম (স.) তার মৃত্যুর খবর জানতে পারেননি। একদা তার কথা উল্লেখ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটির কী হলো? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? সে ছিল এমন এমন বলে তাঁরা তার ঘটনা উল্লেখ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা তার মর্যাদাকে খাটো করে দেখালেন। নবী করীম (স.) বললেন, আমাকে তার ক্ববর দেখিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি তার ক্ববরের কাছে আসলেন এবং তার জানাযার নামায আদায় করলেন।[৩৬] সুতরাং এ হাদীসের প্রেক্ষিতেও বুঝা যায় যে, মাসজিদের ভূমিকা অনন্য।

৬. সহানুভূতি প্রকাশ: মাসজিদে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। পরস্পর কথা-বার্তা, কুশল বিনিময়, শ্রদ্ধা, সম্ভাষণ এবং সালাম বিনিময় হয়। ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং তাদের অন্তরের বক্রতা ও বিরোধিতা নীতি বিলুপ্ত হয়ে ঐক্য ও পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিশীলতার মনোভাব জাগ্রত হয়। কেননা আবূ মাস‘উদ (রা.) থেকে বলেন, নবী করীম (স.) নামাযে (কাতার বাঁধার সময়) আমাদের কাঁধে হাত বুলিয়ে বলতেন,

اِسْتَوُوا وَلاَتَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ

“তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমরা (কাতার বাঁধার সময়ে) পরস্পরের বিরোধিতা করো না; নচেৎ তোমাদের অন্তরের মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি হবে।[৩৭] কাজেই বলা যায় যে, পারস্পরিক সহানুভূতিশীল হবার ব্যাপারেও ইসলামী সমাজে মাসজিদের ভূমিকা যথেষ্ট।

৭. শান্তি ও শৃঙ্খলাবোধ জাগরণ: মুসলমানগণ আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে মাসজিদে সমবেত হয়, তখন স্বভাবতই সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহর ভয়, ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি পাবার আশায় সকলে শান্তি শৃঙ্খলা

বজায় রাখে। অত্যন্ত নীরবতা সহকারে ভাবগম্ভীর পরিবেশে ইমামের পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অতীব শৃঙ্খলার সাথে নামাযের সব করণীয় আদায় করে। মাসজিদে জামাআতে কাতারবদ্ধ হয়ে নামায পড়ার পূর্বে সকলে সুন্দরভাবে শৃঙ্খলা বজায় রেখে যখন দণ্ডায়মান হয় তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হয়। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (স.) নামাযে সাহাবীদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) (নামাযে দাঁড়িয়ে) বললেন,

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ

"তোমরা কাতার সোজা করো। কেননা, কাতার সোজা করা নামাযের পরিপূর্ণতার অংশ বিশেষ।"[৩৮] এমনকি রাসূলুল্লাহ (স.) নিজেই এসে কাতার সোজা করতেন ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দিতেন।[৩৯] সুতরাং শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মাসজিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৮. নেতৃত্ব ও আনুগত্য শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ: মুসলিমগণ মাসজিদে এসে যোগ্যতম ব্যক্তিকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে তাঁরই ইমামতী বা নেতৃত্বে নামায আদায় করে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم

'যখন তিনজন একত্রিত হবে, তখন তাদের মধ্যে যিনি অধিকতর কুরআন ভাল জানেন তিনি ইমাম হবেন।'[৪০] রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ

'যখন তোমাদের কেউ সালাতে আসবে এমতাবস্থায় ইমামকে যে অবস্থায় পাবে, সে সেই অবস্থার হুবহু অনুসরণ বা কাজ করবে।[৪১] ইমামের নির্দেশ মোতাবেক মুকতাদীগণ নামাযের সকল কাজ সমাধা করে ইমামকে রুকূ, সিজদা বা দণ্ডায়মান অবস্থায় পেলে মুক্তাদী হুবহু ইমামের অনুসরণ করবে।[৪২] আর এভাবে মাসজিদে নামায আদায়ের ফলে তারা নেতার নেতৃত্ব ও আনুগত্যের শিক্ষা লাভ করে। ফলশ্রুতিতে ইসলামী সমাজে প্রতিটি বিভাগে নেতা নির্বাচন এবং নেতৃত্বের আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। সুতরাং এসব শিক্ষাদানে মাসজিদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৯. নিয়মানুবর্তিতার ক্ষেত্রে: মাসজিদে মানুষের দৈনিক পাঁচবার নামায আদায়, আযান, ইকামত এবং ইমামের পেছনে নির্দিষ্ট নিয়মমাফিক সব কিছু করার মাধ্যমে সবাই নিয়মানুবর্তী হয়ে গড়ে ওঠে। কারণ, তারা নামাযের বিধি-বিধানের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সকল কাজ সম্পাদন করেন। তারা যখন উযূ করে, উযূর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধারাবাহিকভাবে ধৌত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

'হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য উঠবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয় ধৌত করবে। আর তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করবে।'[৪৩] অনুরূপভাবে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে তাকবীর দিয়ে শুরু করে সালাম দিয়ে নামায সমাপ্ত করবে।[৪৪] সুতরাং মাসজিদে নামায আদায় ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের সকল বিভাগে নিয়মানুবর্তিতা পালনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

১০. সময়ানুবর্তিতার ক্ষেত্রেঃ মাসজিদ মানুষকে সময়ানুবর্তিতারও শিক্ষা দান করে। নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের মধ্য দিয়ে মানুষকে সময়ানুবর্তী ও দায়িত্বজ্ঞান এবং কর্তব্যপরায়ণ করার ক্ষেত্রে মাসজিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নামায নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

'নির্দিষ্ট সময়ে নামায কায়িম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।'[৪৫] এমনিভাবে নামায আদায় হয়ে গেলে মাসজিদে অলসভাবে বসে থাকতে নিষেধ করা হয়েছে এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

'অতঃপর যখন নামায সমাপ্ত হয়, তখন জমিনে ছড়িয়ে পড়, আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান কর।'[৪৬]

১১. পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রেঃ পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে মাসজিদের গুরুত্ব সীমাহীন। কেননা, মাসজিদ আল্লাহর ঘর বলে সেখানে সর্বদা পাক-পবিত্র অবস্থায় প্রবেশ করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা পাক-পবিত্রতার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

'হে আদম সন্তান! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ কর।'[৪৭] এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'পাক-পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেকাংশ।'[৪৮]

১২. জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর ক্ষেত্রেঃ মাসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের সর্বপ্রকার জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী পরিচালনার কেন্দ্রস্থল হচ্ছে মাসজিদ। জনহিতকর সকল কাজকর্ম পরামর্শের ভিত্তিতে মাসজিদ থেকেই করা উচিত। মাসজিদে নববীতে সর্বপ্রকার কাজই নবী (স.) করতেন। আল্লাহর এই ঘর কেবল নামাযের ঘরই নয়। বস্তুত এটা মানব কল্যাণকেন্দ্র। তাই মুয়াজ্জিন পাঁচবার মুসলিমদের শুধু নামাযের জন্যই নয়; ফালাহ বা কল্যাণের জন্যও আল্লহর ঘরের দিকে আহ্বান করে থাকেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

'আর নামায প্রতিষ্ঠা কর; নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে।'[৪৯] সুতরাং মাসজিদ ইসলামী সমাজে অবস্থানকারী মুসল্লীকে যাবতীয় অন্যায় ও পাপাচারের কাজ পরিহার করে সমৃদ্ধ পরিবেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১৩. শিক্ষা বিস্তারেঃ মাসজিদে পাঠাগার স্থাপন, শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সহীহভাবে কুরআন-হাদীস মোতাবেক সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারে মাসজিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে মাসজিদকে ব্যবহার করা খুবই শ্রেয়। নবী করীম (স.) প্রতিষ্ঠিত মাসজিদ ছিল ইসলামের প্রথম উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এ মাসজিদ থেকেই প্রখ্যাত উলামায়ে কিরাম, যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী, ফকীহ, মুহাদ্দিস, বিচারক, রাষ্ট্রনায়ক, ইমাম ও পথ প্রদর্শকগণ শিক্ষা লাভ করেছেন এবং বিশ্ববাসীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় সমুদ্ভাসিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) ছিলেন মাসজিদে নববীর মহান শিক্ষক ও মানবতার পথ প্রদর্শক। মাসজিদে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রসঙ্গে নবী করীম (স.) বলেন,

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

“আল্লাহর ঘরসমূহ হতে কোন ঘরে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করা ও শিক্ষা করার জন্য যখন কোন সম্প্রদায় একত্র হয়, তাদের উপর শান্তি নাযিল হয়, রহমত তাদের ঢেকে ফেলে এবং আল্লাহ তা‘আলা তার যে সব ফেরেশতা আছে, তাদের নিকট তাদের আলোচনা করেন।”[৫০] রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন,

مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيَتَعَلَّمَ خَيْراً أَوْ لِيُعَلِّمَهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ دَخَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ

“যে আমাদের এ মাসজিদে কিছু ভাল জিনিস শিখতে কিংবা শিখাতে আসে, সে যেন আল্লাহর পথের মুজাহিদ। আর যে এটা ব্যতীত মাসজিদে প্রবেশ করে সে যেন এমন জিনিসের দর্শক যা তার নেই।”[৫১]

বস্তুত ইসলামী সমাজে মাসজিদের ভূমিকা হচ্ছে উন্মুক্ত বা গণবিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, দেশী-বিদেশী সকলেই এতে সমানভাবে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায়। বর্তমান সময়ে পূর্বের তুলনায় মাসজিদভিত্তিক শিক্ষা কমেছে। যদিও বিভিন্ন ধরনের স্তর ভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ইসলামী সমাজে শিক্ষা বিস্তারে মাসজিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৪. মাসজিদের অর্থনৈতিক ভূমিকা: নবী করীম (স.) মাসজিদে নববীতে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নির্দেশনা দিতেন। অর্থনৈতিক ব্যাপারেও তিনি নীতিমালা ঘোষণা করেছেন। মাসজিদে নববীতে গনীমতের মাল এবং যাকাত-সাদাকার মাল জমা হতো। মাসজিদ থেকে তা প্রাপকদের মাঝে বিতরণ করা হতো। এ দৃষ্টিতে মাসজিদ যেন ধনাগার ও বিতরণের কেন্দ্র। পরবর্তীকালে প্রত্যেকটি মাসজিদের নিজস্ব বিরাট তহবিল গড়ে উঠেছিল। সে তহবিল থেকে দান ও যাবতীয় সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করা হতো। আজও যদি এ ব্যবস্থা চালু করা যেত তাহলে বিদেশী বিধর্মীদের এনজিওদের হাতে আমাদের ঈমান-আক্বীদা বিনষ্ট হতো না। বস্তুত মাসজিদ ইসলামী সমাজের প্রাণকেন্দ্র। মাসজিদকে বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মুসলিম সমাজ কল্পনাতীত। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মাসজিদ একাধারে ইবাদাত গৃহ, শিক্ষাকেন্দ্র, মিলনায়তন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা কেন্দ্র।

মাসজিদ হবে পবিত্র ও সুগন্ধময়

মাসজিদ আল্লাহর ঘর ও ইবাদতের জায়গা। সুকরাং তা হবে পবিত্র ও সুগন্ধময়। ‘আয়েশা (রা.) বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল (স.) মহল্লায় মাসজিদ বানাতে এবং তা পরিষ্কার ও সুগন্ধময় করে রাখতে আদেশ করেছেন।’[৫২] সামুরাহ (রা.) নিজের ছেলেকে পত্রে লিখেছিলেন, ‘আল্লাহর রাসূল (স.) আমাদেরকে আমাদের মহল্লায় মাসজিদ বানাতে এবং তা পবিত্র রাখতে আদেশ করতেন।’[৫৩]

নবী কারীম (স.) বলেন, “নিশ্চয়ই এই মাসজিদসমূহে কোন প্রকার নোংরা, পেশাব-পায়খানা (ইত্যাদি ময়লা দ্বারা অপবিত্র করা) সঙ্গত নয়। মাসজিদ তো কুরআন পাঠ, আল্লাহর যিক্‌র এবং নামাযের জন্য (বানানো হয়)।[৫৪] তিনি মাসজিদের দরজায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।[৫৫]

মাসজিদে থুথু বা কফ্ ফেলা গোনাহের কাজ। নোংরা বস্তু মাসজিদ থেকে পরিষ্কার করা সাওয়াবের কাজ।[৫৬] যেমন ঋতুবতী মহিলা প্রভৃতি অপবিত্রের জন্য মাসজিদে অবস্থান করা বৈধ নয়।[৫৭]

মাসজিদে যা অবৈধ

(১) হারানো জিনিস খোঁজা; নবী কারীম (স.) বলেন, “যে ব্যক্তি কাউকে মাসজিদে তার হারানো বস্তু খোঁজ করতে দেখবে, সে ব্যক্তি যেন তাকে বলে, ‘আল্লাহ তোমার জিনিস ফিরিয়ে না দিক্।’ কারণ, মাসজিদসমূহ

এ উদ্দেশ্যে বানানো হয়নি।"[৫৮] (২) ক্রয়-বিক্রয়; নবী কারীম (স.) বলেন, "যখন তোমরা দেখবে যে, মাসজিদে কেউ কিছু বেচা-কেনা করছে, তখন তাকে বলবে যে, 'আল্লাহ তোমার বেচা-কেনায় লাভ না দিক।"[৫৯] (৩) অসার ও অশ্লীল কবিতা, গজল বা ছড়া পাঠ; আম্‌র বিন শু'আইবের পিতামহ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (স.) মাসজিদে আপোসে কবিতা আবৃতি ও বেচা-কেনা করতে, জুম'আর দিন (জুম'আর) নামাযের পূর্বে গোল হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন।[৬০] অবশ্য বৈধ শ্রেণীর ইসলামী গজল পাঠ নিষিদ্ধ নয়। একদা হাস্‌সান (রা.) মাসজিদে কবিতা পাঠ করছিলেন। 'উমার (রা.) প্রতিবাদের দৃষ্টিতে তাঁর প্রতি তাকালে তিনি বললেন, 'আমি কবিতা পাঠ করতাম, আর তখন মাসজিদে আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি [নবী করীম (স.)] উপস্থিত থাকতেন।' অতঃপর তিনি আবূ হুরায়রার (রা.) দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, আপনি কি আল্লাহর রাসূল (স.)-কে বলতে শুনেছেন, "(হে হাস্‌সান! মুশরিকদেরকে) আমার পক্ষ থেকে (ওদের কবিতার) জবাব দাও। হে আল্লাহ! জিবরীল (আ.) দ্বারা ওকে সাহায্য করো?" আবূ হুরায়রা বললেন, 'জী হ্যাঁ, (আমি এ কথা শুনেছি)।[৬১] (৪) হৈ-হাল্লা করা ও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা;[৬২] এমনকি কেউ নামায বা কুরআন পড়লে সেখানে সশব্দে কুরআন পাঠও করা যাবে না। একদা নবী কারীম (স.) দেখলেন, লোকেরা নামাযে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ করছে। তিনি বললেন, "মুসল্লী (নামাযী) তো আল্লাহর সাথে চুপিসারে কথা বলে। সুতরাং কী নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলছে তা লক্ষ্য করা দরকার। আর তোমরা এমন উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পড়ো না, যাতে অপরের নামাযে ব্যাঘাত ঘটে।"[৬৩]

বলাই বাহুল্য যে, মাসজিদের যে প্রতিবেশী অথবা অন্য লোক যে (মাইক, টেপ, রেডিও প্রভৃতির) শব্দ বা গান-বাজনা দ্বারা অথবা কোন রঙ-তামাশা দ্বারা মাসজিদের পবিত্রতা-হানি করে এবং মাসজিদে অবস্থিত নামাযীদের নামাযে, তিলাওয়াতে ও আল্লাহর যিক্‌রে ব্যাঘাত ও বাধা সৃষ্টি করে, তার ভয় হওয়া উচিত। কারণ, মহান আল্লাহর সাধারণ উক্তি এই যে,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"এবং যে কেউ আল্লাহর মসজিদসমূহের মধ্যে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে নিষেধ করেছে এবং তা ধ্বংস করতে প্রয়াস চালিয়েছে- তার অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে শঙ্কিত অবস্থায়ই তন্মধ্যে প্রবেশ করা উচিত; তাদের জন্যে ইহলোকে দুর্গতি এবং পরলোকে কঠোর শাস্তি রয়েছে।"[৬৪]

(৫) হদ্দ্ বা ইসলামী দণ্ডবিধি; যেমন মদখোরকে চাবুক মারা, চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীকে কোড়া মারা প্রভৃতি কায়েম করা। নবী কারীম (স.) মাসজিদে হদ্দ্ কায়েম করতে নিষেধ করেছেন।[৬৫]

মাসজিদে যা বৈধ

এমন কতিপয় কাজ রয়েছে, যে সম্বন্ধে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, তা মাসজিদে করা হয়তো বৈধ নয়। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ। (১) দ্বীনী কথাবার্তা, বৈধ আলোচনা, প্রয়োজনীয় সাংসারিক কথা। জাবির বিন সামুরাহ (রা.) বলেন, 'নবী (স.) ফজরের নামায পড়ে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত মুসাল্লা থেকে উঠতেন না। সূর্য উঠে গেলে তিনি উঠে যেতেন। ঐ অবসরে লোকেরা আপোসে কথা বলত। বলতে বলতে তারা ইসলাম-পূর্ব জাহেলিয়াতের কথা শুরু করে দিত। এতে তারা হাসত এবং তিনিও মুচকি হাসতেন।'[৬৬]

অবশ্য নিছক দুনিয়াদারীর কথা বলা বৈধ নয়। নবী কারীম (স.) বলেন, "শেষ যুগে এমন এক শ্রেণীর লোক হবে, যারা মাসজিদে গোল-বৈঠক করে পার্থিব ও সাংসারিক গল্প-গুজব করবে। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে বসো না। কারণ, এমন লোকেদের নিয়ে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।"[৬৭] (২) খাওয়া ও পান করা। 'আব্দুল্লাহ বিন হারিস (রা.) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর আমলে মাসজিদের ভিতর রুটি-গোশত

খেতাম।'[৬৮] যে জিনিস খাওয়া হারাম, তা মাসজিদে খাওয়া তথা সকল স্থানেই খাওয়া হারাম। মাসজিদের সম্মান রক্ষার্থে সে সব হারাম জিনিস সঙ্গে নিয়ে বা পকেটে রেখে মাসজিদে যাওয়া বা নামায পড়াও বৈধ নয়। যেমন গুল, জর্দা, বিড়ি, সিগারেট, তামাক প্রভৃতি খাওয়া বৈধ নয়, বিধায় তা মাসজিদে খাওয়া বা নিয়ে যাওয়া ও অবৈধ।[৬৯] (৩) শয়ন করা; একদা আব্বাদ বিন তামীমের (রা.) চাচা দেখলেন, আল্লাহর রাসূল (স.) মাসজিদে এক পা অপর পায়ের উপর রেখে চিৎ হয়ে শয়ন করে আছেন। সা'ঈদ বিন মুসাইয়িব বলেন, 'উমার এবং উসমান (রা.)ও এরূপ করতেন।'[৭০] আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা.) বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূল (স.)-এর যুগে মাসজিদে ঘুমাতাম। আর আমরা তখন ছিলাম অবিবাহিত যুবক।'[৭১] তবে ঘরে জায়গা থাকতে মাসজিদকে অভ্যাসগতভাবে শয়ন ও বিশ্রামাগার বানানো উচিত নয়। কারণ, ইবনে 'আব্বাস (রা.) বলেন, 'কেউ যেন মাসজিদকে শয়ন ও বিশ্রামাগার বানিয়ে না নেয়।'[৭২]

উপসংহার

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপনে মাসজিদের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা ইসলামের সূচনালগ্নে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেই রাসূলুল্লাহ (স.) মদীনায় সর্বপ্রথম মাসজিদ নির্মাণ করেন। যা ছিল দাওয়াতী কাজের প্রাণকেন্দ্র এবং রাষ্ট্রীয় ভবন। বিভিন্ন বিষয়ের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখানেই সম্পাদন করা হতো। বিভিন্ন দেশ ও এলাকা থেকে আগত প্রতিনিধি ও মেহমানদেরকে রাসূলুল্লাহ (স.) মাসজিদেই স্বাগত জানাতেন। যেখানে মুসলমানরা দৈনিক পাঁচবার একত্রিত হয়। এর ফলে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ এক কাতারে দাঁড়ানোর মাধ্যমে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য, সম্প্রীতি ও একতার উন্মেষ ঘটে। আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা বিনির্মানে, সুন্দর, সমৃদ্ধ, সুশীল ও সুশৃংখল সমাজ গঠনে এবং ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারে মাসজিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তথ্যনির্দেশ

১ আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আল-কাযবিনী, *সুনানু ইব্নে মাজাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.), অধ্যায়: কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামা'আত, পরিচ্ছেদ: যে আল্লাহর জন্য ঘর নির্মাণ করবে, হাদীস নং ৭৩৮, পৃ. ২৪৪।

২ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ২০০৫ খৃ.), পৃ. ৯৫২; মুহাম্মাদ রাওয়াস কাল'আজী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (বৈরূত: দারুন নাফায়েস, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৪২৮।

৩ আবূ 'আব্দিল্লাহ বদরুদ্দীন আয-যারকাশী, *'ইলামুস সাজিদ বি আহকামিল মাসাজিদ*, ১ম খণ্ড (রিয়াদ: আল-মাজলিসুল 'আলা লিশ-শুউন আল-ইসলামিয়্যাহ, ৪র্থ প্রকাশ ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২৮।

৪ *Hans Wehr, A Dictionary of modern Written Arabic* (New York: Spoken Language Services, Inc, 1976), p. 397.

৫ ইবরাহীম মুস্তফা, আহমাদ যায়্যাত, হামিদ আব্দুল কাদের, মুহাম্মাদ আন-নাজ্জার, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, ১ম খণ্ড (আল কাহিরাহ: দারুদ দা'ওয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৪১৬।

৬ নাশওয়ান বিন সাঈদ আল-হুমায়রী আল-ইয়ামী, *শামসুল উলুম ওয়াদাউ কালামিল আরাব মিনাল কুলূম*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২৯৭৪।

৭ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান আল-মাজদাদী আল-বারকাতী, *আত-তা'রীফাত আল-ফিকহিয়্যাহ* (পাকিস্তান: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২০৪।

৮ *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* পৃ. ৪২৮।

৯ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮, وأصل المسجد شرعًا كل موضع من الأرض يُسجد لله فيه

[১০] আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল বিন ইবরাহীম আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারু তাওকুন নাজাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি.), অধ্যায়ঃ কিতাবুত তায়াম্মুম, হাদীস নং ১৩২১, পৃ. ৭৪।

[১১] আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, *সহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাছ আল-'আরাবী, তা.বি.), অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াজিউস সালাহ, হাদীস নং ৫২০, পৃ. ৩৭০।

[১২] আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া বিন শারফ বিন মাররী আন-নববী, *শারহুন নববী 'আলা সহীহ মুসলিম*, ৫ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাছ আল-'আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯২ হি.), পৃ. ৫।

[১৩] *আত-তা'রীফাত আল-ফিকহিয়্যাহ*, পৃ. ২০৪।

[১৪] মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, *আল মু'জামুল মুফাহরাস লিল আল-ফাযিল কুরআন* (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১ম সংস্করণ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৪২৩।

[১৫] আল-ইমামুল কাযী 'আলী বিন 'আলী বিন মুহাম্মাদ বিন ইয আদ-দিমাশকী, *শারহুল আক্বীদাহ আত-তহাবিয়াহ* (বৈরূত মুআসসাসাতুর রিসালাহ, তা.বি.), পৃ. ৫৬৪।

[১৬] সূরাহ আল-বাকারাহ, ১১৪।

[১৭] সূরাহ আত-তাওবা, ১৮।

[১৮] সূরাহ আল-বাকারাহ, ১১৪।

[১৯] ড. আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আল-জুবরীন, *মাসজিদ বিষয়ক ফুসুল ও মাসায়েল* (রিয়াদ, ওয়ারাতুশ শুউন আল-ইসলামিয়্যাহ ওয়াল আওকাফ ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি.), পৃ. ৫।

[২০] *সহীহ মুসলিম*, ৪র্থ খণ্ড, যিক্‌র ও দু'আ অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ কুরআন তিলাওয়াতের জন্য একত্র হওয়ার ফযিলত, হাদীস নং ২৬৯৯, পৃ. ২০৭৪।

[২১] সূরাহ আল-'আনকাবূত, ৪৫।

[২২] *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫০, পৃ. ১৯।

[২৩] সূরাহ আন্-নিসা, ১০৩।

[২৪] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২২২।

[২৫] আহমাদ বিন হাম্বল আবূ আব্দুল্লাহ আশ-শায়বানী, *মুসনাদ আল-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল*, ৩৮শ খণ্ড (কায়রোঃ মুয়াস্‌সাসাতু কুরতুবাহ, তা.বি.), পৃ. ৪৭৪।

[২৬] সূরাহ আলে 'ইমরান, ১৫৯।

[২৭] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল মাসাজিদ এবং সালাতের স্থানসমূহ, পরিচ্ছেদঃ ফজরের সালাতের পর সালাতের স্থানে বসার ফযীলত এবং মাসজিদের ফযিলত, হাদীস নং ৬৭১।

[২৮] সহীহ মুসলিমের উপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭।

[২৯] আবুল 'আব্বাস আহমাদ বিন 'উমার বিন বিন ইবরাহীম আল-কুরতুবী, *আল-মুফহিম মিন তালখীস কিতাবু মুসলিম*, ২য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারু ইবনু কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২৯৪।

[৩০] সূরাহ আল-জিন, ১৮।

[৩১] *সুনানু আবী দাউদ*, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৫০১৩, পৃ. ৩০৩।

[৩২] সূরাহ আল-জুমু'আহ, ৯।

[৩৩] *সহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, পৃ. ৭৪, হাদীস নং ৫৪।

[৩৪] *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৫৭, পৃ. ১৫২।

[৩৫] *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড , অধ্যায়ঃ জানাযা, পরিচ্ছেদঃ জানাযার সালাতে পুরুষদের সঙ্গে বালকদের কাতার, হাদীস নং ১৩২১, পৃ. ৮৭।

[৩৬] পূর্বোক্ত, অধ্যায়ঃ জানাযা, পরিচ্ছেদঃ দাফন করার পর কুবরের পাশে জানাযার সলাত আদায় করা, হাদীস নং ১৩৩৭, পৃ. ৮৯।

[৩৭] *সহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড, অধ্যায়: সালাত, পরিচ্ছেদ: কাতার সোজা করন ও প্রথম কাতারের মর্যাদা, হাদীস নং ৪৩২, পৃ. ৩২৩।

[৩৮] *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, অধ্যায়: আযান, পরিচ্ছেদ: কাতার পূর্ণ করাই হলো সালাত পূর্ণ করা, হাদীস নং ৭২৩, পৃ. ১৪৫।

[৩৯] *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, অধ্যায়: আযান, পরিচ্ছেদ: কাতার সোজা করার সময় ইমামকে মুক্তাদীর সামনে আসা, হাদীস নং ৭১৯, পৃ. ১৪৫।

[৪০] *সহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড, অধ্যায়: কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াজিউস সালাহ, পরিচ্ছেদ: কে ইমামতের যোগ্য, হাদীস নং ৬৭২, পৃ. ৪৬৪।

[৪১] *জামি'উত্-তিরমিযী*, ১ম খণ্ড, অধ্যায়: সফর, পরিচ্ছেদ: ইমাম সিজদাহ অবস্থায় থাকলে মুক্তাদী কী করবে, হাদীস নং ৫৯১, পৃ. ৭৩০।

[৪২] *সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা*, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১১৮৮, পৃ. ১৮৫।

[৪৩] সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৬।

[৪৪] *সুনানু ইবনে মাজাহ*, ১ম খণ্ড, অধ্যায়: কিতাবুত ত্বহারাত, হাদীস নং ২৭৫, পৃ. ১০১।

[৪৫] সূরাহ আন্-নিসা, ১০৩।

[৪৬] সূরাহ আল-জুমু'আহ, ১০।

[৪৭] সূরাহ আল-আ'রাফ, ৩১।

[৪৮] *সহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড, অধ্যায়: কিতাবুত ত্বহারাত, পরিচ্ছেদ: উযূর ফযীলত, হাদীস নং ২২৩, পৃ. ২০৩।

[৪৯] সূরাহ আল-'আনকাবূত, ৪৫।

[৫০] *সহীহ মুসলিম*, ৪র্থ খণ্ড, যিক্র ও দু'আ অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: কুরআন তিলাওয়াতের জন্য একত্র হওয়ার ফযিলত, হাদীস নং ২৬৯৯, পৃ. ২০৭৪।

[৫১] মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান, *ইবনে হিব্বান*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: মুয়াস্সাসাতুর রিসালাাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২৮৮, হাদীস নং ৮৭, অধ্যায়: কিতাবুল ইলম।

[৫২] *সুনানু আবী দাউদ*, ১ম খণ্ড, অধ্যায়: সালাত পর্ব, পরিচ্ছেদ: মহাল্লায় মাসজিদ নির্মাণ, হাদীস নং ৪৫৫, পৃ. ১২৪; জামি'উত তিরমিযী, হাদীস নং ৫৯৪; *সুনানু ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ৭৫৮; *সুনানু ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং ২৬৩৮৬।

[৫৩] *সুনানু আবী দাউদ*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৫৬, পৃ. ১২৪।

[৫৪] *মুসনাদু আহমাদ*, ২০শ খণ্ড, হাদীস নং ১২৯৮৪; *সহীহ আল-জামিউস সগীর লিল আলবানী*, হাদীস নং ২২৬৮, পৃ. ২৯৭।

[৫৫] *সহীহ আল-জামিউস সগীর লিল আলবানী*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৬৮১৩, পৃ. ১১১২।

[৫৬] পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৮৮৫, পৃ. ৫৫৮।

[৫৭] *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৫১; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৮৯০, পৃ. ৮০।

[৫৮] *সহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৬৮, পৃ. ৩৯৭।

[৫৯] জামি'উত *তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩২১, পৃ. ৬০২।

[৬০] *সুনানু আবী দাউদ*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১০৭৯, পৃ. ২৮৩।

[৬১] *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৫৩, পৃ. ৯৮।

[৬২] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ৪৭০।

[৬৩] *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ৬০৯২।

[৬৪] সূরাহ আল-বাক্বারাহ্, ১১৪।

[৬৫] *হাকিম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৯; মুসনাদু আহমাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৪; *সুনানু আবী দাউদ*, হাদীস নং ৪৪৯০।

[৬৬] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৬৭০।

[৬৭] *বায়হাক্বী*, হাদীস নং ২৯৬২; *মিশকাত*, হাদীস নং ৭৪৩; *সিলসিলাহ সহীহাহ*, হাদীস নং ১১৬৩।

---

[৬৮] *সুনানু ইবনে মাজাহ,* হাদীস নং ৩৩০০।

[৬৯] *মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ,* ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৫৮।

[৭০] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ৪৭৫।

[৭১] পূর্বোক্ত, হাদীস নং ৪৪০।

[৭২] *সহীহ তিরমিযী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

Duties of Human Being to Environment and Nature in Islam: An Analysis

Dr. A N M Masudur Rahman*

Abstract: Allah has created mankind as one of the best creation and sent them as His vicegerent on the Earth. They have many duties to the Environment and Nature for sustaining the present and future generation. It's an open declaration in Islam that Environment and Nature protection are important duty to human being. Nowadays it is a well discussed issue around the world. The Environment and Nature can be polluted by various reasons. Only human being can protect these reasons and take necessary initiatives for the purpose. It has originated from Islam at the very beginning. Islam also mentioned some balanced systems to preserve the environment and nature. This article tries to focus on the duties and responsibilities of human being to the Environment and Nature from Islamic viewpoint. It is also an attempt to find out the indications in Islam on Environmental and Natural protection.

Keywords: Duties, Human being, Environment, Islam, Vicegerent on the earth by Allah.

Introduction

The environment is the natural world, as a whole or a particular geographical area, specially as a affected by human activity. According to the Islamic rules, human being has some duties and responsibilities to conserve the degradation of environment and nature for sustaining the present and future generations. Islam is the religion of mankind and humanity. So, it has shown an obvious significance on the issue of preservation of environment and nature, and provided some directions to apply in practical life. There are huge numbers of verses in the Qur'an and several sayings of the Prophet Muhammad (SM) indicate to be balanced by conserving natural resources in environmental dimensions. From the Islamic point of view, the universe has been created by Allah with a specific purpose and for a limited time. The utilization of natural resources is a sacred trust invested for mankind; everybody of mankind is treated as a manager but not an owner, a beneficiary, not a disposer. The nature and environment are considered as the subject matter of enjoyment and also regarded as the gift of the Almighty for entire mankind. Since people are the vicegerent of Allah on the earth.[1] They should take every precaution to ensure the interests and rights of others, and regard their mastery over their allotted piece of land as a joint ownership with the next generation. Therefore they preserve and pass it on to future generations in an excellent condition and it's their important duty and crying need only on account of them.

Composition of environment and nature

The environment and nature are composited by particular substance of whole around of the world. Those are created and gifted by Almighty for entire creations. Such as:

* Associate Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi.

air, water, soil, sea, ocean, rivers, sunlight, moonlight, heat, trees, plants, animal and insects etc.[2] There are more than 750 verses in the Holy Qur'an those are related to environment and nature. More than twenty chapters of the Qur'an are named after certain animals and natural incidents, such as: the Cow, the Cattle, the Mankind, the Women, the Thunder, the Bee, the Spider, the Ant, the Daybreak, the Sun, the Moon, the Iron, the City, the Dawn, the forenoon, the Time, the Night, the clot, the Fig and the Elephant.[3] Moreover there are many cases in which Allah takes an oath by some natural phenomena like: the dawn[4], the fig and olive[5] and the time[6] etc. In numerous verses, the Qur'an states that all the natural phenomena are created only for awareness and glorification of the creator. Allah says:

'And We made the mountains and the birds to celebrate our praise along with David.'[7]
'And there is not a thing but that it glorifies Him with His praise but you do not understand their glorification.'[8]

In many verses the natural phenomena are characterized as divine signs indicating the knowledge, the wisdom and the power of Allah, such as Allah says:

'Most surely in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day, and the ships that run in the sea with that which profits men and the water that Allah sends down from the cloud, then gives life with it to the earth after its death and spreads in it all (kinds of) animals, and the changing of the winds and the clouds that are made subservient between the heaven and the earth, there are signs for a people who understand.'[9]

These verses indicate that human being is obliged to perform such kinds of duties and responsibilities to the environment and nature, otherwise they will be asked in the day of Resurrection.

Duties of human being to the Environment and Nature

Human beings are the best creation of Almighty. They are part and parcel of the nature and the vicegerents from Allah on the earth. So, they have some important duties and responsibilities to the blessings of Allah, such as the environment and nature. They must protect them and prevent any harm to them, which in turn will preserve the rights of others. Human beings must not only help to preserve the environment, but also assist in developing the earth using appropriate environment-sustaining measures. This fact emphasized by the Qur'anic verses. Allah says,

'Do not do mischief on the earth, after it hath been set in order.'[10] *He also says, his aim everywhere is to spread mischief through the earth and destroy crops and cattle. But Allah loveth not mischief.'*[11]

The above verses focus on the duties of human beings to protect and preserve the environment and nature. Demolition, destruction and pollution of the environment and nature are instances of corruption in the land. Thus, modifying the environment is

a human duty but it must be consistent with environment development and based on Islamic values. Any policy, regulation, order or ruling that seeks to protect the environment will be subject to these verses and any behaviour that leads to corruption and environmental degradation is inconsistent with the glorious teachings of Islam. Islam has taken some initiatives to protect and preserve the environment and nature. Those are below:

a) Preventing Extravagance

The word extravagance means squandering. It is defined as any violation of moderation and that tends towards excess or wastage. It is strongly prohibited in Islam and considered as a great sin. Temperance in the use of the environment is derived from the concept of squandering. Hence, proper managing and control over the use of the environment and other resources is the duty of all Muslims. Some verses in the Qur'an discourage the squandering. Such as Allah says,

'Eat and drink, but waste not by squander, for Allah loveth not the wasters.'[12] Also He says, *'For Allah loveth not the wasters.'*[13] *'Verily, spendthrifts are brothers of the devils.'*[14] *'And the transgressors will be companions of the fire.'*[15] *'And do not follow the bidding of the excessive, who cause corruption in the earth and do not work good.'*[16]

There is a Hadith on it, *'Once the Prophet (SM) was crossing S`aad (R.), when he was performing ablution through using too much water. The Prophet said to him, What is this extravagance? S`aad (R.) responded, is there extravagance with water in ablution? The Prophet said, yes, even if you were on a flowing river.'*[17]

At the time, the Companion was puzzled by the applied benefit of this rule. Today it is evident that conservation is an important part of protecting and preserving the environment.

All above verses and Hadith mention that wastage and squander of anything are prohibited. The earth, water, air and soil are the creations of Allah and their utilization should be managed and controlled in a prudent manner. Islam believes that some jobs cause the utilization of excess natural resources that upsets the balance and this is a form of squander.

b) Preventing Earth Pollution

The Muslims prostrate to Allah in several times on the earth. If water is not available or using of water is harmful to one's health, then earthly materials like soil or sands can be used to perform ritual ablution. According to Islam, the earth is introduced as an origin for the creation of human beings. So, they will try to keep it clean. Any harm to the earth will affect all living beings. Since humans and other creatures eat and drink from the sources created by the earth. Any pollution will result in non-healthy products and destroy the nutrition inherent in a healthy earth. Therefore, this cycle shows that any harm to the environment and specially the earth directly returns

to humans. There are some Qur'anic verses in below on maintaining cleanliness of the earth. Allah says,

'From the land that is clean and good, by the will of its cherisher, springs up produce, (rich) after its kind: but from the land that is bad, springs up nothing.'[18] *'And make not your own hands contribute to (your) destruction.'*[19] *'And do good, even as God has done you good, and do not pursue corruption in the earth. Verily God does not love corrupters.'*[20] *'He is the one who created you from the earth and settled you upon it, so that you might cultivate the land and construct towns and cities in which to live.'*[21]

The Prophet (SM) said, *'Be careful about ritual ablution. Certainly, the prayer is your best act. Preserve the earth because it is your mother……'*[22]

The above directions show the importance of protecting the earth and preventing its pollution. But, industrial and chemical activities cause significant harm to the earth. So, it is more important to mitigate these effects by utilizing and constructing the earth properly.

c) **Preventing Water Pollution**

Water is an important gift provided by Allah, which is a basic need of all living creatures. Allah mentioned the word `water' about 66 times in the Qur'an.[23] It is used for socio-religious function, such as cleaning of the body and clothes and other dirty things. Only after cleaning with pure water,[24] Muslims are allowed to pray and perform their other religious activities. One can only pray at a place that has been cleaned. Therefore, Islam stresses on preventing pollution of water resources. Urinating in water and washing or having a bath in stagnant water are forbidden acts in Islam. The Prophet said: '*Do not urinate in water. No one should bathe in still water, when he is unclean.*'[25] The Prophet said: *'Don't waste water even if you are on a running river'*.[26]

On the other hand, water is the most important molecule in the life of an organism and every life originated from it. The Qur'an states: *'And We have made of water everything living.'*[27] The Qur'an also states that *'Do you not see that Allah sends down water from the sky and then the earth is covered in green.'*[28] *'It is he who sendeth down rain from the skies, with it we produce vegetation of all kinds, from some we produce green (crops).'*[29]

Nowadays, this valuable resource is being threatened and all countries are concerned about the ability to continue providing it in sufficient quantities. Therefore, protecting this source should be of top priority for the people and governments. In fact, the lack of water causes the environment cycle to face challenges. Thus, preventing water pollution is an effective way of protecting the environment.

d) Preventing Air Pollution

Air pollution is a common case and offense in our present society. Mixture of carbon dioxide, smoke and other harmful elements are main reason of air pollution. Islam always encourages protecting the air pollution and breathing of fresh air. Because Allah sends fresh air for every life and organism. So, He wants to save them from all kinds of air pollution. The Qur`an states, *'It is Allah who sends the winds which raise the clouds, which We then drive to a dead land and by them bring the earth to life after it was dead.'*[30]

The Prophet (SM) prohibited from some activities that result in offensive smells and odors, from taking place in certain public places. He said: *'whoever eats garlic or onion should keep away from us and from our mosque or should remain in his house.'*[31] The period that one should stay away is limited to the duration of the smell. By analogy, anything that pollutes the air and is detrimental to the health should be prohibited.

e) Preventing Voice Pollution

The voice and sound can be polluted by human being. This kind of pollution is becoming more common today. Specially, it's increasing gradually with the growing spread of technology, horning of vehicles loudly and industrialization. Voice pollution is the root of many diseases for human. According to Islam, most of the activities and professions should be adapted with the environment and do not make annoying sounds. Such as, we will operate our technology and industrial sectors with new methods and tools that would be more adaptable to new environmental conditions. Even voice pollution is mentioned in the Qur'an. Allah says, '*and be moderate in thy pace, and lower thy voice. Verily, the harshest of all voices is the voice of the ass.*'[32]

This verse indicates that when we talk with another the voice will be in the normal scale. No option to be high voltage or loud scale, on account of harmful to another.[33]

f) Planting Trees and crops

Planting trees and crops is an important duty towards environment and nature. It has originated from the very beginning in Islam. So, Islamic teachings highly encourage planting trees and crops and considered it as an important worship. There are many directions in Islam on the preservation of trees and plants.

The Prophet (SM) said: '*Unless you are compelled, do not cut down a tree.'*[34] *Before battles, the Prophet always gave instruction to his soldiers not to harm women, children, the elderly, and those who surrendered and not to destroy or burn farms and gardens.*[35] Even at the times of war, Muslim leaders such as Abu Baker and Omar (R.) also advised their troops not to chop down trees and destroy agriculture or kill any animals.

In addition to protection of plants, there are many hadiths that recommend Muslims to plant and farm. Such as narrated by Anas bin Malik (R.) that Allah's Messenger (SM) said, '*there is none amongst the Muslims who plants a tree or sows seeds, and then a bird, or a person or an animal eats from it, but is regarded as a charitable gift for him.'*[36] *Also he said, 'Whoever waters a date or lote tree it is as if he has given a drink to a thirsty believer.*[37]

Prophet Muhammad (SM) encouraged the planting of trees and the cultivation of agriculture which are considered as good acts. Islam is against the cutting or destruction of plants and trees unnecessarily as is evident in the Hadith: Abdullah Ibn Habashi reported that Prophet Muhammad (SM) said, *'He who cuts a lote-tree, Allah will send him to Hellfire.'*[38]

According to the scholars, the lote-tree grows in the desert and is very much needed in an area which has scarce vegetation. The devastation caused by deforestation in many countries causes soil erosion and kills many of the biodiversity of the earth.[39]

g) Attention to the animals

In Islam, animals have varieties rights, those are considered as important duties of human beings, and they will be asked for that in the day of Resurrection. The Qur'an included animals as communities like humans. Allah says, *'there is no creature on the earth or animal that flies with its wings except that they are communities like you. We have not neglected anything from the Book. Then they will be gathered unto their Lord.'*[40]

A fundamental right for animals is the right to life. According to a well-known hadith, the Holy Prophet said: '*A woman will be put in the hell because she imprisoned a cat until the cat died.*'[41] The Prophet also said: '*Hunting birds or animals for fun is prohibited.*[42] *The Prophet (SM) said, 'Do not take any living being as a target.*'[43]

Narrated Abu Huraira (R.): Allah's Messenger said, '*while a man was walking on a road, he became very thirsty. Then he came across a well, got down into it, drank and then came out. Mean while he saw a dog panting and licking mud because of excessive thirst. The man said to himself, the dog is suffering from the same state of thirst as I did. So he went down the well and filled his shoe with water and held it in his mouth and watered the dog. Allah thanked him for the deed and forgave him. The people asked, is there a reward for us in serving the animals? He said, 'yes, there is a reward for serving any animate.*'[44]

It is also compulsory to provide food, water and place for animals. Animals must be loved and respected. An animal like a sheep or camel must not be slaughtered in front of another one. This is published by the speeches of Muhammad (SM). He said, '*Verily Allah has enjoined goodness to everything; so when you kill, kill in a good way and when you slaughter, slaughter in a good way. So every one of you should sharpen his knife and let the slaughtered animal die comfortably.*'[45]

The above Hadiths indicate that animals must not be killed unless there is a legal permission by Allah, like benefiting from them, slaughtering them. There are adequate reasons for prohibiting hunting animals for fun and one can argue from these reasons for prohibition of killing animals without having a permitting cause. Each animal species plays its role in maintaining a balance and equilibrium on earth. When an entire species becomes extinct, this equilibrium is interrupted and has a negative impact on the environment.

h) Preventing the Ozone layer

The Ozone layer[46] serves as the protective layer of the earth. Allah protects the earth with this layer and people's actions are tearing through this protective layer. Neutralizing toxic gases and radiation is required of us if we wish to protect this protective ceiling. Allah says, '*And We made the sky a protected ceiling, but they are, from its signs, turning away.*'[47] Allah also states, *'It is Allah who made the earth a place of settlement and made the sky a ceiling and formed you and perfected your forms, and provided you with good things. That is Allah your Lord, then blessed is Allah Lord of the worlds.*'[48]

On account of being the earth the source and place of our livelihood, we should protect the earth and environment. Otherwise it leads to corruption and destruction of that. Islam describes such a person as a source of corruption of the earth and environment. Allah says, '*And when he turns away, he strives throughout the land to cause corruption therein and destroy crops and animals. And Allah does not like corruption.*'[49]

Islam is a religion of balance, peace and security that commands all to obey Allah. Therefore, preserving the environment and nature is a great part of duties of human beings.

i) Land Reclamation

Islam has some directions to reclaim the fallow and uncultivable lands. Prophet Muhammad (SM) said, '*Whosoever brings dead land to life, for him is a reward in it, and whatever any creature seeking food eats of it shall be reckoned as charity from him.*'[50]

This testifies the importance the Prophet in the early days of Islam has given to reclamation of land and the equal rights of all Allah's creatures to benefit from the resources of earth.

Conclusion and suggestion

From the above discussion, it can be said; analysis made in this article relating to the protecting environment and nature in the light of Islam. Islam evaluates nature with great importance, while it prefers to preserve the environment before it becomes polluted. Rather than cure of something Islam always takes the action of protection. Islam considered the environmental pollution as a failure of responsibility of human

being, as he is the vicegerent of Allah on the Earth. Islam gives inspiration on ethical discussion and moral responsibilities in such case and a huge accountability to Allah in hereafter, which assures a remarkable punishment. Every Muslim believes in the doomsday, it is more logical that they must abide by these moral lessons. Islam describes a lot of principles and moral values to prevent environment crisis. For solving the crisis and raising people's awareness we would like to suggest below:

1. To be responsible of everyone as a vicegerent of Allah on the earth.
2. To spread environmental awareness using social networking, such as Face book, Twitter, YouTube, Google etc.
3. To start a campaign in school, college, university or workplace for environmental awareness.
4. To open a fund for plantation by students, faculty members and co-workers.
5. To implant around of home, school and workplace.
6. To raise religious feelings among people.
7. To protect nature and the environment for present and future generations.

On the above suggestions, it's said that the protection of the environment directly or indirectly assists in promoting quality of life. Environmental awareness and protection of natural resources is an integral part of Islamic beliefs. Harming others and environment is prohibited in Islam, the rights of others are infringed while the well-being of future generations is compromised. Conservation of nature and the environment is the duty of all people and is a religious duty of Muslims. Also mankind can be questioned in the Day of Resurrection on account of their duties. In essence of all arguments, it can be said that this article has placed its discussion successfully in order to establish important duties of human beings towards environment and nature. But it is also true that the basic environmental and natural duties and responsibilities have originated from Islam.

End Notes and References

[1] Al-Qur'an, Surah al-Baqarah, 2: 30; Surah swad, 38: 26.

[2] Dr. Wahabatuz Zuhaili, *At-Tafsirul Munir*, v 27 (Demasqas: Darul Fikril Muasir, 1418 H), P. 144.

[3] *Encyclopedia of Islam*, v 3 (New Delhi: Commonwealth publishers, 2005), P. 432.

[4] Allah says, By the dawn. Cf: Surah al-Fajr, 89: 01.

[5] Allah says, By the fig and the olive. Cf: Surah at-Tin, 95: 01.

[6] Allah says, By the time. Cf: Surah al-Asr, 103: 01.

---

[7] Surah al-Ambiya, 21: 79.

[8] Surah al-Isra, 17:44.

[9] Surah al-Baqarah: 2: 164.

[10] Surah al-Araf, 7 : 56; 7: 85.

[11] Surah al-Baqarah: 2: 205.

[12] Surah al-Araf, 7:31.

[13] Surah al-An'am, 6:141.

[14] Surah al-Isra, 17:27.

[15] Surah al-Mumin, 40:43.

[16] Surah al- Shu'ara, 26:151-52.

[17] Ibn Majah, *As-Sunan*, Number of Hadith, 425.

[18] Surah al-Araf, 7:58.

[19] Surah al-Baqarah, 2:195.

[20] Surah al-Qasas, 28:77.

[21] Surah Hood, 11:61.

[22] Abul Qasem at Tibrani, *al-Mujamul Kabir*, V 5 (Cairo: Maktaba Ibn Taimia, 1994), Number of Hadith 4596, P 65.

[23] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-M'jam al-Mufharas Li Alfazil Qu'anil Karim* (Cairo: Darul Hadith, 2001), P 779-80.

[24] Burhanuddin al-Maginani said, 'water has three characteristics. Those are colorless, odorless and tasteless. Cf: *al-Hidaya*, V 1 (Bairut: Daru Ihyait Turathil Arabi), P 20.

[25] Muhammad Ibn Ismail al- Bukhari, *As-Sahih*, Number of Hadith, 239; Muslim Ibnul Hajjaj al-Qushairi, *As-Sahih*, Number of Hadith 94, 95, 96, 97.

[26] Muhammad Ibn Easa al-Tirmizi, *Al-Zami'*, Number of Hadith, 57.

[27] Surah al-Ambiya, 21:30; Surah an-Nur, 24:45.

[28] Surah al-Hajj, 22:63.

[29] Surah al-An'am, 6:99.

[30] Surah al-Fatir, 35:9.

[31] *Sahih al-Bukhari*, Number of Hadith, 855.

[32] Surah Luqman, 31:19.

[33] Al-Husain Ibn Masud Al-Baghabi, *M'alimut Tanjhil*, V 6 (Cairo: Daru Taiyaba), P 289.

[34] Abul Hasan An-Nadawi, *As-Siratun Nababiyah* (Demasqas: Daru Ibn Kathir, 1425H), P 518.

[35] Ahmad Ibrahim, *Makka wal Madina* (Bairut: Darul Fikril Arabi, 1425), P 101.

[36] As-Sahih Li Muslim, Number of Hadith, 07, 08, 10.

[37] Sulaiman Ibnul Ash`as As-Sijistani, *As-Sunan*, Number of Hadith, 5241.

[38] Sunanu Abi Daud, Number of Hadith, 5239.

[39] Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurtubi, *Al-Jami Li Ahkamil Qur'an*, V 17 (Cairo: Darul Kutubil Misriah, 1964), P 97.

[40] Surah al-An'am, 6:38.

---

[41] *As-Sahih Li Musli*, Number of Hadith, 133, 134, 135, 2619.

[42] *As-Sahih Li Muslim*, Number of Hadith, 4956; Abu Daud At-Tayalisy, *Al-Musnad*, Number of Hadith, 1984.

[43] *As-Sahih Li Muslim*, Number of Hadith, 4953, 4956.

[44] *Sahihul Bukhari*, Number of Hadith, 2363, 2466, 6009.

[45] *As-Sahih Li Muslim*, Number of Hadith, 1955, 4949; *Sunanu Abi Daud*, Number of Hadith, 2815; Ahmad Ibn Shuaib An-Nasaei, As-Sunan, Number of Hadith, 4412.

[46] A S Hornby said, 'A layer of ozone high above the earth's surface that helps to protect the earth from the sun's harmful rays.' Cf: *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Oxford: University Press, 2003), P 946.

[47] Surah al-Ambia, 21:32.

[48] Surah al-Mu'min, 40:64.

[49] Surah al-Mu'min, 2:205.

[50] *Sahihul Bukhari*, Number of Hadith, 6009.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

‘উমরার বিধানাবলী: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান*

Abstract: ‘Umrah is a significant worship (Ibadat) of Islam. In technical term, ‘Umrah is an Islamic pilgrimage to Mecca, the holiest city for Muslims. Sometimes it refers to visit or to travel a populated place. It is a combination of some works, namely Ihram, Tawaf, Sayee and Shave the Head. Every Muslims can perform the ‘Umrah as his desires at any time over the year. ‘Umrah’s significance in Ramadan is more important rather than other months. According to the description of the Hadith, the significance of ‘Umrah in Ramadan is equal to Hajj. By performing ‘Umrah, sin is forgiven, poverty is removed and livelihood is increased. ‘Umrah is wajib to every Muslims. It is not obliged but encouraged to do. There has a lots of benefits and virtues (fazilat) of ‘Umrah at Hadith. Islam teaches us rules and regulations of every works. Likewise, Islam focuses some provisions of ‘Umrah. It is important to obey these provisions properly. Different provisions of ‘Umrah have been flourished in this article in a rational manner.

ভূমিকা

হজ্জের ন্যায় ‘উমরাও মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘ইবাদত। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর জীবনে একবার ‘উমরা পালন করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ‘উমরা করার প্রতি উৎসাহিত ও গুরুত্ব প্রদান করে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ‘উমরার ফরয দুটি। যথা, ইহ্রাম বাঁধা ও তাওয়াফে যিয়ারত। ‘উমরার ওয়াজিব দুটি। যথা, সাফা মারওয়ার সা‘ঈ বা প্রদক্ষিণ করা এবং মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছোট করা। ‘উমরার সুন্নাত তিনটি। যথা, হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া অথবা ইস্তিলাম করা, তাওয়াফ শেষে দুরাকাআত নামায আদায় করা এবং যমযমের পানি পান করা। ‘উমরার বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিশুদ্ধ নিয়ম ব্যতীত যদি কেউ ‘উমরা পালন করে তাহলে তার ‘উমরা নষ্ট বা ফাসিদ হয়ে যাবে। তাই ‘উমরার সঠিক বিধানাবলী জানার জন্য আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করার চেষ্টা করেছি। আশা করছি প্রবন্ধটি দ্বারা প্রত্যেক মুসলমান ‘উমরার বিধানাবলী সম্পর্কে কিছুটা হলেও জ্ঞাত হবেন ও উপকার লাভ করবেন। আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের সকলকে ‘উমরার বিধানাবলী সঠিক নিয়মানুসারে পালন করার তাওফীক দান করুন।

‘উমরার পরিচয়

‘উমরা শব্দটি একবচন, বহুবচনে عمرات، عمر। ‘উমরা শব্দের আভিধানিক অর্থ اَلزِّيَارَةُ অর্থাৎ সফর করা, ভ্রমণ করা, তীর্থযাত্রা।[১] ‘আরবী ভাষায় ‘উমরা শব্দের অর্থ হলো, জনবহুল স্থানে ভ্রমণ করা।

শরী‘আতের পরিভাষায়, বিশেষ নিয়মে তথা ইহ্রামসহ কা‘বা ঘরের তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা‘ঈ করাকে ‘উমরা বলা হয়।

ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্যরা বলেন,

الْعمرَة: نسك كَالْحَجِّ لَيْسَ لَهُ وَقت معِين وَلَا وقُوف بِعَرَفَة

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

"উমরা হলো হজ্জের ন্যায় কতিপয় কার্য সম্পাদন করা, কিন্তু তা আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই এবং 'আরাফাতে অবস্থানও নেই।"[২]

ইব্ন মানযূর আল-ইফরীকী (র) বলেন,

زِيَارَةُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِالشُّرُوطِ الْمَخْصُوصَةِ الْمَعْرُوفَةِ.

"নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক শর্তের আলোকে বায়তুল হারাম যিয়ারত করার নাম 'উমরা।"[৩]

শায়খ সালিহ্ আল-উছায়মীন (র) বলেন,

اَلتَّعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفاء والمروة والحلق أو التقصير.

"বায়তুল্লাহ্, সাফা-মারওয়া তাওয়াফ এবং মাথার চুল মুণ্ডন করা কিংবা চুল ছোট করার মাধ্যমে আল্লাহ্র 'ইবাদত করাকে 'উমরা বলে।"[৪]

আস্-সাইয়্যেদ সাবিক (র) বলেন,

والمقصود بها هنا زيارة الكعبة والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير.

"কা'বার ভ্রমণ, এর চারপাশে তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ এবং চুল মুণ্ডন করাসহ পুরো কর্মসূচিকে 'উমরা বলা হয়।"[৫]

অতএব এক কথায় বলা যায়, হজ্জের নির্দিষ্ট দিনগুলো অর্থাৎ আট যিলহজ্জ থেকে তের যিলহজ্জ সময় ব্যতীত শরী'আতের নির্ধারিত পন্থায় ইহ্রাম অবস্থায় নিয়্যাত করে কা'বা গৃহ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়া সা'ঈ করার পর মাথার চুল মুণ্ডন অথবা ছোট করে ইহ্রাম মুক্ত হওয়াকে 'উমরা বলে।

'উমরার সময়

বছরের যে কোনো সময় অর্থাৎ দিনে বা রাতে 'উমরা করা যায়। তবে যিলহজ্জ মাসের ৯ থেকে ১৩ তারিখ এই পাঁচ দিন ব্যতীত। এই পাঁচদিন হলো, আইয়ামে তাশরীকের দিন। এ দিনগুলোতে 'উমরা পালন করা নিষিদ্ধ। আস্-সাইয়্যেদ সাবিক (র) বলেন,

ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة. فيجوز أداؤها في يوم من أيامها. وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة. وذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة، وثلاثة أيام بعده، واتفقوا على جوازها في أشهر الحج.

"অধিকাংশ 'আলিমের মতে, সারা বছরই 'উমরার সময়। তাই বছরের যে কোনো সময়ে তা আদায় করা জায়েয। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, 'আরাফার দিন, ১০ যিলহজ্জ এবং আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন 'উমরা করা মাকরূহ্। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে, 'আরাফার দিন ও পরবর্তী তিন দিন 'উমরা আদায় করা মাকরূহ্। হজ্জের মাসে 'উমরা আদায়ের ব্যাপারে সবাই একমত।"[৬]

'ইকরামা (র) বলেন, "আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (র)-কে হজ্জের পূর্বে 'উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, হজ্জের পূর্বে 'উমরা আদায়ে কোনো বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের পূর্বে 'উমরা করতেন।"

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। 'আইশা (রা) ঋতুবতী অবস্থায় বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জ ও 'উমরার সকল কাজ সম্পন্ন করেছেন। পবিত্র হওয়ার পর তিনি তাওয়াফ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল্

(সা)! আপনারা হজ্জ ও ‘উমরা দুটোই করে আসলেন। আর আমি শুধু হজ্জ করে আসব নাকি? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ‘আব্দুর রহমানকে (‘আইশার সহোদর) আদেশ দিলেন ‘আইশার সাথে তানঈম পর্যন্ত যেতে। তারপর তিনি যিলহজ্জ মাসের মধ্যেই হজ্জের পর ‘উমরা করলেন।

‘উমরার সর্বোত্তম মাস ও সময় রমযান মাস। এ মাসে একটি ‘উমরা করলে একটি হজ্জের সমান সাওয়াব পাওয়া যায়। ‘আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ

“রমযানের মধ্যে ‘উমরা করা একটি হজ্জের সমান।”[৭]

অর্থাৎ রমযান মাসে একটি ‘উমরা আদায় করলে একটি নফল হজ্জের সমান সাওয়াব পাওয়া যায়। তবে এর দ্বারা ফরয হজ্জের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না।

‘উমরা সম্পর্কে শরী‘আতের বিধান

হানাফী ও মালিকী মাযহাব মতে, ‘উমরা আদায় করা সুন্নাত। জাবির (রা) বলেছেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ العُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ.

“নবী (সা)-কে ‘উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, এটি কি ওয়াজিব? তিনি উত্তরে বললেন, না।”[৮]

শাফি‘ঈ ও হাম্বলী মাযহাব মতে, ‘উমরা আদায় করা ফরয। কারণ আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন,

وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ

“তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ ও ‘উমরা পূর্ণ করো।”

এ আয়াতটি দ্বারা হজ্জ ফরয হওয়ার পাশাপাশি ‘উমরা ফরয হওয়ার ব্যাপারেও অধিকাংশ সাহাবী ও ওলামায়ে কিরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

উপর্যুক্ত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র) উল্লেখ করে বলেছেন যে, ‘উমরা সম্পর্কে এমন কোনো বিশুদ্ধ হাদীস নেই, যা থেকে এটি নফল প্রমাণিত হয়। ইমাম তিরমিযী (র) উপর্যুক্ত হাদীসটি সম্পর্কে বলেন,

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: العُمْرَةُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَكَانَ يُقَالُ: هُمَا حَجَّانِ الحَجُّ الأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ، وَالحَجُّ الأَصْغَرُ العُمْرَةُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: العُمْرَةُ سُنَّةٌ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَخَّصَ فِي تَرْكِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ثَابِتٌ بِأَنَّهَا تَطَوُّعٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الحُجَّةُ، وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا: كُلُّهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ.

“এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কোনো কোনো ‘আলিমের মতে, ‘উমরা ওয়াজিব নয়। এ কথাও বলা হতো যে, হজ্জ হলো দুটি। কুরবানীর দিন হলো বড় হজ্জ এবং ‘উমরা হলো ছোট হজ্জ। ইমাম শাফি‘ঈ (র) বলেন, ‘উমরা হলো সুন্নাত (প্রতিষ্ঠিত ইবাদত)। আমার জানা মতে তা পরিত্যাগের কেউ অবকাশ দেননি। এটি নফল হওয়া সম্পর্কেও কোনো প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ নেই। নবী করীম (সা) থেকে এটি নফল বলে যে হাদীস বর্ণিত আছে তা য‘ঈফ এবং তা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা জ্ঞাত হয়েছি যে, ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) ‘উমরা আদায় করা ওয়াজিব মনে করতেন।”[৯]

‘উমরার হুকুম

প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর জীবনে একবার ‘উমরা পালন করা ওয়াজিব।[১০] ইব্ন ‘উমার (রা) বলেন,

لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ.

“প্রত্যেকের জন্য হজ্জ ও ‘উমরা অবশ্যই পালনীয়।”

ইব্ন ‘আব্বাস (রা) বলেন, “আল-কুরআনে হজ্জের সাথে ‘উমরার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।” আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন,

وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ

“তোমরা আল্লাহ্র জন্য হজ্জ ও ‘উমরা পূর্ণ করো।”

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহুল-বুখারী গ্রন্থে ‘উমরা আদায় করা ওয়াজিব ও তার ফযীলাত’ শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংকলন করেছেন।”

‘আইশা (রা) বলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

“হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! মহিলাদের উপর কি কোনো জিহাদ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের উপর জিহাদ রয়েছে; তবে তা পরস্পর যুদ্ধ করে নয়; বরং হজ্জ ও ‘উমরা আদায়ই তাদের জিহাদ।”[১১]

আবূ রাযীন আল-‘উকায়লী (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকটে এসে বললেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

“হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমার পিতা খুবই বৃদ্ধ হয়ে গেছে। হজ্জ ও ‘উমরা করা এবং চলাচল করার সক্ষমতা তার নেই। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ ও ‘উমরাহ্ সম্পাদন করো।”[১২]

‘উমরার ফযীলাত

হজ্জের ন্যায় ‘উমরারও বহু ফযীলাত রয়েছে। উক্ত হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ‘উমরা করার প্রতি উৎসাহিত ও গুরুত্ব প্রদান করে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ.

“আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, এক ‘উমরা অপর ‘উমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।”[১৩]

عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

“উম্মু মা‘কিল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, রমযান মাসে ‘উমরা আদায় করা হজ্জের সমতুল্য।”[১৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ.

‘আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস‘ঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, “তোমরা হজ্জ ও ‘উমরা সাথে সাথে আদায় করবে। কেননা হজ্জ ও ‘উমরা উভয়ই গুনাহ্ এবং দারিদ্র দূর করে সেভাবে, যেভাবে হাপর লোহা এবং সোনা-রূপার ময়লা দূর করে। আর হজ্জে মাবরূর আর এর একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত।”[১৫]

ইব্‌ন ‘উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ، وَفْدُ اللَّهِ، دَعَاهُمْ، فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ

“আল্লাহ্র রাস্তায় গাযী, হজ্জ ও ‘উমরাহ্ পালনকারী আল্লাহ্র প্রতিনিধি স্বরূপ। তারা দু‘আ করলে তাদের দু‘আ কবুল করা হয়। তারা কিছু প্রার্থনা করলে তা প্রদান করা হয়।”[১৬]

একাধিকবার ‘উমরা করার বিধান

সামর্থ্যবান ব্যক্তি একাধিকবার ‘উমরা করতে পারবে। তবে বছরে কয়টি ‘উমরা আদায় করা যাবে এ সম্পর্কে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। নাফি‘ (র) বলেন,

اعْتَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَعْوَامًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عُمْرَتَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ

“আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ‘উমার (রা) ইব্‌ন যুবায়রের আমলে বহু বছর পর্যন্ত বছরে দুটি করে ‘উমরা করতেন।”[১৭]

কাসিম (র) বলেন,

أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقُلْتُ: هَلْ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَحَدٌ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ.

“আইশা (রা) এক বছরে তিনটি ‘উমরা করেছেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, এতে কেউ কি তাঁর প্রতি দোষারোপ করেছেন? কাসিম (র) বললেন, সুবহানাল্লাহ্! তিনি না উম্মুল মু’মিনীন?”[১৮]

এজন্য অধিকাংশ ‘আলিমের মতে,

وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وكره مالك تكرارها فى العام أكثر من مرة

“একাধিকবার ‘উমরা করায় দোষের কিছু নেই। তবে ইমাম মালিক (র) বছরে একবারের বেশি ‘উমরা আদায় করাকে মাকরূহ মনে করেন।”[১৯]

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা শর্তে জীবনে একবার ‘উমরা পালন করা সুন্নাত। এক বছরে একাধিকবার ‘উমরা পালন করা জায়েয। ‘উমরাকে হজ্জে সোগরা অর্থাৎ ছোট হজ্জ বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ‘উমরার সংখ্যা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বমোট কতটি ‘উমরা করেছেন এ সম্পর্কে ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বারটি ‘উমরা করেছেন। প্রথমটি হুদায়বিয়ার ‘উমরা, দ্বিতীয়টি ‘উমরাতুল কাযা, তৃতীয়টি জিরান থেকে এবং চতুর্থটি তাঁর হজ্জের মাসে।[২০]

‘উমরার ফরয

হজ্জের ফরয দুটি। যথা, ইহ্রাম বাঁধা ও তাওয়াফে যিয়ারত।

‘উমরার ওয়াজিব

‘উমরার ওয়াজিব দুটি। যথা, সাফা মারওয়ার সা‘ঈ বা প্রদক্ষিণ করা এবং মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছোট করা।

‘উমরার বিধানাবলী

‘উমরা একটি স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমধর্মী ‘ইবাদত। ‘উমরা আদায়ের জন্য ব্যক্তিকে কতিপয় বিধান মেনে ‘উমরার কার্যাবালী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হয়। ‘উমরার বিধানাবালীসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

১. ইহ্রাম বাঁধা

ইহরাম অর্থ নিষিদ্ধ করা, কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা, নিষিদ্ধ মাসে প্রবেশ করা ইত্যাদি। পরিভাষায় ইহ্রাম হলো হজ্জের নিয়্যাতে নির্দিষ্ট কাপড় পরিধান করা।[২১] অন্যভাবে বলা যায়, হাজী যখন ইহ্রাম বেঁধে হজ্জ অথবা ‘উমরা অথবা উভয়টি আদায় করার নিয়্যাতে তালবিয়া পড়ে তখন তার উপর কতিপয় হালাল এবং মুবাহ্ কাজও ইহ্রামের কারণে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এজন্যই একে ইহ্রাম বলা হয়। ইহ্রাম অবস্থায় হাজীগণ যে চাদর ব্যবহার করে একেও রূপক অর্থে ইহ্রাম বলে। যিনি ইহ্রাম বাঁধেন তাকে মুহ্রিম বলা হয়।

ইহ্রামের উদ্দেশ্য হলো হজ্জের নিয়্যাতে নির্দিষ্ট স্থান থেকে এক ধরনের বিশেষ পোশাক (সেলাই বিহীন লুঙ্গী ও চাদর) পরে নগ্ন মস্তকে, সুগন্ধি অলংকার ইত্যাদি না পরে, স্ত্রী সম্ভোগ ও কামোত্তেজনার বশবর্তী না হয়ে, পার্থিবতাকে পরাভূত করে একাগ্র চিত্তে নিজেকে আল্লাহর দাসে পরিণত করে, ‘লাব্বাইক’ ধ্বনি দিয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া।[২২]

ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা সুন্নাত। যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন,

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ.

“তিনি নবী করীম (সা)-কে ইহ্রাম বাঁধার উদ্দেশ্যে (সেলাই করা) পোশাক খুলে ফেলতে ও গোসল করতে দেখেছেন।”[২৩] ইহ্রাম পরিধানের পূর্বে শরীরে ও দাঁড়িতে সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত।

গোসল, উযূ ও সুগন্ধি ব্যবহার করার পর পুরুষ ব্যক্তি একখণ্ড সেলাইবিহীন সাদা কাপড় তহবন্দ হিসেবে এবং একখণ্ড অনুরূপ কাপড় চাদর হিসেবে পরিধান করবে। ইব্ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘নবী করীম (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ চুল আঁচড়িয়ে, তেল মেখে, লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) মদীনা থেকে রওয়ানা দিতেন। তিনি কোনো প্রকার লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করতে নিষেধ করেননি। তবে শরীরে চামড়া রঞ্জিত হয়ে যেতে পারে এরূপ জাফরানী রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। ইব্ন ‘উমার (রা) বলেছেন,

أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الحَرَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ الحَرَامُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ.

“এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে ইহ্‌রাম অবস্থায় কোন্ ধরনের পোশাক পরিধান করার নির্দেশ দেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, জামা, পায়জামা, টুপি, পাগড়ী ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কারো জুতা না থাকলে সে চামড়ার মোজা পরিধান করবে, যা পায়ের গোছার নিচে থাকে। সে জাফরান রংয়ে রঞ্জিত কোনো পোশাক পরতে পারবে না। ইহ্‌রামধারী মহিলারা মুখ ঢাকবে না এবং হাতে মোজা পরিধান করবে না।”[২৪]

মহিলারা যে কোনো ধরনের শালীন পোশাকে ইহ্‌রাম বাঁধতে পারবে। তবে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণকারী কোনো রঙ্গিন বা সৌন্দর্য খচিত পোশাক পরতে পারবে না। ‘আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ , أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلَا تَتَبَرْقَعُ , وَلَا تَلَثَّمُ وَتُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ.

“মুহরিম মহিলা ইচ্ছামত কাপড় পরিধান করতে পারে। তবে ওয়ারস ও জাফরান রং মিশ্রিত কাপড়, বোরকা, নেকাব পরিধান করবে না এবং (পর পুরুষের সামনে) যে কোনো কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবে।”[২৫] এক্ষেত্রে তারা অলঙ্কার, সাজ-সজ্জা প্রকাশ করবে না, হাত মোজা পরিধান করবে না, নিকাব দিবে না।[২৬]

২. কা‘বা গৃহ তাওয়াফ করা

‘উমরার দ্বিতীয় ফরয হলো কা‘বা গৃহ তাওয়াফ করা। তাওয়াফ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পরিদর্শন বা প্রদক্ষিণ। ইসলামী পরিভাষায়, নির্দিষ্ট নিয়মাবলী মেনে, নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পবিত্র কা‘বা ঘরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলে।

অপর ভাষায় কা‘বা গৃহের হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে সেখান থেকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে চারিদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করার নামই তাওয়াফ। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.

“সেই সময়কে স্মরণ কর যখন কা‘বা গৃহকে মানবজাতির মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তা স্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে নামাযের স্থান রূপে গ্রহণ কর এবং ইবরাহীম ও ইসমা‘ঈলকে তাওয়াফকারী, ই‘তিকাফকারী, রুকূ‘ ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।”[৪৬]

কা‘বা গৃহ তাওয়াফ ‘উমরার অন্যতম ফরয বা রুক্ন। কোনো ‘উমরাকারী যদি এটি করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার ‘উমরা বাতিল হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

“তারা যেন প্রাচীন গৃহটি তাওয়াফ করে।”[২৭]

এ তাওয়াফকে তাওয়াফে ইফাযাহ্ বলা হয়।”[২৮]

তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে নামাযের মত দুহাত উঁচু করে ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ ও ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ বলবে। ভিড়ের কারণে হাজরে আসওয়াদ চুমু দেয়া বা স্পর্শ করা সম্ভব না

হলে ইশারা করার মাধ্যমে তাওয়াফ শুরু করতে হবে। প্রত্যেক চক্করের সময় হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে পুনরায় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে হাত উত্তোলন করে হাতে চুমু দিয়ে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হবে। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحَجَرِ: وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ.

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্র কসম! কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে উঠাবেন, তখন তার দুটি চোখ থাকবে, যা দ্বারা তা দেখবে এবং তার একটি জিহ্বা হবে, যা দ্বারা তা কথা বলবে এবং যে তাকে ঈমানের সাথে চুম্বন করেছে তার জন্য সাক্ষ্য দিবে।"[২৯]

এই তাওয়াফের ফযীলাত অপরিসীম। 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ.

"যে ব্যক্তি কা'বা গৃহ তাওয়াফ করল এবং দুই রাক্'আত নামায আদায় করল, সে একজন গোলাম আযাদ করল।"[৩০] অপর বর্ণনায় আছে,

مَنْ طَافَ سَبْعًا، فَهُوَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ.

"যে ব্যক্তি সাতটি তাওয়াফ করল, সে যেন একটি দাস মুক্ত করল।"[৩১]

অপর হাদীসে আছে,

لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً.

"যে ব্যক্তি তাওয়াফের সময় যতবার পা উঠাবে বা নামাবে, ততবার আল্লাহ্ একটি গুনাহ্ ক্ষমা করবেন।"[৩২]

ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

"যে ব্যক্তি পঞ্চাশবার বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে সে তার মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে।"[৩৩]

তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করলে তার সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,

إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا.

"এই কোণদ্বয় স্পর্শ করলে সকল গুনাহ্ ঝরে যায়।"[৩৪]

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে,

أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط لو تركها الحاج بطل حجه.

"সাতটি থেকে চারটি চক্কর হজ্জের রুক্ন।"[৩৫]

এ চারটি বাদ দিলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। অবশিষ্ট তিন চক্কর রুক্ন নয়; কিন্তু ওয়াজিব। কেউ এই তিনটি বা তার কোনো একটি তরক করলে বা বাদ দিলে সে ওয়াজিব তরককারী হবে। তার হজ্জ বাতিল হবে না। তবে তাকে দম দিতে হবে।

অধিক সংখ্যক 'উমরার ফযীলাত বেশি না অধিক তাওয়াফের ফযীলাত বেশি

'উমরা ও তাওয়াফ দুটি ভিন্ন জিনিস। কারণ 'উমরার ফযীলাত 'উমরার জন্য। আর তাওয়াফের ফযীলাত তাওয়াফের জন্য নির্ধারিত। 'উমরার ফরযের মধ্যে ইহ্রাম বাঁধা ও তাওয়াফ করা আবশ্যক।

তাওয়াফ করার মধ্যে ইহ্রাম বাঁধার কোন প্রয়োজন নেই। যে কোন সময় কা'বা গৃহ তাওয়াফ করা যায়। তবে তাওয়াফেও 'উমরার ন্যায় দুই রাকাআত নামায পড়ার বিধান রয়েছে।

অনেককে দেখা যায় একের পর এক নফল তাওয়াফ করতেই থাকে। একটি তওয়াফ শেষ হলে তাওয়াফের দুই রাকাআত নামায পড়ে না। তাদের এ আমল দেখে মনে হয়, শুধু ফরয ও ওয়াজিব তাওয়াফের পরই এ দুই রাকাআত নামায পড়তে হয়। এ ধারণা ভুল। ফরয ও ওয়াজিব তাওয়াফের মত নফল তাওয়াফের পরও দুই রাকাআত নামায পড়া ওয়াজিব এবং বিনা ওযরে একাধিক তাওয়াফের নামাযকে একত্রে পড়া মাকরূহ।[৩৬]

মক্কার হারামে অবস্থানকারীদের জন্য নফল 'ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো কা'বা গৃহের তাওয়াফ। হাদীসে বর্ণিত আছে, 'কা'বার প্রতি সর্বদা ১২০টি রহমত অবতীর্ণ হতে থাকে। যারা তাওয়াফ করেন তাদের জন্য ৬০টি; যারা নফল নামায, তিলাওয়াত ও যিক্র ও 'ইবাদতে মশগুল থাকেন তাদের জন্য ৪০টি; যারা শুধু কা'বার দিকে তাকিয়ে থাকেন তাদের জন্য ২০টি। যে তিনটি জিনিস দেখলেই সাওয়াব পাওয়া যায় তা হলো (ক) কা'বা গৃহ, (খ) আল-কুরআন এবং (গ) মা-বাবার চেহারা।'

দিনে ও রাতে যতবার খুশি তাওয়াফ করা যায়। এতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু একদিনে একটির বেশি 'উমরা করা কঠিন। এজন্য মক্কায় থাকা অবস্থায় বেশি বেশি করে তাওয়াফ করলে বহু সংখ্যক সাওয়াব লাভ করা যায়। অতএব বেশি 'উমরা করলে তার জন্য আলাদা সাওয়াব পাওয়া যাবে। আর বেশি তাওয়াফ করলে তার জন্য ভিন্ন সাওয়াব লাভ করা যাবে।

৩. মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাক্আত নামায

'উমরাকারীকে কা'বা গৃহ তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাক্আত নামায পড়তে হবে। অবশ্য ভিড়ের কারণে অনেক সময় মাকামে ইবরাহীম বরাবর নামায পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন একটু দূরে সরে গিয়ে মসজিদুল হারামের সুবিধাজনক যে কোনো স্থানে এই নামায পড়লেও হবে। 'আলিমগণের কেউ কেউ এ নামাযকে ওয়াজিব বলেছেন। আবার কারো কারো মতে তা নফল। 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন 'উমার (রা) বলেছেন,

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় এলেন এবং সাতবার কা'বার তাওয়াফ করলেন, মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুরাক্আত নামায আদায় করলেন এবং সাফার দিকে বের হলেন। আর বললেন, 'তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।"[৩৭]

এই নামাযের প্রথম রাক্আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন, দ্বিতীয় রাক্আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়া উত্তম। জাবির ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ (রা) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قَرَأَ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ عَادَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে তিলাওয়াত করলেন, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.। এরপর দুই রাক্আত নামায আদায় করেন। তিনি সূরা ফাতিহা, সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করেন। পরে আবার হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তাকে চুম্বন করেন। তারপর সাফা পাহাড়ের দিকে যান।"[৩৮]

৪. যম্যম[৩৯]-এর পানি পান

মাকামে ইবরাহীমে দুই রাক্আত নামায শেষ করে যম্যমের পানি পান করা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যম্যমের পানি পান করার পর বললেন,

إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ, إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ.

"এটি বরকতময়, তৃপ্তিদায়ক ও রোগ নিরাময়কারী।"[৪০]

জিবরাঈল (আ) মি'রাজের রাতে এই পানি দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হৃদয় ধুয়ে দিয়েছিলেন।

ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ.

"পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম পানি হচ্ছে যম্যমের পানি। এতে রয়েছে খাদ্যের স্বাদ ও রোগ নিরাময়।"[৪১]

মুজাহিদ (র) বলেন, 'যম্যমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় সে উদ্দেশ্য সফল হয়। আপনি যদি রোগ থেকে আরোগ্য লাভের নিয়্যাতে তা পান করেন, তাহলে আল্লাহ্ আপনাকে আরোগ্য দান করবেন। তৃষ্ণায় আপনি তা পান করলে তিনি আপনার পিপাসা নিবারণ করবেন। ক্ষুধায় আপনি তা পান করলে আল্লাহ্ আপনার ক্ষুধা নিবারণ করবেন। এটি হলো জিবরাঈল (আ)-এর পায়ের গোড়ালির আঘাতে উৎসারিত পানি এবং ইসমা'ঈল (আ)-এর তৃষ্ণা নিবারণকারী পানীয়।'[৪২] জাবির ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مَاءُ زَمْزَمَ، لِمَا شُرِبَ لَهُ

"যম্যমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে তা পূর্ণ হবে।"[৪৩]

যম্যমের পানি পানের নিয়ম

যম্যমের পানি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে এক নিঃশ্বাসে পান করা এবং পেট পুরে পান করা সুন্নাত। পান করার পর 'আল-হামদুলিল্লাহ্' বলতে হবে। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন,

سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যম্যমের পানি পেশ করলাম। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন।"[৪৪]

আবূ মুলায়কা (র) বলেন, এক ব্যক্তি ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা)-এর নিকট আগমন করলে, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোথা থেকে এসেছ?’ সে বলল, ‘যম্‌যমের পানি পান করে এলাম।’ তিনি বললেন, ‘যেভাবে যম্‌যমের পানি পান করা উচিত, সেভাবে পান করেছ তো?’ সে বলল, ‘কীভাবে?’ তিনি বললেন, ‘যখন যম্‌যমের পানি পান করতে চাইবে, তখন কিবলামুখী হবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিন নিঃশ্বাসে পেট ভরে পান করবে। তারপর আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে।’ কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ، إِنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ، مِنْ زَمْزَمَ.

“আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, তারা যম্‌যম থেকে পেট ভরে পানি পান করে না।”[৪৫]

ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) যম্‌যমের পানি পান করার সময় নিম্নোক্ত দু‘আ পড়তেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

“হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি উপকারী জ্ঞানের, পর্যাপ্ত রিযিকের এবং যাবতীয় রোগ থেকে আরোগ্য লাভের।”[৪৬]

ইবনুল কাইয়্যিম (র) (মৃত ৭৫১ হি.) বলেন,

سَيِّدُ المياه وأَشْرفُهَا وَأَجلُّهَا قَدراً وَأَحبُّهَا إِلَى النّفوس وَأغلاهَا ثمنًا.

“যম্‌যমের পানি হচ্ছে সর্বোত্তম পানি। এটি যেমন সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পানি, তেমনি তা মানুষের নিকট প্রিয়তর। এটি মানুষের নিকট সবচেয়ে মূল্যবান পানি।”[৪৭]

যম্‌যমের পানি দাঁড়িয়ে পান করার কারণ?

যমযম কূপের পানি আল্লাহ তা‘আলা প্রদত্ত একটি বিশেষ নি‘আমত। সাধারণত পানি বসে পান করা সুন্নাত। কিন্তু ইসলামী শরী‘আতের বিধান অনুযায়ী যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নাত। স্বাভাবিক নিয়মে পানি বসে পান সুন্নাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়টির প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) গুরুত্বারোপও করেছেন।

‘আইশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ قَائِمًا وَقَاعِداً.

“নবী করীম (সা) দাঁড়িয়ে ও বসে পান করেছেন।”[৪৮]

আনাস (রা) থেকে অপর হাদীসে বর্ণিত আছে, “নবী (সা) দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করাকে তিরস্কার করেছেন।”[৪৯]

আবূ হুরায়রাহ্ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, “তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পানি পান না করে।”[৫০]

দাঁড়িয়ে পানি পান করা সম্পর্কে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ قَائِمًا.

“নবী করীম (সা) দাঁড়িয়ে পান করেছেন।”[৫১]

'আইশা বিন্‌ত সা'দ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে,

رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا.

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখছি।"[৫২]

পানি দাঁড়িয়ে ও বসে উভয় অবস্থান পান করা যায়। এ সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস পাওয়া যায়। 'আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দাঁড়িয়ে ও বসে (উভয় অবস্থায়) পান করতে দেখেছি।"[৫৩]

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ থেকে নবী করীম (সা) কর্তৃক দাঁড়িয়ে ও বসে উভয় প্রকারের পানি পান করার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ সব হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করার জন্য ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, দাঁড়িয়ে পানি পান করার হাদীসগুলো ইসলামের প্রাথমিক যুগের। এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে পরে। সুতরাং দাঁড়িয়ে পানি পান সম্পর্কিত হাদীসগুলো রহিত (মানসূখ) হয়ে গিয়েছে। এসব হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবেও করা যেতে পারে যে, নবী করীম (সা) বৈধতা বর্ণনার জন্য কোন কোন সময় দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন। এ ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে তা শার'ঈ নির্দেশ বা হারামসূচক নির্দেশনা নয়; বরং পানাহারের নিয়ম হিসেবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে শুধু উত্তম নিয়ম-নীতি পরিত্যাগ বা 'মাকরূহ' বলা যেতে পারে।[৫৪] সুতরাং পানি বসে পান করা সুন্নাত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ বা সংশয় নেই।

এখন প্রশ্ন হলো যমযমের পানি বসে পান করা যাবে নাকি দাঁড়িয়ে পান করতে হবে- এ ব্যাপারে ইসলামী বিধানাবলী কী? ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন,

سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যম্‌যমের পানি পেশ করলাম। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন।"[৫৫]

এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে আরো বর্ণনা পাওয়া যায়। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, "যমযমের পানি যে জন্য পান করা হয়ে থাকে; তা সে জন্যই হবে। অর্থাৎ যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে তাই পূর্ণ হতে পারে।"[৫৬]

ফকীহ্‌গণের মতে, যমযমের পানি কিবলার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নাত বা মুস্তাহাব একটি আমল। তাই এটাকে খুব গুরুত্ব প্রদান করা বা আবশ্যক ভাবা ঠিক নয়। এছাড়া অনান্য ফকীহ্‌গণ বলেছেন, যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব নয়, বরং জায়েয।[৫৭]

যমযমের পানি রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে পান করেছেন, এ সম্পর্কে উপরে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা দলীল বর্ণিত হয়েছে। তাই যমযমের পানি দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে পান করা সুন্নাত। তবে অন্যান্য পানি যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসে পান করেছেন এবং বসে পান করতে বলেছেন তাই তা বসে পান করাই সুন্নাত। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে পানি পান করার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন।[৫৮] 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "তোমরা উটের ন্যায় এক চুমুকে পানি পান করো না; বরং দুই তিন চুমুকে পানি পান করো এবং যখন পান করবে তখন 'বিসমিল্লাহ' বলে পান করো এবং পান করার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বল।"[৫৯]

অতএব এ কথা বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেহেতু যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করছেন এবং করতে বলেছেন সেহেতু দাঁড়িয়ে পান করাই উত্তম। তবে কেউ যদি দাঁড়িয়ে পান করতে অক্ষম হয় অথবা অসুস্থতার কারণে হুইল চেয়ার বসে থাকে অথবা বসা থেকে উঠা কষ্টকর হয় সে ক্ষেত্রে সে বসেই যমযমের পানি পান করতে পারে।

যম্‌যমের পানি বহন ও উপহার প্রদান

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ ও ‘উমরা পালনকারীকে শুধু যম্‌যমের পানি পান করার কথাই বলেননি; বরং এ পানি বহন করে নিয়ে আসা ও উপহার হিসেবে প্রদান করার কথাও বলেছেন। এই পানি বহু মূল্যবান ও রোগ নিরাময়কারী। তাই এই পানি সবচেয়ে মূল্যবান উপহার। হাজীদের জন্য যমযমের পানির চেয়ে উত্তম উপহার আর কিছু নেই। ‘আইশা (র) বলেন,

أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ.

“তিনি (মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে) সাথে করে যম্‌যমের পানি নিয়ে আসতেন। তিনি অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও সাথে করে যম্‌যমের পানি আনতেন।”[৬০]

৫. সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা‘ঈ

‘উমরার ওয়াজিব দুটির মধ্যে সাফা ও মারওয়ার সা‘ঈ একটি। সা‘ঈ শব্দের অর্থ দৌড়ানো। ‘উমরা পালনকালে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যখানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাতবার দৌড়ানোকে সা‘ঈ বলে। সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সা‘ঈ করা সম্পর্কে ‘আলিমগণের পক্ষ থেকে তিনটি মতামত পাওয়া যায়।

এক. সাহাবীগণের মধ্যে ইব্ন ‘উমার, জাবির ও ‘আইশা (রা) এবং ইমাম মালিক, শাফি‘ঈ ও ইমাম আহমদ (র)-এর একটি মত অনুযায়ী সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা‘ঈ করা হজ্জের একটি রুক্ন তথা ফরয। কোনো হাজী এটি বাদ দিলে তার হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং কোনো কুরবানী বা দম দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ হবে না। এ মতের পক্ষে তাঁরা আল্লাহ্ তা‘আলার বাণীকে দলীল হিসেবে পেশ করেন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.

“নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কা‘বা গৃহের হজ্জ অথবা ‘উমরা সম্পন্ন করে, এই দুটির মধ্যে সা‘ঈ করলে তার কোনো পাপ নেই।”[৬১]

‘আইশা (রা) বলেছেন,

قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا.

“রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে তাওয়াফ চালু করেছেন। কাজেই সাফা ও মারওয়ার মাঝের তাওয়াফ (সা‘ঈ) বর্জন করার অধিকার কারো নেই।”[৬২]

‘আইশা (রা) থেকে অপর হাদীসে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

“যে সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করবে না, আল্লাহ্ তার হজ্জ পূর্ণ করবেন না।”[৬৩]

উপর্যুক্ত হাদীস দুটি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হজ্জ ও 'উমরা উভয়টিতেই বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফের সাথে সাথে সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করা অপরিহার্য কর্তব্য বা ফরয।

দুই. ইব্ন 'আব্বাস, আনাস, ইব্ন যুবায়র (রা), ইব্ন সিরীন ও ইমাম আহমাদ (র)-এর একটি বর্ণনা অনুযায়ী সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সা'ঈ করা সুন্নাত। এটি তরক করলে কোনো ফিদ্ইয়া বা কাফ্ফারা দেওয়া ওয়াজিব হবে না। তারা দলীল হিসেবে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করেন,

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.

"এই দুটির (সাফা ও মারওয়া) মধ্যে সা'ঈ করলে তার কোনো পাপ নেই।"[৬৪]

কোনো কাজের কর্তাকে এ কথা বলা যে, 'এই কাজ করলে আপত্তি নেই' প্রমাণ করে যে, ঐ কাজ ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। সুতরাং এ দ্বারা কাজটি 'মুবাহ্' অর্থাৎ করা ও বর্জন করা সমান। করলেও গুনাহ নেই, না করলেও গুনাহ্ নেই। তবে 'সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শন' এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাজটি সুন্নাত। যেহেতু এটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক 'ইবাদত, যা বায়তুল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাই কংকর নিক্ষেপের ন্যায় এটি রুক্নে পরিণত হয়নি।

তিন. ইমাম আবূ হানীফা, সুফইয়ান আছ্-ছাওরী ও হাসান (র)-এর মতে 'এটি ওয়াজিব, রুক্ন বা ফরয নয়। এটি তরক করলে হজ্জ বা 'উমরা বাতিল হবে না। তবে তরক করলে 'দম' অর্থাৎ একটি ছাগল কুরবানী করতে হবে।' ইব্ন কুদামাহ্ (র) এ মতটিকে অগ্রগণ্য করেছেন। তিনি বলেন,

وَهُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ دَلِيلَ مَنْ أَوْجَبَهُ دَلَّ عَلَى مُطْلَقِ الْوُجُوبِ، لَا عَلَى كَوْنِهِ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ.

"এটি অগ্রগণ্য। কেননা যিনি এটিকে ওয়াজিব বলে রায় দিয়েছেন, তার প্রদর্শিত প্রমাণ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, এটি শর্তযুক্ত ওয়াজিব। এমন ওয়াজিব নয় যে, এটি বাদ দিলে মূল দায়িত্ব পালিত হবে না।"[৬৫]

সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করার নিয়ম

সাফা পাহাড় থেকে সা'ঈ শুরু করতে হয়। সাফার নিকটবর্তী হয়ে আল-কুরআনুল কারীমের আয়াত পড়তে হবে,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন। এরপর সাফা পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে দৃষ্টিপাত করে 'আল্লাহু আকবার' বলে উভয় হাত উপরের দিকে কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে হবে।"[৬৬]

অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আটি তিনবার পড়তে হবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নাই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব ও কর্তৃত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নাই। তিনি একক, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভূত করেছেন।"[৬৭]

এরপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে নিজের জন্য এবং সকল মু’মিন-মুসলমানের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট মুনাজাত করতে হবে। এটিও দু‘আ কবুলের স্থান। এছাড়াও যে কোনো দু‘আ করাও বৈধ। এ স্থানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দু‘আ করতে হয়। এরপর যিক্‌র, দু‘আ ও কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে স্বাভাবিক গতিতে পায়ে হেঁটে হেঁটে মারওয়ার দিকে সা‘ঈ করতে হবে। একটু সামনে গেলে বাতনুল মাসীল (দুই সবুজ পিলারের মধ্যবর্তী স্থান) কিছুটা দৌড়ের ভঙ্গিতে অতিক্রম করতে হবে (মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবেন)। এরপর স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছবেন। মারওয়ায় পৌঁছলে এক সা‘ঈ সম্পন্ন হয়ে যাবে। সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে এই দু‘আটি পাঠ করবেন,

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِيْ السَّبِيْلَ الأَقْوَمَ.

“হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করো ও দয়া করো এবং আমাকে সর্বাপেক্ষা সঠিক পথে চালাও।’ এছাড়া অন্য একটি দু‘আও বর্ণিত আছে,

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمَ.

“হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করো ও দয়া করো। তুমি পরম সম্মানিত ও মহৎ।”[৬৮]

উপর্যুক্ত তাওয়াফ ও সা‘ঈ হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ তাওয়াফ ৮ যিলহজ্জের পূর্বে করলে ‘আরাফা, মিনা, মুযদালিফা, জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর ১০ থেকে ১২ যিলহজ্জের মধ্যে শুধু কা‘বা গৃহের তাওয়াফ করলে হজ্জ সম্পন্ন হয়ে যাবে। যারা পূর্বে তাওয়াফ করেননি তাদের জন্য ১০ থেকে ১২ যিলহজ্জের মধ্যে তাওয়াফ ও সা‘ঈ করা আবশ্যক। এর সাথে সাথে হজ্জের সকল কার্যাবলী সমাপ্ত হয়ে যাবে।

৬. মাথার চুল মুণ্ডন করা বা ছাঁটা

তাওয়াফ, মাকামে ইবরাহীমে নামায, যম্‌যম পানি পান ও সাফা মারওয়ায় সা‘ঈ করার পর মাথার চুল মুণ্ডন বা ছাঁটিয়ে খাটো করা ‘উমরার দ্বিতীয় ওয়াজিব। এ বিধান সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ.

“অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্নটি যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন। আল্লাহ চাহে তো তোমরা নিরাপদে তোমাদের মাথা মুণ্ডন করে এবং চুল ছেঁটে নির্ভয়ে মসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে।”[৬৯]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَالمُقَصِّرِينَ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، قَالَ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: وَالمُقَصِّرِينَ.

“আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ‘আল্লাহ্ মাথা মুণ্ডনকারীদের[৭০] উপর রহমত করেন।’ লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! যারা চুল কেটেছে, তাদের উপরও?’ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ‘আল্লাহ্ মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর রহমত করুন।’ লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! যারা চুল কেটেছে, তাদের উপরও?’ তিনি বললেন, আল্লাহ্ মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর রহমত করুন।

লোকেরা পুনরায় বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! যারা চুল কেটেছে, তাদের উপরও?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, যারা চুল কেটেছে, তাদের উপরও আল্লাহ্ রহমত করুন।"[৭১]

মাথা মুণ্ডন হলো ময়লা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর। পক্ষান্তরে চুল ছাঁটার মধ্যে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। সুতরাং তা (ছাঁটার তুলনায় মুণ্ডন করা) উযূর তুলনায় গোসলের সদৃশ হলো। হলকের ক্ষেত্রে মাথার চার ভাগের এক ভাগই যথেষ্ট হবে।"[৭২]

চুল ছাঁটার নিয়ম হলো চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুল পরিমাণ ছেটে ফেলা। এছাড়া মাথা মুণ্ডন করা হলো হালাল হওয়ার (অর্থাৎ ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হওয়ার) অন্যতম উপায়।

মহিলারা কেবল চুল খাটো করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদের মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।[৭৩] চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুল ছোট করতে হবে। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ.

"স্ত্রী লোকদের জন্য মস্তক মুণ্ডনের প্রয়োজন নেই; বরং তারা চুল (এক আঙ্গুল পরিমাণ) কর্তন করবে।"[৭৪]

৭. বিদায়ী তাওয়াফ

বিদায়ী তাওয়াফকে তাওয়াফুস্ সদরও বলা হয়। কেননা এটি হাজীদের মক্কা ত্যাগের সময় করতে হয়। এই তাওয়াফে কোনো রমল নেই। এটি মক্কা থেকে মক্কার বাইরে যাওয়ার জন্যে হাজীর করণীয় সর্বশেষ কাজ। যখন সে মক্কা থেকে বিদায় নিতে চায়, তখনই এটি করতে হয়।

যে সব 'উমরা ও হজ্জ যাত্রী হজ্জের পূর্বেই মদীনায় গমন করেছেন অথবা পরে মদীনায় গমন করে সেখান থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন তাদের সকলকে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

"লোকেরা (হজ্জের উদ্দেশ্য মক্কায় আগমনের পর তার হুক্‌ম আহ্‌কাম সমাপনান্তে তাওয়াফে যিয়ারতের পর) প্রত্যাবর্তন করত। তখন নবী করীম (সা) বলেন, তোমাদের কেউ যেন শেষবারের মতো বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ না করে (মক্কা থেকে) বিদায় গ্রহণ না করে।"[৭৫]

'আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجْتُ مَعَهُ تَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفْرِ الْآخِرِ فَنَزَلَ الْمُحَصَّبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ بَشَّارٍ قِصَّةَ بَعْثِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، قَالَتْ: ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرٍ فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَارْتَحَلَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهِ حِينَ خَرَجَ، ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ.

"আমি নবী (সা)-এর সাথে যিলহজ্জের তের তারিখে রওয়ানা হই। অতঃপর তিনি আল-মুহাস্‌সাব নামক স্থানে অবতরণ করেন। তারপর আমি আমার 'উমরা সম্পন্ন করে তার নিকট শেষ রাতে আগমন করি। তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণকে গমনের জন্য প্রস্তুত হতে ঘোষণা দেন এবং তারা মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে বায়তুল্লাহ্ গমন করেন এবং মদীনার দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। পরে তিনি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন।"[৭৬]

বিদায়ী তাওয়াফের পর সাফা ও মারওয়া সা‘ঈ করতে হবে না। তাওয়াফ শেষে দুই রাক্‌আত নামায আদায়ের পর পেট ভরে যম্‌যমের পানি পান করবেন এবং বিদায় বেলায় কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট মন খুলে দু‘আ করবেন। যেন আল্লাহ্ তা‘আলা শেষ বিচারের দিন এ ‘উমরার বদৌলতে ক্ষমা করেন।

উপসংহার

ইসলামের কোনো বিধানই অনুষ্ঠান সর্বস্ব নয়; বরং ইসলামের বড় থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটি বিধানের পশ্চাতে আল্লাহ্ তা‘আলা অভিপ্রেত নিগুঢ় তত্ত্ব ও প্রভুত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ‘উমরা ইসলামের ফযীলাত ও গুরুত্বপূর্ণ ‘ইবাদত। প্রবন্ধটিতে ‘উমরার বিধানাবলীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দলীল ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে ‘উমরার পরিচয়, সময়, ফরয, ওয়াজিব, হুকুম, ফযীলাত ইত্যাদি। ‘উমরার বিধানাবলীতে ইহ্‌রাম বাঁধা, তালবিয়া পাঠ করা, কা‘বা গৃহের তাওয়াফ করা, মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছাঁটা, মাকামে ইবরাহীমের পিছনে নামায আদায় করা, যম্‌যমের পানি পান, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা‘ঈ করা এবং বিদায়ী তাওয়াফ সম্পর্কিত বিধানাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবনে বেশ কয়েকবার ‘উমরা পালন করেছেন। উম্মাহাতুল মু’মিনীন (রা) ও সাহাবীগণ বহু সংখ্যক ‘উমরা আদায় করেছেন। ‘উমরার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তির পূর্বের গুনাহ্ দূরিভূত হয়। তাই প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের জন্য ‘উমরা আদায় করা ওয়াজিব। কেননা এর মধ্যে কল্যাণ নিহত রয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের সকলকে ‘উমরার সঠিক বিধানাবলী মেনে ‘উমরা আদায় করা তাওফীক দান করুন।

তথ্যনির্দেশ

১ আস্-সাইয়্যেদ সাবিক (র) বলেন, العمرة: مأخوذ من الاعتمار، وهو الزيارة

দ্র. আস্-সাইয়্যেদ সাবিক, *ফিক্‌হুস্-সুন্নাহ্*, ১ম খণ্ড (কায়রো: শিরকাতি মানার আদ্-দাওলিয়্যাহ্, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৭৬৩।

২ ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, *আল-মু‘জামুল-ওয়াসীত* (দিল্লী: কুতুব খানাহ্ হুসায়নিয়্যাহ্, তা.বি.), পৃ. ৬২৭।

৩ ইব্‌ন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল ‘আরাব*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারু ইয়াহ্ইয়াইত্ তুরাছিল ‘আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৬০১।

৪ শায়খ সালিহ্ আল-উছায়মীন, *আশ্-শারহুল মুমতি ‘আলা যাদিল মুসতানকি*, ৭ম খণ্ড (দারু ইবনিল জাওযী, ১৪২২ হি.), পৃ. ৫।

৫ *ফিক্‌হুস্-সুন্নাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬৩।

৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬৫।

৭ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (রিয়াদ: দারুস্-সালাম, ২য় সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), বাবু ‘উমরাতি ফী রামাযানা, হাদীস নং ১৭৮২।

৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘ঈসা আত্-তিরমিযী, *জামি‘উত্-তিরমিযী* (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্‌ন হাজার, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), বাবু মা জাআ ফিল ‘উমরাতি আওয়াজিবাতুন হিয়া আম লা?, হাদীস নং ৯৩১।

৯ *জামি‘উত্-তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬১।

১০ *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ১৭৭৩।

[11] মুহাম্মাদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযভীনি, *সুনানু ইব্ন মাজাহ্* (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্ন হাজার, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), হাদীস নং ২৯০১; আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ* (বৈরূত: দারুল-ফিক্র, তা.বি.), হাদীস নং ২৫৩৬১; *সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্*, হাদীস নং ৩০৭৪; সুনানু দারা কুতনী, হাদীস নং ২৭৪৮।

[12] সুলায়মান ইব্ন আশ'আস আস্-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাঊদ* (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্ন হাজার, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), হাদীস নং ১৮১০; *জামি' উত্-তিরমিযী*, হাদীস নং ৯৩০; আহমাদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ, *সুনানুন্ নাসাঈ* (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্ন হাজার, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), হাদীস নং ২৬২১, ২৬৩৭; *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, হাদীস নং ২৯০৬।

[13] *সহীহুল বুখারী*, বাবু ওজূবিল 'উমরাতি ওয়া ফাযলিহা, হাদীস নং ১৭৭৩; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূত: দারু ইব্ন হায্ম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), বাবুন ফী ফাযলিল হাজ্জি ওয়াল 'উমরাতি, ওয়া ইয়াওমিল 'আরাফা, হাদীস নং (১৩৪৯) ৪৩৭; *সুনানুন নাসাঈ*, ফাযলিল 'উমরা, হাদীস নং ২৬২৯; *জামি' উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফী ফাযলিল 'উমরাতি, হাদীস নং ৯৩৩।

[14] *জামি' উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফী ফাযলিল 'উমরাতি, হাদীস নং ৯৩৯; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং (১২৫৬) ২২১; *সুনানুন্ নাসাঈ*, হাদীস নং ২১১০।

[15] *জামি' উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফী সাওয়াবিল হাজ্জি ওয়াল 'উমরা, হাদীস নং ৮১০; *সুনানুন নাসাঈ*, ফাযলুল মুতাবিআতি বায়নাল হাজ্জি ওয়াল 'উমরা, হাদীস নং ২৬৩১।

[16] *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, বাবু ফাযলি দু'আই হাজ্জি, হাদীস নং ২৮৯৩; বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হাদীস নং ৩৮১৩; *সহীহ তারগীব ওয়াত্ তারহীব*, হাদীস নং ১১০৮।

[17] মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস আশ্-শাফি'ঈ, *মুসনাদু ইমাম আশ্-শাফি'ঈ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১৩৭০ হি./১৯৫১ খ্রি.), আল-বাবুছ ছামিন ফীমা জাআ ফিল 'উমরাতি, হাদীস নং ৯৮২।

[18] আল-বায়হাকী, *আস্-সুনানুস্ সাগীর*, হাদীস নং ১৭৩৯; আল-বায়হাকী, *আস্-সুনানুল কাবীর*, হাদীস নং ৮৭২৭; জুযউ সাদান, হাদীস নং ৩২; *হাদীসু সুফইয়ান ইব্ন 'উয়ায়নাহ্*, হাদীস নং ৫৫।

[19] *ফাত্ওয়া দারুল ইফতা লিল মিশর*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২১৬; *ফিক্হুস্ সুন্নাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬৪।

[20] পূর্বোক্ত।

[21] মুহাম্মদ ইব্ন সালিহ্, *মাজমূ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল*, ২৪শ খণ্ড (দারুল ওয়াতান, ১৪১৩ হি.), পৃ. ২৮৪।

[22] সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৩৫৮-৩৬০।

[23] *জামি' উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফিল ইগতিসালি 'ইনদাল ইহ্রাম, হাদীস নং ৮৩০।

[24] *জামি' উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফিমা লা ইজূঝু লিল মুহরিম লুবসুহু, ইগতিসালি 'ইনদাল ইহ্রাম, হাদীস নং ৮৩৩; *সহীহুল বুখারী*, বাবু মা ইউনহা মিনাত্-তীবী লিল-মুহ্রিমি ওয়াল-মুহ্রিমাতি, হাদীস নং ১৮৩৮; *সুনানু আবী দাঊদ*, বাবু মা ইয়ালবিসু আল-মুহ্রিম, হাদীস নং ১৮২৫; *সুনানুন্ নাসাঈ*, বাবুন্ নাহ্য়ু 'আন তানতাকিবু আল-মার'আতুল হারামু, হাদীস নং ২৬৭৩।

[25] *আস্-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী*, হাদীস নং ৯০৫০।

[26] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ১৮৩৮।

[27] সূরা আল-হাজ্জ: ২২: ২৯।

[28] মুহাম্মাদ আশ্-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, ৫ম খণ্ড (দিমাশক: দারু ইব্ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ১১০।

[29] *জামি' উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফিল হাজারিল আসওয়াদ, হাদীস নং ৯৬১।

[30] *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, বাবু ফাযলিত্-তাওয়াফ, হাদীস নং ২৯৫৬।

[31] *সুনানুন্ নাসাঈ*, বাবু যিকরুল ফাযলি ফিত্-তাওয়াফি বিল-বায়তি, হাদীস নং ২৯১৯।

[32] *জামি' উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফী ইসতিলামির রুকনায়নি, হাদীস নং ৯৫৯।

[33] *জামি' উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফী ফাযলিত্-তাওয়াফ, হাদীস নং ৮৬৬।

[৩৪] *জামি' উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফী ইসতিলামির রুকনায়নি, হাদীস নং ৯৫৯; *সুনানুন্ নাসাঈ*, বাবু যিকরুল্ ফাযলি ফিত্-তাওয়াফি বিল-বায়তি, হাদীস নং ২৯১৯।

[৩৫] *ফিকহুস্ সুন্নাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬১।

[৩৬] *মুসান্নাফ ইব্‌ন আবী শায়বাহ্*, হাদীস নং ১৩৭০৩।

[৩৭] *সহীহুল বুখারী*, বাবু মান সাল্লা রাকআতাইত্ তাওয়াফি খালফাল মাকামি, হাদীস নং ১৬২৭; *সহীহ মুসলিম*, বাবু মা ইয়ালযামু মান আহ্‌রামা বিল হাজ্জি, ছুম্মা কাদিমা মাক্কামা মিনাত্ তাওয়াফি ওয়াস্ সা'ঈ, হাদীস নং (১২৩৪) ১৮৯; *সুনানুন নাসাঈ*, আইনা ইউসাল্লা রাকা'আতাইত্ তাওয়াফি, হাদীস নং ২৯৬০; *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্*, বাবুর রাকা'আতায়নি বা'দাত্ তাওয়াফি, হাদীস নং ২৯৫৯।

[৩৮] *সুনানুন নাসাঈ*, আল-কিরাআমু ফী রাক'আতাইত্ তাওয়াফি, হাদীস নং ২৯৬৩।

[৩৯] **যম্‌যম:** অর্থ অঢেল পানি। তিবরানী ভাষায় যম্‌যম অর্থ থেমে যাও, থাম্ থাম্। মরুভূমিতে দুই বছরের শিশু সন্তান ইসমা'ঈল (আ)-এর সীমাহীন পিপাসা মিটানোর জন্য যখন বিবি হাজেরা (আ) এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিলেন আর কামনা করছিলেন আল্লাহ্‌র অপার করুণা, তখন আল্লাহ্ তা'আলা রহমতের এ পানি উদ্‌গত করেন মরুভূমির শুষ্ক মাটি থেকে। রহমতের এ পানি দেখে বিবি হাজেরা (আ) একে বাঁধ দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করেন এবং তিবরানী ভাষায় বলতে থাকেন যম্‌যম অর্থাৎ থাম থাম। এ থেকে এটির নাম যম্‌যম্ নামে পরিচিতি লাভ করে। যম্‌যম কূপের অবস্থান মাসজিদুল হারাম তথা কা'বার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।

[৪০] আত্-তাবরানী, *আল-মু'জামুস্ সাগীর*, হাদীস নং ২৯৫।

[৪১] আত্-তাবরানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হাদীস নং ৩৯১২; আত্-তাবরানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হাদীস নং ১১১৬৭।

[৪২] *সুনানুদ্ দারা কুতনী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৯; *মুসান্নাফু 'আব্দির রায্‌যাক*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৮।

[৪৩] *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্*, বাবুশ্ শুরবি, মিন যাম্‌যাম্, হাদীস নং ৩০৬২; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ১৪৮৪৯।

[৪৪] *সহীহুল বুখারী*, বাবু মাজাআ ফী যাম্‌যাম্, হাদীস নং ১৬৩৭, বাবুশ্ শুরবি কাইমান, ৫৬১৭; *সহীহ মুসলিম*, বাবুন ফিশ্ শুরবি মিন যাম্‌যাম্ কাইমান, হাদীস নং (২০১৭) ১১৭-১২০; *সুনানুন নাসাঈ*, আশ্-শারিবু মিন যাম্‌যাম্ কাইমান, হাদীস নং ২৯৬৫; *জামি' উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফির রুখসাতি ফিশ্ শুরবি কাইমান, হাদীস নং ১৮৮২; *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্*, বাবুশ্ শুরবু কাইমান, হাদীস নং ৩৪২২; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ১৮৩৮, ১৯০৩, ২১৮৩, ২৬০৮, ৩১৮৬, ৩৪৯৭।

[৪৫] *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্*, বাবুশ্ শুরবি, মিন যাম্‌যাম্, হাদীস নং ৩০৬১; *সুনানু দারা কুতনী*, বাবুল মাওয়াকীতু, হাদীস নং ২৭৩৬; *আল-মু'জামুল কাবীর*, হাদীস নং ১১২৪৬; *আস্-সুনানুল কাবীর লিল বায়হাকী*, হাদীস নং ৯৬৫৬।

[৪৬] *সুনানু দারা কুতনী*, বাবুল মাওয়াকীতু, হাদীস নং ২৭৩৮।

[৪৭] ইব্‌নুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়াহ্, *যাদুল মা'আ ফী হাদই খায়রিল 'ইবাদ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ২৭শ সংস্করণ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৩৯২।

[৪৮] হাফিয আবূ শায়খ ইস্‌ফাহানী, *আখলাকুন্ নবী (সা)*, অনুবাদ: অধ্যাপক মোজাম্মেল হক (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), হাদীস নং ৬৮৪, পৃ. ৩১১।

[৪৯] *জামি' উত্-তিরমিযী*, বাবু মাজাআ ফির-রুখসাতি ফিশ্-শুরবি ক্বাইমান, হাদীস নং ১৮৮৩; *সুনানুন্ নাসাঈ*, বাবুল ইনসাফি মিনাস্-সালাতি, হাদীস নং ১৩৬১।

[৫০] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৫১১৮।

[৫১] *আখলাকুন্ নবী (সা)*, হাদীস নং ৬৮৪, পৃ. ৩১২।

[৫২] পূর্বোক্ত, হাদীস নং ৬৮৫, পৃ. ৩১২।

[৫৩] *আখলাকুন্ নবী (সা)*, হাদীস নং ৬৮৩, পৃ. ৩১১।

[৫৪] পূর্বোক্ত।

[৫৫] *সহীহুল বুখারী*, বাবু মা জাআ ফী যাম্‌যাম্, হাদীস নং ১৬৩৭, বাবুশ্ শুরবি কাইমান, ৫৬১৭; *সহীহ মুসলিম*, বাবুন ফিশ্ শুরবি মিন যাম্‌যাম্ কাইমান, হাদীস নং (২০১৭) ১১৭-১২০; *সুনানুন নাসাঈ*, আশ্-শারিবু মিন যাম্‌যাম্ কাইমান, হাদীস

নং ২৯৬৫; *জামি‘উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফির রুখসাতি ফিশ্ শুরবি কাইমান, হাদীস নং ১৮৮২; *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, বাবুশ্ শুরবু কাইমান, হাদীস নং ৩৪২২; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ১৮৩৮, ১৯০৩, ২১৮৩, ২৬০৮, ৩১৮৬, ৩৪৯৭।

৫৬ *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, ৩০৬২; *মুসনাদু আহমাদ*, ১৪৮৪৯।

৫৭ *ফাতাওয়ায়ে শামী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪-২৫৫।

৫৮ *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২০২৪।

৫৯ *জামি‘উত্-তিরমিযী*, হাদীস নং ১৮৯২।

৬০ *জামি‘উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফিল হাজারিল আসওয়াদ, হাদীস নং ৯৬৩।

৬১ সূরা আল-বাকারাঃ ২ : ১৫৮।

৬২ *সহীহুল বুখারী*, বাবু ওজূবিস্ সাফা ওয়াল মারওয়াতি, ওয়া জুঈলা মিন শাআইরিল্লাহ্, হাদীস নং ১৬৪৩; *সহীহ মুসলিম*, বাবু বায়ানি আন্নাস্ সা‘ঈ বায়নাস্ সাফা ওয়াল মারওয়াতি রুকনুন লা ইয়াসিহ্হুল হাজ্জু ইল্লা বিহি, হাদীস নং (১২৭৭) ২৬২।

৬৩ *সহীহ মুসলিম*, বাবু বায়ানি আন্নাস্ সা‘ঈ বায়নাস্ সাফা ওয়াল মারওয়াতি রুকনুন লা ইয়াসিহ্হুল হাজ্জু ইল্লা বিহী, হাদীস নং (১২৭৭) ৩৬০।

৬৪ সূরা আল-বাকারাঃ ২ : ১৫৮।

৬৫ ইব্ন কুদামাহ্, *আল-মুগনী*, ২য় খণ্ড (কায়রোঃ মাকতাবাতুল কাহিরা, ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ২৫২।

৬৬ সূরা আল-বাকারাঃ ২ : ১৫৮।

৬৭ *সুনানু আবী দাঊদ*, বাবু সিফাতি হাজ্জাতিন্ নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়া সাল্লামা, হাদীস নং ১৯০৫; *সুনানুন্ নাসাঈ*, আয্-যিকরু ওয়াদ্-দু‘আ ‘আলাস্ সাফা, হাদীস নং ২৯৭৪-২৯৭৭; *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, বাবু হাজ্জাতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাদীস নং ৩০৭৪।

৬৮ *ফিক্হুস্ সুন্নাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩০।

৬৯ সূরা আল-ফাত্হঃ ৪৮ঃ ২৭।

৭০ মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার দু‘আ করার কারণ হলো, মুড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা। এর মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে জোর দেয়া। কেননা এটি ‘ইবাদত ও দাসত্বের পূর্ণাঙ্গ নমুনা পেশ করে এবং আল্লাহ্‌র নিকটে বিনয়ের ব্যাপারে অধিকতর বিনয় ও আন্তরিকতার প্রমাণ দেয়। পক্ষান্তরে যে চুল ছোট করে কাটে, সে নিজের জন্য কিছুটা সৌন্দর্য অবশিষ্ট রাখে। তথাপি সবার শেষে তাদের জন্য তার দু‘আর কিছু অংশ বরাদ্দ করেছেন, যাতে তার উম্মতের কোনো হাজী বা ‘উমরাকারী তার নেক দু‘আ থেকে বঞ্চিত থেকে না যায়।

দ্র. *ফিকহুস্ সুন্নাহ্*, ১ম খণ্ড, পাদটীকা দ্র. পৃ. ৭৫৮।

৭১ *সহীহুল বুখারী*, বাবুল হালকি ওয়াত্-তাকসীরি ইনদাল ইহ্লালি, হাদীস নং ১৭২৭; *সহীহ মুসলিম*, বাবু তাফযীলিল হালকি আলাত্-তাকছীরি ওয়া জাওয়াযিত্-তাকছীরি, হাদীস নং (১৩১০) ৩১৭; *সুনানু আবী দাঊদ*, বাবুল হালকি ওয়াত্-তাকসীরি, হাদীস নং ১৯৭৯; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ৫৫০৭, ৬২৩৪।

৭২ ‘আলী ইব্ন আবী বকর আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া*, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২৯৪।

৭৩ মূল হাদীসটি এই, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. -‘আইশা (রা) বলেন, নবী (সা) মহিলাদেরকে তাদের মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।

দ্র. *জামি‘উত্-তিরমিযী*, বাবু মা জাআ ফী কারাহিয়াতিল হালকি লিন্-নিসাই, হাদীস নং ৯১৪, ৯১৫।

৭৪ *সুনানু আবী দাঊদ*, বাবুল হাল্কি ওয়াত্-তাকছীর, হাদীস নং ১৯৮৪-১৯৮৫।

৭৫ *সুনানু আবী দাঊদ*, বাবুল ওয়াদা‘ঈ, হাদীস নং ২০০২; *সহীহ মুসলিম*, বাবু ওজূবি তাওয়াফিল ওয়াদা‘ঈ, হাদীস নং (১৩২৭) ৩৭৯; *সুনানুন্ নাসাঈ*, আয্-যিকরু ওয়াদ্-দু‘আ ‘আলাস্ সাফা, হাদীস নং ২৯৭৪-২৯৭৭; *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, বাবুল বাওয়াফিল ওয়াদা‘ঈ, হাদীস নং ৩০৭০; *সুনানুদ্ দারিমী*, বাবু ফী তাওয়াফিল ওয়াদা‘ঈ, হাদীস নং ১৪৭৪।

৭৬ *সুনানু আবী দাঊদ*, বাবুল ওয়াদা‘ঈ, হাদীস নং ২০০৬; *সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্*, হাদীস নং ২৯৯৮।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ ও প্রকৃতি

বজলুর রশীদ*

Abstract: Islam is a complete code of life and Islamic Economy is an important part of Islam. It is the collection of rules, values and standards of conduct that organize economic life and establish relations of production in an Islamic society. These rules and standards are mainly based on Quran and Sunnah. Ijma and Qias are also important base of Islamic Economy. The nature of Islamic Economy is very clear, realistic and welfare oriented. It follows the Shariah rules. Illegal money earning is strictly prohibited in Shariah. Islamic economy prohibites Usury (ربا), gambling, hush money, cheating and also other harmful earns. Forbidden goods are not produced here. Islamic economy forbids the earning of profits through unfair trading or practices which are damaging or harmful to society. From the Islamic point of view the all kind of ownership belongs to Allah only. He alone can do whatever He likes with all the existing things of this world. He can bring and can take away. He can give life and can take it. We will try to discuss about the nature of Islamic Economy inshaallah.

ভূমিকা

ইসলামী শরী'আহ মানবতার অনন্য সমাধান। এতে মানুষের জীবনের সকল বিষয়ের দিকনির্দেশনা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পেশ করা হয়েছে। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার অন্তর্গত একটি ব্যবস্থা। ইসলামী শরী'আহ যেভাবে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের খুঁটি-নাটি সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়েছে, তেনমিভাবে মানবগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমাধানও প্রদান করেছে সুচারুরূপে। ইসলামী শরী'আহ অর্থনীতির বিষয়ে সুষম ও ভারসম্যপূর্ণ নীতি প্রণয়ন করেছে। ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ, ধোঁকাবাজি, ঠকবাজি, প্রতারণা, বৈষম্য ও অস্পষ্টতার কোন স্থান নেই। সহজ কথায় ইসলামী অর্থনীতিতে নিপীড়নের সকল পথ বন্ধ করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে অর্থব্যবস্থা (Financial System) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। মানুষের জীবনের অধিকাংশ দিক আজ অর্থনির্ভর। তাই প্রত্যেকটি মানুষকে কোন না কোনভাবে অর্থনৈতিক লেনদেন করতেই হয়। সেটা হতে পারে বৈধ বা অবৈধভাবে। কেউ লোভ, বিলাসিতা ও বস্তুবাদের বেড়াজালে আটকে গিয়ে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে উঠে। আবার কেউ অর্থ জমাতে গিয়ে অর্থের যথাযথ ব্যবহার এড়িয়ে কৃপণ হয়ে উঠে। সেইসাথে সমাজপতি ও রাষ্ট্রনেতারা সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চালাতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দর্শনে ইসলাম ছেড়ে একাধিক অর্থব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। তার মধ্যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Capitalistic Economic System) সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Socialistic Economic System), কল্যাণমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Welfare Economic System) সাম্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Communist Economic System) অন্যতম। এসব মস্তিস্কপ্রসূত নীতিমালা কোন সময়ই সমাজে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক সুবিচার (Economic Justice) প্রতিষ্ঠা করা, যেন সমাজে বসবাসরত সকল শ্রেণির মানুষ তথা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সক্ষম-অক্ষম, নারী-

* এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পুরুষ, সাদা-কালো, ধার্মিক-অধার্মিক, যুবক-বৃদ্ধ, ছেলে-মেয়ে, মুকিম-মুসাফির, ধনী-দরিদ্র সবার মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়। সেইসাথে মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সম্মানের সাথে বসবাস করতে পারে এবং মানবেতর জীবন থেকে মুক্তি পেতে পারে। তারা যেন শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সমাজে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে অর্থনৈতিক সম্পদ সৃষ্টিতে নিজ নিজ ভূমিকা রাখতে পারে এবং আল্লাহর অনুগত ও পছন্দনীয় দাস হিসেবে জীবনযাপন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا -'আর জমিনে বিচরণরত প্রতিটি প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহরই।'[১]

ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থ-সম্পদের একমাত্র মালিক ও যোগানদাতা মহান আল্লাহ। মানুষ আমানতদার এবং ব্যবহারকারী বা ভোক্তা মাত্র। মানুষের আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি তার বিশ্বাস, আদর্শ ও মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল। তাই আর্থ-সামাজিক বিষয়াদির উন্নয়ন ও সার্বিক নীতিমালার ভিত্তি হবে তার বিশ্বাস, আদর্শ এবং শরী'আহ। আর ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি হলো, মানুষের কল্যাণ সাধন বা মানব কল্যাণ। সকল শ্রেণির মানুষের মাঝে আদল, ইনসাফ, সুবিচার ও ভারসম্যপূর্ণতা বজায় রাখা। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় জুলুম ও অন্যায়মূলক সকল প্রক্রিয়া নিষিদ্ধ। ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করে থাকে ইসলামী অর্থনীতি। যাকাত থেকে শুরু করে উত্তরাধিকার আইন সব কিছুকেই ইসলামী অর্থনীতি কল্যাণমুখিতার আদলে সাজিয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ।

১. অর্থনীতির আভিধানিক স্বরূপ

১.১ ইকতিসাদের আভিধানিক প্রাধান্যতা

বাংলা 'অর্থনীতি' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে অর্থ সংক্রান্ত নীতিমালা পাওয়া যায়। অর্থের সাথে সম্পর্কিত নীতিগুলোই অর্থনীতি। বাংলা আভিধানের মতে, ধনবিজ্ঞান। এটা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ECONOMICS। এটি একটি ল্যাটিন শব্দ। এই ECONOMICS শব্দটি শাব্দিকভাবে 'অর্থনীতি' শব্দ থেকে আরো সুনির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপক এবং গ্রীকদের গৃহস্থালী কর্মকাণ্ড নির্দেশক। এ শব্দটি গ্রীক শব্দ OIKONOMIA থেকে আগত। যার অর্থ 'গৃহ ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিজ্ঞান'। শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছেন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল। গ্রীকের নগর রাষ্ট্র পরিধি ও আওতায় ছিল সীমিত। জীবনমান সাধারণ পর্যায়ের ছিল। তাই অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্র ছিল কেবল ঘর।

এছাড়া FINANCE শব্দটিও অর্থকেন্দ্রিক শব্দ হিসেবে ইংরেজিতে ব্যবহৃত হয়; যার অর্থ টাকা-পয়সা হিসাব ও ব্যবস্থাপন বিদ্যা[২] বা অর্থবিজ্ঞান। ফাইন্যান্স হলো এমন একটি ক্ষেত্র, যা সময় ও স্থানের ভিত্তিতে সম্পদ ও দায়বদ্ধতার বন্টনকে নিশ্চিত করে, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা থাকার পরও। ফাইন্যান্সকে অর্থ পরিচালনার শিল্প হিসেবেও সংজ্ঞায়িত করা যায়।[৩]

মূলত ফাইন্যান্সের পরিসরের মধ্যে আছে অর্থ (Money) ও আর্থিক বিভিন্ন উপকরণ (Monetary Instruments), অর্থায়ন (Financing), আর্থিক বাজার (Financial Markets), অর্থব্যবস্থাপনা (Financial Management), আর্থিক সিদ্ধান্ত (Financial Decision), বিনিয়োগ (Investment), ব্যবসায়িক অর্থায়ন (Business/Corporate Finance), অর্থপ্রকৌশল (Financial Engineering), সরকারি অর্থায়ন (Government/Public Finance) এবং অর্থ সম্পর্কিত সকল বিষয়।

অন্যদিকে অর্থনীতির আরবী প্রতিশব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক। বরাবরই আরবী পরিভাষাগুলো অন্তর্নিহিত ভাবগাম্ভীর্যের অধিকারী। বাংলা 'অর্থনীতি' ও ইংরেজি 'ECONOMICS' শব্দ দুটি থেকে আরবী الاقتصاد শব্দটি অর্থের গভীরতার দিকে থেকে উচ্চতর।

الاقتصاد শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে قصد মাদ্দাহ হতে। এর অর্থ হলো التوسط তথা মধ্যমপন্থা, الاعتدال তথা পরিমিত অবস্থা বা সামঞ্জস্যতা। এ শব্দটির মাঝে ইসলামের গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। আদম (আ) থেকে ইসলামের সূচনা হলেও ইসলামের চূড়ান্ত ও সর্বোত্তম সংস্করণ হলো উম্মতে মুহাম্মদীর প্রাপ্ত ইসলাম। এ সংস্করণ কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকেই সম্পন্ন করা হয়েছে, বান্দাদের কল্যাণার্থে। পূর্বের অনেক কাঠিন্যতাকে রহিত করে দ্বীন ইসলামকে পরিমিত অবস্থানে নিয়ে আসা হয়েছে এবং উম্মতে মুহাম্মদীকে মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।[৪] কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মধ্যমপন্থীদেরকে আল্লাহ তা'আলা মূল্যায়ন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

-'অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে, যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ।'[৫]

এখানে الاقتصاد শব্দটি আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। مُقْتَصِدٌহচ্ছেন এমন ব্যক্তি যে কাজে-কর্মে, ইবাদাত-বন্দেগিতে, চলনে-বলনে, আচার-আচরণে الاقتصاد তথা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে থাকে। বাড়াবাড়ি করে না সেই সাথে ছাড়াছাড়িও করে না। সে তার ইবাদাতে একটা সুষম অবস্থানে থাকে; আবশ্যকীয় বিষয়গুলো যথাযথভাবে পালন করে এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো মনেপ্রাণে বর্জন করে। কিছু মাকরূহ বিষয় সম্পাদন করে আবার কিছু মুস্তাহাব বিষয় বাদ দেয়। রাসূল (সা) বলেন,

سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا

-'তোমরা যথারীতি আমল কর, ঘনিষ্ঠ হও। তোমরা সকালে, বিকালে এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহর কাজ কর। মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। আকড়ে ধর মধ্যমপন্থাকে, অবশ্যই সফলকাম হবে।'[৬] এখানে রাসূল (সা) মধ্যমপন্থাকেই আবশ্যক করে নেয়ার কথা বলেছেন।

জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা) রাসূল (সা)-এর জুমু'আর খুতবাহ ও সালাত কেমন ছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে القَصْدَ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন,

كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا

-'আমি রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সাথে সালাত আদায় করতাম। তার সালাত ও খুতবা ছিল মধ্যম ধরনের (দীর্ঘও নয় একেবারে সংক্ষিপ্তও নয়)।'[৭] القَصْدَ শব্দটি দ্বারা বুঝানো হচ্ছে, তাঁর সালাত দীর্ঘও ছিল না আবার সংক্ষেপও ছিল না, আকারে মধ্যম ছিল। তাই الاقتصاد শব্দটি 'অর্থনীতি'কে বোঝালেও এটি বাংলা ও ইংরেজি পরিভাষা থেকে অনেক কারণেই ভিন্নতর ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

১.২ অর্থনীতি বুঝাতে المعَاشُ ও المعيشة শব্দের ব্যবহার

আরবীতে অর্থনীতিকে বুঝানোর জন্য المعَاشُ শব্দটির ব্যবহার অনেক প্রাচীন। الاقتصاد শব্দটি প্রচলিত হওয়ার আগে المعَاشُ শব্দটি অর্থ সংক্রান্ত আচার-আচরণ বুঝাতে ব্যবহৃত হতো। বিদ্বানগণ এটিকে শিরোনাম ধরে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইবনে খালদূন তার 'মুকাদ্দামা'য় এ শব্দ উল্লেখ করেছেন। المعَاشُ ও المعيشة শব্দ দুটি নিকটবর্তী ভাব বহন করে। প্রখ্যাত অভিধানবিদ খলীল (র) المعيشة শব্দটির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

الْعَيْشُ: الْحَيَاةُ. وَالْمَعِيشَةُ: الَّذِي يَعِيشُ بِهَا الْإِنْسَانُ: مِنْ مَطْعَمٍ وَمَشْرَبٍ وَمَا تَكُونُ بِهِ الْحَيَاةُ. وَالْمَعِيشَةُ: اسْمٌ لِمَا يُعَاشُ بِهِ.

-'الْعَيْش অর্থ হলো الْحَيَاةُ তথা জীবন। আর الْمَعِيشَةُ হলো, যে খাবার, পানীয় এবং জীবনের সাথে সম্পর্কিত যেগুলো দ্বারা মানুষ জীবনধারণ করে। এটি একটি বিশেষ্য, যা জীবিকার উপাদানগুলোকে বুঝায়।'[৮]

المعَاشُ শব্দটি মূলত مَعَشٌ থেকে বহুবচন হয়েছে। এর সমার্থক বহুবচনের অন্য দুটি রূপ হলো- مَعَايِشُ ও مَعَاشَاتٌ । আল কুরআনে একাধিক স্থানে শব্দটির ব্যবহার এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

-'আমি তোমাদের জন্যে তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যেও যাদের অন্নদাতা তোমরা নও।'[৯]

ইবনু মাস'ঊদ আল বাগাভী (র) বলেন,

جَمْعُ مَعِيشَةٍ، قِيلَ: أَرَادَ بِهَا الْمَطَاعِمَ وَالْمَشَارِبَ وَالْمَلَابِسَ

-'مَعَايِشَ শব্দটি مَعِيشَةٍ -এর বহুবচন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য খাদ্য, পানীয় ও পরিধান সামগ্রী।'[১০] ইমাম কুরতুবী (র)ও অনুরূপ বলেছেন।[১১]

সত্য দ্বীন, সত্য কিতাব, সত্য ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের পরও যারা এ মহাসত্যকে অস্বীকার করবে এবং মুখ ফিরিয়ে নিবে, তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পারিবারিক জীবন অত্যন্ত লাঞ্ছনাদায়ক হবে। আর পরকালে তাকে অন্ধ হিসেবে উঠানো হবে। এটি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং বিষয়টি বুঝাতে গিয়ে مَعِيشَةً শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

-'এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।'[১২] দাহ্‌হাক (র) ইবনু 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন,

المعيشة الضَّنْك: أن تضيق عليه أبواب الخير فلا يهتدى لشيء منها، وله معيشة حرام يركض فيها. قال الضحاك: فهذه المعيشة هي الكسب الخبيث، وبه قال عكرمة.

-'সংকীর্ণ জীবন হলো, তার জন্য কল্যাণের দরজাগুলো সংকুচিত হয়ে যাবে, ফলে সে কোন কিছুতেই সঠিক পথ পাবে না। আর তার জীবিকা হারাম, যেটার জন্য সে শ্রম ব্যয় করছে। দাহ্‌হাক (র) বলেন, এটাই হলো অপবিত্র জীবিকা। 'ইকরামা (র)ও অনুরূপ বলেছেন।'[১৩] 'আতিয়্যাহ আল 'আওফী (র) ইবনু আব্বাস (রা) থেকে আরেকটি মত উল্লেখ করে বলেন, المال الذي لا يتّقي الله صاحبُه فيه -'এটি হলো এমন সম্পদ, যাতে সে আল্লাহকে ভয় করে না।'[১৪]

সুতরাং অর্থনীতি বুঝাতে المعَاشُ ও المعيشة শব্দদ্বয়ের ব্যবহারের যথার্থতা রয়েছে। যেহেতু উভয় শব্দই জীবিকা, উপার্জন, অর্জিত সম্পদ ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করছে। কুরআনে উল্লিখিত এ শব্দ থেকেও সাহাবী, তাবেয়ী ও মুফসসিরগণ এমন অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থনীতির মৌলিক উপাদনগুলো খাদ্য, পানীয়, পরিধেয় বস্ত্র, চিকিৎসার বাহিরে নয়। তাই الاقتصاد এর পাশাপাশি المعَاشُ শব্দটির ব্যবহার যৌক্তিক এবং ঐতিহাসিকভাবেই এর উপস্থিতি পাওয়া যায়। অন্যদিকে উর্দুতে অর্থনীতিকে বুঝাতে معيشت এবং معاشيات শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়।

১.৩ অর্থনীতির প্রাচীন ও আধুনিক পরিভাষা

অর্থনীতির বিষয়টি মানুষের জীবন যাত্রার সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় অর্থনীতির প্রাচীন পরিভাষা ও বর্তমান বা আধুনিক পরিভাষার মাঝে বেশ ব্যবধান রয়েছে। মানুষের জীবন-চলাচল সব সময় অভিন্ন থাকেনি, বর্তমানেও থাকছে না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। সময়ের ব্যবধানে মানুষের আচার-আচরণ, উপাদান-উপকরণ, আয়-ব্যয় ও উৎপাদনে পরিবর্তন বিদ্যমান। বস্তু-অবস্তু, প্রাণি-অপ্রাণি, জীব-জড় সবকিছুতেই এ পরিবর্তন দৃশ্যমান। সনাতন মানুষের জীবনযাপন বর্তমান থেকে অনেক সহজ সরল ছিল। মৌলিক চাহিদাগুলো তারা প্রাকৃতিকভাবে মেটাতো। কায়িক পরিশ্রমই ছিল তাদের উৎপাদনের মূলমন্ত্র। অনেকটা 'দিনে এনে দিনে খাই' রীতিতে চলত তারা। তাই তাদের সময়ে অর্থনীতির বিশেষ পরিভাষায় বিশেষ কোন গ্রন্থ ছিল না। আইন, ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন এবং অর্থনীতি তখন একই সাথে আলোচিত ছিল। তাদের পরিভাষায় উৎপাদন, ভোগ ও দৈনন্দিন সংসার পরিচালনার ন্যূনতম জ্ঞানকেই অর্থনীতি বলা হতো। অনেক পূর্বে খ্যাতিমান দুজন দার্শনিক প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্ব) ও অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিষ্টপূর্ব) অর্থনীতির অনেক মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া প্রাচীন ভারতে চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্বে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' সারা দেশের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সামরিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। এভাবেই অর্থনীতির পরিভাষাগত রূপটি আরো ফাংশনাল ও জটিল হতে থাকে। রাজনৈতিক অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়, যখন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ১৭৭৬ সালে তার বিখ্যাত বই "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" রচনা করেন। আর আধুনিক অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো অ্যাডাম স্মিথের এ বইটি।[১৫]

অ্যাডাম স্মিথ অর্থনীতির পারিভাষিক পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, A science which inquiries into the nature and causes of the wealth of nations-'অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান, যা জাতিসমূহের সম্পদের ধরণ ও কারণ অনুসন্ধান করে।'[১৬]

আলফ্রেড মার্শাল বলেন, Economic is the study of mankind in the ordinary business-'অর্থনীতি মানব জীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।'[১৭]

অর্থনীতিবিদ Samuelson ও Nordhaus বলেন,

Economics is the study of how societies use scarce resources to produce valuable goods and service and distribute them among different individuals.

-'কীভাবে মানুষ ও সমাজ অর্থ দ্বারা ও অর্থ ব্যতীত দুষ্প্রাপ্য সম্পদকে বিভিন্ন উৎপাদন কাজে নিয়োগের জন্য নির্বাচন করে এবং সমাজ ও জনসাধারণ বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভোগের নিমিত্তে বণ্টন করে তার আলোচনাই হলো অর্থনীতির বিষয়বস্তু।'[১৮]

Dominick Salvatore Ph.D & Eugene Diulio এর মতে,

Economics is a social science that studies individuals and organizations engaged in the production, distribution, and consumption of goods and services.

-'অর্থনীতি এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান, যা পণ্য ও সেবাগুলোর উৎপাদন, বিতরণ ও ব্যবহারে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধ্যয়ন করে।'[১৯]

অর্থনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল এর মতে,

Economics is the science which traces the laws of such of the phenomena of societz as arise from the combined operations of mankind for the production of wealth, in so far as those phenomena are not modified bz the pursuit of anz other object.

-'অর্থনীতি হলো একটি বিজ্ঞান, যা মানব সমাজের সম্পত্তির উৎপাদনের জন্য যৌথ অভিযান থেকে উত্থাপিত যেমন সমাজের ঘটনাসমূহের আইনগুলোকে আঁকড়ে ধরে, সেই সমস্ত ঘটনাগুলো অন্য যেকোনো বস্তুর অনুসরণ দ্বারা পরিবর্তিত হয় না।'[২০]

২. ইসলামী অর্থনীতি বা ইকতিসাদে রব্বানীর পারিভাষিক স্বরূপ

ইসলাম সার্বজনীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বিধৃত হয়েছে। সকল সৃষ্টিই সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আল্লাহর অনুগত, শুধু মানুষ ও জীন ব্যতিত। যেহেতু এদের উভয়কে তিনি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন তাই তারা ভালো-মন্দ দুটিই করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ইচ্ছাশক্তি দেয়ার পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য ইসলামকে এমনভাবে পেশ করেছেন– যাতে রয়েছে আদেশ, নিষেধ, উপদেশসহ যাবতীয় নির্দেশনা। সেই নির্দেশনায় ব্যক্তিগত জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন কোন কিছুই বাদ রাখা হয়নি। তাই মহান আল্লাহর দেয়া ব্যক্তিগঠণমূলক বিধি-নিষেধগুলো মানলে তাকে বলা হবে প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি, পারিবারিক বিধি-নিষেধগুলো পরিবারে বাস্তবায়ন করলে তাকে বলা হবে ইসলামী পরিবার, সে অনুসারে সমাজ চললে তাকে বলা হবে ইসলামী সমাজ, আর তদানুযায়ী রাষ্ট্র চললে তাকে বলা হবে ইসলামী রাষ্ট্র। এভাবে মানবজীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইসলামের সুমহান ও কল্যাণকর নীতিমালাগুলো প্রয়োগ হবে। ইসলামী অর্থনীতি তেমনি একটি ক্ষেত্র মাত্র। ব্যক্তি যখন তার অর্থ সংশ্লিষ্ট আচরণগুলোকে কুরআন-সুন্নাহ তথা শরী'আহর অধীনে সম্পাদন করবে, যাবতীয় অবৈধতা, অনাচার ও ক্ষতিকর বিষয়গুলো থেকে নিজের অর্থকে পরিচ্ছন্ন রাখবে, আর্থিক আচরণে শরী'আহ নিরূপিত হালাল-হারামকে সমুন্নত রাখবে তখন তাকে বলা হবে ইসলামী অর্থনীতি বা ইকতিসাদে রব্বানী। এটিই হলো অর্থনীতির পরিচয় সংক্রান্ত মুসলিম পণ্ডিতগণের অভিমতের সারকথা।

অনেকেই বলেন, ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে শরী'আহর বিধি-নির্দেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তার প্রয়োগ, যা বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে অবিচার প্রতিরোধে সমর্থ, যেন এর ফলে মানবমণ্ডলীর সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। ফলে আল্লাহ ও সমাজের প্রতি তারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে।[২১]

ড. মুহাম্মাদ শাওকী আল-ফানজিরী বলেন,

هو الذي يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه وفقا لأصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية

-'এটা অর্থনীতির কার্যক্রমকে নির্দেশ করে এবং একে ইসলামী মূলনীতি ও রীতিনীতির আলোকে শৃঙ্খলিত করে।'[২২]

ড. মুহাম্মাদ আল-আরাবী বলেন,

الاقتصاد الاسلامى بأنه مجموعة الأصول العامة الاقتصادية التى تستخرجها من القران والسنة، والبناء الاقتصادي الذي نقيمة على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وعصر.

-'ইসলামী অর্থনীতি হলো অর্থ সংক্রান্ত সাধারণ কিছু রীতিনীতি, যা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উদগত হয়েছে। আর অর্থনীতির ভিত্তি সকল পরিবেশে ও যুগে ঐ সকল নীতির আলোকেই প্রতিষ্ঠিত হয়।'[২৩]

৩. ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি

ইসলামের ভিত্তিই মূলত ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি। ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে ইসলামের অর্থগত আচার-আচরণ, লেনদেন, জীবিকা উপার্জন, আয়-ব্যয় ইত্যাদির রূপরেখা দেখানো হয়েছে। ইসলামের প্রধান ও মৌলিক ভিত্তি দুটি; আল্লাহর কিতাব আল-কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহসমূহ। দুটিই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত নির্ভেজাল ওহী। শুধু পার্থক্য হলো একটি তিলাওয়াতে সাওয়াব রয়েছে (মাতলূ), অন্যটিতে নেই (গায়রে মাতলূ)। আল-কুরআন ও সুন্নাহর পরই আরো দুটি বিষয়ে ইসলাম গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। একটি সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য বা যে কোন যুগের মুসলিম পণ্ডিতদের ঐকমত্য। একে ইসলামী পরিভাষায় ইজমা' (الإجماع) বলা হয়। আর অন্যটি কুরআন বা হাদীসের উপর ভিত্তি করে সমসাময়িক সমস্যার সমাধানকল্পে তুলনাকরণ। একটি আয়াত বা হাদীসের উপর ভিত্তি করে নব-উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধান বের করা। ইসলামী পরিভাষায় এটিকে ক্বিয়াস (القياس) বলা হয়। উপর্যুক্ত চারটিই ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি।

প্রত্যেকটি জীবনধারারই একটি দর্শন থাকে, যাকে আবর্তিত করে সেটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ভাবধারা, নীতিমালা ও সার্বিক বিষয় নির্ধারিত হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। বস্তুবাদ বা পুঁজিবাদের ন্যায় ভোগই ইসলামী অর্থনীতির নিছক উদ্দেশ্য নয়। পার্থিব জীবন অতিবাহিত করে হিসাব বিহীনভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়াতেই মানুষের শেষ নয়। মানুষকে তার মহান রবের সামনে দাঁড়াতে হবে এবং পার্থিব জীবনের সকল কর্মে হিসাব দিতে হবে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। একটি অণু পরিমাণ পাপও তার হিসেবের খাতা থেকে বাদ পড়বে না। তাই পরকালের ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য পৃথিবীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে স্বচ্ছ ও সুন্দর করা প্রয়োজন। এই সংক্ষিপ্ত জীবনেই সব কিছুর যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। একটা খুনের বিনিময়ে একটি জীবন নেয়া যেতে পারে কিন্তু একাধিক খুনের জন্য হত্যাকারীর জীবন একাধিকবার নেয়া সম্ভব নয়। ভালো প্রতিদানের ক্ষেত্রেও পৃথিবীতে যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাই একটি ন্যায্য, নিরপেক্ষ ও ইনসাফপূর্ণ বিচারের জন্য আখিরাত একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। আর ইসলামের প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড ও নীতিমালা পরকালভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো, সম্পদ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার-বিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দানের মাধ্যমে একটি কল্যাণকর ইনসাফপূর্ণ সুষম অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করত সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করা ও সার্বজনীন কল্যাণ সমৃদ্ধি সাধনের প্রচেষ্টা করা।[২৪]

৫. আল-কুরআনে অর্থনৈতিক নির্দেশনা

আল-কুরআনই ইসলামী অর্থনীতির একমাত্র প্রধান উৎস। দ্বিতীয় উৎস হলো হাদীস। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানবতার সমাধানকল্পে, ধীরে ধীরে, প্রয়োজন অনুপাতে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন যে বিষয়ে মানুষ দিশেহারা হয়েছে, সত্য পেতে হিমশিম খেয়েছে, মিথ্যার বেড়াজালে ফেঁসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তখনই দয়াময় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে, তাদেরকে সঠিক বিষয়টি জানানোর জন্য কুরআন নাযিল করেছেন তার প্রিয় নবীর উপর। অনুরূপভাবে অর্থনীতির বিষয়গুলো মানুষের জীবনের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। তাই বিভিন্ন আচার-আচরণে ও চলমান জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় নাযিলকৃত আয়াতগুলো পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে অর্থনীতির মূলনীতি পেশ করেছে। নিম্নে আল-কুরআন থেকে এমন কতিপয় বিষয় উপস্থাপন করা হলো।

৫.১ কর্ম ও উৎপাদনের নির্দেশনা

আল-কুরআনের অগণিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন পাশাপাশি রিযিক অন্বেষণের জন্য জমিনে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তার অনুগ্রহ তালাশের কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

-'তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। আর তাঁর কাছেই পুনরুজ্জীবন হবে।'[২৫]

তিনি আরো বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

-'অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।'[২৬]

৫.২ ব্যক্তি মালিকানার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

আল-কুরআনে এমন অনেক আয়াত এসেছে যেগুলোতে ব্যক্তি মালিকানায় সম্মান প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, অন্যের সম্পদ রক্ষা করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

-'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।'[২৭]

৫.৩ অর্থনৈতিক ভারসাম্য

আল-কুরআনের বহু আয়াতে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিত এসেছে। আল্লাহ তা'আলা সম্পদ গচ্ছিত রেখে সংকট সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। কেবল ধনীদের মাঝে সম্পদের স্তুপ জমিয়ে মুনাফা অর্জনের চেষ্টাকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

-'আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।'[২৮]

৫.৪ অভাবীদেরকে সম্পদ প্রদান

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম কল্যাণকামী মূলনীতি হলো যাকাত ব্যবস্থা। গরিব ও অভাবীদেরকে ইসলাম যতটা ন্যায্য অধিকার দিয়েছে অন্য কোন ধর্ম তা দেয়নি। যাকাত ব্যবস্থা তার প্রামাণ্য নজীর। ধনীদের সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ হলো গরিবদের অধিকার। এটা কোন দয়া বা অনুকম্পা নয়। তাদের সম্পদকে পবিত্র করে দেয় এ যাকাত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

-'আর তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে।'[২৯]

যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যাকাত প্রদান করতে অবহেলা করে তাদের জন্য আল-কুরআনে সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

-'আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে জমা করে রাখার স্বাদ গ্রহণ কর।'[৩০]

৫.৫ অবৈধ মুনাফা অর্জনে নিষেধাজ্ঞা

আল-কুরআন সুদকে অবৈধ মুনাফা হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। এ মুনাফা অর্জন করতে গিয়ে গরিবরা শোষিত হয়, অভাবীরা বঞ্চিত হয়, ধনীরা আরো ধনী হতে থাকে। টাকার বিনিময়ে টাকা নেয়া কোন ব্যবসা নয়, এ পন্থায় মুনাফা অর্জন মানুষকে শ্রমহীন করে তুলে, ব্যবসা থেকে বিরত রাখে। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ ইসলামের সবচেয়ে বড় গুণাহগুলোর একটি। সুদ নামক সমাজ বিধ্বংসী এই উপাদান গ্রহণ অর্থই হলো স্বয়ং আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা। সুদ গ্রহণ করা অর্থই হলো শয়তানের খপ্পরের অধীন করে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

-'যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে, ক্রয়–বিক্রয় তো সুদ নেয়ারই মতো!'[৩১]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

-'হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার।'[৩২]

৫.৬ ব্যবসায়ের বৈধতা

আল-কুরআন ব্যবসাকে শুধু হালালই করেনি; বরং ব্যবসা করতে উৎসাহিত করেছে। নবী করীম (সা) ও সাহাবীগণ ব্যবসা করেছেন। নিজের শ্রমে রিযিক অর্জন করেছেন। সকল মুসলিমের জন্য ব্যবসা একটি উত্তম রিযিকের মাধ্যম। কিয়ামত পর্যন্ত ব্যবসায়ের বৈধতা ও এর মর্যাদার বিষয়টি অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যবসায়ের বৈধতা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ব্যবসায়ের বৈধতার স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا -'আর আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।'[৩৩]

নবী করীম (সা) এর জীবদ্দশায় সাহাবীগণ যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন, তখন নতুন অবস্থানে সম্বলহীন অবস্থায় তারা ব্যবসায় মনোনিবেশ করলেন। পূর্ব থেকেই মক্কায় অবস্থানকারী আনসার সাহাবীগণ অনেকেই চাষাবাদ করতেন। মদীনায় পৌঁছে নবী (সা) আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরী করে দিলেন। ফলে তাদের মাঝে এমন বিস্ময়কর দৃঢ় ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টি হলো, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আনরাসারগণ মুহাজিরদেরকে সব ধরণের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাদের কাজকর্মে মুহাজিরদেরকে অংশীদার বানিয়ে দিলেন। তারা টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, জমি-জমা মুহাজির ভাইদের জন্য উৎসর্গ করল। এমনকি কেউ একাধিক স্ত্রীর একজনকে তালাক দিয়ে তাঁর মুহাজির ভাইকে দিতে সম্মত হয়ে গেল। তেমনি সা'দ ইবনু রাবী'আ (রা) ছিলেন ধনী ব্যক্তি। তিনি 'আব্দুর রহমান (রা)-কে বললেন, 'আসুন, আমার সম্পদ আপনাকে দুই ভাগে ভাগ করে দেই। আমার দুইজন স্ত্রী রয়েছে। একজনকে তালাক দিয়ে দেই; ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আপনি তাকে বিয়ে করে নিবেন।'

'আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ (রা) বললেন, 'আল্লাহ আপনার সম্পদে এবং পরিবার-পরিজনে বরকত দিন। আমাকে বাজারটি দেখিয়ে দিন।' লোকেরা তাকে বাজার দেখিয়ে দিল। তিনি সেদিনই লাভ স্বরূপ কিছু পনির ও ঘি নিয়ে ঘরে ফিরলেন। পরবর্তীতে একদিন রাসূল (সা) তাঁর গায়ে যাফরান নির্মিত সুগন্ধির হলদে দাগ দেখতে পেয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার?' তিনি বললেন, 'জনৈক আনসারী মহিলা বিবাহ করেছি।' রাসূল (সা) বললেন, 'কী মাহরানা দিয়েছ?' তিনি বললেন, 'খর্জুর বীচি।' বর্ণনাকারী হুমায়দের রিওয়ায়াতে আছে, খর্জুর বীচির ওজন পরিমাণ স্বর্ণ। রাসূল (সা) বললেন, 'একটি বকরী হলেও ওয়ালিমা কর।'[৩৪]

সুতরাং বলা যায় যে, ব্যবসা ছিল সাহাবায়ে কেরামের রিযিক অন্বেষণের অন্যতম অবলম্বন।

৬. ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিসমূহ

প্রতিটি অর্থব্যবস্থার ন্যায় ইসলামী অর্থনীতির কিছু মূলনীতি বা মূল বিষয় রয়েছে। আর এই সব মূলনীতিই মূলত ইসলামী অর্থনীতির প্রাণ বা মূলভিত্তি। নিচে তা উল্লেখ করা হলো-

এক. অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পার্থক্য করা: ইসলাম মনে করে সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে মানুষের অবাধ স্বাধীনতা নেই। বরং আল্লাহ যে উপায়ে উপার্জন করাকে হালাল করেছেন, কেবল সে উপায়েই উপার্জন করা যাবে। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।'[৩৫]

দুই. সম্পদ কুক্ষিগত করা নিষিদ্ধ: ইসলাম মানুষকে ইচ্ছে মতো সম্পদ সঞ্চয় করতে নিরুৎসাহিত করে। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও জমিনের পরম সত্ত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর; আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন।"[৩৬] তিনি আরো বলেন, 'আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।'[৩৭]

চার. ব্যয়–বিনিয়োগের নির্দেশ: সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার পরিবর্তে ইসলাম নির্দেশ দেয় তা প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করার এবং ব্যবসায় বিনিয়োগ করার। আল্লাহ বলেন, "তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কী ব্যয় করবে? বলে দাও-যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্যে, আত্মীয়–আপনজনের জন্যে, ইয়াতীম-অনাথদের জন্যে, অসহায়দের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহর জানা রয়েছে।"[৩৮] তিনি আরো বলেন, "এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।"[৩৯]

পাঁচ. পরস্পরকে সহযোগিতা করা: পরস্পরকে সহযোগিতা করা ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন, 'যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি কর।'[৪০]

ছয়. যাকাত প্রদান: প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ যদি থাকে, তাহলে তার একটি নির্দিষ্ট অংশ অবশ্যই গরীবদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া। যাকাত প্রদানের নির্দেশ ও এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, 'তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে।'[৪১]

সাত. মীরাছ: ধন-সম্পদ সুষম বণ্টনের পরও যা অবশিষ্ট থাকে, মৃত্যুর পর তা বিক্ষিপ্ত করা ও ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ইসলাম এ বিধান রেখেছে।

৭. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

৭.১ স্রষ্টা প্রদত্ত

ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রদত্ত। আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে মানবজাতির জন্য মনোনিত করেছেন যাতে এর মাধ্যমে সকল সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ সমাধান পেশ করতে পারেন। এতে ব্যক্তির অর্থনৈতিক সমাধানও দেয়া হয়েছে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাথে। কুরআনের

অগণিত আয়াতে মানুষের লেনদেন, আচার-আচরণ, সম্পদের ব্যবহার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। আর এ কুরআন ইসলামী শরী'আর মূল মানদণ্ড। তাই ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে রব্বানী (الربانية) অর্থনীতি তথা স্রষ্টা প্রদত্ত অর্থনীতি। ইসলামী শরী'আহর মূলনীতিগুলো অপরিবর্তনীয় ও এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহই গ্রহণ করেছেন। আর এ কারণে এতে কোন ধরণের বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির সুযোগ নেই। সাইয়েদ কুতুব (র) বলেন,

تصور رباني، جاء من عند الله بكل خصائصه، وبكل مقوماته وتلقاه الإنسان كاملا بخصائصه هذه ومقوماته، لا ليزيد عليه من عنده شيئا، ولا لينقص كذالك منه شيئا ... هو نفسه المصدر الذي خلق الإنسان، هو الخالق المدبر الذي يعلم طبيعة هذا التصور وحاجات حياته المتطورة على مدى الزمان

-'স্রষ্টা প্রদত্ত রূপরেখা সকল বৈশিষ্ট্য ও উপাদান নিয়েই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে। মানুষও তা গ্রহণ করে সকল বৈশিষ্ট্য ও উপাদান যথাযথ রেখে। মানুষ তার নিজ থেকে কিছুই বাড়ায় না ও কমায় না ... তিনি নিজেই একমাত্র প্রণয়নকারী যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পরিচালনাকারী, যিনি এই রূপরেখার প্রকৃতি এবং সময়ের আলোকে তার জীবনের নব উদ্ভাবিত প্রয়োজনগুলো জানেন।'[৪২]

লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক থেকেও ইসলামী অর্থনীতির অভিন্ন লক্ষ্য হলো আল্লাহ প্রদত্ত রীতিগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহর গোলামী সম্পন্ন করা। অর্থগত আচরণের দিক থেকে আল্লাহ যা আদেশ দিয়েছেন তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা এবং নিষেধ পরিহার করে চলা। কেননা মানুষকে কেবল তাঁর দাসত্ব করার জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

-'আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।'[৪৩]

৭.২ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের অন্তর্ভুক্ত

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পূর্ণাঙ্গতা। ইসলাম একটি সার্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি দিক সবিস্তারে এতে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নিজেই ঘোষণা করেছেন, 'আমি কিতাবে কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি।'[৪৪] তাই অর্থনীতি ইসলামী ধারণা-বিশ্বাস, শরী'আহ ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন কিছু নয় যেমনটা কিছু কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেছেন। তারা দ্বীন তথা ধর্ম থেকে অর্থনীতিকে পৃথক করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন। আর ইসলাম নির্ধারিত অর্থনীতি ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা মানব মস্তিষ্কপ্রসূত অর্থনীতি গ্রহণ করবেন না।[৪৫]

৭.৩ নৈতিক অবিচলতা ও দৃঢ়তা

ইসলামী অর্থনীতিতে দৃঢ়তা, অবিচলতা ও নমনীয়তার অপূর্ব সমন্বয় রয়েছে। ইসলামের বিধানগুলো অত্যন্ত দৃঢ় ও অবিচল। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ভিত্তি ও মৌলিক বিধানগুলো সর্বদাই অপরিবর্তনীয়। সময়ের ব্যবধানে এতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসে না। নির্ভেজাল ইলাহী নির্দেশনা হিসেবে এগুলোর কোন সংশোধনের প্রয়োজন পরে না এবং কোন সংযোজন ও সংকোচনের সুযোগ থাকে না। যেমন সুদ, মদ, জুয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধের ব্যাপারে কারো কোন ইজতিহাদ বা হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। এটি ইসলামী অর্থনীতির দৃঢ়তা ও অবিচলতা। অন্যদিকে মানবরচিত অর্থনীতিগুলোর নীতি পরিবর্তন, সংযোজন-সংকোচনের এবং সময় ও স্থানের আলোকে উন্নয়নের প্রয়োজন পরে। তাই অবিচলতার দিক থেকে ইসলামী অর্থনীতির সাথে সাধারণ অর্থনীতির তুলনা চলে না।

৭.৪ ভারসাম্যপূর্ণ

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান। মহা বিশ্বজগৎ সৃষ্টিতে যেমন ভারসাম্যতার অপূর্ব সমন্বয় রয়েছে তেমনিভাবে ইসলামের প্রত্যেকটি বিধি-বিধানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিমিতি, সুষমতা ও ভারসাম্যতার চমৎকারিত্ব লুকিয়ে আছে। আল-কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ন্যাপরায়ণতার দণ্ড প্রতিষ্ঠার আদেশ করেছেন। তিনি বলেন, وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ -'আর তোমরা ন্যায্যতার সাথে ওযন প্রতিষ্ঠা করো এবং দাঁড়িপাল্লাকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না।'[৪৬] ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী শরী'আহ প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যতা ও ন্যায্যতা সৃষ্টি করেছে। ইসলামী অর্থনীতি বস্তু ও আত্মার মাঝে অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছে এবং ভোগ ও ত্যাগের মাঝে সুষম বন্ধন সৃষ্টি করেছে। বস্তুবাদী অর্থনীতি কেবল ভোগবাদ ও বস্তুবাদের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে মানুষকে দুনিয়ায় 'খাও দাও ফূর্তি করো'র মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি পরকালভিত্তিক ও জবাবদিহিমূলক হওয়ায় এতে ভারসাম্যতা যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে। ব্যয় করে ফকির হয়ে যাওয়াও নয় আবার সম্পদ কুক্ষিগত করে সমাজে সংকট সৃষ্টিও নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন,

يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ ، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

-'হে 'আব্দুল্লাহ! আমি এ সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি প্রতিদিন সাওম পালন কর এবং সারারাত সালাত আদায় করে থাক। আমি বললাম, ঠিক শুনেছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, এরূপ করবে না বরং মাঝে মাঝে সাওম পালন কর আবার সাওম ছেড়েও দাও। রাতে সালাত আদায় কর আবার ঘুমাও। কেননা তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার চোখের হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার মেহমানের হক আছে।'[৪৭]

ইসলামী অর্থনীতি ইবাদাত থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া থেকে বারণ করার পাশাপাশি 'আমল ও ইবাদাতের মাঝেও সমন্বয় সাধন করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

-'অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।'[৪৮]

ব্যক্তি সম্পদের স্বাধীনতা দেয়ার পাশাপাশি মানবতার ক্ষতি হয় এমন খাতে অর্থ ব্যয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কৃপণতাকে নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি সীমাহীন ভোগকে সীমিত করার আদেশ দেয়া হয়েছে। সর্ব ক্ষেত্রেই ইসলামী অর্থনীতি অত্যন্ত ভারসম্যপূর্ণ একটি অর্থব্যবস্থা।

৭.৫ বাস্তববাদিতা

বাস্তববাদিতা ইসলামী অর্থনীতির তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিক। ইসলাম মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ সমস্যাগুলোর বাস্তব সমাধান পেশ করেছে। তেমনি ইসলামী অর্থনীতি মানুষের স্বভাব, আচার-আচরণগুলোকে বিশ্লেষণ করে, তাদের অবস্থা ও প্রয়োজন গুলোকে প্রতিপালন করে এবং সমাজে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করে। মানুষ স্বভাবতই সম্পদকে প্রচ্ছন্নভাবে ভালোবাসে। এজন্য ইসলাম মানুষের সম্পদের মালিকানাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আবার সীমাহীন ভোগবাদিতা মানুষকে স্বার্থপূজারী করে তুলে এবং সমাজকে বিনষ্ট করে ফেলে, তাই ভোগের ক্ষতিকর দিককে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আবার মানুষের মধ্যে

স্তর বিন্যাস থাকবে, পদমর্যাদার ভিন্নতা থাকার বিয়ষটি অত্যন্ত বাস্তব একটি বিষয়। সকলেই সমান অবস্থানে থাকলে পৃথিবীতে শৃঙ্খলার সাথে বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

-'আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম।'[৪৯]

৭.৬ অন্যায় ও যুলুম নিষিদ্ধকরণ

অন্যায়, অবিচার ও যুলুমের উচ্ছেদ করা ও নির্যাতিতদের পক্ষে কথা বলা ইসলামী অর্থনীতির একটি বিশেষ দিক। আল্লাহ তা'আলা নির্যাতিতদেরকে পৃথিবীতে ওয়ারিস বানাতে চান। এটা হচ্ছে বঞ্চিতদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নীতি। 'উত্তরাধিকারী' করার অর্থ হচ্ছে বঞ্চিতদের জন্যও পৃথিবীতে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। এমন বেতন, সুবিধা, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বসবাসের সুযোগ; যা তাদের জীবনকে সুন্দর করে তোলে। তাই ইসলামী অর্থনীতি সব শ্রেণির অধিকার সমুন্নত রেখে এমন সব আইন, বিধি, নীতি, প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহিত করে, যাতে সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিশেষভাবে সুরক্ষিত হয়। ইসলাম শ্রেণি সংঘাতের বিপরীতে প্রতিটি শ্রেণির অধিকারের মাপকাঠি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। অন্য সব শ্রেণির ন্যায়সঙ্গত অধিকারও রক্ষা করেছে। কিন্তু সাধারণ লোকদের অধিকার (তারা দুর্বল হওয়ার কারণেই) প্রাধান্য পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

-'পৃথিবীতে যারা নির্যাতিত ও বঞ্চিত, তাদের অনুগ্রহ করতে চাই। তাদেরকে পৃথিবীতে ইমাম ও উত্তরাধিকারী বানাতে চাই। তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করতে চাই।'[৫০]

৭.৭ সার্বজনীন কল্যাণ সাধন

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি হলো, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ সাধন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

-'আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'[৫১]

রাসূল (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (সৃষ্টির প্রতি) দয়া করে না, (স্রষ্টার পক্ষ থেকে) তার প্রতি দয়া করা হবে না।'[৫২]

৭.৮ সম্পদের একমাত্র মালিকানা আল্লাহ তা'আলার

মহান আল্লাহ আকাশ, জমিন ও এতদুভয়ের মাঝে যা রয়েছে তা সৃষ্টি করেছেন। তাই পৃথিবীর সকল সম্পত্তির মালিক একমাত্র তিনিই। তিনি তাঁর বান্দাদের তার মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন এবং ভোগের সুযোগ দিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -'আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁর কাছে। তিনি যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।'[৫৩]

৭.৯ যাকাত ব্যবস্থা ও জননিরাপত্তা

যাকাত ব্যবস্থা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অনন্য বৈশিষ্ট্য। যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম আর্থিকভাবে দুর্বল ও অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত প্রদানকে ধনীদের উপর আবশ্যক করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে ধনীদের কাছে দরিদ্রদের হক বা অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ -'আর তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।'[৫৪] আল-কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াতে সালাতের পরে যাকাত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

-'তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন।'[৫৫]

মূলত ইসলাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসম্পদ সঞ্চয় করা ও মাত্রাতিরিক্ত ভোগকে নিষিদ্ধ করেছে। ব্যক্তির কাছে যে অর্থসম্পদ রয়েছে, ইসলাম তা নিজের প্রয়োজনে খরচ করতে বলেছে নয়তো হালাল ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে বলেছে নয়তো দান করে দিতে বলেছে। যাতে করে এর মাধ্যমে গরীব ও দুঃখীদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হয়। এভাবে এক শ্রেণির মাঝেই গচ্ছিত না রেখে সম্পদ সমাজে অবিরাম আবর্তিত হতে থাকবে আর এতে করে সমাজের সর্বশ্রেণির জনগণ উপকৃত হবে এবং সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। সম্পদ জমা করে রাখার ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করেছে, তা হলো ২.৫% হারে সেই সঞ্চিত সম্পদ থেকে বের করে নির্ধারিত খাতে বিলিয়ে দেয়া। এভাবে জমাকৃত সম্পদ পবিত্র হবে এবং মানবতার উন্নয়নে কাজে লাগবে। ইসলামী অর্থনীতিতে এটাই যাকাতব্যবস্থা।

৭.১০ অপচয় নিষিদ্ধকরণ

অপচয় ঠেকাতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ইসলামী শরী'আহ। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বহু স্থানে অপচয় ও অপব্যয় রোধের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন এবং শক্তভাবে সতর্ক করেছেন। এ বিয়ষটি ইসলামী অর্থনীতির একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক। অপচয় ব্যক্তি ও সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মাত্রায় ব্যয় করার নামই অপচয়, যা আরবীতে 'ইসরাফ' বলা হয়। অন্যদিকে, অপব্যয় হচ্ছে অন্যায় ও অযৌক্তিক উপায়ে সম্পদের অপব্যবহার, যাকে আরবীতে 'তাবযীর' বলা হয়। আল-কুরআনে তাবযীর বা অপব্যয় সম্পর্কে বহু আয়াত এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا – إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

-'আর কোনো অবস্থাতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।'[৫৬]

সম্পদ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমানত। তিনি যাকে ইচ্ছা বাড়িয়ে দেন, যাকে ইচ্ছা কমিয়ে দেন। তাই সম্পদের অপচয় করা, বিনা কারণে নষ্ট করা এবং অন্যায় কাজে ব্যবহার করা সবই সম্পদের খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। সম্পদকে সঠিক কাজে ও সর্বোত্তম পন্থায় ব্যবহার করা সম্পদশালী ব্যক্তির দায়িত্ব। ইসলাম খাওয়া, পান করা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয় করার অবাধ সাধীনতা দেয়ার পাশাপাশি সম্পদ অপচয় করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এবং আহার কর ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। আল্লাহ তা'আলা অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।'[৫৭] সুতরাং আল্লাহ তা'আলার দেয়া নিয়ামতগুলোর সঠিক ও সর্বোত্তম ব্যবহার করা এবং এর বিনষ্ট ও অবমূল্যায়ন ঠেকানো ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক।

৭.১১ ব্যক্তি স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ

ব্যক্তি স্বাধীনতা মানুষের অন্যতম প্রধান অধিকার। প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা, বৈধ বিষয়ে চাহিদার ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতি ব্যক্তি স্বাধীনতাকে উন্মুক্ত করেছে। কখনো সমাজের মানুষের স্বীয় অধিকার ও স্বাধীনতা পূরণের পরিবেশ তৈরী করে দিয়েছে। কিন্তু অন্যায়, অবৈধ, অযৌক্তিক, ক্ষতিকর ও মানবতা বিধ্বংসী স্বাধীনতাকে সংকোচিত করে দিয়েছে এবং তা পূরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কারণ সৃষ্টিগতভাবে মানুষকে ভালো-মন্দ উভয় কাজ করার ইচ্ছাশক্তি দেয়ার কারণে প্রবৃত্তিগতভাবে অনেক অবৈধ চাওয়ার-পাওয়ার সৃষ্টি হয়। এই চাওয়া ও স্বাধীনতাগুলো মানবতার জন্য ক্ষতিকর ও সমাজ বিনষ্টের কারণ। তাই ইসলাম এ ক্ষেত্রে সীমারেখা বেধে দিয়েছে। অবৈধ অর্থ উপার্জনের যে চাহিদা, সুদ খাওয়ার যে চাহিদা, ঠকানো ও প্রতারণার যে চাহিদা ও স্বাধীনতা, ইসলাম তা সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। প্রবৃত্তির অনুগামী না হয়ে সত্যের অনুগামী হওয়াই ইসলামের মূলমন্ত্র। খেয়াল-খুশি ও প্রবৃত্তির অনুগামীরা তাদের প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়ে সমাজ নষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

-'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা কর না?'[৫৮]

মানবতার কল্যাণে ইতিবাচক চাওয়া ও স্বাধীনতাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে বিপরীতে মানবতার বিপর্যয় ঠেকাতে অবৈধ চাওয়া ও স্বাধীনতাগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ফলে তৈরী হয়েছে একটি স্বচ্ছ অর্থব্যবস্থা।

৭.১২ অর্থপূজা ও লোভ-লালসায় নিন্দা

বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অর্থপূজা, লোভ-লালসা, ভোগবিলাস ষোলকলায় পূর্ণ রয়েছে। মানুষ যখন বৈধতা-অবৈধতার পরোয়া না করে অর্থ উপার্জন করতে থাকে, সমাজের কল্যাণকামীতাকে উপেক্ষা করে সম্পদ সঞ্চয়ে আত্মনিয়োগ করে তখন তা অর্থপূজায় রূপ নেয়। অর্থপূজা ব্যক্তিকে স্বার্থপূজারী বানিয়ে ফেলে। তখন সে কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে ব্যবধান করতে পারে না। মানুষের চাওয়ার শেষ নেই, লোভেরও সীমানা নেই। পার্থিব জীবনে কারোই কোন ক্ষেত্রে পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়। গোটা পৃথিবী তাকে দিয়ে দেয়া

হলেও তার লোভ তখন তাকে নতুন আরেকটা পৃথিবীর চাহিদা সৃষ্টি করে দিবে। এভাবে চাহিদা ও লোভের কোন সীমান্ত ও প্রান্ত নেই। মানুষকে বেশি বেশি চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পরকাল থেকেই ভুলিয়ে রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ -حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

-'বেশির প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা কবরে চলে যাও।'[৫৯] তাই ইসলামী অর্থনীতি অর্থপূজা ও লোভ-লালসাকে নিন্দা করে অল্পতুষ্টি ও হৃদয়ের তৃপ্তিতে উৎসাহিত করেছে।

৮. ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবনবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়ার কারণে তা ব্যক্তির ঈমানের সাথেও অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। তাই ইসলামী অর্থনীতিকে অস্বীকার করলে ব্যক্তির ঈমান প্রশ্নবিদ্ধ হবে। আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেয়ার অর্থ হলো অর্থক্ষেত্রে তার দেয়া বিধানগুলোও মেনে নেয়া এবং পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তা প্রতিপালন করা। তাই ঈমানের ক্ষেত্রেই ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা প্রবল। ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে দাবি করলে তাকে ইসলামী অর্থনীতিতে সমর্পিত হতে হবে।

অন্য দিকে ব্যক্তির ইবাদাত কবূল হওয়ার জন্য হালাল উপার্জন অপরিহার্য বিষয়। রাসূল (সা) বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ، -'হারাম সম্পদে গঠিত কোনো দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' হাদীসটি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, অর্থনীতিকে ইসলামী শরী'আহর আদলে ঢেলে সাজানো ঠিক কতটা জরুরী। হালাল উপার্জন এবং এর মাধ্যমে একজন মুসলিমের পরলৌকিক সফলতা অর্জনের নিমিত্তে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বা অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা অপরীসীম।

এছাড়া আরো কিছু কারণ বা বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় ইসলাম অর্থনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরীসীম। তা হলো ইসলামী অর্থনীতি কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক। ইসলামী অর্থনীতি একটি সার্বজনীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সব যুগের সব মানুষের অধিকার পূরণের কথা বলা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির সাম্যবাদী রূপ সব মহলে প্রশংসার দাবিদার। এতে ধনী-গরীব, আশরাফ-আতরাফ, আরব-অনারব, শাসক-শাসিত ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষের হক, অধিকার ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। সর্বাধিক মুনাফা অর্জন নয় অথবা সম্পদ কুক্ষিগত করা নয়; বরং মানবকল্যাণ নিশ্চিত করা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ আমানত।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম ভোগসর্বস্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির যেমন ঘোর বিরোধী তেমনি সমাজতন্ত্রীদের ন্যায্য অর্থনৈতিক সাম্যের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে ক্ষমতার উৎস ধরে ব্যক্তি মালিকানা অস্বীকার করাকেও সমাজের জন্য অহিতকর মনে করে। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সম্পদের মূল মালিক মহান আল্লাহ্ আর মানুষ সম্পদের আমানতদার। তাকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করেছে। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ নির্দেশিত জীবন দর্শনের ভিত্তিতে মানুষকে তার জীবিকা আহরণ, আহরিত সম্পদের ন্যায্য বণ্টন এবং সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যয় ও ভোগ ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু সম্পদ আল্লাহর, তাই সে ব্যক্তিগতভাবে যে পরিমাণ সম্পত্তির মালিকানা পাবে তা আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় একমাত্র ভোগ ও খরচ করার অধিকারী হবে। বিত্তবান হলে তার সম্পত্তিতে গরীবেরও হক থাকবে। আল্লাহ বলেন, "আর তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে ভিক্ষুক ও দীনহীনদেরও অধিকার রয়েছে।"[৬০] সহজ কথায়, আল্লাহর সম্পদ আল্লাহর

প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর হুকুম অনুসারে উপার্জন, ভোগ-ব্যবহার, বিলি বণ্টন, ব্যয় করাই হলো ইসলামী অর্থনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

তথ্যনির্দেশ

১. আল-কুরআন, সূরাহ্ হুদ, ১১ : ০৬।

২. *English-Bangla Dictionary* (Dhaka: Bangla Academy, 3rd Edition, June 2015), P.258.

৩. *Wikipedia, the free encyclopedia* : https://en.wikipedia.org/wiki/Finance

৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

-'এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি, যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে এবং যাতে রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।' দ্র. সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১৪৩।

৫. সূরাহ্ ফাতির, ৩৫ : ৩২।

৬. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (বৈরূতঃ দারু তওকুন নাজাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি.), হাদীস নং ৬৪৬৩।

৭. মুসলিম ইবনুল হুজ্জাজ আন-নাইসাপুরী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূতঃ দারু ইহয়াউত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং ৮৬৬।

৮. আহমাদ ইবনু ফারিস, *মাকাইসুল লুগাহ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি.), পৃ. ১৯৪।

৯. সূরাহ্ আল-হিজর, ১৫ : ২০।

১০. ইবনু মাস'ঊদ আল বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, ৪র্থ খণ্ড (রিয়াদঃ দারু তায়্যিবাহ লিন-নাশরি ওয়াত তাওযী', ১৪১৭ হি.), পৃ.৩৭৪।

১১. মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল কুরতুবী, *আল জামি'উ লি আহকামিল কুরআন*, ১০ম খণ্ড (কায়রোঃ দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি.), পৃ. ১৩।

১২. সূরাহ্ ত্বহা, ২০ : ১২৪।

১৩. জামালুদ্দীন ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর*, ৩য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি.), পৃ. ১৮১।

১৪. তদেব।

১৫. অধ্যাপক এম. এম. আকাশ, *অর্থনীতি নবম-দশম শ্রেণি* (ঢাকাঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ২ ।

১৬. সা'দ ইবনু হামদান আল-লিহইয়ানী, *মাবাদিউল ইকতিসাদিল ইসলামী* (কায়রোঃ দারুল কিতাবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪২৮ হিজরী), পৃ. ৩; *অর্থনীতি নবম-দশম শ্রেণি*, পৃ. ২।

১৭. Alfred Marshall (1890-1920), *Principles of Political Economy*, v. 1 (London: Macmillan, 8th edition), pp. 1-2.

১৮. Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, *Economics* (McGraw-Hill International Edition, Nineteenth Edition, 2010), p.4.

---

১৯. Dominick Salvatore Ph.D & Eugene Diulio Ph.D, *Principles of Economics* (McGraw-Hill International Edition, Nineteenth Edition, 2003), p.1.

২০. Mill, John Stuart (1844), *On the Definition of Political Economy*, Essay V, in Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy (V39).

২১. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ* (রাজশাহীঃ দি রাজশাহী স্টুডেন্ট'স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ৪র্থ সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৮।

২২. ড. মুহাম্মাদ শাওকী আল-ফানজিরী, *আল-ওয়াজীযু ফিল ইকতিসাদিল ইসলামী* (মিসরঃ দারুশ শুরূফ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ১২।

২৩. তদেব।

২৪. আবুল ফাতাহ্ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন* (ঢাকাঃ কওমী প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি.), পৃ. ৬।

২৫. সূরাহ্ আল-মুল্‌ক, ৬৭ : ১৫।

২৬. সূরাহ্ আল-জুমু'আহ্, ৬২ : ১০।

২৭. সূরাহ্ আল-বাকারাহ্, ২ : ১৮৮।

২৮. সূরাহ্ আল-হাশর, ৫৯ : ০৭।

২৯. সূরাহ্ আয-যারিয়াহ্, ৫১ : ১৯।

৩০. সূরাহ্ আত-তাওবাহ্, ৯ : ৩৪-৩৫।

৩১. সূরাহ্ আল-বাকারাহ, ২ : ২৭৫।

৩২. সূরাহ্ আলে 'ইমরান, ৩ : ১৩০।

৩৩. সূরাহ্ আল-হাশর, ৫৯ : ০৭।

৩৪. মূল ভাষ্যঃ

لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ المَدِينَةَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ أُقَاسِمْكَ مَالِي نِصْفَيْنِ، وَلِيَ امْرَأَتَانِ فَأُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَدَلُّوهُ عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ قَدْ اسْتَفْضَلَهُ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَهْيَمْ؟» قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: «فَمَا أَصْدَقْتَهَا؟» قَالَ: نَوَاةً. قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

দ্র. *সুনানুত-তিরমিযী*, হাদীস নং ১৯৩৩।

৩৫. সূরাহ্ আন-নিসা, ৪ : ২৯ ।

৩৬. সূরাহ্ আলে 'ইমরান, ৩ : ১৮০ ।

৩৭. সূরাহ্ আত-তাওবাহ্, ৯ : ৩৪।

৩৮. সূরাহ্ আল-বাকারাহ্, ২ : ১১৫।

৩৯. সূরাহ্ আয-যারিয়াহ্, ৫১ : ১৯।

৪০. সূরাহ্ আল-বাকারাহ্, ২ : ২৮০।

৪১. সূরাহ্ আত-তাওবাহ্, ৯ : ১০৩।

৪২. সাইয়েদ কুতুব, *খাছাইছুত তাছাওউরুল ইসলামী ওয়া মুকাওয়ামাতুহু* (কায়রোঃ দারুশ শুরূফ, ১ম সংস্করণ, তা.বি), পৃ. ৯০।

৪৩. সূরাহ্ আয-যারিয়াহ্, ৫১ : ৫৬।

৪৪. সূরাহ্ আল-আন‘আম, ৬ : ৩৮।

৪৫. সূরাহ্ আলে-‘ইমরান, ৩ : ১৯।

৪৬. সূরাহ্ আর-রহমান, ৫৫ : ০৯।

৪৭. *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ১৯৭৫।

৪৮. সূরাহ আল-জুমু‘আহ, ৬২ : ১০।

৪৯. সূরাহ আয্-যুখরূফ, ৪৩ : ৩২।

৫০. সূরাহ আল-কাসাস, ২৮ঃ ৫।

৫১. সূরাহ আল-কাসাস, ২৮ : ৭৭।

৫২. *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ৬০১৫।

৫৩. সূরাহ আশ-শূরা, ৪২ : ১২।

৫৪. সূরাহ আয-যারিয়াহ্, ৫১ : ১৯।

৫৫. সূরাহ আল-বাকারাহ্, ২ : ১১০।

৫৬. সূরাহ বানী ইসরাঈল, ১৭ : ২৭।

৫৭. সূরাহ আল-আ‘রাফ, ৭ : ৩১।

৫৮. সূরাহ আল-জাছিয়া, ৪৫ : ২৩।

৫৯. সূরাহ আত-তাকাছুর, ১০২ : ১-২।

৬০. সূরাহ আয-যারিয়াহ্, ৫১ : ১৯।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

আল-কুরআনে বর্ণিত যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মো. আশরাফুল ইসলাম*

Abstract: Islam is a complete code of life. There are clear directions of Islam for personal, social, cultural, economical and political life. In all these cases, economic life is very important. Because of the activities of people's daily life are somehow related to the economy. In the context of a full life, Islam has also discussed the issues related to the economy. An important branch of the Islamic economy is the Zakat system which is considered as the third pillar of Islam. Zakat is a religious duty for all Muslims who meet the necessary criteria of wealth. As regards the expenditure of income from Zakat, eight sections are mentioned in the glorious Qur`an. The Qur`an says, "Alms are for the poor and the needy, and those employed to administer the [funds]; for those whose hearts have been [recently] reconciled [to the truth]; for those in bondage and in debt; in the cause of Allah; and for the wayfarer. [thus is it] ordained by Allah and Allah is full of knowledge and wisdom." [9:60] In the verse mentioned above, the following eight sections are described who are entitled to receive Zakat. 1. The poor and impoverished, 2. The needy, 3. The collectors of Zakat, 4. New Muslims to Win over of hearts to Islam, 5. Ransoming of slaves, 6. Helping the debtors, 7. The Way of Allah and 8. Hospitality to wayfarers. In short, it may be said that Zakat is a significant matter in the Islamic Shari`ah. So to focus the heads of expenditure of Zakat described in the holy Qur`an are the main content of this article.

ভূমিকা

ইসলাম একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যে জীবন ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রয়েছে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। আর এ সকল ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজকর্ম কোন না কোনভাবে অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। এজন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামেও অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থা, যা ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ বা রুকন হিসেবে বিবেচিত। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে ঈমান, নামায এবং রোযা সকলের জন্য আবশ্যক হলেও হজ্জ এবং যাকাত শুধুমাত্র শর্তসাপেক্ষে[১] ফরয অর্থাৎ তা কেবল সম্পদশালীদের জন্য ফরয। যাকাতের বিধান ইসলামী শরীয়তের মূল চারটি উৎস তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের বিধান অপরিহার্য বিধায় এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে। এ সকল আয়াতে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দানের পাশাপাশি যাকাত ব্যয়ের খাত সম্পর্কেও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং যে সকল ব্যক্তির উপর যাকাত আদায় করা ফরয তাদের জন্য এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। আলোচ্য প্রবন্ধে যাকাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের পর যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে।

* এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

যাকাতের পরিচয়

যাকাত (زَكَاة) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে زَكَوَاتٌ।[২] আভিধানিক অর্থে যাকাত শব্দটি পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা, প্রাচুর্য, বৃদ্ধি, বরকত, বর্ধিত হওয়া, অতিরিক্ত, প্রশংসা, সংশোধন প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।[৩] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো, purification,[৪] purity, honesty, justification[৫] ইত্যাদি। আল-কুরআনে যাকাত (زَكَاة) শব্দটি পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,[৬] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ -'যে ব্যক্তি পবিত্রতা অবলম্বন করেছে সে-ই সফলকাম হয়েছে।' অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,[৭] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ -'যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সে-ই সফলকাম হয়।'

পরিভাষায়, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে খুশি করার নিমিত্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাস-দাসী ব্যতিত নির্দিষ্ট শ্রেণির হকদারকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।[৮]

সায়্যিদ সাবিক (র) (১৩৩৫-১৪২০ হি.) বলেন,

اَلزَّكَاةُ اِسْمٌ لما يُخْرِجُهُ الْإِنْسَان مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ.[৯]

-'আল্লাহ্ তা'আলার এমন প্রাপ্যকে যাকাত বলা হয়, যা অসহায়দেরকে প্রদান করা হয়।'

ইব্ন 'আবিদীন আদ্-দিমাশকী (র) (১১৯৮-১২৫২ হি.) বলেন,

تَمْلِيكُ الْمَالِ: أَيْ الْمَعْهُودِ إِخْرَاجُهُ شَرْعًا مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يُدْفَعُ لِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ لِلَّهِ تَعَالَى بَيَانٌ لِاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ[১০]

-'কোন প্রকার উপকারের নিয়্যত ব্যতিত (হাশেমী বংশ ও তাদের দাস-দাসী ব্যতিত অন্য) দরিদ্র মুসলিমদেরকে বার্ষিক নিসাবের নির্দিষ্ট অংশের মালিক বানিয়ে দেয়াকে যাকাত বলা হয়।'

'আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী (র) (১২৯৯-১৩৬০ হি.) বলেন,

تَمْلِيْكُ مَالٍ مَخْصُوْص لِمُسْتَحقّه بَشَرَائِطٍ مَخْصُوْصَة[১১]

-'নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদ নির্দিষ্ট শ্রেণির হকদারকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে[১২] মালিক বানিয়ে দেয়ার নামই হচ্ছে যাকাত।'

যাকাতের বিধান ইসলামী শরীয়তের মূল চারটি উৎস তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে যাকাত সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾[১৩]

-'আর তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে যারা অবনত হয়।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত অনাদায়ের করুণ পরিণতি উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾[১৪]

-'আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের বর্ণিত আছারেও যাকাত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিষদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যাকাতের বিধান ফরয হওয়ার ব্যাপারে সকল মুসলমান ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। এতদ্ব্যতিত বিষয়টি কিয়াস তথা যুক্তির মানদণ্ড দ্বারাও প্রমাণিত।

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

মাসারিফুয্-যাকাত (مَصَارِفُ الزَّكَاةِ) শব্দটি একটি যৌগিক শব্দ। প্রথমত মাসারিফ (مَصَارِفٌ) শব্দটি مَصْرَف এর বহুবচন। এর অর্থ, ব্যয়ের খাত, ব্যাংক, প্রবাহ, পথ, নালা, নর্দমা,[১৫] ব্যয় করা, বণ্টন করা, অতিবাহিত করা, প্রদান করা, খরচ করা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত زَكَاة শব্দটির অর্থ, পবিত্রতা, প্রাচুর্য, বৃদ্ধি, বরকত, প্রশংসা,[১৬] Purification,[১৭] Purity, honesty, justification[১৮] ইত্যাদি। সুতরাং মাসারিফুয্-যাকাত (مَصَارِفُ الزَّكَاةِ) অর্থ হলো, যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ, যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ, যাকাত প্রদানের খাতসমূহ, যাকাত ব্যয়ের জায়গা বা স্থানসমূহ।

পরিভাষায়, যাকাতের অর্থ-সম্পদ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত ও সুনির্ধারিত শ্রেণিকে মাসারিফুয্-যাকাত (مَصَارِفُ الزَّكَاةِ) বলা হয়। অর্থাৎ আল-কুরআনের সূরা আত্-তাওবার ৬০ নং আয়াতে যে আট শ্রেণির লোকদেরকে যাকাত প্রদানের খাত হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তারাই হলো মাসারিফুয্-যাকাত (مَصَارِفُ الزَّكَاةِ)।

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (র) (১২৪৮-১৩০৭ হি.) বলেন,

هِيَ ثَمَانِيَة كَمَا فِي الْآيَةِ، وَتحرِم عَلَى بَنِي هَاشِم وَمَوَالِيْهِمْ، وَعَلَى الْأَغْنِيَاءِ، وَالْأَقْوِيَاءِ الْمكتسبين.[১৯]

-'সেগুলো (যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ) আটটি, যা (আল-কুরআনের) আয়াতে রয়েছে। আর তা (যাকাতের সম্পদ) বনূ হাশিম, তাদের অধীনস্থ গোলাম, ধনী ও সামর্থ্যবানদের জন্য হারাম।'

মুহাম্মাদ মুখতার আশ্-শানকীতী (র) (১৯৪২-২০১৯ খ্রি.) বলেন,

مَصَارِفُ الزَّكَاة، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ بَيَانٌ مِنَ الْمُسْتَحَقّ لِأَخذ الزَّكَاة.[২০]

-'যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত হকদারদের বর্ণনাকে মাসারিফুয্-যাকাত (مَصَارِفُ الزَّكَاةِ) বা যাকাতের খাতসমূহ বলা হয়।'

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন; কিন্তু তাদের সকলকে একই রকম অবস্থা দান করেননি। কাউকে বিপুল সম্পদের মালিক করেছেন তো আবার কাউকে করেছেন নিঃস্ব। এ সকল অবস্থা প্রদান করার কারণ হলো মানুষকে পরীক্ষা করা। অর্থাৎ যারা নিঃস্ব তারা তাদের এ অবস্থার উপর আল্লাহ্ তা'আলার উপর আস্থা বা ভরসা করে কি-না? এবং যারা সম্পদশালী তারা তাদের সম্পদ থেকে দরিদ্র ও নিঃস্বদের অধিকার আদায় করে কি-না? এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্ তা'আলা ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের হক নির্ধারণ করেছেন। উক্ত হক আদায়ের জন্যই যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এ যাকাত ঢালাওভাবে সকল মুসলমানের উপর ফরয নয়; বরং যে ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে, তার উপর যাকাত ফরয। আর যাকাত আদায়ের পর তা যথাযথভাবে ব্যয়ের জন্য আল-কুরআন ও হাদীসে

নির্দিষ্ট কতিপয় খাতের কথা বিধৃত হয়েছে। যাকাত ব্যয়ের আটটি খাতের পরিচয় প্রদান করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[২১]

-'নিশ্চয়ই যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে; এই হলো আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ঐকমত্যে অত্র আয়াতে সেই ওয়াজিব সাদকার খাতগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা মুসলমানদের জন্য নামাযের মতই ফরয। কারণ এ আয়াতে নির্ধারিত খাতগুলো ফরয সাদকারই খাত। আর হাদীসের ভাষ্যমতে, নফল সাদকা শুধু আট প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আরও প্রশস্ত। ইমাম কুরতুবী (র) (৬০০-৬৭১ হি.) বলেন, আল-কুরআনের যে সকল স্থানে সাদকা শব্দের ব্যবহার হয়েছে, সেখানে নফল সাদকার কোন নিদর্শন না থাকলে ফরয সাদকাই উদ্দেশ্য হবে। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে إِنَّمَا (কেবল) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই শুরু থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, সাদকার যে সকল বর্ণনা সামনে দেয়া হচ্ছে কেবল সে খাতগুলোতেই সকল ওয়াজিব সাদকা ব্যয় করা হবে। এছাড়া অন্য কোন ভালো খাতেও ওয়াজিব সাদকা ব্যয় করা যাবে না। যেমন- জিহাদের প্রস্তুতি, মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ কিংবা জনকল্যাণমূলক সংস্থা প্রভৃতি।[২২]

আলোচ্য আয়াতে যাকাতের আটটি ব্যয়খাতের মধ্যে প্রথম চারটি ব্যয়ের খাত লাম (لَامْ) বর্ণের আওতায় বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরবর্তী চারটি ব্যয়খাতের শিরোনাম পরিবর্তন করে লাম (لَامْ) এর পরিবর্তে ফী (فِي) ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ বর্ণনাভঙ্গির কারণ সম্পর্কে আল্লামা যামাখশারী (র) (৪৬৭-৫৩৮ হি.) বলেন, এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, শেষের এ চারটি ব্যয়খাত প্রথম চারটি ব্যয়খাতের তুলনায় বেশি হকদার। কারণ ফী (فِي) হরফটি পাত্রকে বুঝানোর জন্য বলা হয়। ফলে তার অর্থ দাড়ায়, "যাকাতের সম্পদসমূহ সে সকল লোকদের মাঝে রেখে দেয়া উচিত।"[২৩] তাদের অধিকতর হকদার হওয়ার কারণ এই যে, প্রয়োজনীয়তা তাদেরই অধিক। কেননা যে লোক কারো মালিকানাধীন দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, সে সাধারণ ফকীর-মিসকীনের তুলনায় অধিক কষ্টে রয়েছে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কারো কাছে ঋণী সেও সাধারণ ফকীর-মিসকীনের তুলনায় অধিক অভাবে থাকে। কেননা নিজের দৈনন্দিন ব্যয়ভারের তুলনায় বেশি চিন্তা থাকে তার পাওনাদারের প্রতি।[২৪]

আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ অজ্ঞ মুনাফিকদের বর্ণনা দিয়েছেন যারা সাদকা বন্টনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর আপত্তি উঠিয়েছিলেন। এখন এ আয়াতে বর্ণনা করছেন যে, যাকাতের মাল বন্টন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং যাকাত বন্টন করার ক্ষেত্রগুলো স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[২৫]

যিয়াদ ইব্ন হারিছ আস্-সুদাঈ (রা) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করি। অতঃপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমাকে যাকাতের কিছু মাল দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতের (মাল ব্যয়ের ব্যাপারে) তাঁর নবী ও অন্যের নির্দেশের উপর সন্তুষ্ট হননি; বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বয়ং নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তা আট শ্রেণির লোকের মধ্যে বিভক্ত করেছেন। যদি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও তবে আমি অবশ্যই তোমাকে তোমার হক প্রদান করব।'[২৬]

বুরহান উদ্দীন 'আলী আল-মারগীনানী (র) (৫৩০-৫৯৩ হি.) বলেন, যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের ভিত্তি হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الخ﴾। এ আয়াত অনুযায়ী যাকাতের খাত মোট আট প্রকার। তন্মধ্যে 'যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়' (مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْب) শ্রেণিটি রহিত হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। আর এর উপর ইজমা সংগঠিত হয়েছে।[২৭]

যাকাতের উল্লিখিত আটটি খাত ব্যতিত অন্য কোন খাতে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করা যাবে না। যদি কেউ এর বাহিরে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করে তাহলে তার যাকাত আদায় ধর্তব্য হবে না। এজন্য যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাই নিম্নে আল-কুরআনে বর্ণিত যাকাতের আটটি খাত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. ফকীর

ফকীর (فَقِيْر) শব্দটি (فقر) মূলধাতু থেকে উদ্ভূত। এটি একবচন, বহুবচনে فُقَرَاء, فَقِيْرَاتٌ, فَقَائِرُ, فِقَرٌ। ফকীর (فَقِيْر) শব্দের শাব্দিক অর্থ, মুখাপেক্ষী, অভাবগ্রস্ত, অভাবী, গরীব, দরিদ্র,[২৮] poor,[২৯] poverty-stricken, poor man, pauper[৩০] ইত্যাদি। আল-কুরআনেও ফকীর (فَقِيْر) শব্দটি অনুরূপ অর্থে একবচন ও বহুবচন উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾[৩১]

-'অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার করো এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,[৩২] ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ -'আর (জেনে রাখ) আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত।'

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,[৩৩] ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ -'হে মানবজাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ্; তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।'

ফকীর শব্দের পরিচয় দানে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে তারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

ক. 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) (মৃ. ২৩ হি.) বলেন,[৩৪] اَلْفَقِيرُ لَيْسَ بِالَّذِي لَا مَالَ لَهُ، وَلَكِنَّ الْفَقِيرَ الْأَخْلَقُ الْكَسْبِ -'যার কোন সম্পদ নেই শুধু তাকেই ফকীর বলা হয় না; বরং যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে, কিছু পানাহারও করছে এবং কিছু আয়-উপার্জনও করছে সেও ফকীর।'

খ. ইমাম আবূ হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.)-এর মতে,[৩৫] اَلْفَقِيرُ مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ -'যার সামান্য পরিমাণ সম্পদ আছে তাকে ফকীর (فَقِيْر) বলা হয়।' অর্থাৎ ফকীর (فَقِيْر) বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যার নিকট গচ্ছিত সম্পদ তার প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। অথবা তার নিকট গচ্ছিত সম্পদ নিসাব পরিমাণ সম্পদের তুলনায় কম অথবা নিসাব পরিমাণ বটে; কিন্তু তা বৃদ্ধিযোগ্য সম্পদ নয় অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয় অর্থাৎ বিভিন্ন চাহিদার মধ্যে সে আবদ্ধ।[৩৬]

গ. ইমাম শাফি'ঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.) ও ইমাম আহমাদ (র) (১৬৪-২৪১ হি.)-এর মতে,[৩৭] هُوَ مَنْ لَيْسَ لَهُ مَال وَلَا كَسْب يَقَعُ مَوْقِعاً مِنْ كِفَايَتِهِ، أَوْ حَاجَتِهِ -'ফকীর (فقير) হলো ঐ ব্যক্তি, যার জীবন ধারণের উপযোগী অত্যাবশ্যকীয় কোন সম্পদ কিংবা উপার্জনের কোন ব্যবস্থা নেই, যা দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। এমনকি এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের কোন উপায়ও তার নেই।'

ঘ. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী (র) (২২৪-৩১০ হি.) বলেন, الْمُتَعَفِّف مِنْهُمُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ، وَالْمُتَذَلِّل مِنْهُمُ الَّذِي يَسْأَلُ -'সেই অভাবগ্রস্থ ব্যক্তি, যে নিজেকে সর্বপ্রকারের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করে চলছে এবং যে কারো নিকট প্রার্থনা করে না। আর মিসকীন হলো লাঞ্ছনাগ্রস্ত অভাবী ব্যক্তি, যে ভিক্ষা করে বেড়ায়।' এ মতের সমর্থনে তিনি আল-কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদীদের প্রসঙ্গে বলেন,[৩৮] ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ -'তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।'[৩৯]

ঙ. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী (জন্ম ১৯২৬ খ্রি.) বলেন, 'ফকীর সেই মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে বলে, যে মানুষের নিকট সাওয়াল করে না বা হাত পাতে না।'[৪০]

মূলত ফকীর শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজে বসবাসকারী যে সকল ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহের কোন উপায়-উপকরণ নেই, যারা সর্বতোভাবেই সহায়-সম্বলহীন তারাই ফকীর। এককথায়, ফকীর বলতে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বুঝায়, যাদের স্বাভাবিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ পূরণার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ বা বৈধভাবে উপার্জনের সন্তোষজনক কোন উপায় নেই। কোন শারীরিক ত্রুটি বা বার্ধক্যজনিত কারণে কেউ স্থায়ীভাবে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে এবং সাহায্য-সহায়তা পেলে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এ পর্যায়ের সব ধরনের অভাবী লোকের জন্য সাধারণভাবে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৪১] যেমন- এতিম শিশু, বিধবা নারী, উপার্জনহীন বেকার এবং এমন সব লোক যারা সাময়িক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে।

মোটকথা, ফকীর হলো সমাজের একটি অবহেলিত দরিদ্র শ্রেণি। তাদের সাহায্যার্থে যাকাত প্রদানকারীদের এগিয়ে আসা কর্তব্য। আল-কুরআনেও আল্লাহ্ তা'আলা ফকীর বা অভাবগ্রস্তদেরকে দান করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে বলেন,

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾[৪২]

-'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি তোমরা গোপনে দান-খয়রাত কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কতিপয় গুনাহ দূর করে দিবেন। বস্তুত তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অবহিত আছেন।'

২. মিসকীন

মিসকীন (مِسْكِين) শব্দটি (سكن) মূলধাতু থেকে নির্গত। এটি একবচন, বহুবচনে মাসাকীন (مَسَاكِين)। এর অর্থ হলো, নিঃস্ব, অসহায়, অতি দরিদ্র, সর্বহারা, দীন, বেচারা,[৪৩] a poor person,[৪৪] poor, miserable, beggar, humble, submissive, servile[৪৫] ইত্যাদি। মিসকীন (مِسْكِين) শব্দটি আল-কুরআনেও অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾[৪৬]

-'আর তারা মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করত না।'

মিসকীন শব্দের পরিচয় দানে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.)-এর মতে,[৪৭] اَلْمِسْكِيْنُ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ -'যার কিছুই নেই তাকে 'মিসকীন (مِسْكِيْن) বলে।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের জন্য অন্যের নিকট যাঞ্ছা করতে বাধ্য।

খ. ইমাম শাফি'ঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.) ও ইমাম আহমাদ (র) (১৬৪-২৪১ হি.)-এর মতে,

هُوَ الَّذِيْ يقدِر عَلَى كَسْب مَا يسد مسداً مِنْ حَاجَتِهِ، وَلَكِنْ لَا يكفِيْهِ، كَمَنْ يحتَاجُ إِلَى عَشَرَة وَعِنْدَهُ ثَمَانِيَة لَا تكفِيْهِ الْكِفَايَة اللَّائِقَة بِحَالِهِ مِنْ مُطْعِمٍ وَمُلبسٍ وَمسْكنٍ.[৪৮]

-'মিসকীন (مِسْكِيْن) বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যার নিকট তার প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা আছে; কিন্তু তা তার জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন- কোন ব্যক্তির দশ টাকার প্রয়োজন; কিন্তু সে খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থানের জন্য আট টাকার ব্যবস্থা করতে পেরেছে।'

গ. কাতাদা (র) (৬০-১১৭ হি.) বলেন,[৪৯] الْفَقِيرُ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ وَالْمِسْكِينُ الصَّحِيحُ الْجِسْمِ -'ফকীর হচ্ছে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং মিসকীন হচ্ছে সুস্থ-সবল লোক।'

ঘ. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র) (১১৪৩-১২২৫ হি.) বলেন, 'ফুকারা শব্দের পরে উল্লেখ করা হয়েছে মাসাকীন শব্দটি। এতে করে বুঝা যায় যে, মিসকীনেরাও ফকীরদের অনুবর্তী বা অন্তর্ভুক্ত। এখানে সাধারণভাবে ফকীর শব্দটি উল্লেখ করে পরক্ষণে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে মিসকীনদেরকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾[৫০]

-'তোমরা নামাযের সংরক্ষণ করো, বিশেষভাবে সংরক্ষণ করো মধ্যবর্তী নামাযের।'[৫১]

মিসকীন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'যারা মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায় এবং দু-এক গ্রাস খাবার বা দু-একটা খেজুর ভিক্ষা নিয়ে ফিরে যায় তারা মিসকীন নয়। এ কথা শুনে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! তাহলে মিসকীন কে? তিনি বললেন, (ঐ ব্যক্তি হলো প্রকৃত মিসকীন) মানবীয় মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর মত যার সামর্থ্য নেই; সমাজের মানুষও তাকে অভাবী বলে জানে না, যাতে তাকে দান করতে পারে। আর এরূপ ব্যক্তি নিজ থেকেও কারো কাছে কিছু চায় না।'[৫২] হাদীসে উল্লিখিত গুণের অধিকারী ব্যক্তিগণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾[৫৩]

-'দান-খয়রাত ঐ সকল গরীব লোকদের জন্য, যারা আল্লাহ্র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে; ফলে জীবিকার সন্ধানে তারা অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। যাঞ্ছা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে

অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। আর তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবশ্যই পরিজ্ঞাত।'

মিসকীন (مِسْكِيْن) শব্দের শাব্দিক অর্থের মধ্যেই অভাব, অসহায়তা, দীনতা, দুর্ভাগ্য, পীড়িত ও লাঞ্ছনা অর্থ নিহিত রয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে সাধারণ অভাবীদের তুলনায় যাদের অবস্থা বেশি শোচনীয় তারাই মিসকীন হিসেবে খ্যাত। নবী করীম (সা) মিসকীন (مِسْكِيْن) শব্দটির ব্যাখ্যা করে এমন কতিপয় ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করার পরামর্শ প্রদান করেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ লাভ করতে সমর্থ হয়নি। ফলে তারা চরম অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে; কিন্তু তাদের পদমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ তাদেরকে অন্যের নিকট হাত পাতা থেকে বিরত রেখেছে। আবার তাদের বাহ্যিক অবস্থাও এমন নয় যে, কেউ তাদেরকে দেখে অভাবী মনে করে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিবে। এজন্যই কুরআন ও হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ-সম্পদ উপার্জন করতে সক্ষম হয় না, যাকে সাহায্য করার জন্য চিহ্নিত করা যায় না এবং যে নিজ থেকে কোন ব্যক্তির নিকট সাহায্যও চায় না, সে ব্যক্তিই প্রকৃত মিসকীন। অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি দরিদ্র হলেও একজন সম্ভ্রান্ত, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও ভদ্র মানুষের গুণে গুণান্বিত। এরূপ ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে তারা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হবে। তাই বিত্তবানদের কর্তব্য হলো তাদেরকে চিহ্নিত করে যথোপযুক্ত সাহায্য-সহযোগিতা করা।

ফকীর ও মিসকীনের তুলনামূলক আলোচনা

আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহে ফকীর ও মিসকীনের কথা একইসাথে উল্লেখ করেছেন। শব্দ দুটির পরিচয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফকীর ও মিসকীন উভয়ই দরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু তাদের মধ্যে কার অবস্থা বেশি শোচনীয় এ নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.) ও ইমাম মালিক (র) (৯৩-১৭৯ হি.)-এর মতে,[৫৪] اَلْمِسْكِيْنُ أَسْوَأُ حَالاً مِنَ الْفَقِيْرِ -'ফকীরের তুলনায় মিসকীনের অবস্থা গুরুতর।' এ মতের স্বপক্ষে তাঁরা দলীল হিসেবে আল-কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ – يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ – أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾[৫৫]

-'অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে এতিম আত্মীয়কে বা ধুলি-ধুসরিত মিসকীনকে অন্নদান করা।'

আয়াতের মর্মার্থ হলো মিসকীন ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় স্বীয় পেট মাটিতে লাগায়। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মিসকীনের নিকট ক্ষুধা নিবারণের মত খাদ্য থাকে না এবং শরীর আবৃত করার মত কোন কাপড়ও থাকে না। সুতরাং মিসকীনের অবস্থা ফকীরের তুলনায় সংকটাপন্ন বলে সাব্যস্ত হলো। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾[৫৬]

-'দান-খয়রাত ঐ সকল গরীব লোকদের জন্য, যারা আল্লাহ্র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে; ফলে জীবিকার সন্ধানে তারা অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। যাঞ্ঞা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে

অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। আর তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত।'

উপর্যুক্ত আয়াতে এমন ব্যক্তিকে ফকীর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যে ব্যক্তি যাঞ্ঝা করে না। ফলে অজ্ঞ লোকেরা তাকে ধনী মনে করে। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন তার বাহ্যিক অবস্থা ভালো হবে। আর বাহ্যিক অবস্থা ভালো হওয়ার জন্য ফকীরের নিকট সামান্য কিছু হলেও সম্পদ থাকা দরকার। এ থেকেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতটি সাব্যস্ত হয়।[৫৭]

এতদ্ব্যতিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, ফকীরের তুলনায় মিসকীনের অবস্থা শোচনীয়। 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানের (শাসক নিয়োগ করে) পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর সাদকা (যাকাত) ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া হবে। তোমার এ কথা যদি তারা মেনে নেয়, তবে (কেবল) তাদের উত্তম মাল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে এবং মাযলূমের বদ-দোয়াকে ভয় করবে। কেননা তার (বদ-দোয়া) এবং আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা থাকে না।'[৫৮]

অত্র হাদীস থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, ফকীর হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই। অথচ এখানে মিসকীনের কথা আলোচিত হয়নি। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ফকীরের তুলনায় মিসকীন অধিক দরিদ্র ও অসহায়। কারণ ফকীরকে যখন যাকাত প্রদানের কথা বলা হয়েছে তখন তার থেকে আরো দরিদ্র তথা মিসকীন ব্যক্তিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

খ. ইমাম শাফি'ঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.) ও ইমাম আহমাদ (র) (১৬৪-২৪১ হি.)-এর মতে,[৫৯] اَلْفَقِيْرُ أَسْوَأَ حَالاً مِنَ الْمِسْكِيْن -'মিসকীনের তুলনায় ফকীরের অবস্থা গুরুতর।' এ মতের স্বপক্ষে তাঁরা দলীল হিসেবে আল-কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾[৬০]

-'নৌকাটির ব্যাপারে সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করার ইচ্ছা করলাম। কেননা তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বল প্রয়োগে প্রতিটি নৌকা ছিনিয়ে নিত।'

আলোচ্য আয়াতে হযরত খিযীর (আ) যে নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করেছিলেন তা ছিল মিসকীনদের। কেননা এ আয়াতে নৌকার মালিকদেরকে মিসকীন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মিসকীনের নিকট সামান্য পরিমাণ হলেও সম্পদ থাকে। আর ফকীরের নিকট কিছুই থাকে না। সুতরাং মিসকীনের তুলনায় ফকীরের অবস্থা অধিক সংকটাপন্ন ও গুরুতর।[৬১]

ইমাম শাফি'ঈ (র) ও ইমাম আহমাদ (র) কর্তৃক উত্থাপিত দলীলের জবাবে হানাফীগণ তিনটি জবাব প্রদান করেছেন।

প্রথম জবাব: নৌকার মালিকদেরকে অনুগ্রহ ও দয়ার দৃষ্টিতে মিসকীন বলা হয়েছে। যেমন- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার দোয়ার মধ্যে বলেছিলেন,

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِينِ يَوْمَ القِيَامَةِ[৬২]

-'হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে মিসকীন হিসেবে জীবিত রাখ, মিসকীন হিসেবেই মৃত্যু দাও এবং কিয়ামত দিবসে মিসকীনদের দলভুক্ত করেই আমার হাশর করো।'

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মিসকীন হওয়ার দোয়া করেছেন। অথচ তিনি দরিদ্রতা ও সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য দোয়া করতেন। এ দুটি বিষয়ের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে দরিদ্রতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন তা ছিল অন্তরের দরিদ্রতা, ভিক্ষাবৃত্তি ও ফিতনা থেকে। আর মিসকীন হওয়ার দোয়া ছিল আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ধৈর্য, তাওয়াক্কুল, দয়া, রহমত প্রভৃতি কামনার জন্য। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এমন মিসকীন করো, যে দয়া ও রহমতের যোগ্য।

দ্বিতীয় জবাব: ঐ নৌকা মিসকীনদের ছিল না; বরং তারা ভাড়া খাটত। এক্ষেত্রে আয়াতের মর্মার্থ হবে, হযরত খিযীর (আ) নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করেছিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, যেন মিসকীনদের উপার্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে না যায়। কেননা তিনি যদি নৌকাটিকে ত্রুটিমুক্ত করে রেখে যেতেন, তাহলে অত্যাচারী শাসক তার অভ্যাস অনুযায়ী তা আত্মসাৎ করত। ফলে মিসকীনরা উপার্জন করতে অক্ষম হয়ে পড়ত।

তৃতীয় জবাব: এটি ছিল ধার করা নৌকা। বালকরা এটির মালিক ছিল না। যাই হোক আয়াতটি এ কথার প্রমাণ বহন করে না যে, মিসকীনের নিকট কিছু হলেও থাকে।[৬৩]

ফকীর ও মিসকীন একই শ্রেণিভুক্ত কি-না?

সূরা আত্-তাওবায় বর্ণিত আয়াত অনুযায়ী ফকীর ও মিসকীনকে যাকাত প্রদানের ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। সকলের ঐকমত্যে ফকীর ও মিসকীন উভয়ই যাকাত পাওয়ার হকদার। আল-কুরআনে বর্ণিত ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الخ﴾ -আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে ফকীর অতঃপর মিসকীন শব্দটি উল্লেখ করেছেন। দারিদ্র এবং যাকাতের হকদার হিসেবে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু আয়াতে উল্লিখিত فُقَرَاءِ ও مَسَاكِين শব্দ দুটির মাঝে আল্লাহ্ তা'আলা (واو) অব্যয় ব্যবহার করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শব্দ দুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী একটি শব্দকে অপরটির সাথে সংযুক্ত করলে শব্দ দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই এখানেও ফকীর ও মিসকীন শব্দ দুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৬৪]

ফকীর ও মিসকীন স্বতন্ত্র দুটি শ্রেণি নাকি একই শ্রেণি? এ সম্পর্কে ফকীহগণের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.)-এর মতে, اَلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين দ্বারা দুটি পৃথক শ্রেণির হকদারকে বুঝায়। অর্থাৎ ফকীর ও মিসকীন দুটি স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির শ্রেণি। কেননা আল-কুরআনে শব্দ দুটি পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

খ. ইমাম আবূ ইউসুফ (র) (১১৩-১৮২ হি.)-এর মতে, اَلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين শব্দ দুটি দ্বারা একই শ্রেণিভুক্ত হকদারকে বুঝায়। অর্থাৎ ফকীর ও মিসকীনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নেই, তারা স্বতন্ত্র কোন শ্রেণি নয়; বরং একই শ্রেণিভুক্ত।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মধ্যকার এরূপ মতপার্থক্যের ফলাফল নিম্নোক্ত উদাহরণে প্রকাশ পাবে। যেমন- কোন ব্যক্তি তার সমুদয় সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ করিম নামক এক ব্যক্তি, ফকীর এবং মিসকীন এ তিন শ্রেণির জন্য অসিয়ত করল। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে,

উক্ত এক-তৃতীয়াংশ সম্পদকে দুই ভাগ করে এক ভাগ করিমকে এবং অন্যভাগ ফকীর ও মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করা হবে। কেননা, তাঁর মতে ফকীর ও মিসকীন একই শ্রেণির। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, উক্ত এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ তিন ভাগে ভাগ করে এক অংশ করিমকে, এক অংশ ফকীরদেরকে এবং অন্য অংশ মিসকীনদেরকে দেয়া হবে। কেননা তাঁর মতে ফকীর ও মিসকীন স্বতন্ত্র দুটি শ্রেণি।[৬৫]

৩. যাকাত বিভাগের কর্মচারী

‘আমিল (عَامِل) শব্দটি ‘আমালুন (عَمَلٌ) মূলধাতু থেকে উদ্ভূত। এটি একবচন, বহুবচনে ‘আমিলীন (عَامِلِيْن), ‘আমিলূন (عَامِلُوْن) এবং ‘উম্মাল (عُمَّال) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো, কর্মচারী, চাকর, শ্রমিক, গভর্নর, কর্মী, আমলকারী,[৬৬] work, work-man, laborer, employee, governer[৬৭] ইত্যাদি।

পরিভাষায়, যে সকল কর্মচারী যাকাত ও উশর আদায়ের নিমিত্তে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয় তাদেরকে ‘আমিলীন (عَامِلِيْن) বলে। অর্থাৎ যারা যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থেকে যাকাত আদায়, যাকাত বিতরণ, যাকাতের সম্পদের হিসাব সংরক্ষণ এবং তাদের উপর অর্পিত যাকাত দফতরের বিভিন্ন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে।[৬৮]

‘আমিলীন (عَامِلِيْن) বা যাকাত বিভাগে নিয়োজিত কর্মচারীগণকে রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত করা হয় এবং তাদের পারিশ্রমিক যাকাতের খাত থেকেই আদায় করা হয়। এর কারণ হলো, আল্লাহ্ তা‘আলা মুসলমানদের থেকে যাকাত ও অপরাপর সাদকা আদায়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾[৬৯]

-‘(হে রাসূল!) আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদকা আদায় করুন, যেন এর মাধ্যমে আপনি সেগুলোকে পবিত্র ও বরকতময় করতে পারেন।’

এ আয়াত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবর্তমানে তাঁর উত্তরাধিকারী খলীফা বা আমীরুল-মুমিনীনের উপর যাকাত ও সাদকা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়। বলাবাহুল্য সহকারী ব্যতিত শুধু আমীরের পক্ষে এ বিরাট দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا বা যাকাত আদায়কারী বলতে সে সকল সহকারীদের কথাই বুঝানো হয়েছে। এজন্য নবী করীম (সা) বহু সাহাবীকে বিভিন্ন স্থানে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করতেন এবং আদায়কৃত যাকাত থেকেই তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করতেন।[৭০]

যাকাত আদায়ের কর্মচারীদের পারিশ্রমিক যাকাতের সম্পদ থেকে দেয়ার ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কেননা তারা যাকাত দফতরের কাজে নিয়োজিত থেকে অধিকাংশ সময় এ কাজে ব্যয় করে বিধায় তাদের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব রাষ্ট্রের সরকারের উপর বর্তায়। এতদ্ব্যতিত তারা যেন বিত্তবানদের নিকট থেকে যাকাত ব্যতিত অন্য কিছু গ্রহণ না করে এবং এরূপ কোন প্রয়োজনও যেন তারা অনুভব না করে সে জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপরন্তু এ ব্যবস্থা দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, যাকাত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অর্থাৎ যাকাতের আয় দ্বারাই যাকাত বিভাগ পরিচালিত হয়। অন্য কোন উৎসের উপর নির্ভর করতে হয় না। এই ব্যবস্থার সাথে জড়িত সকলের প্রয়োজন এখান থেকেই পূর্ণ হবে। এ কারণে যাকাত হতেই তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরি প্রদান করার জন্য আল-কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি হাদীসেও এ সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

‘আতা ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ، [৭১]

-‘সম্পদশালীর যাকাত নেয়া বৈধ নয় পাঁচ শ্রেণির লোক ব্যতিত। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদরত ব্যক্তি, যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যে ব্যক্তি যাকাতের মাল নিজ অর্থ দ্বারা ক্রয় করে এবং মিসকীন প্রতিবেশী, যে তার প্রাপ্ত যাকাত থেকে ধনী ব্যক্তিকে উপঢৌকন প্রদান করে।’

আবূ সা‘ঈদ আল-খুদরী (রা) (মৃ. ৭৪ হি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ، [৭২]

-‘ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। অবশ্য যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় থাকে অথবা মুসাফির ব্যক্তি অথবা কারো দরিদ্র প্রতিবেশী যদি যাকাত হিসেবে কিছু মাল প্রাপ্ত হয়ে তা তার ধনী প্রতিবেশীকে উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করে অথবা দাওয়াত করে খেতে দেয়, তবে তা তাদের (ধনীদের) জন্য বৈধ বা হালাল।’

ইব্‌নুস-সা‘ইদী আল-মালিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমার ইব্‌নুল-খাত্তাব (রা) আমাকে যাকাত আদায়কারী হিসেবে নিযুক্ত করলেন। আমি যখন কাজ শেষ করলাম এবং তাঁর কাছে পৌঁছে দিলাম তখন তিনি আমাকে পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমি তা করেছি। সুতরাং আমি আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট থেকেই এর প্রতিদান নিব। তিনি বললেন, আমি যা দিচ্ছি তা নিয়ে নাও। কেননা আমিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময় যাকাত আদায়ের কাজ করেছি। আর তিনিও আমাকে পারিশ্রমিক প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন আমিও তোমার মত এরূপ বলেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, তুমি অন্বেষণ না করা সত্ত্বেও যখন তোমাকে কিছু দেয়া হয়, তখন তুমি তা গ্রহণ করো। অতঃপর (তা থেকে) তুমি নিজে খাও অথবা দান করে দাও।’[৭৩]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত বিভাগের কর্মচারীদেরকে যাকাত হতে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তা দান নয়; বরং তাদের পরিশ্রম ও কর্মের বিনিময়েই তা প্রদান করা হয়। এজন্য ধনী হওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ করা বৈধ। কারণ দায়িত্ব পালনের কারণেই সে যাকাতের হকদার হয়েছে; কিন্তু যাকাত আদায়কারী যদি হাশিমী বংশের হয়ে থাকে তাহলে উক্ত ব্যক্তি পারিশ্রমিক হিসেবেও যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না। যদিও কাজের বিনিময়ে যাকাতের অর্থ নেওয়া তার অধিকার; কিন্তু এতে যাকাতের কিঞ্চিত ছাপ রয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারকে ময়লার সন্দেহ থেকে পবিত্র থাকতে হবে। পক্ষান্তরে মর্যাদার যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তি হাশিমীর সমতুল্য নয়। সুতরাং তার ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহ বিবেচ্য নয়। যাকাত ব্যয়ের আটটি খাতের মধ্যে একমাত্র এ খাতেই পারিশ্রমিক স্বরূপ যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। অথচ যাকাত সে দানকে বলা হয়, যা কোন বিনিময় ব্যতিত দরিদ্রদেরকে প্রদান করা হয়। সুতরাং কোন গরীব ব্যক্তিকে কাজের বিনিময়ে যাকাতের সম্পদ প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না। আর যাকাতের হকদার ব্যক্তি যদি যাকাত বিভাগের কর্মচারী নিযুক্ত হয় এবং তার বেতন-ভাতা নিসাব পরিমাণ না হয়, তাহলে সে বেতন ব্যতিত যাকাতের অর্থও গ্রহণ করতে পারবে।[৭৪]

যাকাত আদায়কারীর পারিশ্রমিকের পরিমাণ

যাকাত বিভাগে নিয়োজিত কর্মচারীগণকে কী পরিমাণ পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে? এ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.)-এর মতে, যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিকে শাসক তার শ্রমের পরিমাণ অনুসারে পারিশ্রমিক প্রদান করবেন। যার দ্বারা ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন তথা তার নিজের ও পরিবার-পরিজনের জীবিকা নির্বাহের জন্য যথেষ্ট হয়। তাদেরকে এক-অষ্টমাংশ প্রদান করতে হবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই।[৭৫] তবে যাকাত আদায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রয়োজন পূরণার্থে যদি সম্পূর্ণ যাকাতের মাল ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে অর্ধেকের বেশি দেয়া যাবে না। আর যদি লোকজন নিজেরাই যাকাতের মাল শাসকের নিকট প্রদান করে তাহলে আদায়কারী তার হকদার হবে না। কেননা তার কাজের জন্য তাকে তা প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে তার কর্ম অনুপস্থিত থাকায় সে তার হকদার হবে না।[৭৬]

খ. ইব্ন যায়দ (র) বলেন, 'উমার (রা) ও অন্যান্য শাসকগণ যাকাত বিভাগে নিয়োজিত কর্মচারীগণকে সংগৃহীত যাকাতের এক-অষ্টমাংশ প্রদান করতেন না; বরং শ্রম অনুযায়ী তাদেরকে পারিশ্রমিক প্রদান করতেন।[৭৭]

গ. আবূ বকর আল-জাসসাস (র) (৩০৫-৩৭০ হি.)-এর মতে, 'যাকাত আদায়ে নিয়োজিত ব্যক্তি ও তাদের সহকারীদেরকে কাজ ও পরিশ্রম অনুযায়ী যাকাতের সম্পদ থেকে পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ তাদেরকে এ পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে, যা দ্বারা যাকাত আদায়ে নিয়োজিত থাকাকালীন সময় তাদের সাংসারিক যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা যথেষ্ট হয়। তবে এ ব্যয় মধ্যম পর্যায়ের হতে হবে। অর্থাৎ তাদেরকে পারিশ্রমিক প্রদান করতে গিয়ে যদি যাকাতের অর্থ নিঃশেষ হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তাদের বেতন হ্রাস করতে হবে।'[৭৮]

ঘ. ইমাম শাফি'ঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.)-এর মতে, যাকাত আদায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিকে আদায়কৃত সম্পদের এক-অষ্টমাংশ প্রদান করতে হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতের আটটি ক্ষেত্র বর্ণনা করেছেন। কাজেই প্রত্যেকের জন্য এক-অষ্টমাংশ নির্ধারিত। আর তাই যাকাত আদায়কারীকে তার আদায়কৃত সম্পদ থেকে এক-অষ্টমাংশ দেয়া হবে।[৭৯]

ঙ. ইমাম দাহহাক (র) (মৃ. ১০২ হি.) বলেন, যাকাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে বেতন-ভাতা বাবদ যাকাতলব্ধ সম্পদের এক-অষ্টমাংশ প্রদান করতে হবে।[৮০]

মোটকথা, ইমাম আবূ হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.) ও তার মতের অনুসারীদের মতে, যাকাত আদায়কারীর জন্য কোন নির্ধারিত অংশ নেই; কিন্তু ইমাম শাফি'ঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.) ও তাঁর মতের অনুসারীদের মতে, যাকাত আদায়কারীর অংশ সুনির্ধারিত।

যাকাত আদায়কারীর শ্রেণিবিভাগ

যে সকল ব্যক্তিবর্গ যাকাত সংগ্রহ ও তা বিতরণের কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তারাই আল-কুরআনে উল্লিখিত 'আমিলীন (عَامِلِيْنَ) বা যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে তাদের একটি তালিকা প্রদত্ত হলো।

ক. আল-'আশির (اَلْعَاشِر): যাকাতদাতা ও যাকাত গ্রহীতার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনকারী।

খ. আল-কাতিব (اَلْكَاتِب): যাকাত সংক্রান্ত নথিপত্র এবং হিসাব সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি।

গ. আল-কাসিম (اَلْقَاسِم): যাকাত বণ্টনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি।

ঘ. আল-হাফিয (اَلْحَافِظ): যাকাতের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি।

ঙ. আল-হাশির (اَلْحَاشِر): যাকাতদাতা ও যাকাত গ্রহীতাদেরকে ডেকে যারা সমবেত করেন।

চ. আল-'আরীফ (اَلْعَرِيْف): যাকাতের ন্যায্য অধিকারের নাম-ঠিকানা সংগ্রহকারী ও তাদের অবস্থা সম্পর্কে যাকাত কর্মচারীগণকে অবহিতকারী।

ছ. আল-কায়্যাল (اَلْكَيَّال): যাকাতের পরিমাণ নির্ণয়কারী ও ওযনকারী।

জ. আর্-রা'ঈ (اَلرَّاعِي): যাকাত খাতে প্রাপ্ত চতুষ্পদ জন্তুসমূহের তদারককারী। অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুর রাখাল, মেষপালক, পানি পান করানোর লোক ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ।

যাকাত যথাযথভাবে আদায় ও প্রদান হচ্ছে কি-না? তা তদারক করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত। তথাপি রাষ্ট্রের বেতনভুক্ত কর্মচারী, কর্মকর্তা, বিচারক, গভর্নর, রাষ্ট্রপ্রধান ও অন্যান্য সরকারি কর্মচারীগণ এর অন্তর্ভুক্ত হবেন না। কারণ তারা নির্দিষ্টভাবে শুধু যাকাতের কাজে নিয়োজিত নন।[৮১]

৪. মন জয় করার জন্য

আল-মুআল্লাফাতুল কুলূব (اَلْمُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْب) শব্দটি যৌগিক। প্রথমত মুআল্লাফাতুন (مُؤَلَّفَةٌ) শব্দটি বাবে تَفْعِيْل থেকে ইসমে মাফ'উল (اِسْم مَفْعُوْل)-এর একবচনের সীগাহ। এর অর্থ, আকৃষ্ট করা হয়েছে, সন্তুষ্ট করা হয়েছে।[৮২] দ্বিতীয়ত কুলূব (قُلُوْبٌ) শব্দটি বহুবচন, একবচনে কালবুন (قَلْبٌ)। এর অর্থ, অন্তর, হৃদয়, মন, আত্মা, হৃৎপিণ্ড, অভ্যন্তর, কেন্দ্র, শাঁস, খেজুর গাছের শাঁস,[৮৩] heart, middle, center[৮৪] ইত্যাদি। সুতরাং আল-মুআল্লাফাতুল কুলূব (اَلْمُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْب) শব্দের অর্থ, মন সন্তুষ্ট করা হয়েছে এমন লোকজন,[৮৫] যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়, যাদের মন আকৃষ্ট করা হয়, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে এমন লোকজন ইত্যাদি।

মুআল্লাফাতুল কুলূব প্রথমত দুই প্রকার; যথা- মুসলমান ও কাফির। মুসলমানদের মধ্যে আবার কয়েক শ্রেণি রয়েছে। এক. যে সকল অভাবগ্রস্ত নওমুসলিমের ঈমান তত মজবুত নয়। ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে তা প্রদান করা হতো। যেমন- 'উয়াইনা ইব্ন বদর ফাজারী, আকরা' ইব্ন হাবিস এবং 'আব্বাস ইব্ন মারদাস। দুই. এদের কেউ ছিল ধনী; কিন্তু তাদের অন্তর তখনো ইসলামে রঞ্জিত হয়নি। তিন. এদের কেউ ছিল পরিপক্ক মুসলমান; কিন্তু তার গোত্রকে এর দ্বারা হিদায়াতের পথে আনা উদ্দেশ্য ছিল। যেমন- আকরা' ইব্ন হাবিস এবং 'আব্বাস ইব্ন মারদাস। তারা ছিলেন নিজ নিজ গোত্রের অধিপতি। তারা নিজেরা দুর্বল ঈমানদার না হলেও তাদের গোত্রের লোকেরা দুর্বল ঈমানের অধিকারী ছিল। উপর্যুক্ত প্রকারের মুসলমানদেরকে যাকাত প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল তাদের মন জয় করে ইসলামের প্রতি অধিকতর আকৃষ্টকরণ। 'আতা (র) বলেন, শেষোক্ত প্রকারের মুসলমানদের মধ্যে ঐ প্রকারের মুসলমানও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদেরকে মোকাবিলা করা সহজ ছিল না। তারা নেতৃস্থানীয় হওয়ায় তাদেরকে বশীভূত না করা পর্যন্ত তাদের অধীনস্থদেরকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। এজন্যই তাদেরকে কখনো গনীমত থেকে আবার কখনো যাকাতের সম্পদ থেকে অর্থ প্রদান করা হতো।[৮৬]

অমুসলিম মুআল্লাফাতুল কুলূব হলো ঐ সকল ব্যক্তি, যারা অচিরেই ইসলাম গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায় এবং যাদের পাপমুক্তি কামনা করা হয়। সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া ছিলেন তাদের অন্যতম। অমুসলমানদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল, যাদেরকে অর্থ দিলে দল পরিবর্তন করে মুসলমানদের সাহায্যকারী হতে পারে এবং তাদের শত্রুতা হ্রাস পেতে পারে। এজন্য তাদেরকে পরিতুষ্ট রাখা প্রয়োজন ছিল। আবার

কতিপয় এমন ব্যক্তি ছিল, যারা নসীহত ও শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে দয়া, দান ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমগ্র জীবনের ব্রত ছিল আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদেরকে কুফুরীর অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসা। তাই এ ধরনের লোকদেরকে প্রভাবিত করার জন্য তিনি এরূপ বৈধ পন্থা অবলম্বন করতেন। উপরোল্লিখিত সকল প্রকারের ব্যক্তিই মুআল্লাফাতুল কুলূব-এর অন্তর্ভুক্ত।[৮৭]

মোটকথা, মুআল্লাফাতুল কুলূব দ্বারা নওমুসলিমদের পরিতুষ্ট করা হয় ইসলামের উপর অবিচল থাকার জন্য এবং অমুসলিমদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য। সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى صَارَ، وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ[৮৮]

-'হুনায়নের (যুদ্ধের) দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সম্পদ দান করলেন। (এর পূর্বে) তিনি আমার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। অতঃপর আমাকে (সম্পদ) প্রদান করার পর তিনি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হলেন।'

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) (মৃ. ৭৪ হি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট কিছু স্বর্ণের টুকরো পাঠালেন। অতঃপর তিনি তা চার ব্যক্তির মাঝে বণ্টন করে দিলেন। আল-আকরা' ইব্ন হাবিস হানযালী, যিনি মাজাশেয়ী গোত্রের ছিলেন; 'উয়াইনা ইব্ন বদর আল-ফাযারী; যায়দ আত্-তায়ী, যিনি বনী নাবহান গোত্রের ছিলেন এবং 'আলকামা ইব্ন উলাছা আল-'আমিরী, যিনি বনী কিলাব গোত্রের ছিলেন। এতে কুরায়শ ও আনসারগণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং বলতে লাগলেন, নবী করীম (সা) নাজাদবাসী নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে দিচ্ছেন না। অতঃপর নবী করীম (সা) বললেন, আমি তো তাদেরকে (ইসলামের প্রতি) আকৃষ্ট করার জন্য মনোরঞ্জন করছি।'[৮৯]

৬৩০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কার কাফিরদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তাঁর এরূপ মহানুভবতায় অধিকাংশ কাফির ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ইসলাম গ্রহণের পর এ সকল নওমুসলিমের পুনর্বাসন অত্যন্ত জরুরি ছিল। কেননা পৌত্তলিক ও ইসলামের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে তারা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল এবং কষ্টভোগ করেছিল। এ সকল সংঘর্ষে মুসলমানদের তুলনায় কাফিরদের অবস্থা ছিল অধিক শোচনীয়।[৯০] তবে উক্ত নওমুসলিমদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণে যাকাতের হকদার সাব্যস্ত করা হয়নি; বরং তাদের দারিদ্রের কারণে তাদেরকে যাকাতের সম্পদের হকদার করা হয়েছিল। যাকাতের সম্পদ প্রদানের কারণে তাদের মনে মুসলমানদের সম্পর্কে কোনরূপ অবিশ্বাস বা সন্দেহ অবশিষ্ট ছিল না।[৯১]

ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাদেরকে যাকাত প্রদান করেছিলেন তাদের নামের একটি তালিকা ইয়াহইয়া ইব্ন আবী কাছীর (র)-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়। যথা- বনূ উমাইয়ার আবূ সুফইয়ান ইব্ন হারব, বনূ মাখযূমের হারিছ ইব্ন হিশাম ও 'আব্দুর রহমান ইব্ন ইয়ারবূ', বনূ জুমাহের সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া, বনূ 'আমির ইব্ন লুআয়-এর সুহায়ল ইব্ন 'আমর ও হুওয়াইতিব ইব্ন 'আব্দিল 'উয্যা, বনূ আসাদ ইব্ন 'আব্দিল 'উয্যার হাকীম ইব্ন হিযাম, বনূ হাশিমের সুফইয়ান ইব্নুল হারিছ ইব্ন 'আব্দিল মুত্তালিব, বনূ ফাযারাহের 'উয়ায়না ইব্ন হিসন ইব্ন বদর, বনূ তামীমের আকরা' ইব্ন হাবিস, বনূ নাসরের মালিক ইব্ন 'আওফ, বনূ সুলায়মের 'আব্বাস ইব্ন মিরদাস, বনূ ছাকীফের 'আলা ইব্ন হারিছাহ।

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শুধু 'আব্দুর রহমান ইব্ন ইয়ারবূ' ও হুওয়াইতিব ইব্ন 'আব্দিল 'উয্যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পঞ্চাশটি উট প্রদান করেছিলেন এবং অবশিষ্ট সকলকে একশটি উট প্রদান করেছিলেন।[৯২]

মুআল্লাফাতুল কুলূব-এর হুকুম

মুআল্লাফাতুল কুলূব (مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْب) বা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য যাকাতের সম্পদ প্রদান করার হুকুম অবশিষ্ট আছে কি-না? এবং বর্তমান কালে এ খাতে কাউতে যাকাত দেয়া যাবে কি-না? এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.)-এর মতে, মুআল্লাফাতুল কুলূব-এর অংশ এখন আর নেই। কারণ বিষয়টি এখন অপ্রয়োজনীয়। তাঁর মতে, দরিদ্র মুসলিমের মন জয় করার জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা বৈধ; কিন্তু ধনীকে এরূপ যাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। সুতরাং যাকাত দেয়ার সময় দেখে নিতে হবে যে, যাকাত গ্রহীতা প্রকৃতই দরিদ্র কি-না?[৯৩] পক্ষান্তরে কাফিরদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হোক বা না হোক তাদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে না। তাই বর্তমানে যাকাতের খাত আটটি নয়; বরং সাতটি। এটিই সাহাবা-ই কিরামের ইজমা।[৯৪]

ইব্ন হুমাম (র) বলেন, আবূ বকর (রা) (মৃ. ১৩ হি.)-এর খিলাফতের সময় (১১-১৩ হি.) 'উয়াইনা ইব্ন হিসন ও আকরা' ইব্ন হাবিস তাঁর নিকট একটি জমি চেয়েছিলেন। তখন আবূ বকর (রা) তাদেরকে ঐ জমির দলীল লিখে দিলেন; কিন্তু 'উমার (রা) ঐ দলীল হাতে নিয়ে ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন, রাসূল (সা) এ রকম দান করতেন ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। আর এখন আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মুসলমানদেরকে করেছেন অমুখাপেক্ষী। তাই তোমরা যদি ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম। অন্যথায় ফয়সালা হবে তলোয়ারের মাধ্যমে।[৯৫] হাব্বান ইব্ন আবী জাবালা বলেন, 'উয়াইনা ইব্ন হিসন যাকাত গ্রহণের জন্য উপস্থিত হলে 'উমার (রা) আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন,

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾[৯৬]

-'আর আপনি বলুন, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে। সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনয়ন করুক আর যার ইচ্ছ কুফুরী অবলম্বন করুক।' এ আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে 'উমার (রা) তাদেরকে বুঝালেন যে, এখন হৃদয় জয় করার জন্য কাউকে যাকাত প্রদান করার কোনই প্রয়োজন নেই। অতএব ইসলাম গ্রহণের জন্য আমরা কাউকে কোন কিছু দিব না। যাদের ইচ্ছা হবে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে আর যাদের ইচ্ছা কুফুরীর পথ গ্রহণ করবে।[৯৭]

খ. ইমাম শাফি'ঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.)-এর মতে, মুআল্লাফাতুল কুলূব-এর কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। যেমন- ইসলাম গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করতে বা তাতে দৃঢ় রাখার জন্য বা এদেরকে দেখে অন্যরাও যেন ঈমান গ্রহণ করে অথবা মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হয়। তাঁর প্রথম মতানুযায়ী, বর্তমানে এ সকল খাতের মধ্যে প্রথম ও শেষ ধরনের লোকদেরকে যাকাত প্রদান করা যাবে না। কারণ ইসলাম বর্তমানে যথেষ্ট শক্তিশালী। আর দ্বিতীয় ও অধিকতর সহীহ অভিমত হলো, বাকি দুই ধরনের লোকদেরকে বর্তমানেও যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে।[৯৮]

গ. ইমাম মালিক (র) (৯৩-১৭৯ হি.), ইমাম আহমাদ (র) (১৬৪-২৪১ হি.), ইমাম যুহরী (র) (মৃ. ১২৪ হি.), কাযী 'আব্দুল ওয়াহাব (র), ইবনুল 'আরাবী (র) (৪৬৮-৫৪৩ হি.) প্রমুখের মতে, মুআল্লাফাতুল

কুলূব-এর হুকুম রহিত হয়নি। তাঁরা বলেন, আবূ বকর (রা) ও 'উমার (রা)-এর শাসনামলে আবশ্যকতা ছিল না বিধায় এ খাতে ব্যয় সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এ খাতে ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পুনরায় ব্যয় করা যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্তর জয় করার জন্য এ খাতে যাকাত প্রদান করেছিলেন। তবে ইমাম মালিক (র)-এর অপর মতে, ইসলামের শক্তি সুদৃঢ় হওয়ায় এখন এ খাতে ব্যয় করার আর প্রয়োজন নেই।[৯৯]

ঘ. 'উমার (রা) (মৃ. ২৩ হি.), 'আমির (র), শা'বী (র) (২১-১০৩ হি.) এবং একদল আলিমের মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর যাকাত ব্যয়ের এ ক্ষেত্রটি আর অবশিষ্ট নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, মুসলমানরা বর্তমানে বিভিন্ন দেশের কর্তৃত্ব লাভ করেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার বহু বান্দা তাদের অধীনস্থ রয়েছে। কিন্তু অন্যান্যদের মতে, মন জয় করার উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ এখনো ব্যয় করা বৈধ। কারণ মক্কা বিজয় এবং হাওয়াযিন বিজয়ের পরেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ লোকদেরকে যাকাতের মাল প্রদান করেছিলেন। এতদ্ব্যতিত এখনো এরূপ প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।[১০০]

ঙ. 'ইকরামা (র) (২৫-১০৫ হি.), শা'বী (র) (২১-১০৩ হি.), সুফইয়ান ছাওরী (র) (৯৭-১৬১ হি.), ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই (র) (১৬১-২৩৮ হি.) প্রমুখের মতে, অমুসলিম মুআল্লাফাতুল কুলূব-এর যাকাতের অংশ বর্তমানে বিলুপ্ত হয়েছে।[১০১]

চ. মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী (র) (২২৪-৩১০ হি.) বলেন, এ ব্যাপারে আমার নিকট বিশুদ্ধ মত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাত নির্ণয় করেছেন। মুসলমানদের দারিদ্র বিমোচন ও ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। ইসলামের শক্তি বৃদ্ধিতে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলকে দেয়া হয়। কেননা দীনের সাহায্যার্থে তাদেরকে যাকাত প্রদান করা হয়। তারা এ সম্পদের মুখাপেক্ষী নয়। যেমন- মুজাহিদকে তার অভাব মোচনের জন্য নয়; বরং জিহাদের কারণে যাকাত প্রদান করা হয়। তদ্রূপ ইসলামের দিকে চিত্ত আকর্ষণ করার লক্ষ্যে যাকাত প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের কল্যাণ সাধন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও ইসলামের বিজয় ও প্রসার লাভের নিমিত্তে এ খাতে যাকাত প্রদান করেছেন। কাজেই যাদের মতে, ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির কারণে এ খাতে যাকাত ব্যয় করার প্রয়োজন নেই তাদের এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা উপর্যুক্ত অবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করেছেন।[১০২]

ছ. হাসান বসরী (র) (২১-১১০ হি.), যুহরী (র) (মৃ. ১২৪ হি.), মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী (র), যায়নুল 'আবিদীন ইব্ন ইমাম হুসায়ন (র) (৩৮-৯৩ হি.), আবূ সাওয়ার (র) প্রমুখের মতে, মুআল্লাফাতুল কুলূব-এর হুকুম রহিত হয়নি; বরং এখনো বিদ্যমান।[১০৩] হাসান বসরী (র)-এর অপর মতে, বর্তমানে এমন লোক নেই, যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য যাকাত প্রদান করতে হবে। এরূপ লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে বিদ্যমান ছিল।[১০৪]

জ. ইমাম কুরতুবী (র) (৬০০-৬৭১ হি.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য যাকাতের খাত থেকে দান করেছিলেন, সবিস্তারে তাদের নাম উল্লেখ করে বলেছেন, মুআল্লাফাতুল কুলূব-এর অন্তর্ভুক্ত সকলেই মুসলমান ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কাফির ছিল না।[১০৫]

ঝ. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র) (১১৪৩-১২২৫ হি.) বলেন, বর্তমান সময়ে কোন অমুসলিমকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। সুতরাং যাকাত দানের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার আর প্রয়োজন নেই। ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

﴿الخ﴾ আয়াতে উল্লিখিত বিধানটি মুসলিম মুআল্লাফাতুল কুলূব-এর সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। অমুসলিম মুআল্লাফাতুল কুলূব এ খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার সম্পদশালীরাও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ সম্পদশালীদের জন্য যাকাত হালাল না হওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।[১০৬]

ঞ. মাহমূদ ইব্‌ন ‘আমর আয্‌-যামাখশারী (র) (৪৬৭-৫৩৮ হি.)-এর মতে, আল-কুরআনের ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الخ﴾ আয়াতে উল্লিখিত যাকাতের ব্যয়খাতের বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো, কাফির-মুনাফিকদের অপবাদ খণ্ডন করা। অর্থাৎ যাকাতের অংশ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। আয়াতে এ ব্যয়খাতসমূহের বিবরণ দিয়ে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, যাকাতের মধ্যে কাফিরদের কোন অধিকার নেই। সুতরাং বলা যায় যে, মুআল্লাফাতুল কুলূবের মধ্যে কাফিরগণ অন্তর্ভুক্ত থাকলে এ কথা বলার প্রয়োজন ছিল না।[১০৭]

মোটকথা, মুআল্লাফাতুল কুলূব-এর অংশ কিয়ামত পর্যন্ত বাতিল হওয়া সাব্যস্ত হয় না। কেননা ইসলামী রাষ্ট্র যদি মুআল্লাফাতুল কুলূব-এর জন্য অর্থ-ব্যয় করার প্রয়োজন মনে করে, তাহলে যেন ব্যয় করতে পারে। বিধায় আল্লাহ্ তা‘আলা যে অবকাশ রেখেছেন তা অবশ্যই অক্ষুণ্ন থাকা উচিত। আর সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এ সম্পর্কে যে মতৈক্য হয়েছিল তার কারণ হলো, তাঁদের যুগে এমন অবস্থা বিরাজ করছিল যে, তাতে মুআল্লাফাতুল কুলূব-এর জন্য কাউকে কিছু দেওয়ার প্রয়েজন তাঁরা অনুভব করতেন না। কাজেই কোন গুরুত্বপূর্ণ দীনি স্বার্থ তথা প্রয়োজন ও কল্যাণের নিমিত্তে আল-কুরআনে যে খাতটি বর্ণিত হয়েছে, সাহাবীগণের মতৈক্যের কারণে তা রহিত হয়েছে বলে সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়।

৫. দাসমুক্তি

রিকাব (رِقَاب) শব্দটি বহুবচন, একবচনে রাকাবাতুন (رَقَبَةٌ)। এর বহুবচনের আরেকটি রূপ হলো, রাকাবাতুন (رَقَبَاتٌ)। রাকাবাতুন (رَقَبَةٌ) শব্দটির অর্থ, দাস, ক্রীতদাস, গোলাম, ব্যক্তি, ঘাড়, গর্দান, গলদেশ,[১০৮] slavery,[১০৯] neck, slave, person[১১০] ইত্যাদি। তবে শব্দটি এখানে মুক্ত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল-কুরআনে শব্দটি দ্বারা পরোক্ষভাবে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, মানুষের জন্য দাসত্ব হলো গলায় বাঁধা শৃঙ্খলের মতো। আর দাস-দাসীকে এই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার অর্থ হলো গলায় বাঁধা রশি খুলে ফেলা। সুতরাং আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী, فِي الرِّقَابِ-এর অর্থ হলো, মানুষের গলা তথা দাস-দাসীকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তকরণের কাজে যাকাত ব্যয় করা।

আর্-রিকাব (اَلرِّقَاب) বা দাসদেরকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ দুভাবে ব্যয় করা যেতে পারে। প্রথমত যে ক্রীতদাস তার মালিককে অর্থ প্রদানের বিনিময়ে মুক্তিলাভের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এরূপ মুকাতাব দাসকে দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তিলাভের জন্য যাকাত প্রদান করা বৈধ। দ্বিতীয়ত যাকাতের অর্থের মাধ্যমে দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়া। এ দুটি মতের ব্যাপারে ফকীহগণ বিভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি মত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.), ইমাম শাফি‘ঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.), ইমাম আহমাদ (র) (১৬৪-২৪১ হি.) ও ইমাম মালিক (র) (৯৩-১৭৯ হি.)-এর এক মতে, আর্-রিকাব (اَلرِّقَاب) অর্থ মুকাতাব[১১১] ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী। তবে মুকাতিবকে হতে হবে নিশ্চিতরূপে নিঃস্ব। এ ধরনের দাসমুক্তির ক্ষেত্রে নিসাব পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজন হলেও তা প্রদান করা জায়েয। কারণ মুক্তি নিশ্চিত করাই এখানে মুখ্য বিষয়।[১১২] ‘আলী (রা) (মৃ. ৪০ হি.), সা‘ঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) (৪৬-৯৫ হি.),

লাইছ (র) (৯৪-১৭৫ হি.), সুফইয়ান ছাওরী (র) (৯৭-১৬১ হি.), ইবরাহীম নাখ'ঈ (র) (৪৭-৯৬ হি.), শা'বী (র) (২১-১০৩ হি.) ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) (মৃ. ১১০ হি.)ও অনুরূপ মত পোষণ করেন।

খ. হাসান আল-বসরী (র) (২১-১১০ হি.), মুকাতিল ইব্‌ন হায়্যান (র), 'উমার ইব্‌ন 'আব্দিল 'আযীয (র) (৬১-১০১ হি.), সা'ঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) (৪৬-৯৫ হি.), ইবরাহীম নাখ'ঈ (র) (৪৭-৯৬ হি.), যুহরী (র) (মৃ. ১২৪ হি.) ও ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, 'আর্-রিকাব (اَلرِّقَابِ) দ্বারা ঐ গোলামদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করে তাদের মনিবদের সাথে মুক্তি লাভের শর্ত করে নিয়েছে। যাকাতের সম্পদ থেকে তাদেরকে এ পরিমাণ অর্থ দেয়া যাবে, যার দ্বারা তারা মুক্তি লাভ করতে পারে।'[১১৩]

গ. বুরহান উদ্দীন 'আলী আল-মারগীনানী (র) (৫৩০-৫৯৩ হি.) বলেন, 'আর্-রিকাব (اَلرِّقَابِ) অর্থ, মুকাতাবকে দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তি লাভের জন্য সাহায্য করা।'[১১৪] অর্থাৎ যাকাতের অর্থ দিয়ে দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দিলে যাকাত আদায় হবে না। কেননা যাকাত আদায়ের জন্য মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত। আর এ ক্ষেত্রে মালিক বানিয়ে দেয়ার অর্থ পাওয়া যায় না। কারণ নিছক দাস কোন কিছুর মালিক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।[১১৫]

ঘ. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র) (১১৪৩-১২২৫ হি.)-এর মতে, 'আর্-রিকাব (اَلرِّقَابِ)-এর উদ্দেশ্য হলো মুকাতাব ক্রীতদাস।'[১১৬]

ঙ. ইমাম আহমাদ (র) (১৬৪-২৪১ হি.) ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) (মৃ. ৬৮ হি.)-এর উক্তি "আপন সম্পদের যাকাতের মাধ্যমে বাদী ও গোলাম ক্রয় করে স্বাধীন করে দাও"- সম্পর্কে বলেন, প্রথমে আমিও মনে করেছিলাম, যাকাতের অর্থ দিয়ে ক্রীতদাসী মুক্ত করা যায়; কিন্তু পরবর্তীতে আমি এ ধারণাটি পরিত্যাগ করেছি। তাঁর নিকট জানতে চাওয়া হলো, কেন? ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) তো এ রকম বিষয়কে বৈধ বলেছেন। এর জবাবে ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর উক্তি আবেগপ্রবণ। অথবা তাঁর কথার অর্থের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের মত্ততা ও উদ্বিগ্নতা।[১১৭]

চ. ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী (র) (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন, যাকাতের এ খাতের অর্থকে দুভাগে ভাগ করতে হবে। এক ভাগ দ্বারা মুসলিম মুকাতিবদেরকে মুক্ত করতে হবে এবং অপর ভাগ দ্বারা মুসলিম ক্রীতদাসী ক্রয় করে স্বাধীন করে দেয়া যাবে।[১১৮]

ছ. ইমাম মালিক (র) (৯৩-১৭৯ হি.)-এর অন্য মতে, আর্-রিকাব (اَلرِّقَابِ) অর্থ খাটি গোলাম বা বাদী, মুকাতিব গোলাম বা বাদী নয়। অর্থাৎ যাকাতের অর্থ দ্বারা ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দেয়া যাবে।[১১৯] ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) (মৃ. ৬৮ হি.), হাসান বসরী (র) (২১-১১০ হি.) ও আবূ ছাওর (র)ও এরূপ অভিমত পোষণ করেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে করণীয়

ইসলামের নির্দেশনা হলো মানুষ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব করবে, অন্য কারো দাসত্ব করা তার জন্য বৈধ নয়। এজন্য ইসলামে দাস-দাসী মুক্ত করাকে ফযীলতের কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বহু হাদীসও বর্ণিত রয়েছে। বারা ইব্‌ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। রাসূল (সা) বললেন, তুমি তো অল্প কথায় প্রশ্ন করে

অত্যন্ত ব্যাপক বিষয় জানতে চেয়েছ। (জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার জন্য) তুমি একটি প্রাণী আযাদ করে দাও এবং একটি দাস মুক্ত করে দাও।'[১২০]

আবূ হুরায়রা (রা) (মৃ. ৫৯ হি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ [১২১]

-'তিন ব্যক্তি এমন, যাদেরকে সাহায্য করা আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কর্তব্য বলে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহিদ, মুকাতাব দাস, যে মুক্তিপণ আদায়ের ইচ্ছা রাখে এবং বিবাহ ইচ্ছুক ব্যক্তি, যে (বিবাহের মাধ্যমে) পবিত্রতার ইচ্ছা পোষণ করে।'

অন্যত্র হাদীসে বলা হয়েছে, 'আযাদকৃত গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আযাদকারীর প্রতিটি অঙ্গকে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন, এমনকি লজ্জাস্থানের বিনিময়ে লজ্জাস্থানকেও। কেননা প্রত্যেক পুণ্যের বিনিময় ঐরূপই হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তোমরা যে আমল করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিদান দেয়া হবে।'[১২২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে সম্পদশালী সাহাবীগণ দাস মুক্তির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। এতদ্ব্যতিত ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল-মাল থেকেও এ খাতে অর্থ ব্যয় করা হতো; কিন্তু আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় দাস প্রথার বিলোপ সাধিত হয়েছে। মূলত ইসলামের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কারণে ক্রীতদাস প্রথার অভিশাপ থেকে মানবজাতি নিষ্কৃতি পেয়েছে। বর্তমান যুগে সে দাসপ্রথা না থাকার কারণে অনেকেই ধারণা করেন যে, এ খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার কোন প্রয়োজন নেই। আবার অনেকের মতে, এ খাতের অর্থ দ্বারা এ খাত সংশ্লিষ্ট নিত্য-নতুন সমস্যার সমাধানে ব্যয় করা যাবে। যেমন- কেউবা দালালের খপ্পরে পরে বিদেশে গমন করে অত্যন্ত কষ্টে জীবন-যাপন করছেন, কেউবা বিভিন্ন দেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে, কেউবা অর্থাভাবে জরিমানা না দিতে পেরে মিথ্যা মামলায় কারাগারে বন্দী জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এরূপ প্রভৃতি ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে এ খাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। কেননা কতিপয় ক্ষেত্রে এ সকল ব্যক্তি ক্রীতদাস অপেক্ষাও ভয়ংকর অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং এ দৈন্য ও দুর্দশা থেকে মুক্ত করার মত তাদের সামর্থ্যও নেই।[১২৩]

৬. ঋণগ্রস্ত

আল-গারিম (الْغَارِم) শব্দটি (غرم) মূলধাতু থেকে নির্গত। এটি একবচন, বহুবচনে আল-গারিমীন (الْغَارِمِيْن)। আল-গারিম (الْغَارِم) শব্দের অর্থ, ঋণগ্রস্ত, ঋণী, দেনাদার, খাতক,[১২৪] debtor[১২৫] ইত্যাদি। তবে শব্দটি কখনো ঋণদাতার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল-গারিম (الْغَارِم) শব্দটি আল-কুরআনে অবশ্যম্ভাবী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾[১২৬]

-'নিশ্চয়ই এর (জাহান্নামের) শাস্তি অবশ্যম্ভাবী।'

পরিভাষায়, আল-গারিম (الْغَارِم) হলো এমন ব্যক্তি, যার ঋণের পরিমাণ তার মালিকানাধীন সম্পদের অধিক বা সমান। আর উক্ত মাল দ্বারা ঋণ পরিশোধ করলে তার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে না। যেমন- কোন ব্যক্তির নিকট এক হাজার দিরহাম রয়েছে এবং সে নয়শ দিরহাম ঋণগ্রস্ত। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। কেননা নয়শ দিরহামের সাথে পাওনাদারের হক সম্পৃক্ত থাকার কারণে তা

অনস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই সে এর মালিক নয়। আর অবশিষ্ট একশ দিরহাম নিসাব পরিমাণ নয়। সুতরাং তার জন্য যাকাতের অর্থ গ্রহণ করা বৈধ।

ইমাম আবূ হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.)-এর মতে, গারিম (غَارِم) হলো ঐ ব্যক্তি, যার উপর ঋণ রয়েছে এবং সে ব্যক্তি উক্ত ঋণের পরিমাণ থেকে বেশি নিসাবের মালিক নয়।[১২৭]

ইমাম শাফি'ঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.) বলেন, গারিম (غَارِم) হলো ঐ ব্যক্তি, যে দুজনের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কিংবা দুই গোত্রের মাঝে শত্রুতা বিদূরিত করতে গিয়ে আর্থিক দায় বহন করছে।[১২৮]

ইব্ন কাছীর (র) (৭০০-৭৭৪ হি.) বলেন, এটি কয়েক প্রকার। যেমন- এক ব্যক্তি কারো বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিল বা কারো কর্জের জামিন হলো। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়ে গেল অথবা নিজেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ল কিংবা কেউ কোন নাফরমানীমূলক কাজ করার শাস্তিস্বরূপ তার উপর ঋণের বোঝা চেপে বসল। তারপর সে তাওবা করল। এমতাবস্থায় তাকে যাকাতের মাল প্রদান করা যাবে। যাতে সে এর দ্বারা তার এ ঋণ আদায় করতে পারে।[১২৯]

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) (১৮৯৭-১৯৭৬ খ্রি.) বলেন, ঋণগ্রস্তকে তার ঋণমুক্তির জন্য দান করা সাধারণ ফকীর-মিসকীনকে দান করার তুলনায় উত্তম। তবে শর্ত হচ্ছে, সে ঋণগ্রস্তের নিকট এ পরিমাণ সম্পদ থাকবে না, যা দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। কারণ অভিধানে এরূপ ঋণী ব্যক্তিকেই আল-গারিম (غَارِم) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১৩০]

কাবীছা ইব্ন মুখারিক আল-হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একবার আমি (দেনার জামিন হয়ে) বিরাট অংকের ঋণী হয়ে পড়লাম। অতঃপর তা পরিশোধের ব্যাপারে কিছু চাওয়ার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, যাকাত বা সাদকার মাল আসা পর্যন্ত আমার কাছে অপেক্ষা করো। তা এসে গেলে আমি তোমাকে তা থেকে দিতে নির্দেশ দিব। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি বললেন, হে কাবীছা! মনে রেখ, তিন ব্যক্তি ছাড়া কারো জন্য হাত পাতা বা সাহায্য করা হালাল নয়। ১. যে ব্যক্তি (কোন ভাল কাজ করতে গিয়ে বা দেনার জামিন হয়ে) ঋণী হয়ে পড়েছে। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত প্রার্থনা করা তার জন্য হালাল। আর যখন দেনা পরিশোধ হয়ে যাবে তখন সে এ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। ২. যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হয়েছে এবং এতে তার যাবতীয় সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। তার জন্য এ সাহায্য চাওয়া হালাল যতক্ষণ না তার নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। রাবীর সন্দেহ- তিনি কি 'কিওয়াম' শব্দ বলেছেন না 'সিদাদ' শব্দ বলেছেন? (উভয় শব্দের অর্থ একই)। ৩. যে ব্যক্তি এমন অভাবগ্রস্ত হয়েছে যে, তার গোত্রের তিনজন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, "সত্যিই অমুক ব্যক্তি অভাবে পড়েছে" তার জন্য জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ সম্পদ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সাহায্য প্রার্থনা করা হালাল। হে কাবীছা! এ তিন প্রকার লোক ব্যতিত অন্যদের জন্য সাহায্য চাওয়া হারাম। অতএব এই তিন প্রকার লোক ব্যতিত যে সকল লোক সাহায্য চেয়ে বেড়ায় তারা হারাম ভক্ষণ করে।'[১৩১]

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) (মৃ. ৭৪ হি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফল ক্রয় করে লোকসানের সম্মুখীন হয়। এতে তার ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের বললেন, তোমরা তাকে দান করো। লোকেরা তাকে দান-খয়রাত করল; কিন্তু তা ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট ছিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঋণদাতাদের বললেন, যে পরিমাণ তোমরা পাচ্ছ তাই গ্রহণ করো। আর তোমরা এর থেকে অধিক কিছু পাবে না।'[১৩২]

‘আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন, ‘পাঁচ শ্রেণির লোক ব্যতিত সম্পদশালীর জন্য যাকাত নেয়া বৈধ নয়। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদরত ব্যক্তি, যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যে ব্যক্তি যাকাতের মাল নিজ অর্থ দ্বারা ক্রয় করে এবং মিসকীন প্রতিবেশী, যে তার প্রাপ্ত যাকাত থেকে ধনী ব্যক্তিকে উপঢৌকন প্রদান করে।’[১৩৩]

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে যাকাত প্রদানের হুকুম

এ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে ফকীহগণের কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করা হলো।

ক. ইমাম শাফি‘ঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.) ও অধিকাংশ আলিমের মতে, যে ব্যক্তি ঋণের টাকায় পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে তাকে যাকাতের টাকা প্রদান করা যাবে। তবে যে ব্যক্তি ঋণের অর্থ কোন পুণ্যকর্মে ব্যয় না করে অপ্রয়োজনীয় অথবা পাপকর্মে ব্যয় করে ঋণী হয়েছে তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে না।[১৩৪] যেমন- মদ্যপান, বিয়ে-শাদী বা অন্য কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে শরীয়ত বিরোধী অনুষ্ঠান পালন, অপচয়-অপব্যয়, অসৎ কাজ সম্পাদন কিংবা আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যয়ের ফলে যারা ঋণী হয় তাদেরকে এ খাত থেকে অর্থ দেয়া যাবে না। যাতে তার পাপ কাজ ও অপব্যয়ে অনর্থক উৎসাহ প্রদান করা না হয়। কেননা আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾[১৩৫]

-‘হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করো এবং খাও ও পান করো; কিন্তু অপব্যয় করো না। কেননা তিনি অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।’

অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا – إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾[১৩৬]

-‘আর তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করো না। কেননা নিঃসন্দেহে অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।’

খ. ইমাম মালিক (র) (৯৩-১৭৯ হি.)-এর মতে, শরীয়ত বিরোধী কোন অসৎ কাজ সম্পাদনের জন্য নয়; বরং হালাল ও বৈধ কাজের কারণে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়েছে এবং এমতাবস্থায় তার নিকট যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট না থাকে তাহলে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। আর যদি হারাম কাজের জন্য ঋণগ্রস্ত হয় এবং কৃত গুনাহের জন্য পরবর্তীতে আল্লাহ্‌ তা‘আলার নিকট তাওবা করে, তাহলে তাকেও যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে।[১৩৭]

গ. ইমাম আবূ হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.)-এর মতে, যার নিকট ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ বিদ্যমান নেই তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। উক্ত ব্যক্তি যে কোনো কারণেই ঋণী হোক না কেন। অর্থাৎ ব্যক্তি অসৎকাজে ব্যয় করে ঋণী হলে তাকেও যাকাতের অর্থ প্রদান করে সাহায্য করা যাবে। এ কথার দলীল হলো, আলোচ্য আয়াতে কেবল وَالْغَارِمِينَ (এবং ঋণে জর্জরিতদের জন্য) বলা হয়েছে। আর কথাটি একটি সাধারণ অর্থবোধক শব্দ। এখানে নির্দিষ্ট কোন ঋণগ্রস্তকে চিহ্নিত করা হয়নি।[১৩৮]

ঘ. ইমাম আহমাদ (র) (১৬৪-২৪১ হি.)-এর মতে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের জন্য কিংবা অন্যের জন্য, ভালো কিংবা মন্দ কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করুক না কেন তাকে যাকাত প্রদান করা বৈধ। তবে শর্ত

হলো, ব্যক্তি যদি নিজের জন্য ঋণ গ্রহণ করে তাহলে ফকীর হওয়া ব্যতিত তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে না। আর যদি প্রকাশ্য ক্ষতি রোধ তথা জান-মাল ইত্যাদি ধ্বংসের কারণে অপরের জন্য ঋণ গ্রহণ করে তাহলে এরূপ ব্যক্তি ধনী হলেও যাকাতের সম্পদ থেকে অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। ইমাম শাফি‘ঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.) থেকেও এরূপ একটি মত বর্ণিত আছে।[১৩৯]

ঋণদাতাকে যাকাত প্রদানের হুকুম

ঋণগ্রহীতার অর্থ পরিশোধের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে ঋণদাতার নিকট উক্ত অর্থের প্রয়োজন অনুভূত হলে তার জন্য আবশ্যক পরিমাণ যাকাত গ্রহণ করা বৈধ। এতদ্ব্যতিত ঋণ যদি দীর্ঘমেয়াদী না হয় এবং ঋণগ্রহীতা যদি গরীব হয়, তাহলে বিশুদ্ধ মতানুসারে উক্ত ঋণদাতা ব্যক্তির জন্যও যাকাত গ্রহণ করা বৈধ। কেননা এ ক্ষেত্রে সে ইব্নুস-সাবীলের মতো। পক্ষান্তরে ঋণগ্রহীতা যদি ধনী হয় এবং ঋণের কথা স্বীকার করে তবে ঋণদাতাকে যাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে ঋণগ্রহীতা যদি ঋণের কথা অস্বীকার করে এবং এ ব্যাপারে ঋণদাতার নিকট ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী থাকে তাহলে এ অবস্থায়ও তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা বৈধ নয়। আর যদি ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী বিদ্যমান না থাকে তাহলে বিচারকের নিকট এ ব্যাপারে মুকদ্দমা দায়ের না করা পর্যন্ত যাকাত গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ হবে না। বিচারকের নিকট মুকদ্দমা দায়ের করার পর তার নিকট ঋণদাতা শপথ করে বলবে। অতঃপর শপথ করার পর তার জন্য যাকাতের অর্থ গ্রহণ করা বৈধ হবে।[১৪০]

৭. আল্লাহ্‌র রাস্তায়

ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ) শব্দটি একটি যৌগিক শব্দ। ফী (فِي) শব্দটির অর্থ, মধ্যে, মাঝে, অভ্যন্তরে, ভিতরে, বিষয়ে, সম্বন্ধে।[১৪১] আর সাবীলুন (سَبِيْلٌ) শব্দটি একবচন, বহুবচনে সুবুলুন (سُبُلٌ); যার অর্থ, পথ, পন্থা, রাস্তা, উপায়, পদ্ধতি, কারণ, হেতু, দোষ, দায়, অভিযোগ,[১৪২] way, road, path[১৪৩] ইত্যাদি। সুতরাং ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ) শব্দটির অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র রাস্তায়, আল্লাহ্‌র পথে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি। শব্দটি আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতেও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾[১৪৪]

-‘আর যারা আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়, আল্লাহ্ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না।’

আল-কুরআনে বর্ণিত ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الخ﴾ আয়াতে উল্লিখিত আটটি খাতের মধ্যে শেষোক্ত চারটি খাতের প্রারম্ভে ফী (فِي) শব্দটি ব্যবহার করার পর পুনরায় ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ) শব্দটির প্রারম্ভে ফী (فِي) শব্দটি ব্যবহার করার কারণ সম্পর্কে আল্লামা যামাখশারী (র) (৪৬৭-৫৩৮ হি.) বলেন, এ খাতটি পূর্বোল্লিখিত সকল খাত অপেক্ষা উত্তম। কেননা এতে দুটি উপকার রয়েছে। গরীব-নিঃস্বদেরকে সাহায্য করার পাশাপাশি ধর্মীয় সেবায়ও সহায়তা করা হয়।[১৪৫]

ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ)-এর ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

ক. ইমাম শাফি‘ঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) (১১৩-১৮২ হি.) ও অধিকাংশের মতে, ‘ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ) বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে সম্পদহীন হয়ে পড়ে। কেননা নিঃশর্তভাবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বলতে সাধারণত মুজাহিদকেই বুঝায়।’[১৪৬]

খ. ইমাম আহমাদ (র) (১৬৪-২৪১ হি.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) (১৩২-১৮৯ হি.)-এর মতে, 'ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ) হলো হজ্জের সফরে গমনকারী অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি।[১৪৭] কেননা উম্মু মা'কাল (রা) থেকে দীর্ঘ বর্ণিত এক হাদীসে বলা আছে যে, আবূ মা'কাল (রা) তাঁর উট আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার নিয়্যত করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উম্মু মা'কাল (রা)-কে উক্ত উটে আরোহণ করে হজ্জে গমন করতে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, হজ্জে গমন করা আল্লাহ্‌র রাস্তায় গমন করার সদৃশ।'[১৪৮]

অন্যত্র নবী করীম (সা) বলেন,[১৪৯] إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ -'নিশ্চয়ই হজ ও 'উমরা সাবীলিল্লাহ-এর অন্তর্ভুক্ত।'

গ. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র) (১১৪৩-১২২৫ হি.) বলেন, নিঃস্ব হওয়া যখন যাকাতের সকল খাতের একটি সাধারণ উপযুক্ততা, তখন 'ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ) কথাটিকে সাধারণভাবেই রেখে দেওয়া সমীচীন। কথাটিকে জিহাদ বা হজ্জ- এর কোনটির সাথে সম্পৃক্ত করা ঠিক নয়। আর দরিদ্র কোন শিক্ষার্থীকে যাকাতের অর্থ প্রদান করাও 'ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ)-এর অন্তর্ভুক্ত।[১৫০]

ঘ. অধিকাংশ তাফসীরকারকগণ ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ) বলতে জিহাদ ও হজ্জ পালন করা অর্থ গ্রহণ করেছেন। যেমন ইব্‌ন কাছীর (র) (৭০০-৭৭৪ হি.) বলেন,

وَأَمَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْهُمُ الْغُزَاةُ الَّذِينَ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الدِّيوَانِ، وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْحَسَنِ وَإِسْحَاقَ والحج من سبيل الله الحديث[১৫১]

-'ঐ মুজাহিদ ও গাযীরা এর অন্তর্ভুক্ত, যাদের দফতরে কোন হক থাকে না। আর ইমাম আহমাদ (র), হাসান (র) ও ইসহাক (র)-এর মতে, হজ্জও ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ)-এর অন্তর্ভুক্ত।'

জিহাদের ক্ষেত্রটি হলো, যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এবং যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেখানে একে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যে সকল কাজ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন সে সকল কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা তথা ভৌগোলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করার লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা তথা সামরিক গবেষণা, অস্ত্র তৈরি, অস্ত্র ক্রয়, যুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রভৃতি খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা বৈধ। আর হজ্জ করার ক্ষেত্রটি হলো, এমন ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা, যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছিল; কিন্তু সে ব্যক্তি উক্ত সময় হজ্জ আদায় করতে পারেনি। এমতাবস্থায় পরবর্তীতে তার নিকট হজ্জ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ফুরিয়ে গেছে।[১৫২]

ঙ. ইব্‌ন মাস'উদ আল-কাসানী (র) (মৃ. ৫৮৭ হি.) বলেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ)-এর অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ কিংবা ইবাদত করার ইচ্ছাপোষণ করে। আর সে কাজ সম্পন্ন করতে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হয়; কিন্তু তার নিকট এরূপ অর্থ না থাকলে সে ব্যক্তিও ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ)-এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। যেমন- ধর্মীয় শিক্ষা ও দীনের প্রচার-প্রসার প্রভৃতি কাজ এ শ্রেণির অন্তর্গত। যদি কোন যাকাতের হকদার এ সকল কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে; কিন্তু উক্ত ব্যক্তি যদি সম্পদশালী হয় তাহলে তাকে এরূপ অর্থ দেয়া যাবে না।[১৫৩]

মূলত ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ) শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ এবং এর ব্যাখ্যাও বিস্তৃত। আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে[১৫৪] সকল উত্তম কাজ-ই[১৫৫] ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর যে সকল ব্যক্তি শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থের মাধ্যমে কুরআনকে বুঝতে চায়, তারা সে সমস্ত কাজকেও ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ)-এর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করেছেন, যা কোন দিক দিয়ে সৎকাজ বা ইবাদত হিসেবে গণ্য। যেমন- মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতাল, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ, কূপ খনন, পুল ও সড়ক তৈরি করা এবং জনকল্যাণমূলক সংস্থার কর্মচারীদের বেতন ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাকে ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ)-এর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গ্রহণ করে যাকাতের ব্যয়খাত সাব্যস্ত করা; যা একান্তই ভুল এবং সমগ্র উম্মতের ইজমার পরিপন্থী। কেননা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যত রকম তাফসীর এ শব্দটির ব্যাপারে উদ্ধৃত হয়েছে সেখানে এ শব্দটিকে শুধু হজ্জ পালনকারী ও মুজাহিদগণের জন্য নির্দিষ্ট বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর যে সকল ফকীহ জ্ঞানার্জন কিংবা সৎকর্মসমূহকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তারাও এ শর্তেই তা করেছেন যে, তাদেরকে ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হতে হবে। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ফকীর ও অভাবগ্রস্তরা যাকাত ব্যয়খাতের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তাই এদেরকে ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ)-এর অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও এরা যাকাতের হকদার ছিল।[১৫৬]

৮. মুসাফির

ইব্‌নুস-সাবীল (اِبْنُ السَّبِيْلِ) শব্দটি একটি যৌগিক শব্দ। প্রথমত ইব্‌নুন (اِبْنٌ) শব্দটির অর্থ পুত্র হলেও আরবী পরিভাষায় اِبْنٌ, اَبٌ ও اَخٌ প্রভৃতি শব্দসমূহকে সে সমস্ত বিষয়ের জন্যও বলা হয়, যার গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক কারো সাথে বিদ্যমান থাকে। আর সাবীলুন (سَبِيْلٌ) শব্দটি একবচন, বহুবচনে সুবুলুন (سُبُلٌ); যার অর্থ, পথ, পন্থা, রাস্তা, উপায়, পদ্ধতি, কারণ, হেতু, দোষ, দায়, অভিযোগ,[১৫৭] way, road, path[১৫৮] ইত্যাদি। সুতরাং ইব্‌নুস-সাবীল (اِبْنُ السَّبِيْلِ) শব্দটির অর্থ হলো, পথিক, পথচারী, মুসাফির, পর্যটক,[১৫৯] wayfarer, traveler, vagabond, tramp[১৬০] ইত্যাদি। শব্দটি আল-কুরআনেও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾[১৬১]

-‘এবং আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান করো এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না।’

পরিভাষায়, পথিক ও মুসাফিরকে ইব্‌নুস-সাবীল (اِبْنُ السَّبِيْلِ) নামে আখ্যায়িত করা হয়। আর যাকাতের ব্যয়খাতের ক্ষেত্রে এমন মুসাফির বা পরদেশী প্রবাসীকে বুঝানোই উদ্দেশ্য, যার নিকট সফরকালে প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ থাকে না। স্বদেশে তার যত অর্থ-সম্পদই থাকুক না কেন সে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে।

বুরহান উদ্দীন ‘আলী আল-মারগীনানী (র) (৫৩০-৫৯৩ হি.) বলেন, ‘ইব্‌নুস-সাবীল (اِبْنُ السَّبِيْلِ) হলো যার স্বীয় আবাসস্থলে অর্থ রয়েছে; কিন্তু সে যে স্থানে রয়েছে, সেখানে তার নিকট কিছুই নেই।’[১৬২]

ড. ওয়াহবাহ আয্‌-যুহায়লী (১৯৩২-২০১৫ খ্রি.) বলেন, ‘ইব্‌নুস-সাবীল (اِبْنُ السَّبِيْلِ) হলো সেই মুসাফির ব্যক্তি যে ইবাদতের জন্য অর্থাৎ হজ্জ, জিহাদ, মদীনা যিয়ারত, দীনি শিক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে সফর

করার ইচ্ছা পোষণ করেছে; কিন্তু সাহায্য ব্যতিত তার জন্য গন্তব্যস্থলে পৌঁছা সম্ভব নয়। উক্ত ব্যক্তি যদি ধনীও হয় তাহলেও সে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে।[১৬৩]

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) (মৃ. ৭৪ হি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। অবশ্য যারা আল্লাহ্র রাস্তায় থাকে অথবা মুসাফির ব্যক্তি অথবা কারো দরিদ্র প্রতিবেশী যদি যাকাত হিসেবে কিছু মাল প্রাপ্ত হয়ে তা তার ধনী প্রতিবেশীকে উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করে অথবা দাওয়াত করে খেতে দেয়, তবে তা তাদের (ধনীদের) জন্য বৈধ বা হালাল।'[১৬৪]

মুসাফির ব্যক্তির সফরের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। যেমন- দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে, জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে, চাকরি বা কর্মের জন্য অথবা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির সৌন্দর্য অবলোকনের জন্য সফর করা। উপর্যুক্ত সফরসমূহ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশেও হতে পারে। মোটকথা, এ সকল উদ্দেশ্যে গমনকারী ব্যক্তি ইব্নুস-সাবীল (اِبْنُ السَّبِيْل)-এর অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন। তবে যে ব্যক্তি শুধু সফরের সংকল্প করেছে; কিন্তু এখনো ঘর থেকে বের হয়নি সে ইব্নুস-সাবীল (اِبْنُ السَّبِيْل)-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা সে পথিমধ্যে সৃষ্ট বিভিন্ন কষ্ট, ধুলিময়তা, ক্ষুধা, পিপাসা, আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভিন্নতা প্রভৃতি কষ্ট কেমন? তা অনুধাবন করতে পারবে না।[১৬৫]

ইব্ন যায়দ (র) ও মুজাহিদ (র) (২১-১০৪ হি.) বলেন, 'মুসাফির ব্যক্তি ধনী হোক বা গরীব হোক, যদি তার পথখরচ শেষ হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, হারিয়ে যায় বা এ ব্যাপারে কোনরূপ সমস্যা দেখা দেয় অথবা তার নিকট যদি পথ খরচ-ই না থাকে তাহলে তার জন্য যাকাতের অর্থ গ্রহণ করা অবধারিত হয়ে যায়।[১৬৬]

মুসাফির ব্যক্তিকে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছা পর্যন্ত প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ দিতে হবে। অর্থাৎ তার খাবার খরচ, যাতায়াত খরচ, প্রয়োজনে পোশাকের খরচ এমনকি অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনীয় বস্তুর খরচও প্রদান করা যেতে পারে। সফর যতই দীর্ঘ হোক না কেন মুসাফির ব্যক্তিকে তার বাড়ি পৌঁছা পর্যন্ত যাতায়ত খরচ দেয়া বাঞ্ছনীয়। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন যাকাতের অর্থের কোনরূপ অপচয় বা অপব্যয় না হয়। এজন্য মুসাফির ব্যক্তির করণীয় হলো তুলনামূলক সহজলভ্য যানবাহন ব্যবহার করা।[১৬৭]

যাকাতের উপর্যুক্ত খাতসমূহ বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, একমাত্র যাকাত বিভাগের কর্মচারী (عَامِل) ব্যতিত অবশিষ্ট খাতসমূহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত। তাই কোনক্রমেই ধনী, সুস্থ-সবল ও উপার্জন সক্ষম ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে না। কেননা. 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (সা) বলেছেন,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ[১৬৮]

-'ধনী ও সুঠাম দেহের অধিকারী কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল নয়।'

'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আদী ইব্নুল খিয়ার (র) বলেন,

أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ: أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ[১৬৯]

-'আমাকে অপরিচিত দুজন ব্যক্তি এই সংবাদ প্রদান করেছেন যে, তাঁরা বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তখন তিনি যাকাতের মাল বণ্টনে রত ছিলেন। ঐ দুই ব্যক্তি কিছু মালের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে পুনরায় দৃষ্টি অবনত করেন। তিনি আমাদের

উভয়কে সুস্থ-সবল ও হৃষ্টপুষ্ট দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমাদের দুজনকে দান করব। (কিন্তু জেনে রাখ) এই সম্পদে ধনী, কর্মক্ষম ও সুস্থ-সবলদের কোন অধিকার নেই।'

উপসংহার

ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটিকে অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ ইসলামী রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সমস্যা হলো দারিদ্র। এ দারিদ্র দূরীকরণ শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রাম নয়; বরং এটি একটি সমন্বিত সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম। দারিদ্রের কারণে মানুষ বিভিন্ন অনৈতিক ও মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রব্যবস্থাও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এজন্য সামজ ও রাষ্ট্র থেকে দারিদ্র দূরীকরণে আধুনিক বিশ্বে মানুষ নিত্যনতুন বিভিন্ন মতবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো কোন মতবাদই মানুষের সে কাঙ্ক্ষিত আশা পূরণ করতে পারেনি। পরিতাপের বিষয় হলো বর্তমান মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশও দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে মানব রচিত সে সকল মতবাদেরই দ্বারস্থ হচ্ছে। ফলে তারা দারিদ্রের সে করাল গ্রাস থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে না। অথচ তাদের কাছে রয়েছে সামগ্রিক জীবনের মুক্তির সনদ আল-কুরআনুল-কারীম। যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল (সা)-এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। এ গ্রন্থের নির্দেশনার আলোকেই হযরত মুহাম্মাদ (সা) আধুনিক ও কল্যাণকর একটি রাষ্ট্র মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। সুতরাং সে কল্যাণকর রাষ্ট্রকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যাকাত ব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে কার্যকর করা আবশ্যক। আর যাকাত ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণতা দান তথা যাকাত ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল লাভের জন্য যাকাত ব্যয়ের খাতকে আল-কুরআনে উল্লিখিত আটটি খাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

তথ্যনির্দেশ

১ হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, মুসলিম, স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক, সুস্থ দেহের অধিকারী, পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হওয়া, হজ্জ সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা, হজ্জের সময় হওয়া ও হজ্জে গমনের পথ নিরাপদ হওয়া। আর যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ কয়েকভাগে বিভক্ত। যেমন- ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত শর্ত হচ্ছে, মুসলিম, স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া। সম্পদের সাথে সম্পর্কিত শর্ত হচ্ছে, নিসাব পরিমাণ হওয়া, পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া, মালের পূর্ণাঙ্গ মালিকানা থাকা, প্রবৃদ্ধিশীল মাল হওয়া, মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া এবং মাল ঋণমুক্ত হওয়া। আর সম্পদ যদি পশু হয় তাহলে আরো কতিপয় শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। যথা- গৃহপালিত হালাল পশু হওয়া, বিচরণশীল এবং কাজ-কর্মহীন পশু হওয়া।

২ লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাতি ওয়াল-আদাবি ওয়াল-'উলূম* (বৈরূতঃ আল-মাতবা'আতুল-কাছূলীকিয়্যাহ, ১৯শ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৩০৩; ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস ও ড. হামিদ সাদিক, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (বৈরূতঃ দারুন্-নাফাইস, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩১ হি./ ২০১০ খ্রি.), পৃ. ২৩৩; Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: Spoken Language Services, Inc, Third Edition, 1976), p. 379.

৩ ইব্‌ন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল-'আরব* (বৈরূতঃ দারুল-ফিকর, তা.বি.), পৃ. ৩৫৭; সায়্যিদ সাবিক, *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৩২৭; 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী, *আল-ফিক্‌হু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৫৩৬; হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মাদ রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন* (বৈরূতঃ দারুল কলম, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি.), পৃ. ৩৮০-৩৮১; মুফতী মুহাম্মাদ 'আমীমুল ইহসান, *কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ* (করাচী: মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩১৪; আশ্-শরীফ আল-জুরজানী, *আত্-তা'রীফাত* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১১৪; ড. ইবরাহীম মাদকূর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, ১ম

খণ্ড (মিসর: মাকতাবাতুশ্-শুরূক আদ্-দাওলিয়্যাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩৯৬-৩৯৭; বদরুদ্দীন আল-‘আয়নী, *‘উমদাতুল কারী শারহু সাহীহিল বুখারী*, ৮ম খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত্-তুরাছিল ‘আরাবী, তা.বি.), পৃ. ২৩৩; সম্পাদনা পরিষদ, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি./ ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১০৮৭; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু‘জামুল ওয়াফী]* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৫৩৭।

৪ Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of islam* (New Delhi: Rupa & Co, 3rd Impression, 1993), p. 699.

৫ *A Dictionary of Modern Written Arabic*, p. 379.

৬ আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আল-‘আলা, ৮৭ : ১৪।

৭ সূরা আশ্-শামস, ৯১ : ৯।

৮ বদরুদ্দীন আল-‘আয়নী (র) (৭৬২-৮৫৫ হি.) বলেন,

هُوَ إِيتَاء جُزْء من النِّصَابِ الشَّرْعِيّ الْحَوْلِي إِلَى فَقير مُسْلِم غَيْر هَاشِمِي وَلَا مَوْلَاهُ بِشَرْط قطع الْمَنْفَعَة عَن الْمُزَكِي لله تَعَالَى،

দ্র. *‘উমদাতুল কারী শারহু সাহীহিল বুখারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৮; ইব্নুল ‘আরাবী (র) (৪৬৮-৫৪৩ হি.) বলেন,

هِيَ شَرْعًا: إِيْتَاء جُزْء مِنَ النِّصَابِ الْحَوْلِي إِلَى فَقِيْر غَيْرَ هَاشِمِي.

দ্র. *‘উমদাতুল কারী শারহু সাহীহিল বুখারী*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩; আশ্-শরীফ আল-জুরজানী (র) (৭৪০-৮১৬ হি.) বলেন,

فِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَنْ إِيْجَاب طَائِفَة مِنَ الْمَالِ فِي مَالٍ مَخْصُوْص لِمَالِكٍ مَخْصُوْص

দ্র. *আত্-তা‘রীফাত*, পৃ. ১১৪; Thomas Patrick Hughes বলেন, ZAKAT. Whence it is also used to express a portion of property bestowed in alms, as a sanctification of the remainder to the proprietor. Lt is an institution of Islam and founded upon an express command in the Qur'an (*vide* Surah ii. 77), being one of the five foundations of practical religion.

cf. *Dictionary of islam*, p. 699.

৯ *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৭; হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ রাগিব আল-ইস্পাহানী (র) (মৃ. ৫০২ হি.) বলেন,

الزَّكَاةُ: لما يُخْرِجُ الْإِنْسَان مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ،

দ্র. *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ. ৩৮০-৩৮১।

১০ ইব্ন ‘আবিদীন আদ্-দিমাশকী, *রাদ্দুল মুহতার*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ৩য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২৫৮।

১১ *আল-ফিক্হু ‘আলাল মাযাহিবিল আরবা‘আহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৬।

১২ অর্থাৎ আল-কুরআনে বর্ণিত যাকাতের আটটি খাতের যেকোনো একটি খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা। আটটি খাত হলো, ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন, দাস-মুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী এবং মুসাফির।

১৩ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৪৩।

১৪ সূরা হা-মীম আস্-সাজদাহ, ৪১ : ৬-৭।

১৫ *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৮; *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু‘জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ৯৫৫।

১৬ *আরবী-বাংলা অভিধান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮৭; *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু‘জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ৫৩৭।

১৭ *Dictionary of islam*, p. 699.

১৮ *A Dictionary of Modern Written Arabic*, p. 379.

১৯ আবুত্-তায়্যিব মুহাম্মাদ সিদ্দীক খান ইব্ন হাসান ভূপালী, *আর্-রওদাতুন্-নাদিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড (রিয়াদ: দারু ইবনিল কায়্যিম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৪৮।

২০ মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মুখতার আশ্-শানকীতী, *শারহু যাদিল মুসতাকনি‘*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮।

২১ সূরা আত্-তাওবাহ, ৯ : ৬০।

২২ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৪৩৫।

২৩ আবুল-কাসিম মাহমূদ ইব্ন 'আমর আয্-যামাখশারী, *আল-কাশ্শাফ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল-কিতাবিল 'আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি.), পৃ. ২৮৩।

২৪ *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৪।

২৫ আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইব্ন 'উমার ইব্ন কাছীর আদ্-দিমাশকী, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, তাহকীক: মুহাম্মাদ হুসায়ন শামসুদ্দীন, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি.), পৃ. ১৪৫।

২৬ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস্-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাঊদ* (বৈরূত: দারুল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫-১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবু মান ইয়ু'তা মিনাস্-সাদাকাতি ওয়া হাদ্দুল গিনা, হাদীস নং ১৬৩০; *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

২৭ বুরহান উদ্দীন 'আলী আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত্-তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ১১০; সায়্যিদ সাবিক (র) (১৩৩৫-১৪২০ হি.) বলেন,

مَصَارِفُ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَاف، حَصرهَا اللّٰهُ فِيْ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

দ্র. *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৩; 'আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী (র) (মৃ. ১৩৬০ হি.) বলেন,

مَصْرَفُ الزَّكَاةِ: تصرفُ الزَّكَاة لِلْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

দ্র. *আল-ফিক্হু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬২।

২৮ *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৩; *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ৭৬৪।

২৯ *Dictionary of islam*, p. 115.

৩০ *A Dictionary of Modern Written Arabic*, p. 723.

৩১ সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ২৮।

৩২ সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩৮।

৩৩ সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৫; আরও দেখুন: সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৭৩; সূরা আত্-তাওবাহ, ৯ : ৬০; সূরা আল-হাশর, ৫৯ : ৮।

৩৪ *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৫; সায়্যিদ সাবিক (র) (১৩৩৫-১৪২০ হি.) বলেন,

اَلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِيْن: وَهُمُ الْمُحْتَاجُوْنَ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ كفَايَتهم، وَيُقَابِلهم الْاَغْنِيَاء الْمكفيون مَا يحتَاجُوْنَ إِلَيْه

দ্র. *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৩।

৩৫ *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০; কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র) (১১৪৩-১২২৫ হি.) বলেন,

قَالَ اَكْثَرُ الْحَنْفِيَّة اَلْفَقِيْرُ مَنْ لَهُ مَال دُوْن النِّصَاب وَمَا قلت أَوْفق لمَذْهَب اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ الله

দ্র. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, তাহকীক: গোলাম নবী আত্-তূনিসী, ৪র্থ খণ্ড (পাকিস্তান: মাকতাবাতুর রাশিদিয়্যাহ, ১৪১২ হি.), পৃ. ২৩১।

৩৬ সম্পাদনা পরিষদ, *আশরাফুল হিদায়া*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ১৩১।

৩৭ ড. ওয়াহবাহ আয্-যুহায়লী, *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহূ*, ৩য় খণ্ড (দিমাশক: দারুল-ফিক্র, ৪র্থ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ২৯৬; 'আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী (র) (১২৯৯-১৩৬০ হি.) বলেন,

اَلشَّافِعِيَّةُ قَالُوْا: اَلْفَقِيْرُ هُوَ مَنْ لَا مَالَ لَهُ أَصْلاً، وَلَا كَسْب مِنْ حَلَالٍ، أَوْ لَهُ مَال، أَوْ كَسْب مِنْ حَلَالٍ لَا يكفِيْه

দ্র. *আল-ফিক্হ 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৫; কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র) (১১৪৩-১২২৫ হি.) বলেন,

قَالَ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّة انَّ الْفَقِيْرَ مَنْ لَيْسَ لَهُ مَال أَصْلًا

দ্র. *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩২; জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস্-সুয়ূতী (র) (৮৪৯-৯১১ হি.) বলেন,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَقَع مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتهمْ

দ্র. জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস্-সুয়ূতী (র), *তাফসীরুল জালালায়ন* (কায়রো: দারুল-হাদীছ, ১ম সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ২৫০।

৩৮ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৬১।

৩৯ *তাফসীরুত্-তাবারী*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩০৯।

৪০ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা*, অনুবাদ: আব্দুল কাদের (ঢাকা: সৃজন প্রকাশনী, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৯০।

৪১ জাবেদ মুহাম্মাদ, *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪১৫ হি./২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৩১।

৪২ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৭১।

৪৩ *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫১; *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ৯৪৪।

৪৪ *Dictionary of islam,* p. 353.

৪৫ *A Dictionary of Modern Written Arabic*, p. 909.

৪৬ সূরা আল-হা-ক্কাহ, ৬৯ : ৩৪; সূরা আল-মা'উন, ১০৭ : ৩; আরও দেখুন: সূরা আল-মুদ্দাছছির, ৭৪ : ৪৪; সূরা আল-ফাজর, ৮৯ : ১৮; সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৭৭।

৪৭ *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০।

৪৮ *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭; 'আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী (র) (১২৯৯-১৩৬০ হি.) বলেন,

اَلشَّافِعِيَّة قَالُوا: اَلْمِسْكِيْنُ مِنْ قدْر عَلَى مَال، أَوْ كَسْب حَلَالٍ، يسَاوِي نِصْف مَا يكفِيْهِ فِي الْعمرِ الْغَالِبِ الْمتَقَدمِ، أَوْ أَكْثَر مِنَ النِّصْفِ

দ্র. *আল-ফিক্হু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৬; কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র) (১১৪৩-১২২৫ হি.) বলেন,

قَالَ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِية الْمِسْكِيْن مَنْ لَهُ قَلْيل مِنَ الْأَعْمَالِ لِاَنَّ قَوْله تَعَالَى فَاِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِيْن وَاِطْعَام

দ্র. *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩২-২৩৩; জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস্-সুয়ূতী (র) (৮৪৯-৯১১ হি.) বলেন, الْمَسَاكِين: الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَكْفِيهِمْ দ্র. *তাফসীরুল জালালায়ন*, পৃ. ২৫০।

৪৯ *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

৫০ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৩৮।

৫১ *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩২; সায়্যিদ সাবিক (র) (১৩৩৫-১৪২০ হি.) বলেন,

اَلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِيْن: وَهُمُ الْمُحْتَاجُوْنَ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ كفَايَتهم، وَيُقَابِلهم الْاَغْنِيَاء الْمكفيون مَا يحتَاجُوْنَ إِلَيْه

দ্র. *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৩।

৫২ মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ আল-কুরায়শী আন্-নায়সাপুরী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূত: দারুল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবুল মিসকীনিল্লাযী লা ইয়াজিদু গিনান ওয়ালা ইয়ুফতানু লাহূ ফা-ইয়ুতাসাদ্দাকু 'আলায়হি, হাদীস নং ২২৮২।

---

[৫৩] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৭৩; কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র) (১১৪৩-১২২৫ হি.) বলেন, اَلسَّكِيْنَةُ اَىْ لَا يتَحَرَّكُ لِاَجَلِ السُّؤَال দ্র. *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩২।

[৫৪] *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭।

[৫৫] সূরা আল-বালাদ, ৯০ : ১৪-১৬।

[৫৬] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৭৩।

[৫৭] *আশরাফুল হিদায়া*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩১-১৩২।

[৫৮] মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল-বুখারী* (বৈরূতঃ দারু ইব্ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবু আখযিস্-সাদাকাতি মিনাল আগনিয়াই ওয়া তুরাদ্দা ফিল ফুকারাই হায়ছু কানূ, হাদীস নং ১৪৯৬।

[৫৯] *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭।

[৬০] সূরা আল-কাহ্ফ, ১৮ : ৭৯।

[৬১] *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৩।

[৬২] মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী, *সুনানুত্-তিরমিযী* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল-মা'আরিফ, ১ম সংস্করণ, তা.বি.), আবওয়াবুয্-যুহদ, বাবু মা জাআ আন্না ফুকারাআল মুহাজিরীনা ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা কাবলা আগনিয়াইহিম, হাদীস নং ২৩৫২।

[৬৩] *আশরাফুল হিদায়া*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩২।

[৬৪] *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৪।

[৬৫] *আশরাফুল হিদায়া*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩২।

[৬৬] *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩; *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ৬৭৮।

[৬৭] *A Dictionary of Modern Written Arabic*, p. 646.

[৬৮] জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস্-সুয়ূতী (র) (৮৪৯-৯১১ হি.) বলেন,

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا: أَيْ الصَّدَقَات مِنْ جَابٍ وَقَاسِم وَكَاتِب وَحَاشِر

দ্র. *তাফসীরুল জালালায়ন*, পৃ. ২৫০; কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র) (১১৪৩-১২২৫ হি.) বলেন,

الْعامِلِينَ عَلَيْها اَىْ عَلَى الصَّدَقَاتِ عد الله سُبْحَانَهُ مِنْ اَصْنَافِ الْفُقَرَاء عَامِل الصَّدَقَةِ وَأَعْوَانِهِمْ مَجَازًا سَوَاءٌ كَانُوْا اَغْنِيَاء اَوْ فُقَرَاء لِاَنَّهُمْ وكلاء لِلْفُقَرَاءِ فِى أَخذ الصَّدَقَاتِ وَتقسيمهَا مَشْغُوْلُوْنَ بِاُمُوْرِهِمْ

দ্র. *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৩।

[৬৯] সূরা আত্-তাওবাহ, ৯ : ১০৩।

[৭০] *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৩৭।

[৭১] *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু মান ইয়াজূযু লাহূ আখযুস্-সাদাকাতি ওয়া হুওয়া গানিয়্যুন, হাদীস নং ১৬৩৫।

[৭২] পূর্বোক্ত, হাদীস নং ১৬৩৭।

[৭৩] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু ইবাহাতিল আখযি লিমান উ'তিয়া মিন গায়রি মাসআলাতিন ওয়ালা ইশরাফিন, হাদীস নং ২২৯৭।

[৭৪] *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮।

[৭৫] *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৩।

[৭৬] *আশরাফুল হিদায়া*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩।

[৭৭] মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী, *তাফসীরুত্-তাবারী*, তাহকীকঃ ড. 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্দিল মুহসিন আত্-তারাক্কী, ১১শ খণ্ড (প্রকাশনা স্থান অনুল্লেখঃ দারু হিজর লিত্-তাবা'আতি ওয়ান্-নাশরি ওয়াত্-তাওযী'ই ওয়াল ই'লান, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ৫১৮।

---

[৭৮] *দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা*, পৃ. ১২০।

[৭৯] *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৩।

[৮০] *তাফসীরুত্-তাবারী*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫১৭।

[৮১] *Law and philosophy of Zakat,* Pp. 291-292; *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৮; *দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা*, পৃ. ১২২।

[৮২] *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫২।

[৮৩] *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৭; *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু‘জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ৮০০।

[৮৪] *A Dictionary of Modern Written Arabic,* p. 784.

[৮৫] *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু‘জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ৮৬৫।

[৮৬] *তাফসীরে মা‘আরেফুল কোরআন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪০।

[৮৭] *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

[৮৮] আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ* (বৈরূতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), মুসনাদু সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া আল-জুমাহী ‘আনিন্-নাবিয়্যি (সা), হাদীস নং ১৫৩০৪।

[৮৯] *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবু আহাদীছিল আম্বিয়া, বাবু কাওলিল্লাহি ‘আযযা ওয়া জাল্লাঃ ওয়া আম্মা ‘আদুন ফাউহলিকূ বি-রীহিন সারসারিন ..., হাদীস নং ৩৩৪৪; কিতাবুত্-তাওহীদ, বাবু কাওলিল্লাহি তা‘আলাঃ তা‘রুজুল মালাইকাতু ওয়ার-রূহু ..., হাদীস নং ৭৪৩২; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু যিকরিল খাওয়ারিজি ওয়া সিফাতিহিম, হাদীস নং ২৩৪০; *সুনানু আবী দাঊদ*, কিতাবুস্-সুন্নাত, বাবুন ফী কিতালিল খাওয়ারিজ, হাদীস নং ৪৭৬৪; আহমাদ ইব্ন শু‘আয়ব আন্-নাসাঈ, *সুনানুন্-নাসাঈ* (বৈরূতঃ দারুল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫-১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, আল-মুআল্লাফাতু কুলূবুহুম, হাদীস নং ২৫৭৮।

[৯০] *Law and philosophy of Zakat,* p. 295.

[৯১] *দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা*, পৃ. ১২৩-১২৪।

[৯২] *তাফসীরুত্-তাবারী*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২০।

[৯৩] *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৫; ইমাম কুরতুবী (র) (৬০০-৬৭১ হি.) বলেন,

قَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ: لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَقَطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ اجْتَمَعَتِ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى سُقُوطِ سَهْمِهِمْ.

দ্র. আবূ ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আল-কুরতুবী, *তাফসীরুল কুরতুবী*, ৮ম খণ্ড (কায়রোঃ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ১৮১।

[৯৪] *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৯।

[৯৫] *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৬।

[৯৬] সূরা আল-কাহ্ফ, ১৮ : ২৯।

[৯৭] *তাফসীরুত্-তাবারী*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২২।

[৯৮] *তাফসীরুল জালালায়ন*, পৃ. ২৫০।

[৯৯] *তাফসীরে মা‘আরেফুল কোরআন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪১।

[১০০] *তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৭; *তাফসীরুল কুরতুবী*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮১।

[১০১] *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

[১০২] *তাফসীরুত্-তাবারী*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২৩।

[১০৩] *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৫।

[১০৪] *তাফসীরুত্-তাবারী*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২১।

---

[১০৫] *তাফসীরুল কুরতুবী*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮১।

[১০৬] *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

[১০৭] *আল-কাশ্শাফ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮২।

[১০৮] *আরবী-বাংলা অভিধান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪৭; *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ৫১৮।

[১০৯] *Dictionary of islam*, p. 545.

[১১০] *A Dictionary of Modern Written Arabic*, p. 353.

[১১১] **মুকাতাবঃ** এমন দাসকে মুকাতাব বলা হয়, যে তার মনিবের সাথে (নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের ভিত্তিতে মুক্তিলাভের) লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ। দ্র. *কাওয়া'ইদুল ফিক্হ*, পৃ. ৫০২।

[১১২] *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৬; জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস্-সুয়ূতী (র) (৮৪৯-৯১১ হি.) বলেন, وَفِي: فَكِّ، الرِّقَاب: أَيْ الْمُكَاتَبِينَ দ্র. *তাফসীরুল জালালায়ন*, পৃ. ২৫০।

[১১৩] *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

[১১৪] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০।

[১১৫] *আশরাফুল হিদায়া*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

[১১৬] *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৬।

[১১৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭।

[১১৮] পূর্বোক্ত।

[১১৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬।

[১২০] 'আলী ইব্ন 'উমার আদ্-দারা কুতনী, *সুনানুদ্-দারা কুতনী* (বৈরূতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবুল-হাছছি 'আলা ইখরাজিস্-সাদাকাতি ওয়া বায়ানি কিসমাতিহা, হাদীস নং ২০৫৫।

[১২১] *সুনানুত্-তিরমিযী*, আবওয়াবু ফাদাইলিল জিহাদি 'আন রাসূলিল্লাহি (সা), বাবু মা জাআ ফিল মুজাহিদি ওয়ান্-নাকিহি ওয়াল মুকাতাবি ওয়া 'আওনিল্লাহি ইয়্যাহুম, হাদীস নং ১৬৫৫; আহমাদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ, *সুনানুন্-নাসাঈ*, কিতাবুন্-নিকাহ, বাবু মা'উনাতিল্লাহিন্-নাকিহাল্লাযী ইয়ুরীদুল 'আফাফা, হাদীস নং ৩২১৮।

[১২২] *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

[১২৩] *দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা*, পৃ. ১৩০।

[১২৪] *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ৭২২।

[১২৫] *A Dictionary of Modern Written Arabic*, p. 671.

[১২৬] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৬৫।

[১২৭] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০।

[১২৮] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০; জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস্-সুয়ূতী (র) (৮৪৯-৯১১ হি.) বলেন,

وَالْغَارِمِينَ: أَهْل الدِّين إنْ اسْتَدَانُوا لِغَيْرِ مَعْصِيَة أَوْ تَابُوا وَلَيْسَ لَهُمْ وَفَاء أَوْ لِإِصْلَاحِ ذَات الْبَيْن وَلَوْ أَغْنِيَاء

দ্র. *তাফসীরুল জালালায়ন*, পৃ. ২৫০।

[১২৯] *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৮।

[১৩০] *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৬।

[১৩১] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু মান তাহিল্লু লাহুল মাসআলাতু, হাদীস নং ২২৯৩।

[১৩২] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল মুসাকাতি ওয়াল মুযারা'আহ, বাবু ইসতিহবাবিল ওয়াদ'ই মিনাদ্-দায়নি, হাদীস নং ৩৮৭২; *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল-বুয়ূ', বাবু ফী ওয়াদ'ইল জাইহাহ, হাদীস নং ৩৪৬৯; *সুনানুত্-তিরমিযী*, আবওয়াবুয্-যাকাত, বাবু

মান তাহিল্লু লাহুস্-সাদাকাতু মিনাল গারিমীনা ওয়া গায়রিহিম, হাদীস নং ৬৫৫; *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ*, কিতাবুল আহকাম, বাবু তাফলীসুল মু'দামি ওয়াল বায়'ই 'আলায়হি লি গুরামাইহী, হাদীস নং ২৩৫৬।

[১৩৩] *সুনানু আবী দাঊদ*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু মান ইয়াজূযু লাহূ আখযুস্-সাদাকাতি ওয়া হুওয়া গানিয়্যুন, হাদীস নং ১৬৩৫।

[১৩৪] *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৮; *আল-ফিক্‌হু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৬।

[১৩৫] সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ৩১।

[১৩৬] সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৬-২৭।

[১৩৭] *আল-ফিক্‌হু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৪।

[১৩৮] *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৮; *আল-ফিক্‌হু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৩।

[১৩৯] *আল-ফিক্‌হু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৫।

[১৪০] *দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা*, পৃ. ১৩২।

[১৪১] *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬০; *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ৭৬৯।

[১৪২] *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২; *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ৫৫৩।

[১৪৩] *A Dictionary of Modern Written Arabic*, p. 396.

[১৪৪] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৪; উল্লিখিত আয়াত ব্যতিত ফী সাবীলিল্লাহ (فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ) শব্দটি আল-কুরআনে আরও ৪২ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

[১৪৫] *আল-কাশ্‌শাফ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩।

[১৪৬] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০; *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৮; জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস্-সুয়ূতী (র) (৮৪৯-৯১১ হি.) বলেন,

وَفِي سَبِيل اللَّه: أَيْ الْقَائِمِينَ بِالْجِهَادِ مِمَّنْ لَا فَيْء لَهُمْ وَلَوْ أَغْنِيَاء

দ্র. *তাফসীরুল জালালায়ন*, পৃ. ২৫০; কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র) (১১৪৩-১২২৫ হি.) বলেন,

قَالَ الشَّافِعِي وَابُو يُوْسُف وَجَمْهُوْر الْعُلَمَاءِ المُرَاد بِهِ مُنْقَطِعِ الْغَزَاة

দ্র. *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৮।

[১৪৭] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০; কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র) (১১৪৩-১২২৫ হি.) বলেন,

قَالَ اَحْمَدُ وَمحمد بْنُ الْحَسَن مُنْقَطِعِ الْحَاج

দ্র. *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৮।

[১৪৮] *সুনানু আবী দাঊদ*, কিতাবুল-মানাসিক, বাবুল-'উমরাহ, হাদীস নং ১৯৮৯।

[১৪৯] আবূ দাঊদ সুলায়মান আত্-তায়ালিসী, *মুসনাদু আবী দাঊদ আত্-তায়ালিসী*, তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আব্দিল মুহসিন আত্-তারাক্কী (মিসর: দারু হিজর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), ওয়া উম্মু মা'কালিল আশজা'ইয়্যাতু (রা) 'আনিন্-নাবিয়্যি (সা), হাদীস নং ১৭৬৭; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীছু উম্মি মা'কালিল আসাদিয়্যাহ, হাদীস নং ২৭২৮৬।

[১৫০] *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯।

[১৫১] *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৮।

[১৫২] *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৬-৪৪৭।

[১৫৩] 'আলাউদ্দীন আল-কাসানী, *বাদাই'উস্-সানা'ঈ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৪৫।

১৫৪ এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ -'হে রাসূল! আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য।' দ্র. সূরা আল-আন'আম, ৬ : ১৬২।

১৫৫ এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ -'আর তোমরা পরস্পর সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যকে সাহায্য করো এবং পাপ ও সীমালজ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যকে সহায়তা করো না।' দ্র. সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ২।

১৫৬ *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৮।

১৫৭ *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২; *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ৫৫৩।

১৫৮ *A Dictionary of Modern Written Arabic*, p. 396.

১৫৯ *আরবী-বাংলা অভিধান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২; *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ৫৫৩।

১৬০ *A Dictionary of Modern Written Arabic*, p. 396.

১৬১ সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৬; এতদ্ব্যতিত ইব্নুস্-সাবীল (اِبْنُ السَّبِيْل) শব্দটি আল-কুরআনে আরও ৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬২ *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০; ইব্ন কাছীর (র) (৭০০-৭৭৪ হি.) বলেন,

وَكَذَلِكَ ابْنُ السَّبِيلِ وَهُوَ الْمُسَافِرُ الْمُجْتَازُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى سَفَرِهِ

দ্র. *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৯; জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস্-সুয়ূতী (র) (৮৪৯-৯১১ হি.) বলেন,

وابْن السَّبِيل: الْمُنْقَطِع فِي سَفَره

দ্র. *তাফসীরুল জালালায়ন*, পৃ. ২৫০; কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র) (১১৪৩-১২২৫ হি.) বলেন,

ابْنِ السَّبِيلِ وَهُوَ الْمُسَافِر فَاعْلَمْ انَّ الْمُسَافِر امَّا اَنْ يَكُوْنَ مَالِكًا لِنِصَاب يَمْنَع أَخذ الزَّكَاة اَوَّلًا وَعَلَى الثَّانِي يعْطى لَهُ الزَّكوة اِتِّفَاقا سَوَاء كَانَ فِى أَثْنَاءِ السَّفَرِ اَو مرِيْدا لِلسَّافر

দ্র. *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯।

১৬৩ *আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০২।

১৬৪ *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু মান ইয়াজূযু লাহু আখযুস্-সাদাকাতি ওয়া হুওয়া গানিয়্যুন, হাদীস নং ১৬৩৭।

১৬৫ *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত*, পৃ. ১৩৮।

১৬৬ *তাফসীরুত্-তাবারী*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩২১।

১৬৭ *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত*, পৃ. ১৩৯।

১৬৮ *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু মান ইয়ু'তা মিনাস্-সাদাকাতি ওয়া হাদ্দুল গিনা, হাদীস নং ১৬৩৪; *সুনানুত্-তিরমিযী*, আবওয়াবুয্-যাকাত, বাবু মান লা তাহিল্লু লাহুস্-সাদাকাতু, হাদীস নং ৬৫২; *সুনানুন্-নাসাঈ*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু ইযা লাম ইয়াকুন লাহূ দারাহিমু ওয়া কানা লাহূ 'আদলুহা, হাদীস নং ২৫৯৭; *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু মান সাআলা 'আন যাহরি গিনা, হাদীস নং ১৮৩৯।

১৬৯ *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু মান ইয়ু'তা মিনাস্-সাদাকাতি ওয়া হাদ্দুল গিনা, হাদীস নং ১৬৩৩।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

যন্ত্রসংগীতের নান্দনিকতা ও তবলা সংগতবাদন

ড. দীনবন্ধু পাল*

Abstract: To perform instrumental raga music the vocal music styles are followed such as Dhrupad, Khyal, Thumre etc. Here the tabla accompany is must both the vocal and instrumental performancr. But in Dhrupad vocal style usally used Pakhowaj instead of tabla. Parforming a raga with instrument in vilanibit laya in called. Masithani gat which is followed in vocal khyal style. On the other hand Rejakhani gat is simitar to Madhya laya or dutalaya khyal style Alltaough texts are not requirgd in instrumental music. So in elaboration of raga the emotion of the artistplays the most important role. There are some techsier and terms accompany table like Alap, Tukra, Rela. Layakari (variation of rhythm) swaal- jowabeto which are applied during performance. This article discusser the aesthetical important and use of technical part of table during performances of Instvuynental raga music like Surod, Setar, violin, shanai etc and defferiut styter also the aesthetical view of Instrumetal Music and important of Tabla accompany.

ভূমিকা

যন্ত্রসংগীতের সাথে তবলা সংগত বাদনে তত, ঘন, শুশির সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের স্বকীয়তা ও উৎকর্ষতা বিবেচনীয়। এই বাদ্যযন্ত্রগুলো লোকজ ঢঙ্গ থেকেই ক্রমান্বয়ে উচ্চাঙ্গসংগীত ধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে শিল্পীর সৃজনশীল ও মনোরঞ্জক সংগীত পরিবেশনাকে যন্ত্রসংগীত বলা যায়। যে সকল যন্ত্রে রাগসংগীত পরিবেশন করা যায় সেগুলোর সাথে তবলার বাদনক্রিয়া সংগত বাদন হিসেবে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। যন্ত্রসংগীতে ধ্রুপদ অঙ্গের বাদন ক্রিয়ায় শিল্পী দীর্ঘ সময় ধরে ধ্রুপদের মতোই তাল ছাড়া রাগের আলাপ করেন। এরপরে কম্পোজিশান বা বন্দিশ (গৎ) অংশে তবলা বাদনক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু খেয়াল অঙ্গের বাদনের সাথে বিলম্বিত গৎ এ তবলা বাদন কণ্ঠসংগীতের সাথে সংগত বাদনের চেয়েও বৈচিত্র্যপূর্ণ। রাগ পরিবেশনের জন্য যন্ত্রসংগীতে তত, শুশির, ঘন, আনদ্ধ সকল যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে রঞ্জকতা বিদ্যমান। তারযন্ত্রের মধ্যেই যেমন সরোদ, সেতার, বীণা, গীটার ইত্যাদি আঙ্গুলের মাথায় মিজরাব ব্যবহার করে বাজানো হয়। আবার সারেঙ্গী, এস্রাজ, বেহালা, রবাব ইত্যাদি যন্ত্র ছড়ের সাহায্য বাজানো হয়। কাঠিরদ্বারাআঘাত করে সন্তুর যন্ত্রটি বাজানো হয়। শুশির যন্ত্রের মধ্যে বাঁশি ও সানাই রাগ পরিবেশনের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঘনবাদ্যের মধ্যে জলতরঙ্গে স্টিল বা সিরামিক এর পাত্রে পানির সাহায্য সুরারোপিত করে কাঠির সাহায্যে রাগ পরিবেশন করা যায়। আবার আনদ্ধ যন্ত্রে তবলা তরঙ্গে রাগের সীমিত স্বরূপ পরিবেশন করা সম্ভব।

যন্ত্রসংগীতের সাথে সংগত বাদনে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। (ক) সাথসংগত, (খ) গুণগত সংগত এবং (গ) সওয়াল জবাবের মাধ্যমে সংগত। সাথসংগত মূল শিল্পীর সাথে শুধুমাত্র ঠেকা না বাজিয়ে তার পরিবেশনার ছন্দ বৈচিত্র্যকে লক্ষ্য করে তাৎক্ষণিক বোল বাণী প্রয়োগ করে সংগত করলে তাকে বলে সাথসংগত।[১] যতক্ষণ পর্যন্ত মূল শিল্পী তার ছন্দ বৈচিত্র্য শেষ না করে স্থায়ী গৎ-এ ফেরেন সেই সময় পর্যন্ততবলা শিল্পীও তালের ঠেকা বাজাতে পারেন না। সাথসংগতের ক্ষেত্রে তবলা শিল্পীকে লয়দার ও বুদ্ধিমান হওয়া একান্তপ্রয়োজন। এই অংশে উভয় শিল্পীর মধ্যে একটি সুস্থ পরিবেশনার ভাব বিনিময়ের মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। যন্ত্রসংগীত শিল্পী রাগরূপের ক্যানভাসে তুলির আঁচর দিয়ে যেন সংশ্লিষ্ট রাগের

* সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ছন্দজাল তৈরি করেন। একইভাবে তবলা বাদকও স্বতন্ত্র বাদনের পেশকারের ন্যায় দ্বৈত ভূমিকার সহযাত্রী হন।

গুণগত সংগতে তবলা বাদক নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদর্শন করে সংগত বাদন প্রতিষ্ঠিত করেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক তবলা বাদকেরই সংশ্লিষ্টঘরানার কিছু কিছু বোল বাণীর উপরে দুর্বলতা থাকে। এই বোল বাণীগুলোকে তিনি সংগত বাদনে তালের ও রাগের ভাব অনুযায়ী প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। এই সংগতে তবলা বাদক একটি বিস্তার শ্রেণীর রচনা বাজিয়ে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সবসময় তবলা শিল্পীকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে মূল শিল্পী যে ভাবের বা রসের সৃষ্টি করেছেন তা যেন কোনো ভাবেই রসভঙ্গের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। অর্থাৎ এই পর্বে এমন রচনা বাজাতে হবে যাতে মূলশিল্পীর পরিবেশনার সাথে সম্পৃক্ত হয়।

যন্ত্রসংগীত শিল্পী যে ছন্দজাল তৈরি করেছেন সেই অনুযায়ী ছন্দ বিন্যাস করা যেতে পারে। অথবা নতুন ছন্দ বিন্যাস তৈরি করে শিল্পীকে নতুন ছন্দ প্রকরণের সন্ধান দেয়া যেতে পারে। এইভাবে সংগত বাদন উপস্থাপন করলে সমগ্র অনুষ্ঠানটি গতিপ্রাপ্ত হতে পারে। এই অংশে তবলা বাদক একক বাদনের মতো সুযোগ পেয়ে থাকেন তবে উপস্থাপনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ সঠিক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সওয়াল জবাবে একজন প্রশ্নকর্তা অপরজন উত্তর দাতা। একজন শিল্পী যে ছন্দজাল তৈরি করছেন তাৎক্ষণিক সেই ছন্দ বৈচিত্র্যের সম্যক উত্তর দিচ্ছেন তবলা বাদক তবলার বোলবাণীর মাধ্যমে। সাথসংগতের ক্ষেত্রে যেমন উভয় শিল্পী একত্রে বাদন ক্রিয়া উপস্থাপন করে থাকেন। কিন্তু সওয়াল জবাবের ক্ষেত্রে শিল্পী যখন সুর ও ছন্দের বিভিন্ন প্রকার বাদন ক্রিয়া উপস্থাপন করেন। সেই সময় বাদন ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে তবলা শিল্পীকে সুস্পষ্ট ঠেকার প্রয়োগ করে সংগত বাদন করতে হয়। যন্ত্রসংগীত শিল্পীর ছন্দ বৈচিত্র্য এর বাদন ক্রিয়া শেষ হলে, তাৎক্ষণিক তবলা শিল্পী তবলার বোল বাণীদ্বারাঐ সুর ও ছন্দের সম্যক উত্তর দিতে থাকেন। এক্ষেত্রে তবলা বাদকের স্মরণ শক্তি প্রখর হওয়া, শ্রুতিধর হওয়া এবং লয়ের দক্ষতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। একটি ভাল পরিবেশনা তখনি হবে যখন সংগত বাদনকে আলাদা করে ভাবতে হয় না। আর এখানেই একজন তবলা বাদকের সার্থক সংগত বাদন।

বিষয় বিবরণ

হিন্দুস্থানী সংগীত রীতিতে সেতার, বীণা, তানপুরা প্রভৃতি যন্ত্রে তুম্বার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেতার অথবা বীণার উচ্চাঙ্গ রীতির বাদনে যন্ত্র দুটির সুর বা স্কেল এবং মননশীলতা নির্ভর করে এর গঠন প্রণালীর ওপর। তানপুরা কেবলমাত্র স্থির সুরের জন্য প্রয়োজন হলেও লেডিস এবং জেন্স তানপুরাকে কণ্ঠস্বরের অনুকরণে তুম্বার আকৃতি সংযোজিত হয়। তেমনি এই যন্ত্রটি সরোদ, সেতার, বীণা, সানাই, বাঁশি, সারেঙ্গী, এস্রাজ, বেহালা, সন্তুর প্রভৃতির সাথে স্কেল অনুযায়ী মিলিয়ে নিতে হয়। অর্থাৎ কণ্ঠসংগীত শিল্পীর অনুরূপ (লেডিস এবং জেন্স) উপর্যুক্ত যন্ত্রগুলির সাথে তানপুরা প্রয়োজন হয়। আবার সংগত বাদনে তবলার স্কেলও মূল যন্ত্রের অনুস্বরণে ব্যবহৃত হতে হবে। যেমন একটি ছোট বাঁশির স্কেল হয় উঁচু এবং বড় বাঁশির স্কেল নিচু স্বরের হয়ে থাকে। এই উঁচু এবং নিচু স্কেলের তবলার মুখ যথাক্রমে ছোট ও বড় হয়ে থাকে। আবার শানাই যন্ত্রের স্কেলও দৈর্ঘ্যের ওপর এবং ব্যসের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং এই সকল যন্ত্রের সাথে সংগত বাদনে যন্ত্র সম্পর্কিত গঠন প্রণালীর অভিজ্ঞতাও বিশেষভাবে বিবেচনীয়। বিভিন্ন যন্ত্রের গঠন প্রণালীতে ব্যবহৃত মানসম্পন্ন উপকরণগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে সংশ্লিষ্টযন্ত্রের বাদকগণ স্বীয় যন্ত্রের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান থাকেন। যন্ত্রের গঠন অনুযায়ী শব্দের নান্দনিক ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়। আর এ কারণে আমরা কোনো যন্ত্র না দেখেই বলতে পারি এটি কিসের শব্দ। অথবা বাদনক্রিয়া শুনেই বলতে পারি যন্ত্রটি কোন শিল্পী বাজিয়েছেন। যন্ত্রসংগীতের সাথে সংগত বাদনে যন্ত্রের গঠন প্রণালীকে মানসম্পন্ন বিবেচনা করেই বিভিন্ন যন্ত্রের সাথে সংগত বাদন বিষয়ে এই আলোচনা করা হলো।

সেতারের সাথে সংগত বাদন

নিম্নমানের সেতারে এ তরবের তার ব্যবহৃত হয় না। মূলতার ও চিকরি, বড় চওড়া সওয়ারির উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু তরবের তার যায় চ্যাপ্টা সওয়ারির উপর দিয়ে। এই ছোট সওয়ারি বড় সওয়ারির ঠিক নীচে থাকে। বীণার মতই সওয়ারি হাড়, হরিণের শিঙ বা কাঠের তৈরী। তর্জনীতে তারের মিরজাব পরে তারগুলোকে টেনে আঘাত করতে হয়। আঙুল দুভাবে চালনা করা হয়। তার আঘাত করার সময় আঙুল নিজের দিকে আনতে হয়, আবার তারে আঘাত করে আঙুলকে নিজের দিক থেকে দূরে নিয়ে যেতে হয়। দক্ষিণ ভারতীয় বীণার মত চিকরি ব্যবহৃত হয় মূল সুর ধরে রাখার জন্যে।

সেতারেরও লাউ অনেকটা গোলাকার। লাউ চ্যাপ্টা আকৃতির হলে যন্ত্রকে বলে 'কছুআ' অর্থাৎ কচ্ছপাকৃতি সেতার, লাউ এর খোলকে বলে তুম্বা। তুম্বার একদিক গলার সঙ্গে আঠা দিয়ে জোড়া। তুম্বার উপরিভাগ পাতলা কাঠেরদ্বারাআবৃত। কাঠের আচ্ছাদন সমতল বা একটু স্ফীত হতে পারে, গলার সাথে সংযুক্ত করা হয় ডাণ্ডা, ডাণ্ডার উপরে উত্তল (কনডেক্স) পেতলের পর্দা বা ফ্রেটস্ বাঁধা থাকে যাতে সপ্তকের প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলো সরানো যেতে পারে। পর্দার চলনশীলতার জন্যে এই ব্যবস্থাকে বলে 'চলঠাট'।[২] আজকাল এর প্রচলন হলেও পুরনো ছাঁচে পর্দা ছিল নির্দিষ্ট। তাদের বলা হত অচল ঠাট যেমন, রুদ্রবীণা ও সরস্বতী বীণা। উচ্চমার্গের বাদ্যযন্ত্রে ডাণ্ডার শেষ প্রান্তে আরো একটি লাউ থাকে। রাগ বাজাবার জন্যে পাঁচটি ধাতব তার মূল সত্তয়ারির উপর দিয়ে প্রসারিত থাকে। এছাড়া আরও দুইটি তার থাকে সুর ধরে রাখার জন্য তাদের বলে চিকরি। মূল তারগুলির নিচে এগারটি থেকে সতেরটি পাতলা তার থাকে অনুরণনের জন্যে, এদের বলে তরব।

সেতার, সরোদ, সারেঙ্গী, সন্তুর, বেহালা ও এস্রাজ এই সব যন্ত্রগুলো তারের হলেও প্রত্যেকটি যন্ত্রের নিজস্ব স্বকীয়তা বিদ্যমান এবং প্রত্যেকটি যন্ত্রের বাদনশৈলীর যথেষ্ট পার্থক্যও আছে। সারেঙ্গী বেহালা এস্রাজ এই যন্ত্রগুলো ছড়ের সাহায্যে বাজানো হয়ে থাকে সেই জন্য এই যন্ত্রগুলোর সাথে সংগত বাদন আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে। সরোদ ও সন্তুর এই যন্ত্রগুলোও আলাদা করে সংগত বাদন আলোচনা করা হবে।

অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় সেতার ও দুই ধারাতে বাজানো বা পরিবেশিত হয়ে থাকে ধ্রুপদঅঙ্গে ও খেয়াল অঙ্গে। ধ্রুপদঅঙ্গে যখন সেতারের বাদন ক্রিয়া উপস্থাপন হয় তখন দীর্ঘক্ষণ ধরে তাল ছাড়া আলাপ, জোড় পরিবেশিত হয়। তারপর তালে গৎ এবং খেয়াল পরিবেশন করেন। অঙ্গে যখন এই যন্ত্রের বাদন ক্রিয়া পরিবেশিত হয় তখন উচ্চাঙ্গকণ্ঠের ন্যায় সামান্য আলাদা করেই তালে গৎ পরিবেশন করেন। সেতারের একক বাদন এবং সহযোগী বাদন হিসেবে হিন্দুস্থানী সংগীতে বহুল প্রচলিত। সেতারের একক বাদন পরিবেশিত হয় উচ্চাঙ্গ সংগীতে এবং সহযোগী বাদন পরিবেশিত হয় লঘু সংগীতে।

সেতার বাদক আলাপ অংশ শেষ করেই বিলম্বিত 'গৎ' উপস্থাপন করেন। তাৎক্ষণিক গৎ এর কোন অংশে 'সম' নির্দেশ করছেন তা তবলা বাদক বোঝে নেন এবং সাথে সাথে 'গৎ' এর ধরণ অনুযায়ী বা ভাব আবেদন নান্দনিকতা অনুযায়ী তবলা বাদক একটি স্থায়ী বিস্তারশ্রেণীর রচনা উপস্থপন করেন। এবং সেই সাথে মূল পরিবেশনার গতি তরান্বিত করতে থাকেন। সেতার বাদক তবলা বাদকের কম্পোজিশানটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে রাগের বিস্তারঅংশে প্রবেশ করেন এবং সেই সময় তবলা বাদক তাঁর রাগের বিস্তারের নান্দনিকতা অনুযায়ী নান্দনিকতাপূর্ণ ঠেকা পরিবেশন করতে থাকেন। মূলশিল্পী কয়েক আবর্তন বিস্তারকরে রাগের গৎ বাজান তখন তবলা বাদক আবারও একটি কম্পোজিশান উপস্থাপন করেন কয়েক আবর্তন কম্পোজিশানটা বাজিয়ে তিহাই দিয়ে গৎ এর সমে প্রবেশ করেন। সেতার বাদক আবার তবলা বাদকের কম্পোজিশানটার নান্দনিকতা অনুযায়ী শিল্পী যে রাগটি পরিবেশন করছেন সেই রাগের সুর বিস্তারকরেন। এইভাবে কয়েক আবর্তন করার পর আবারও মূল গৎ এ ফিরে আসেন। তাৎক্ষণিক তবলা বাদক আবার সেতার বাদকের সুরের ভাবাবেশ অনুযায়ী উপোজ অঙ্গের কোনো কম্পোজিশান কিংবা মিঠাই হাতের কোনো

গৎ বা টুকড়া বাজিয়ে সমে আসেন। মূলশিল্পী আবার বিস্তারকরতে করতে অন্তরা অংশে প্রবেশ করেন। স্থায়ীর গৎ এর বাদন ক্রিয়ার মতোই অন্তরার গৎ এও একই রকমভাবে বিস্তারকরেন। এবং তবলা বাদক তাঁর নান্দনিকতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বোলবাণীর সমাবেশ ঘটাতে থাকেন। এই রকম ভাবে উভয়েই মূল পরিবেশনাকে নান্দনিকতাপূর্ণ করেন।

সেতারেও বিলম্বিত বা মধ্য বিলম্বিত লয়ে জবাবী সংগত বাদন হয়ে থাকে। সেতার বাদক যে রাগ পরিবেশন করছেন সেই রাগের স্বর সংগতি নিয়ে বিভিন্ন কৌশলে জবাবী সংগত বাদন উপস্থাপন করেন। এই অংশটি সকল ধরনের শ্রোতার কাছে ভীষণভাবে গ্রহণযোগ্য। প্রথমে সাধারণত ছোট আকারের স্বর সংগতির সমাবেশ ঘটান এবং তা পর্যায়ক্রমে বড় আকারের হয়ে থাকে বা করে থাকেন। এবং তাৎক্ষণিক তবলা বাদক সেতার বাদকের বিভিন্ন ধরনের স্বর সংগতির উত্তর দিতে থাকেন। আবার কোনো কোনো সময় একটু উল্টোও ব্যাপার ঘটে থাকে তা হলো তবলা বাদক প্রশ্ন করেন এবং মূল শিল্পী তাঁর উত্তর দিতে থাকেন। পরিবেশনার মধ্যে যায় করা হোক না কেন তা যেন মূল পরিবেশনার ভাব আবেদন বজায় থাকে। নান্দনিকতাপূর্ণ পরিবেশনার জন্য উভয় শিল্পীর মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব থাকা একান্ত প্রয়োজন। সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব না থাকলে কোনো ভাবেই ভাল পরিবেশনা সম্ভব না।

সেতারেও বিভিন্ন তালে রাগ সংগীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। প্রচলিত হিন্দুস্থানী তালেও অপ্রচলিত হিন্দুস্থানী তালে। যথা– বিলম্বিত ত্রিতাল, দ্রুত ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, রূপকতাল, আড়াচৌতাল, একতাল ইত্যাদি। এবং অল্প প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল যথা– চারতালকে সওয়ারী, পঞ্চম সওয়ারী, নসরুক, ময়ূর তাল ইত্যাদি কণ্ঠসংগীতের ক্ষেত্রে যেমন উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত শিল্পী বেশী পছন্দ করে থাকেন বিলম্বিত একতালে রাগসংগীত পরিবেশন করতে। তেমনি যন্ত্রসংগীত শিল্পীও অন্যান্য তালের চেয়ে বিলম্বিত ত্রিতালে রাগসংগীত পরিবেশন করতে বেশী পছন্দ করে থাকেন।

কণ্ঠসংগীতের চেয়ে যন্ত্রসংগীতের সাথে তবলা সংগত বাদন ক্রিয়া অনেক বেশি কষ্টসাধ্য। যন্ত্রসংগীতের সাথে যদি তবলা সংগত করার অভ্যাস না থাকে তাহলে যে ধরনের যন্ত্র হোক না কেন সেই যন্ত্রের সাথে সংগত করার কোনোভাবেই সম্ভব না। যন্ত্রসংগীতের সাথে তবলা সংগত করতে হলে অবশ্যই অভিজ্ঞ তবলা শিল্পী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রেও রাগ অনুযায়ী বা রাগের ভাব আবেদন অনুযায়ী সংগতবাদন হয়ে থাকে। যন্ত্রসংগীত মানেই তবলা স্বতন্ত্র বাদনের মতো সারাক্ষণ তবলা বাদক বিভিন্ন ধরনের বোল বাণীর সমাবেশ ঘটাবেন তা কখনোই নান্দনিকতাপূর্ণ পরিবেশনা হতে পারে না। ভাল পরিবেশনার জন্য যখন যেভাবে সংগত বাদন করা উচিত তা একজন দক্ষ তবলা বাদক করে থাকেন।

অন্তরার বাদন ক্রিয়া শেষ করে আবার স্থায়ীর গৎ-এ ফিরে বিভিন্ন লয়ের সংমিশ্রণে তান ও বোল তান পরিবেশন করেন। তান ও বোল তান অংশে তবলা বাদকও মূল শিল্পীর লয়ের সাথে একত্রিত হয়ে সাত সংগতের মতো ঠেকার বিভিন্ন নান্দনিকতা ফুটিয়ে তোলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ পরিবেশনার মাধ্যমে বিলম্বিত লয়ের বাদন ক্রিয়ার সমাপ্তি করেন। বিলম্বিত লয়ের গৎ পরিবেশনা শেষ করেই দ্রুত লয়ের গৎ পরিবেশনা করেন তাৎক্ষণিক তবলা শিল্পী গৎ এর ধরন অনুযায়ী বন্দিশ শ্রেণির কোনো একটি কম্পোজিশান বাজিয়ে তাঁর বাদন ক্রিয়ার সূচনা করেন। দ্রুত অংশে মূল শিল্পী ছোট ছোট আকারে সুর সংগতির অবতারনা করেন বিলম্বিত লয়ের পরিবেশনা চাইতে দ্রুতঅংশে রাগের স্বরূপটা চঞ্চল প্রকৃতির হয়। এবং আসতে আসতে লয়ের গতি আরো দ্রুতহতে থাকে এই দ্রুত অংশটিকে ঝালা অংশ বলে। ঝালা অংশে মূলশিল্পীর সাথে তবলা শিল্পী শুধুই ঠেকার প্রয়োগ করতে থাকেন। তবে ঝালার সুরের আবেদন অনুযায়ী তবলা শিল্পী তাঁর মেধা দিয়ে ঠেকার আওয়াজের বিভিন্ন রূপ বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ ঝালা অংশ পরিবেশন করে ঝালার সুরের ভাব অনুযায়ী মূলশিল্পী তিহাই পরিবেশন করেন সেই সাথে তবলা শিল্পীও তিহাই দিয়ে মূল পরিবেশনা শেষ করেন।

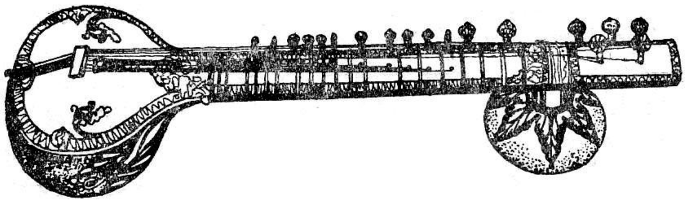

সেতার

সরোদের সাথে সংগত বাদন

হিন্দুস্থানী সংগীতের সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন যন্ত্র এবং প্রায় বিশ্বের সর্বত্র পরিচিত। ৯১৩ সালে সমরখন্দের অধিকারী জনৈক ইবন আল আবাস এক ধরনের চওড়া পরিধির তারের বাদ্যযন্ত্র আবিস্কার করেন নাম ‘শরুদ’।[৩] প্রথম যুগের ইন্দোপারসিক সাহিত্যে সরোদের উল্লেখ আছে। এই যন্ত্রটি আদি মধ্যযুগে ভারতীয় যন্ত্র হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করে এবং ভারতীয় সরোদ মধ্য এশিয়া থেকেই এমন মত প্রচলিত আছে। এই যন্ত্রটি আদি মধ্যযুগে ভারতীয় যন্ত্র হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করে।

বর্তমানে যন্ত্রটিতে একটু সংস্কার করে আঙুল রাখার জায়গায় কাঠের পরিবর্তে ইস্পাতের পাতলা তক্তা, চারটি মূল তার, চারটি সহায়ক তার, দুটি সুর ধরে রাখার এবং প্রায় একডজন তরবের তার সবই ধাতু নির্মিত ব্যবহৃত হয়। রবারের মত সরোদ একটা ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে বাজানো হয় তাকে বলে ‘জন’।

অন্যান্য তার যন্ত্রের মধ্যে সরোদ সর্বাপেক্ষা গুরুগম্ভীর যন্ত্র। ধ্রুপদাঙ্গীয় যন্ত্রের মধ্যে সরোদ অন্যতম, তবলা ও পাখোয়াজ যন্ত্র দ্বারা সরোদের সাথে সংগত বাদন হয়ে থাকে। তবে পাখোয়াজের তুলনায় তবলা দ্বারা সংগত বাদন বেশি প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। সরোদের একক বাদনশৈলীও সহযোগী বাদনশৈলী উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীতে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য যন্ত্রের মতোই সরোদের বাদন ক্রিয়াও পরিবেশিত হয় দীর্ঘক্ষণ আলাপ, জোর, ঝালা দিয়ে আবার অল্প সময় আলাপ করেও সরোদের বাদন ক্রিয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ ধ্রুপদঅঙ্গের বাদন ক্রিয়া ও খেয়াল অঙ্গের বাদন ক্রিয়া। তবে সরোদের বাদনশৈলী খেয়াল অঙ্গের তুলনায় ধ্রুপদঅঙ্গের বাদন ক্রিয়া বেশে প্রচলিত। সরোদের বাদন ক্রিয়াও কণ্ঠ বা অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় দুটো অঙ্গে পরিবেশিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিলম্বিত ও দ্রুতলয়ে। বিভিন্ন তালে এই যন্ত্রের বাদন ক্রিয়া লক্ষ্যণীয়, যথা বিলম্বিত ত্রিতাল, দ্রুত ত্রিতাল, দ্রুত একতাল, ঝাঁপতাল, রূপকতাল, আড়াচৌতাল, তিলুআড়া, চারতালকে সওয়ারী, পঞ্চমসওয়ারী, নসরুকতাল ইত্যাদি।

উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত শিল্পী যেমন বিলম্বিত একতাল, মধ্যলয় ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, রূপকতাল ইত্যাদি তালে খেয়াল পরিবেশন করেন। তবে বেশির ভাগ কণ্ঠসংগীত শিল্পীগণ বিলম্বিত একতালে খেয়াল পরিবেশন করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তেমনি যন্ত্রসংগীত শিল্পীগণও অন্যান্য তালে বাদন ক্রিয়া পরিবেশন করলেও বেশি পছন্দ করে থাকেন বিলম্বিত ত্রিতাল ও দ্রুতত্রিতালে। রেজাখানি গৎ বা মসিত খানি গৎ বাজিয়ে শিল্পী তাঁর পরিবেশনা শুরুকরেন। যন্ত্রসংগীত শিল্পীগণ দীর্ঘক্ষণ আলাপ, জোর, ঝালা করে থাকেন যা তালযন্ত্র ছাড়া, আবার সংক্ষিপ্ত আলাপ করেও রাগ সংগীত পরিবেশন করে থাকেন। উভয় ধারার বাদনশৈলী উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে বিদ্যমান। মূলশিল্পী আলাপচারিতা শেষ করেই যে তালে গৎ পরিবেশন করবেন সেই তালে প্রবেশ করেন, সেই সাথে তবলা শিল্পীও গৎ এ কোন স্থানে সম নির্দিষ্ট আছে তা তিনি সহজেই অনুধাবন করে থাকেন। গৎ এর ভাব আবেদন নান্দনিকতা অনুযায়ী তবলা বাদক তাঁর বাদনক্রিয়া নির্ধারণ করে থাকেন। কোনো কোনো তবলা শিল্পী তাঁর বাদনক্রিয়া শুরুকরেন মিঠাই হাতের টুকড়া কিংবা উপোজ অঙ্গের কোনো কম্পোজিশান দিয়ে। আবার কোনো কোনো তবলা শিল্পী বাজনার সূচনা

করেন পেশকার কিংবা উঠান দিয়ে। যেকোনো কম্পোজিশন দিয়েই বাদনক্রিয়া সূচনা হোক না কেন তা যেন মূল শিল্পীর গৎ এর বা রাগের ভাব আবেদন ও নান্দনিকতা অনুযায়ী হয়। যখন তবলা শিল্পী কোনো কম্পোজিশন উপস্থাপন করেন সেই সময় মূল শিল্পীকে শুধুমাত্র গৎ এর পুর্নাবৃত্ত করতে হয়। সেই সময় যদি মূল শিল্পী বিস্তারবা অন্য কোনো সুরছন্দের প্রবেশ ঘটান তাহলে মূল পরিবেশনার ব্যাঘাত ঘটবে। তেমনি মূল শিল্পীও যখন রাগের ভাবাবেশ সৃষ্টি করছেন বা বিভিন্ন ছন্দের বা সুর বিস্তারে মনোনিবেশ করছেন, সেই সময় তবলা শিল্পীকে সুর ও ছন্দের ভাবাবেশ অনুযায়ী নান্দনিকতাপূর্ণ ঠেকার অবতারনা করা উচিত। কিন্তু যদি তবলা শিল্পী ঠেকার অবতারনা না করে, বিভিন্ন বোলবাণীর প্রবেশ ঘটান তাহলে মূল পরিবেশনাটার ব্যাঘাত ঘটায় স্বাভাবিক।

মূল শিল্পী যে রাগের গৎ পরিবেশন করছেন সেই রাগের কিছুক্ষণ বিস্তারকরে মূল গৎ এ প্রবেশ করেন, সেই সময় তবলা শিল্পী রাগের ভাব আবেদন ও নান্দনিকতা অনুযায়ী তাৎক্ষণিক তবলার স্থায়ী বিস্তারশ্রেণী রচনা থেকে যেমন পেশকার বা কায়দা বা রেলা কায়দা যেকোনো একটি কম্পোজিশান কয়েক আবর্তনে বাজিয়ে তিহাই দিয়ে মূল ঠেকাই বা গৎ এর সমে প্রবেশ করেন। কম্পোজিশান পরিবেশনার সময় শিল্পীকে শুধুই মূল গৎ এর বাদন ক্রিয়া পরিবেশন করতে হয়। আবার সরোদ বাদক রাগের বিস্তারশুরুকরেন এবং সেই সাথে তবলা শিল্পী মূল ঠেকার অবতারণা করেন। তবে মূলঠেকার সাথে সাথে খানাপুরি, মুখড়া, মোহড়া বা ছোট ছোট তিহাই কিংবা ঠেকার বিভিন্ন প্রকার বাজিয়ে সরোদ বাদকের বাদন ক্রিয়াকে আরো বেশি গতিশীল করে তুলতে সাহায্য করেন একজন দক্ষ তবলা বাদক।

এই নিয়মে কিছুক্ষণ বিস্তারকরে আবার মূল গৎ এ প্রবেশ করেন এবং তবলা বাদকও তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে একটি বিস্তারশ্রেণীর রচনা কিংবা উপোজ অঙ্গের কোনো কম্পোজিশান বাজিয়ে গৎ এর সমে প্রবেশ করেন। এইভাবে মূলশিল্পী সুর ও ছন্দের অবতারণা করতে করতে অন্তরার অংশে প্রবেশ করেন। স্থায়ীর গৎ এর ন্যায় অন্তরার গৎ-এ ও ঠিক একই নিয়মে সুর বিস্তারপরিবেশন করেন এবং সেই সাথে তবলা শিল্পী ও তাঁর নান্দনিকতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বোলবাণীর সমাবেশ ঘটান। এইভাবে মূলশিল্পী পর্যায়ক্রমে রাগের ভাবআবেদন ও নান্দনিকতা অনুযায়ী অন্তরা অংশের বাদনক্রিয়া শেষ করে আবার স্থায়ী অংশে ফিরে আসেন সরোদ বাদক বিভিন্ন লয়ের সংমিশ্রণে তান সারগাম পরিবেশন করেন এবং কিছুক্ষণ তান পরিবেশন করার পর জবাবী অংশ পরিবেশন করেন এই অংশে মূলশিল্পী যে ধরনের ছন্দ বৈচিত্র্য পরিবেশন করছেন তাৎক্ষণিক তবলা বাদক তাঁর ছন্দ বৈচিত্রকে তবলা বাঁয়ার সহযোগে আরো বেশি নান্দনিকতাপূর্ণ করছেন। এইভাবে কিছুক্ষণ জবাবী অংশ পরিবেশনার মাধ্যমে বিলম্বিত লয়ের বাদন ক্রিয়ার সমাপ্তি টানেন।

তাৎক্ষণিক দ্রুত লয়ের গৎ পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত হন, দ্রুত লয়ের গৎ শুরুর সাথে সাথে তবলা শিল্পী বন্দিশ শ্রেণীর কোনো কম্পোজিশান টুকড়া, গৎ কিংবা কোনো চক্রদার বাজিয়ে তাঁর সংগত বাদনের সূচনা করেন। দ্রুত লয়ের বাদনক্রিয়া মূলশিল্পী বিভিন্ন লয়কারীর সংমিশ্রণে তান পরিবেশন করতে থাকেন, এক একটি করে তান পরিবেশন করেন এবং মূল রাগের গৎ ফিরে আসেন, সেই সাথে তবলা শিল্পীও তাঁর বাদনশৈলীর বা রাগের ভাব আবেদন অনুযায়ী তাৎক্ষণিক কোন ধরনের কম্পোজিশান বাজালে মূল পরিবেশনার নান্দনিকতা বৃদ্ধি করবে তা একজন দক্ষ তবলাবাদক করে থাকেন। আবার কোনো কোনো সময় সাথসংগত বাদনও করে থাকেন এখানে মূলশিল্পী যে ধরনের সুর বৈচিত্র্য করছেন তাঁর সাথে তবলা বাদকও তবলার বোল বাণীদ্বারাসুর বৈচিত্র্যকে বিভিন্নভাবে ফুটিয়ে তোলেন।

সরোদ বাদক দ্রুত লয়ের গৎ পরিবেশনার এক পর্যায়ে জবাবী অংশ প্রদর্শন করেন, এই পর্যায়ে একজন প্রশ্নকর্তা আরেকজন উত্তরদাতা। মূলশিল্পী যে ধরনের প্রশ্ন করছেন তাঁর তাৎক্ষণিক তবলা শিল্পী উত্তর দিচ্ছেন। এই অংশের পরিবেশনাকে বলে জবাবী সংগত এইভাবে কয়েক আবর্তন করার পর মূলশিল্পী ক্রমান্বয়ে ঝালা অংশে প্রবেশ করেন। ঝালা অংশে শুধুমাত্র ঠেকার প্রয়োগ করে সংগত বাদন করতে হয়।

তবে মূল পরিবেশনার সুর ও ছন্দের নান্দনিকতা অনুযায়ী ঠেকার প্রকার প্রয়োগ করলে পরিবেশনটা প্রাণবন্ত হয় এইভাবে কিছুক্ষণ ঝালা অংশ পরিবেশনার মাধ্যমে উভয় শিল্পী ঝালার অংশবিশেষ নিয়ে তিহাই দিয়ে মুল পরিবেশনার সমাপ্তি করেন।

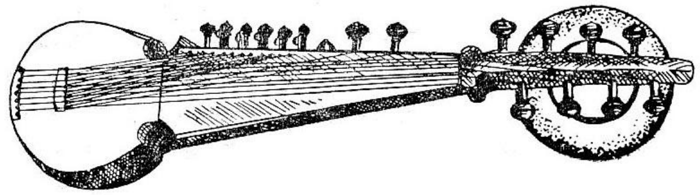

সরোদ

বেহালা, সারেঙ্গী ও এস্রাজ-এর সাথে সংগত বাদন

বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই বেহালার প্রচলন দেখা যায়। বর্তমানে উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে এর প্রচলন বেশী। ধ্বনির অনুকরণে সাহায্যকারী বেহালার মধ্যবর্তী মূখ্য অংশকে বেলী বলে। বেলীর চারদিকের অংশগুলি রিবস্ অর্থাৎ সাইডস বলে। বেলীল সহিত সংলগ্ন বেহালার যে অংশে খুঁটি থাকে উহাকে ‘নেক’ বলে। বেহালার খুঁটির দিকের প্রান্তভাগকে হেও অথবা স্কেল বলে। বেহালার খুঁটিকে পেগস্ বলা হয়। পেগস্ এর নীচের অংশকে নাট বলে। বেহালার যে অংশে আঙ্গুল রাখিয়া বাজান হয় উহাকে ফিঙ্গার বোড বলে। বেহালার যে অংশের উপর দিয়া তার ‘পেগস্’ এ পৌছায় তাহাকে ব্রিজ বলে। বেহালা হেডের ঠিক বিপরীত অংশ এই অংশে ৪টি তারের একপ্রান্ত বাঁধা থাকে। বেলীর উভয় পার্শ্বের গর্ত দুইটিকে সাউন্ড হোলস্ বলে। বেলীর নীচের অংশকে (টেল পীসের দিকে) বাটন বলে। সেগজের সাহায্যে বেহালা বাজান হয় তাহাকে ‘বো’ বলে।[৪]

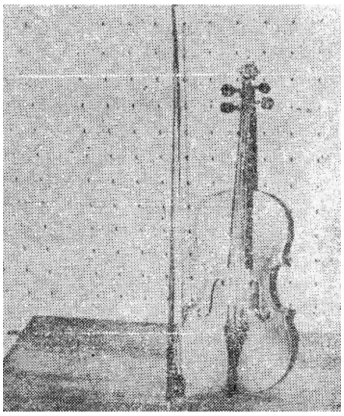

বেহালা

ভারতীয় ছড়ি টানা যন্ত্রের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সারেঙ্গী। একখণ্ড বড় কাঠ থেকে তৈরী এবং দৈর্ঘ্য প্রায় ষাট সেন্টিমিটার। ফাঁপা খোলটি চওড়া, কিন্তু নীচের দিকে একটু সরচ হয়ে চ্যাপ্টা আঙুল রাখার জায়গাতে শেষ হয়েছে। নীচের অংশটা চামড়ায় ঢাকা এবং মূল শব্দ প্রকোষ্ঠরূপে কাজ করে। পরের অংশটি কাঠ দিয়ে ঢাকা। চারটি মূল তার সাধারণত পশুর নাড়ি দিয়ে তৈরী এবং উত্তর ভারতের বাদ্যযন্ত্রের

বৈশিষ্ট্যানুযায়ী তরব আছে। আঙুল চালনা কৌশলই এর অন্যতম যে বৈশিষ্ট্য অন্য কোন যন্ত্রে নেই। আঙুলের মাথা দিয়ে নয়, আঙুলের নখের পাশা দিয়ে তার থামানো হয়।[৫]

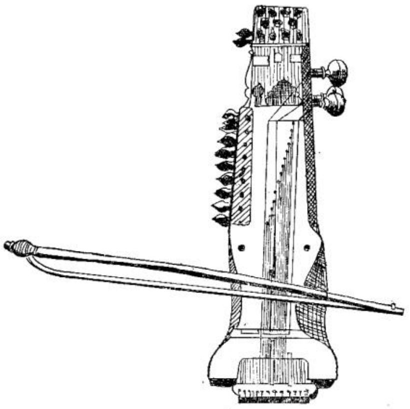

সারেঙ্গী

এস্রাজের উপরের অংশ সেতারের মতো এবং নীচের অংশ কাষ্ঠ নির্মিত অনেকটা সারেঙ্গীর অনুরূপ। দণ্ডটি কাঠের তৈরী এবং ভিতরের অংশটি ফাঁপা। উক্ত দণ্ডের উপরিভাগে অর্থাৎ পট্রীতে পিতলের কিংবা অন্য কোন ধাতুর ১৬ বা ১৯টি ফেটস্ শক্ত সুতার সাহায্য সেতারের ন্যায় বাঁধা থাকে। দণ্ডের ডান পাশে মোট ১২/১৪টি কানের সঙ্গে তরফের তার সংযুক্ত থাকে এবং মূখ্য চারটি তার দণ্ডের উপরের কান বা খুটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এই চারটি তারের ১ম তারটি স্টিলের, সুর বাঁধা হয় মন্দ্র সপ্তকের মধ্যমে। জুড়ির তার দুইটি ব্রোঞ্জ বা পিতলের, সুর বাঁধা হয় মন্দ্র সপ্তকের সড়জে এবং অন্তিম তারটি পিতলের এবং সুর বাঁধা হয় মন্দ্র সপ্তকের পঞ্চমে। এসরাজের সুর বাঁধার নিয়ম শিল্পী রাগের ভিত্তিতে পরিবর্তন করতে পারেন।[৬]

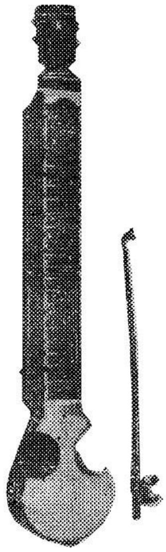

এসরাজ

বেহালা, সারেঙ্গী, এস্রাজ এই যন্ত্রগুলো ছড়ের সাহায্যে বাজানো হয় এবং এই যন্ত্রগুলো লঘুসংগীত ও শাস্ত্রীয় সংগীত উভয়ধারার সংগীতে ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। অর্থাৎ এই যন্ত্রগুলো একক বাদন ও সংগত বাদনে ব্যবহার হয়ে থাকে। বেহালা, সারেঙ্গী, এস্রাজ এই যন্ত্রগুলো উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীতের সাথে সহযোগী যন্ত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার প্রত্যেকটি যন্ত্র একক বাদন হিসেবে উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

এই যন্ত্রগুলোও অন্যান্য যন্ত্রের মতোই দুটো অঙ্গে বাজানো হয়ে থাকে বিলম্বিত লয়ে ও দ্রুতলয়ে। এই যন্ত্রগুলোর সাথে পাখোয়াজ ও তবলা উভয় যন্ত্রদ্বারা সংগত বাদন হয়ে থাকে। তবে পাখোয়াজের তুলনায় তবলার সংগত বাদন বহুল প্রচলিত। এই যন্ত্রগুলোও ধ্রুপদও খেয়াল অঙ্গের বাদনশৈলীর প্রচলন বিদ্যমান। তবে সরোদ সেতার বীণার বাদন ক্রিয়া ধ্রুপদঅঙ্গের বেশি প্রচলিত, সেই তুলনায় বেহালা, সারেঙ্গী, এস্রাজ এই যন্ত্রগুলো ধ্রুপদঅঙ্গের চাইতে খেয়াল অঙ্গের বাদনশৈলী পরিলক্ষিত হয়। সেতার, সরোদ, বাঁশির সাথে সংগত বাদন আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সারেঙ্গী, বেহালা ও এস্রাজ এই যন্ত্রগুলো ছড়ের সাহায্য বাজানো হয়, কাজেই আলাদাভাবে সংগত বাদন উল্লেখ না করে একই সাথে সংগত বাদন প্রণালী আলোচনা করা হলো।

অন্যান্য যন্ত্রের মতোই বিলম্বিত অঙ্গে একটি গৎ বাজানো হয় এবং স্থায়ী ও অন্তরা দুটো অংশ থাকে এবং দ্রুতঅঙ্গেও একটি গৎ বাজানো হয় সেটাও দুটো অংশে বিভক্ত স্থায়ী ও অন্তরা। এই যন্ত্রগুলোও প্রচলিত ও অল্প প্রচলিত তালে বাদন ক্রিয়া হয়ে থাকে। যথা বিলম্বিত ত্রিতাল ও দ্রুতত্রিতাল, ঝাঁপতাল, রূপক, নসরচক, চারতালকে সওয়ারী, পঞ্চম সওয়ারী, তিলুআড়া ইত্যাদি। বিলম্বিত অংশে আলাপ অংশ শেষ করে যে তালে রাগ পরিবেশন করবেন সেই তালের গৎ এর বাদন ক্রিয়া উপস্থাপন করেন। তাৎক্ষণিক তবলা বাদক গৎ এর ধরন অনুযায়ী কোন ধরনের কম্পোজিশন বাজালে মূলশিল্পীর বাদনক্রিয়া নান্দনিকতাপূর্ণ হবে তা একজন গুণি তবলা বাদক নির্ধারণ করে থাকেন।

মূলশিল্পীও তবলা বাদকের বাদন ক্রিয়াকে সাধুবাদ জানান। রাগের ভাবাবেশ অনুযায়ী বা রাগের গভীরতা অনুযায়ী শিল্পী সুরের ভাবাবেশ সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। সেই সাথে তবলা বাদকও সুরের ভাবাবেশ অনুযায়ী নান্দনিকতাপূর্ণ ঠেকার প্রয়োগে আত্মনিবেদন করেন। এইভাবে কয়েক আবর্তন সুরের বিস্তারকরে মূল গৎ বা বন্দিশে আসেন। সেই সময় তবলা বাদক শিল্পীর সুর বিস্তারের রেশ ধরে কোনো একটি কম্পোজিশন উপস্থাপন করে সুরের ভাবাবেশকে আরো বেশী প্রাণবন্ত করে তোলেন। আবার মূলশিল্পী যে রাগ পরিবেশন করছেন সেই রাগের বিস্তারের মাধ্যমে পরিবেশনাকে আরো বেশী নান্দনিকতাপূর্ণ করে তোলেন। বিস্তারঅঙ্গে তবলা বাদক রাগের ভাব অনুযায়ী নান্দনিকতাপূর্ণ ঠেকার অবতারনা করেন। ঠেকার মাঝে মাঝে খানাপুরি বা মুখড়া, মোহড়া বা তিহাই প্রয়োগ করে গৎ বা বন্দিশের সমে আসেন। সেই ক্ষেত্রে মূল পরিবেশনাটা আরো বেশি গতিশীল হয়ে উঠে। সংগতের সময় যেমন শুধু ঠেকার প্রয়োগ করলে পরিবেশনা একঘেয়েমী হতে পারে। তেমনি সারাক্ষণ বোলবাণী প্রয়োগ করে সংগত করলেও পরিবেশনার ব্যাঘাত ঘটতে পারে সেই জন্য তবলা বাদককে যেমন বোলবাণী প্রয়োগ করেও সংগত করতে হবে তেমনি পরিমিতি বোধও থাকতে হবে।

শিল্পীর বাদন ক্রিয়ার মধ্যে যদি শৈলীগত বা ঘরানাগত ভাব আবেদন না থাকে তাহলে যতই গুণি তবলাবাদক হোক না কেন সেই শিল্পীর সাথে সংগত বাদনও কোনো ভাবেই শৈলীগত বা ঘরানাগত হওয়া সম্ভব না। বাদন ক্রিয়া যত ঘরানাদার হবে তাঁর সাথে তবলা সংগত বাদনও হবে ঘরানাদার। বেহালা / সারেঙ্গী / এস্রাজ বাদক পর্যায়ক্রমে রাগের বিস্তারকরতে করতে অন্তরা অংশে প্রবেশ করতে থাকেন। অন্তরা অংশেও স্থায়ীর অনুরূপ ভাবে সুর ও স্বরের সমাবেশ ঘটান। এই অন্তরা অংশেও পর্যায়ক্রমে শিল্পীর সুরের ভাবাবেশ অনুযায়ী তবলা শিল্পী তাঁর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কম্পোজিশন উপস্থাপন করতে থাকেন।

সারেঙ্গী, বেহালা, এস্রাজ এই যন্ত্রগুলোতেও জবাবী সংগত বাদন হয়ে থাকে। যে রাগ পরিবেশন করছেন সেই রাগের সুর, স্বর ও বিস্তারকে বিভিন্ন কৌশলে উপস্থাপন করতে থাকেন এবং তবলা শিল্পীকে নির্দেশিত করেন। তাৎক্ষণিক তবলা বাদক তবলার বোলবাণী দ্বারা সুর ও ছন্দের সঠিকভাবে জবাব দিতে থাকেন। জবাবী সংগত বাদনে তবলা বাদকের স্মরণশক্তি প্রখর হওয়া কিংবা বুদ্ধিমান ও লয়দার হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এইভাবে কয়েক আবর্তন বা কিছু সময় জবাবী বাদন ক্রিয়া পরিবেশন করে বিলম্বিত লয়ের বাদন ক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটান। তাৎক্ষণিক বেহালা, সারেঙ্গী বা এস্রাজ বাদক দ্রুতলয়ের গৎ বা বন্দিশ বাজানো শুরুকরেন এবং সেই সাথে তবলা শিল্পীও গৎ এর সম অনুযায়ী বা গৎ এর ভাব আবেদন অনুযায়ী বন্দিশ শ্রেণীর কোনো রচনা কিংবা উপোজ অঙ্গের কোনো বোলবাণী প্রয়োগ করে তাঁর বাদন ক্রিয়ার সূচনা করেন। দ্রুত অংশেও মূলশিল্পী বিভিন্ন লয়ের সংমিশ্রণে বিস্তার, তান, বোলবাট ইত্যাদি পরিবেশন করেন। তবে বিলম্বিত লয়ের চেয়ে দ্রুতঅংশে রাগের ভাব আবেদন চঞ্চল প্রকৃতির হয়ে থাকে। সেই সাথে তবলা সংগত ও মূলশিল্পীর রাগের চলন অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে পরিবেশনার গতি বা লয় বাড়তে থাকে। সেই সাথে তবলা বাদকও বিভিন্ন ধরনের বন্দিশশ্রেণীর বোলবাণী প্রয়োগ করতে থাকেন। এইভাবে মূলশিল্পী ঝালা অংশের বাদন ক্রিয়ায় প্রবেশ করেন। ঝালা অংশে অতি দ্রচতলয়ে তালের ঠেকা প্রয়োগ হয় বলে সাধারণত এই অংশে অন্য কোনো বোলবাণীর প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। তবে বিভিন্নভাবে ঠেকার প্রকার প্রয়োগ করে তবলা শিল্পী মূল পরিবেশনার নান্দনিকতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। কিছুক্ষণ ঝালা অংশের বাদন ক্রিয়া পরিবেশন করে বেহালা / সারেঙ্গী বা এস্রাজ বাদক তিহাই দিয়ে পরিবেশনার সমাপ্তি করেন। শিল্পীর তিহাই এর ধরন অনুযায়ী তবলা শিল্পীও একই সাথে তিহাই প্রয়োগ করেন এবং উভয়ে তিহাই শেষ করে মূল গৎ এর সমে এসে মূল পরিবেশনার সমাপ্তি করেন।

সন্তুরের সাথে সংগত বাদন

'সন্তুর' কাশ্মীর উপত্যকার বিশেষ যন্ত্র, অন্যত্র এটি দেখা যায় না বা বাজানো হয় না। এর প্রাচীন নাম 'শততন্ত্রী বীণা', অর্থাৎ যে বীণায় একশ তার আছে এই নামটিই পরিবর্তিত হয়ে 'সন্তুর' হয়েছে। বুৎপত্তি বাদ দিলেও আধুনিক সন্তুর যন্ত্রে অনেক তার আছে এবং কাঠি দিয়ে বা থেকে তৈরী এবং আকারে অসমান্তরাল চতুর্ভুজের মত। প্রত্যেক সারিতে দুটি সওয়ারি হিসেবে পনেরো সারিতে ত্রিরিশটি সওয়ারি থাকে। একই স্বরে বাঁধা চারটি ধাতব তারের সমষ্টি প্রতিটি জোড়া সওয়ারি উপর দিয়ে প্রসারিত। এভাবে তারের মোট সংখ্যা ষাট। বাদক, সন্তুর সামনে নিয়ে বসেন এবং দুটো পাতলা সোজা কাঠি দিয়ে বাজান। কাঠি দুটির বাজাবার দিকটি সামান্য বাঁকানো।[৭] পাশ্চাত্যে এটি 'ডালসিম্যার' বা 'সিম্ব্যালন' নামে পরিচিত।

অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় সন্তুরেরও একক বাদন ও সহযোগী বাদন হিসেবে লঘুসংগীত ও উচ্চাঙ্গসংগীত শৈলীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লঘুসংগীতে সহযোগী বাদন ও উচ্চাঙ্গসংগীত শৈলীতে একক বাদন ক্রিয়া পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই বাদ্যযন্ত্রটি দুইটি কাঠির সাহায্য আঘাত করে বাজাতে হয়। তাই অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মতো সন্তুরে মীরের ব্যবহার তুলনামূলক কম হয়ে থাকে এবং অন্যান্য যন্ত্রের তুলনায় সন্তুরে রাগসংগীত পরিবেশিত হয় সাধারণত মধ্য বিলম্বিত লয়ে, পর্যায়ক্রমে অতি দ্রচতলয়ে এর বাদন ক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে। সন্তুরেও দুই ধারার বাদনশৈলী পরিলক্ষিত হয় ধ্রুপদও খেয়াল অঙ্গের। তবে সেতার বা সরোদের তুলনায় সন্তুরে খেয়াল অঙ্গের বাদনশৈলী সাধারণত বেশি হয়ে থাকে। শিল্পী আলাপ অংশ শেষ করেই যে রাগ বাজাবেন সেই রাগের গৎ বা বন্দিশে প্রবেশ করেন। শিল্পীর গৎ / বন্দিশের ভাব বা রাগের ভাব অনুযায়ী তবলা বাদক বন্দিশ বা গৎ এর সম থেকে স্থায়ী বিস্তারশ্রেণীর রচনা থেকে কোনো একটি কম্পোজিশন বাজিয়ে তার বাদন ক্রিয়ার সূচনা করেন। সন্তুর বাদক সংগত বাদকের বাদন ক্রিয়ার সময় শুধুই রাগের বন্দিশের পূর্ণাবৃত্তি করতে থাকেন। সংগত বাদকের কম্পোজিশন উপস্থাপনের পর শিল্পী রাগের বিস্তারঅংশে

প্রবেশ করেন। শিল্পীর বিস্তারের সময় তবলা বাদককে বিস্তারের ভাব বা ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন আঙ্গিকে ঠেকার প্রয়োগ করে সংগত বাদন পরিবেশন করতে হয়। শিল্পী বিস্তারশেষ করে বন্দিশে প্রবেশ করেন, তবলা শিল্পী ও রাগের আবহ অনুযায়ী কোনো উপোজ অঙ্গের কম্পোজিশান বা কোনো স্থায়ী বিস্তারশ্রেণীর রচনার বাদন ক্রিয়া করে থাকেন। তবলা শিল্পীর কম্পোজিশান শেষ হলেই সন্তুর বাদক আবার বিস্তার অংশে প্রবেশ করেন। বিস্তার অংশে তবলা শিল্পী ঠেকায় পুনাবৃত্তি ঘটান। এইভাবে উভয় শিল্পী রাগের গতি প্রকৃতিকে তরান্বিত করতে করতে অন্তরা অংশে প্রবেশ করেন।

স্থায়ী অংশের বাদন ক্রিয়ার মতোই অন্তরা অংশেও একইভাবে রাগের ভাব আবেদন অনুযায়ী বিভিন্ন আঙ্গিকে বিস্তার করতে থাকেন। তেমনি শিল্পীর বাদন ক্রিয়ার ধরণ অনুযায়ী তবলা শিল্পীও তাঁর মেধা ও দক্ষতা প্রদর্শন করে মূল পরিবেশনার ভাবগাম্ভিজ্য আরো সুদৃঢ় করে গড়ে তোলেন। এইভাবে কিছু সময় অন্তরা অংশের বাদন ক্রিয়া উপস্থাপন করেই আবারও শিল্পী স্থায়ীর গৎ / বন্দিশে প্রবেশ করেন। এই পর্বে শিল্পী বিভিন্ন লয়কারীর সহযোগে বিভিন্ন তান সারগাম উপস্থাপন করেন। তান, সারগাম এর সময় সংগত বাদনে সুস্পষ্ট ঠেকার প্রয়োগে সংগত বাদন করতে হয়। শিল্পীর এক একটি তান, সারগাম শেষ হলেই তবলা শিল্পীও বিভিন্ন লয়কারীযুক্ত বিভিন্ন বন্দিশ শ্রেণীর রচনার বাদন ক্রিয়া করে থাকেন। এই পর্বেও তবলা শিল্পীর বোল বাণীর প্রয়োগের সময় মূল শিল্পীকে গৎ / বন্দিশের পূর্নাবৃত্তি করতে হয়। পর্যায়ক্রমে শিল্পী তান, সারগাম এর পর জবাবী বাদন ক্রিয়া উপস্থাপন করেন।

সন্তুর বাদন যে রকম সুর ও স্বরের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করছেন। তাৎক্ষণিক তবলা বাদকও সেই সুর ও স্বরের বৈচিত্র্যকে অনুসরণ করে তবলা ও বাঁয়ার সংমিশ্রণে উক্ত ভাব আবেদনের সম্যক জবাব দেন। আবার কোনো সময় তবলা বাদকের সুর ও স্বর বৈচিত্র্যের জবাব দেন মূল শিল্পী। উল্লেখ্যযে, কোনো সময় উভয় শিল্পী একসাথে বাদন ক্রিয়া করেন। এই বাদনশৈলীকে সাথসংগত বাদন ক্রিয়া বলে, সাথসংগত বা জবাবী সংগতের মাধ্যমে বিলম্বিত লয়ের রাগসংগীতের বাদন ক্রিয়া সমাপ্ত করেন। এরপর দ্রুতলয়ের গৎ / বন্দিশের বাদন ক্রিয়ায় প্রবেশ করেন। উল্লেখ্যযে, বিলম্বিত লয়ের বাদন ক্রিয়ার মতোই দ্রুতলয়েরও বাদন ক্রিয়া হয়ে থাকে। তবে এই লয়ের বাদন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে রাগের ভাবগাম্ভীর্য্যকে শিল্পী পর্যায়ক্রমে চঞ্চল প্রকৃতির করে পরিবেশনা করতে থাকেন। দ্রূতলয়ের বাদনক্রিয়ায় সাধারণত ছোট ছোট আকারের স্বরবিস্তার, তান, সারগাম, বোল, বাট ইত্যাদি অংশগুলো শিল্পীর মেধা, দক্ষতা ও মেজাজ অনুযায়ী তা পরিবেশনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। তবলা শিল্পীও সন্তুর বাদকের বাদন ক্রিয়ার মেজাজ বা ভাব আবেদন অনুযায়ী সংগত বাদনে বিভিন্ন ধরনের বোল বাণীর প্রয়োগ করে মূল পরিবেশনার নান্দনিকতা বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এই দ্রুতলয়ের পরিবেশনা করতে করতে, শিল্পী অতি দ্রুতলয়ে প্রবেশ করেন, এই অতি দ্রুতলয়ের পরিবেশনাকে যন্ত্রসংগীতের ভাষায় ঝালা বলে। ঝালা অংশে সংগত বাদনে শুধুমাত্র ঠেকার প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত তালের ঠেকা ছাড়া অন্য কোনো বোল বাণীর প্রয়োগ করা যায় না। কারণ ঝালা অংশটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পরিবেশিত হয় বলে তবলা শিল্পীকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শিল্পীর লয়ের সাথে একত্রিত হয়ে ঝালা অংশের বাদন ক্রিয়া পরিবেশন করতে হয়। বিশেষভাবে এই ঝালা অংশের বাদন ক্রিয়ার উভয় শিল্পীকে লয়দার হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। এইভাবে কিছুক্ষণ ঝালা অংশ পরিবেশনা করার পর উভয় শিল্পী তিহাই বাজিয়ে মূল পরিবেশনা শেষ করেন।

অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় সন্তুরেও প্রচলিত ও অল্প প্রচলিত সব ধরনের রাগসংগীত বাজানো হয়ে থাকে। তবে এই যন্ত্রে হালকা ও রোমান্টিক রাগের বাদন ক্রিয়া লক্ষ্যণীয়। এছাড়া এই যন্ত্রে ধুন/ঠুমরী অঙ্গের বাদন ক্রিয়া অন্যান্য যন্ত্রের চেয়ে খুবই শ্রুতিমধুর হয়ে থাকে। যন্ত্রসংগীতের সাথে সংগত বাদনে, তবলা বাদকের যদি আগে থেকে অভ্যাস না থাকে। তাহলে সরাসরি যন্ত্রসংগীতের সাথে সংগত বাদন করা খুবই মুশকিল। কাজেই যে যন্ত্রসংগীত শিল্পীর সাথে সংগত বাদকের আগে থেকে সংগত বাদনে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে সেই

শিল্পীর সাথে সংগত বাদন তথা মূল পরিবেশনা অনায়াসে প্রাণবন্ত করে তোলা সম্ভব। একটি নান্দনিকতাপূর্ণ পরিবেশনার জন্য উভয় শিল্পীর একই রকম মনোভাব, সুর ও লয়ের দক্ষতা, মানসিকতা পরিবেশনার মেজাজ ইত্যাদি বিষয়গুলো একান্তভাবে প্রয়োজন।

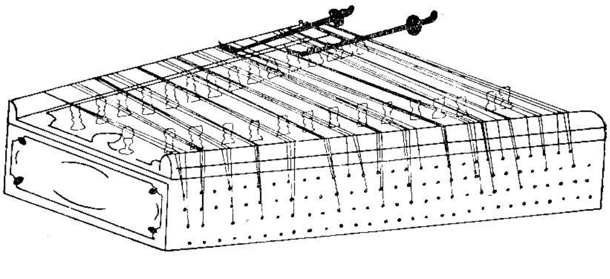

সন্তুর

বাঁশির সাথে সংগত বাদন

বাঁশি অতি পরিচিত, প্রাচীন ও মধুর সুরের যন্ত্র। সাধারণত বাঁশ দিয়েই তৈরী। বিভিন্ন ধরনের বাঁশি থাকলেও আড়বাঁশির বাদনক্রিয়াই উচ্চমার্গের হয়ে থাকে। এতে ৬টি অথবা ৭টি ছিদ্র থাকে এবং একপ্রান্ত বন্ধ থাকে ও আরেকপ্রান্ত খোলা থাকে।

যন্ত্রসংগীতের সাথে সংগতের সময় আগে দেখতে হবে কোন যন্ত্রের সাথে সংগত করতে হবে। কেননা সংগতের ভাব আবেদন ও নান্দনিকতাও অনুরূপ হবে। উদাহরণস্বরূপ যেমন সরোদের সাথে সংগত যে ওজনের বা গম্ভীর হবে, বাঁশি, বেহালা বা সন্তরের সাথে নিশ্চয় সেই ওজনের সংগত হবে না, ওজনের তারতম্যতারদ্বারাসংগত করা একজন গুণী তবলা বাদকের বিশেষগুণ। সেই জন্য তবলা শিল্পীকে একই কম্পোজিশান বা একই বোলবাণী জোর ও মৃদু শব্দেরদ্বারারেওয়াজ করা একান্তপ্রয়োজন। বাঁশির সাথে সংগত বাদন। উচ্চাঙ্গকণ্ঠের ন্যায় বাঁশিতেও বিলম্বিত একতাল, বিলম্বিত ঝুমরা, বিলম্বিত ত্রিতাল, বিলম্বিত ঝাঁপতাল, রূপকতাল ছাড়াও আরও কিছু অল্পপ্রচলিত হিন্দুস্থানী তালে বাঁশিতে রাগসংগীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। সেইসব তালগুলো হলো যথা চারতালকে সওয়ারী, পঞ্চম সওয়ারী, নসরচক, তিলুআড়া ইত্যাদি। কণ্ঠের ন্যায় বাঁশিতেও বিলম্বিত, মধ্যলয় ও দ্রুতলয়ে রাগসংগীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। উত্তরভারতীয় সংগীত ধারায় বাঁশির এককবাদন ও সংগতবাদন বহুল প্রচলিত।

অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় বাঁশির বাদন ক্রিয়া দুই ধারাতে হয়ে থাকে ধ্রুপদঅঙ্গ ও খেয়াল অঙ্গ। ধ্রুপদঅঙ্গের বাদন ক্রিয়ায় শিল্পী দীর্ঘক্ষণ আলাপ, জোর, ঝালা পরিবেশন করেন এবং এই অংশে কোনো সংগত বাদন হয় না বা কোনো তালযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। আলাপ অংশটি শেষ করে তালে রাগের গৎ বা বন্দিশ পরিবেশন করেন। কিন্তু খেয়াল অঙ্গে বা ঢঙ্গে যখন বাঁশিতে রাগসংগীত পরিবেশিত হয় সেই ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীতের ন্যায় অল্প কিছুক্ষণ আলাপ করেই তালে রাগের গৎ বা বন্দিশ পরিবেশন করেন। তবে কণ্ঠসংগীতের চেয়ে বাঁশিতে আরো দ্রুতলয়ে রাগসংগীত পরিবেশিত হয়ে থাকে।

বাঁশির সাথে তবলা বাদন ক্রিয়া উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীতের মতোই হয়ে থাকে। বাঁশির বাদন ক্রিয়া ফুদিয়ে, কাজেই শিল্পীর দমের বিষয়টা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত শিল্পী যেভাবে বন্দিশের স্বরূপ বা রাগের ভাব আবেদন নান্দনিকতা ফুটিয়ে তোলেন, অনুরূপভাবে বাঁশি বাদকও দমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাগের ভাব আবেদন ও নান্দনিকতা ফুটিয়ে তোলেন। সেই জন্য বাঁশির সাথে তবলা সংগত বাঁশি বাদকের

দমের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে এবং সেই সাথে রাগের স্বরূপ রাগের ভাবগাম্ভীর্যকে লক্ষ্য করে তবলার সংগত বাদন প্রদর্শন করা উচিত।

বাঁশির সাথে সংগতের সময় তবলা বাদককে লক্ষ্য রাখতে হবে, বাঁশি বাদক কোন তালের গৎ বা বন্দিশ পরিবেশন করছেন এবং সেই সাথে কোন লয়ে, শিল্পী যে তালের গৎ বা বন্দিশ পরিবেশন করছেন, তাৎক্ষণিক তবলা শিল্পী সেই তালের এবং গৎ এর ভাব অনুযায়ী সংগত বাদন উপস্থাপন করেন।

বাঁশি

সূচনার সময় গৎ বা বন্দিশের ভাব মেজাজ বা রাগের ভাব মেজাজকে গুরুত্ব দিয়ে তবলা শিল্পী তাৎক্ষণিক কি ধরনের বোল বাণী প্রয়োগ করলে রাগের বা গৎ এর ভাব মেজাজ দুই বজাই থাকবে। সেইভাবে তবলা শিল্পী হয় উপোজ অঙ্গের কোনো বোলবাণী, টুকড়া, গৎ বা উঠান বাজিয়ে তবলা শিল্পী তাঁর বাদন ক্রিয়া সূচনা করেন। বিশেষভাবে বাদনক্রিয়া সূচনার সময় উপোজ অঙ্গের কোনো বোলবাণী প্রয়োগ করাই উত্তম। তবে যে অঙ্গের বোলবাণী দিয়েই বাদনক্রিয়া আরম্ভ হোক না কেন তা যেন রাগের ভাবাবেশ অনুযায়ী নান্দনিকতাপূর্ণ হয়।

সবকিছুর মূলে রয়েছে তবলা বাদকের দক্ষতাও মেধা। যে তবলা বাদক যত মেধাবী তাঁর সংগত বাদনও হবে ততই বুদ্ধিদীপ্ত ও নান্দনিকতাপূর্ণ। বাঁশি বাদনের বা রাগের স্বর ও সুর বিস্তারের সাথে সাথে তবলা বাদকও তাঁর বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে ঠেকার আওয়াজের বিভিন্ন নান্দনিক বিষয়গুলো ফুটিয়ে তোলেন। আবার কোনো কোনো সময় তবলা শিল্পী সংগত বাদনে টুকড়া, গৎ, মুখড়া, মহড়া, তিহাই ইত্যাদি বোলবানী পরিবেশন করে বাদন ক্রিয়ার গতিকে তরান্বিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। সংগত বাদনের মাঝে ছোট ছোট তিহাই, ঠেকার প্রকার, মুখড়া, মোহড়া ইত্যাদি বোল বাণী প্রয়োগের মাধ্যমেও আরেক ধরনের রঞ্জকতা সৃষ্টি করে থাকেন সংগতকারী তবলা বাদক এবং সেই সাথে মূল পরিবেশনাও আরো বেশী প্রাণবন্ত হয়ে থাকে। বাঁশির বাদনক্রিয়া অন্যান্য যন্ত্রের মতো অতিদ্রুতলয়ে পরিবেশিত হয় না, তবে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীতের চেয়ে দ্রুতলয়ে বাজানো বা পরিবেশিত হয়ে থাকে। দ্রুতলয়ের বাদন ক্রিয়ার অংশটুকুকে ঝালা অংশ বলে। ঝালা অংশে তবলা বাদন ক্রিয়ায় শুধুমাত্র ঠেকার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে ঝালা অংশের সুরের ভাবাবেশ অনুযায়ী একজন দক্ষ তবলা বাদক তালের ঠেকার বিভিন্ন প্রকার উপস্থাপন করে থাকেন।

ঝালা অংশে তবলা সংগত করা সহজ সাধ্য নয়, কারণ তবলা শিল্পীর যদি আগে থেকে বিভিন্ন লয়ে ঠেকা বাজানোর বা পরিবেশনার অভ্যাস না থাকে, তাহলে তাৎক্ষণিক দ্রুতলয়ে ঠেকা প্রয়োগ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রেও একজন অভিজ্ঞ তবলাবাদক তাঁর বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে তাৎক্ষণিক মূল পরিবেশনার নান্দনিকতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন।

ঝালা অংশেও মূল শিল্পীর সুর ও স্বর বৈচিত্র্যকে অনুসরণ করে একজন দক্ষ তবলা শিল্পী তাৎক্ষণিক তাঁর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মূল পরিবেশনা বা ঝালা অংশের বাদনক্রিয়া প্রাণবন্ত করে তোলেন। ঝালা অংশ শেষে মূলশিল্পী তিহাই দিয়ে মূল পরিবেশনা শেষ করেন সেই সাথে মূল শিল্পীর তিহাই-এর ধরণ অনুযায়ী তবলা শিল্পীও তাৎক্ষণিক তিহাই যুক্ত করে উভয়ে পরিবেশনার সমাপ্তি করেন।

দক্ষিণ ভারতীয় বীণাকে সরস্বতী বীণা ও উত্তরভারতীয় বীণাকে রুদ্রবীণা বলা হয়। এতে রাগ বাজাবার জন্যে ব্যাপক স্বরমাত্রাযুক্ত তার আছে। বীণার বাদন ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী সুর ধরে রাখার জন্যে আলাদা তার ব্যবহৃত হয় এবং এই তারগুলি এমনভাবে বিন্যস্ত যে তাদের উপর 'তাল' বাজানো যেতে পারে। অর্থাৎ বীণায় স্বর, রাগ ও তাল তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা আর কোন বাদ্যযন্ত্রে নেই।[৮]

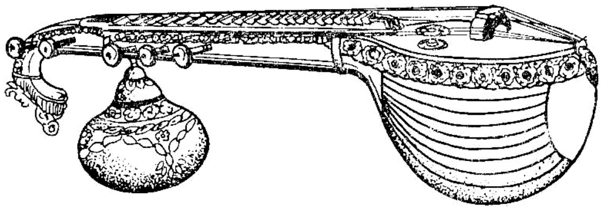

বীণা

উপসংহার

একজন যন্ত্রসংগীত শিল্পী কেবলমাত্র সেতার বা সরোদকে মিরজাবদ্বারাতারের উপর আঘাত বা অন্য হাতের আঙ্গুলদ্বারাস্বরের ছন্দ নির্ণয় করেন যা বাদন ক্রিয়ার সাথে তার শ্বাস- প্রশ্বাস এবং রাগের ভাব অনুযায়ী অনুভূতি বিশেষ ঢঙ্গে তা পরিবেশন করার চেষ্টা করেন। যে কারণে একজন শিল্পীকে না দেখে কেবলমাত্র বাদন ক্রিয়া শুনেই আমরা শিল্পীকে চিনতে পারি বা বুঝতে পারি। তবলা বাদক এই বাদনক্রিয়ার একজন প্রত্যক্ষ সহযোগী এবং উন্নতমানের শ্রোতা তিনিও তার বাদন ক্রিয়ার শ্বাস-প্রশ্বাস এবং অনুভূতির ছন্দময় মায়াজাল সৃষ্টি করেন। এ ধরনের বাদন ক্রিয়ার সংগত বাদককে না দেখেও আমরা চিনতে পারি।

তথ্যনির্দেশ

১ বি. চৈতন্য দেব, *ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, এ-৫, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি ১১০০১৬, ১৯৯১, পৃ. ১১৫।

২ তদেব, পৃঃ ১১৬।

৩ তদেব, পৃ. ১০৯-১১০।

৪ শ্রী ননী গোপাল বন্দোপাধ্যায়, *সংগীত দর্শিকা* (১ম খণ্ড), শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৪নং নস্করপাড়া রোড, যাদবপুর, কলিকাতা-৭৫, ২০০২, পৃ. ১৪৬।

৫ বি. চৈতন্য দেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০।

৬ দেবব্রত দত্ত, *সংগীত তত্ত্ব (১ম খণ্ড)*, প্রকাশক– দেবব্রত দত্ত ট্রাস্ট, ৪৯/১ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৩।

৭ বি. চৈতন্য দেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯।

৮ তদেব, পৃ. ১১২।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি : একটি সমীক্ষণ

মো. ইমরুল আসাদ*

Abstract: The use of drama in education is Theatre In Education (TIE). Students get the chance to know theirselves with joy by teaching through drama. As a result the realization and knowledge become easy. Thinking drama as mirror of soul, the mirror reveal befor the students because of theatrical technique in education. As a result students get the opportunity to view and know theirselves in the mirror of drama. When a student knows himself as well as his future doors will open in front of him. In other words drama and theatrical technique undoubtedly play a supportive role in revealing the portal to soul. In education system of Bangladesh applying theatrical technique can play a vital role. The theatrical methods in education can be adjusted as students guideline. The role of theatre students is essential to make education technique more attractive. How should the process of selection of team, manuscript, drama making method, follow-up etc be done in this manner? How theatrical method is very helpful in teaching? That is what case study observes in this article.

ভূমিকা : মানুষ শিল্প থেকে আনন্দ পায়, কারণ তা সুন্দর। সৃষ্টিশীলতা এই আনন্দের উৎস। মানুষের সৃজনশীল অনুকরণের মাঝে আনন্দ ও শিক্ষা লাভের প্রক্রিয়া আবহমানকালের। জন্মের পরই মানুষ অনুকরণপ্রিয় এবং তা অর্জন করে নেয় তার পরিজন ও পরিবেশ থেকে। এটা তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। পরিচিত ব্যক্তি বা বস্তুর অনুকরণ দেখে আনন্দ আসে জ্ঞান থেকে, কারণ সেই ব্যক্তি বা বস্তু জ্ঞানের সাহায্যে অনুকরণ উপভোগ করে; আর যদি সেই ব্যক্তি বা বস্তু পরিচিত না হয়, তখনও আনন্দ পায়, সেই আনন্দের উৎস সৃষ্টির নৈপুণ্য অর্থাৎ একটি নবলব্ধ জ্ঞান। আদিম সমাজে মানুষ পশু শিকারের পর তার অনুকরণ করতো। মানুষগুলো একত্রে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেউ সাজতো শিকারি আবার কেউ পশুর বেশ ধারণ করতো। আনন্দদান ও শিকারের অভিজ্ঞতা প্রদানই উদ্দেশ্য ছিল। সেখানে থাকতো ভাষা ও ক্রিয়া। পৃথিবীর শৈশবেই ভাষা ও ক্রিয়া এই দু'য়ের সমন্বয়ে অজ্ঞাতসারেই জন্ম নিয়েছে নাট্যের বীজ । শিল্পের এ মাধ্যমটি এমনি এমনি তৈরি হয় নি। পৃথিবীর সব শিল্পমাধ্যমই মানুষের প্রয়োজনে ও মানুষের আনন্দদানের জন্য সৃষ্টি হয়েছে।

থিয়েটার বা নাট্য এমনি একটি শিল্পমাধ্যম যা ঘটমান প্রক্রিয়া। একটি নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে দর্শক সম্মুখে জীবন্ত মানুষের সাথে জীবন্ত মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। থিয়েটারের মাধ্যম জীবন্ত দর্শক। যেমন চিত্রকরের অন্যতম মাধ্যম রং, ভাস্করের মাটি, পাথর কিংবা কংক্রিট, সাহিত্যিকের শব্দ। অন্যান্য সকল শিল্পকর্মের মত থিয়েটার সৃষ্টি করা হয় মানুষের জন্যই। এ কারণেই শিল্পের অন্যান্য মাধ্যম থেকে থিয়েটার আলাদা। থিয়েটারের প্রতিটি গাঁথুনিতে অদৃশ্য খেলা চলে দর্শক ও অভিনেতাদের মাঝে। তাই গ্রোটস্কি থিয়েটারকে বলেছেন, থিয়েটার এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে অভিনেতা ও দর্শকের মোকাবেলা ঘটে। থিয়েটার অন্যান্য খেলার মতোই একটি খেলা। খেলা বলেই এর জন্য চর্চা, পুনর্নির্মাণ ও সহযোগিতা দরকার হয়। এ খেলায় দর্শকবৃন্দের সাথে অভিনেতাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার জীবন্ত প্রবাহ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন মতবাদ ও তত্ত্বের আবির্ভাবে নাট্য উপস্থাপনাতে নতুন নতুন ফর্ম বা রীতি লক্ষণীয়। বর্তমান বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন নাট্যের যে প্রচলিত ধারণা তাতে গবেষণা এবং অ্যাকশন বিষয় দুটির বাড়তি সংযোজন ঘটেছে। অর্থাৎ পিপল্স থিয়েটার, পপুলার থিয়েটার, পলিটিক্যাল থিয়েটার, ফোরাম থিয়েটার অথবা প্রত্যক্ষ ও নিয়মিতভাবে

* এম.ফিল গবেষক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উন্নয়নের নিমিত্তে পরিবেশিত কোনো নাট্য-আঙ্গিক অথবা নাট্যরীতিতে গবেষণা, সংলাপ, অ্যাকশন এবং ফলোআপ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হলেই বর্তমান প্রচলিত ধারণায় সেই নাট্যরীতিকে উন্নয়ন নাট্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বলে অভিহিত করা যায়।

সত্তরের দশকে নাট্যকলায় যুক্ত হয় আরো একটি নতুন নাট্যরীতি 'থিয়েটার ইন এডুকেশন' বা শিক্ষাদানে নাট্যপদ্ধতি। এই নতুন ফর্মটি শিক্ষা ও উন্নয়ন নাট্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিকল্প নাট্য আঙ্গিক। যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরাসরি অবদান রাখতে সক্ষম। নতুন এ নাট্যরীতিটির জন্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে নাট্যের অবদানের অনুভব থেকে। এই নাট্য পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে গবেষণা, সংলাপ, অ্যাকশন ও ফলোআপের বিষয়গুলো।

শিক্ষা ও শিক্ষার দর্শন

আমাদের নিজেদের কাছে প্রথমত এটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত দর্শন কী হওয়া উচিত। অর্থাৎ কী শিক্ষা দিচ্ছি, কেন এই শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমূহ কী কী এবং কীভাবেই বা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে? শিক্ষাদর্শনসংক্রান্ত প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া যেতে পারে এভাবে, প্রকৃত শিক্ষা দিতে হলে শরীরকে গড়ে তুলতে হবে, সজাগ করে তুলতে হবে সৌন্দর্যের বাসনাকে, স্বভাব-চরিত্রকে গড়তে হবে এবং শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে স্থায়ীভাবে সৃষ্টি করতে হবে মনুষ্যত্বের একটা মহান আদর্শ। এসব যদি হয় তাহলেই শিক্ষায় রয়েছে ত্রুটি; আংশিক Development হয়েছে মাত্র— সর্বাঙ্গীণ Development হয়নি।

ব্যক্তির চিন্তন বিকশিত হবে শিক্ষা গ্রহণের ফলে। তৈরি হবে বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা এবং সময়ের চলমানতায় মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারের যাবতীয় সঞ্চিতি তার সামনে উন্মোচিত হবে। ব্যক্তি ও রাষ্ট্র এ দু'য়ের পারস্পরিক চালিকাশক্তিরূপে পরিগণিত শিক্ষা। শিক্ষা গ্রহণের ফলে আলোকিত হয় ব্যক্তি, তৈরি হয় জীবন ও জগত সম্পর্কে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। তার মধ্যে উৎসারিত মানবীয় গুণাবলী ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমাজ তথা রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর হয়ে ওঠে। শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে পারে কেবল তখনই।

শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে নানা মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। একদল মনে করেন শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যক্তি, অপর দলের অভিমত হল শিক্ষার কেন্দ্রীয় স্থান দখল করবে সমাজ। আবার কেউ কেউ এ রকম অভিমত দিয়ে থাকেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল সংসারের প্রয়োজন মেটানো। যখন আমরা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি সঠিক দর্শনমতো অগ্রসর হবো কেবলমাত্র তখনই চিরকল্যাণের সুবাতাস আনয়ন করবে সে শিক্ষা। এ ক্ষেত্রে বার্ট্রান্ড রাসেল (১৯৭২-১৯৭০) বলেছেন, 'যথাযথ শারীরিক, আবেগগত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচর্যার মাধ্যমে প্রত্যেককেই বিকশিত করা যায়।'[১] তাঁর নির্দেশিত শিক্ষার তিনটি তত্ত্ব প্রণিধানযোগ্য। প্রথম তত্ত্বটি অনুসারে ক্রমোন্নতর সুযোগ সৃষ্টি করা শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য, আর এমন প্রভাব দূর করা যা উক্ত সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। দ্বিতীয়টি অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য সংস্কৃতিবান করে প্রতিটি ব্যক্তিকে গড়ে তোলা এবং ব্যক্তির দক্ষতার সর্বোচ্চ বিকাশ। তৃতীয়টি অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নয়, গোটা সম্প্রদায় এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে কেজো নাগরিক তৈরি করা।

শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তি মুক্ত মনের অধিকারী হয়ে নিজের জীবনকে প্রভাবিত করবার মতো ক্ষমতাশীল হয় এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ মানবসম্পদে পরিণত করে। শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টে ফেলেছে বর্তমান কালের মানুষ। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এমন একদিন ছিল, যখন শিক্ষা অর্থে ধর্ম শিক্ষাই বুঝাত। তখন সমাজের প্রধান বন্ধনই ছিল ধর্মের বন্ধন। এখন সেদিন আর নাই।

শিক্ষার পাঠ্যবিষয় পরিকল্পনার মধ্যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়কে সমানভাবে বিবেচনায় রাখা দরকার। যাকে আমরা কর্মমুখী শিক্ষা বা জীবনমুখী শিক্ষা-পরিকল্পনা নামে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। নলিনীকান্ত মনে করেন—

> জীবনের ব্যাপারের সহিত মিলিয়া মিশিয়া জিনিসকে হাতে করিয়া নাড়িয়া ছানিয়া চলিতে চলিতে যেসব সমস্যা, যেসব সমাধান হতে থাকে, মনে যেসব ভাব, যেসব চিন্তা উদয় হয় তাহাদিগকে জীবনের ব্যাপারে জিনিসের উপর ফেলিয়া ফলাইয়া যে নব নব ভাবের, চিন্তার সৃষ্টি হইতে থাকে তাহাই শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষা অন্যরূপ হয়না।[২]

এ্যারিস্টটল বলেছেন, 'দেহ ও মনের সুষম বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য।'[৩] শিক্ষার ক্ষেত্রকে ও পদ্ধতিকে শিক্ষার্থীর কাছে অধিকতর গ্রহণীয় করে তুলে আনন্দ। জীবনের বিশাল দিকটি অনাবিষ্কৃত থাকে এবং শিক্ষায় অপূর্ণতা থেকে যায় শুধু গৎবাধা পাঠমুখস্থ করা ও পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনের পরেও। যে কারণে কিশোর রবীন্দ্রনাথ [১৮৬১-১৯৪১] একদিন স্কুলে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

> রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় শিক্ষার লক্ষ্য হলো, মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ উন্মোচন, ব্যক্তিগত সকল শুভ সম্ভাবনার স্ফূরণ, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যোগ, শিক্ষিত অশিক্ষিতের বৈষম্যের বিমোচন, আত্মিক ও ব্যবহারিকের মধ্যে সমন্বয়, জ্ঞান, বোধ, কল্পনা ও সৌন্দর্যচেতনার কর্ষণ ও বিকাশ, কর্মে জ্ঞানের নিয়োগের দ্বারা জীবনের সম্পন্নতা ও সমৃদ্ধি অর্জন, সৃজনশীলতার সাহায্যে মনুষ্যের পরিচর্যা ও প্রসার। স্পষ্টতই এই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার কেন্দ্র ছিল এক জীবন লগ্ন, সমাজ লগ্ন এবং বিশ্বলগ্ন।[৪]

গ্রুন্ডভিগ এ ধরনের শিক্ষাকে তাই আখ্যায়িত করলেন 'মৃতের স্কুল' (School for Death) বলে। তিনি এক ধরনের গণবিদ্যালয় বা ফোক হাই স্কুল (Folk High School)-এর ধারণা সামনে আনলেন যেখানে পরীক্ষাগ্রহণ বা সার্টিফিকেট প্রদান নয়, ছাত্রদের চেতনাবৃদ্ধিই হবে মূল কাজ। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে ফোক হাই স্কুলগুলি এমন হবে যে তা কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে যথার্থভাবে শিক্ষার আলো প্রদান করে তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলবে।

১৮৪৪ সালে ডেনমার্কে প্রথম গণবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান পর পরবর্তী নানা সময়ে তা জার্মানি, সুইডেন, নরওয়ে, আমেরিকা, তানজানিয়া, ফিলিপাইন, ভারত ও বাংলাদেশে প্রসার লাভ করে। বাংলাদেশের ছয়টি গণবিদ্যালয় হয় জয়পুরহাটের উঁচাই, চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া/রাউজান, বাগেরহাটের খানজাহানীরা, চাঁদপুরের পাঁচগ্রাম/পঞ্চগ্রাম, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও এবং কুমিল্লার বিজয়পুর গণবিদ্যালয়। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত গ্রুন্ডভিগ ও তাঁর গণবিদ্যালয়ের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে প্রফিললন ঘটাতে চেয়েছিলেন নিজস্ব চিন্তার। তাঁর কাছে বিদ্যাচর্চা হলো জীবনচর্চার নামান্তর তাই শান্তিনিকেতনকে ঘিরে তিনি এক জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যে জীবন থেকে জ্ঞানপিপাসু ছাত্রছাত্রীরাই উপকৃত হবে না, শিক্ষকরাও শিখবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষকরাও শিখবে, গ্রুন্ডভিগ এর dialogue কিংবা পাওলো ফ্রেইরে'র [১৯২১-১৯৯৭] 'dialogic process of education' একই দিককে নির্দেশ করে।

সঠিক অর্থে [education] এবং স্বাক্ষরতাকে [literacy] সমার্থক বলে ধরে নেওয়া যায় না। একটু পড়তে পারা, নাম সই করতে পারা আর ছোটখাটো হিসাব করতে পারার মধ্যে 'শিক্ষা' শব্দটিকে সীমাবদ্ধ রাখলে সে শিক্ষা দ্বারা মহৎ কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। অথচ বাংলাদেশে সাক্ষরতা অর্থে এ ধরনের শিক্ষাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। শিশুর জীবনের প্রথম ক'টি বছর মানসিক বিকাশ সাধনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ জীবনের শিক্ষা ও মূল্যবোধের দীক্ষা। যদি পাঁচ থেকে ছয় বৎসর পর্যন্ত কোনো শিশু উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী জীবনের যে কোনো ভালো শিক্ষকই তার শিক্ষার আগ্রহকে উদ্দীপিত করতে পারবেন। এই ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর শিক্ষার প্রথম পর্যায় পরিবারকে কেন্দ্র

করে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে সন্তোষজনক দৃষ্টান্ত সচরাচর মেলে না তা দুঃখজনক হলেও বলতে দ্বিধা নেই । এমনকি ছাত্র-ছাত্রীরাও বাধ্য হয়ে সে শিক্ষাকে গ্রহণ করবার প্রয়াসে ব্রতী হয়। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই বাংলা ছাড়া অন্য বিষয়ের শিক্ষকদের উপযুক্ত মনে করে না। বাংলা ও ইংরেজি ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত আছে। বেশির ভাগ শিক্ষকই ঐ সব ধারণার সাথে পরিচিত নন। পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করার মধ্যে ফলে শিক্ষাটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ছাত্ররা ঐ সব বিষয় অপছন্দ করে, কোনো আনন্দ পায় না। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ চিত্র চিরাচরিত। সুতরাং উপরিউক্ত দৃশ্য ভেসে ওঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়। জোর জবরদস্তি করেও তেমন ভাল ফলাফল লাভ করা যায় না। স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে শহর অঞ্চলে লক্ষ করা যায় ব্যাগভর্তি বই কাঁধে ঝুলিয়ে তাদেরকে স্কুলে যেতে হয়। শিক্ষকের শাসন আর অভিভাবকের বকুনি থেকে রক্ষা পাওয়ার আতংক থেকেই এই স্কুলে যাওয়া । তাদের স্বতঃস্ফূর্ত মনোবৃত্তি এক্ষেত্রে খুবই ক্ষীণ।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ

বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত এবং প্রতিটি শ্রেণির জন্য সুস্পষ্টরূপে আলাদা আলাদা শিক্ষাধারা বিরাজমান। যেমন উচ্চবিত্ত ও শাসকশ্রেণির জন্য ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল, কে.জি. স্কুল, ক্যাডেট কলেজ এমনকি প্রাইভেট শিক্ষায়তন। অনেকেরই আবার ক্যাডেট কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা পছন্দসই। কিন্তু এই এলিট শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলে আদৌ কি মুক্তি ঘটছে কিংবা ঘটবে? সর্বোচ্চ ভর্তুকিপ্রাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে এই ক্যাডেট কলেজগুলোকে টিকিয়ে রাখার সার্থকতা আসলে কোথায়? মনে প্রশ্ন থেকে যায়।

অন্যপক্ষে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত আর ভূমিহীন বৃহদায়তনের কৃষক শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে নিদারুণ করুণ চিত্র পাওয়া যায়। মধ্য ও নিম্নবিত্তের ছেলেমেয়েদের জন্য ঘুণে ধরা শিক্ষার আধুনিক নড়বড়ে কাঠামো। আর গ্রাম বাংলার কৃষক-শ্রমিক গতরখাটা মানুষের জন্য মধ্যযুগের মাদ্‌রাসা শিক্ষা। একটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্রে তিন ধারার শিক্ষব্যবস্থা নিয়ে আমরা শংকিত নই। যদি শংকিতই হতাম তাহলে এর জন্য যথার্থ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও নীতিমালা প্রণয়ন তথা এর বাস্তবায়ন করতে উদ্যোগী হতাম। একই রাষ্ট্রে একাধিক ধারা প্রচলিত থাকার ফলে নিঃসন্দেহে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মেধা বিকাশের একমুখী কার্যক্রম দেশে চালু হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যাতে সবাই মেধা বিকাশের সমান সুযোগ পায়। অন্তত সভ্য ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌল দায়িত্ব সেটিই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গোড়াতেই গলদ দিয়ে শুরু করেছি আমরা। কিন্ডার গার্ডেন, প্রাইমারি স্কুল এবং মাদ্রাসার ত্রিধারা ব্যবস্থা বৈষ্যমের বীজ বপন করছে বৈকি!

শিক্ষাদানে নাট্যপদ্ধতি

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানের ও ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ। কবিতা, উপন্যাস, গল্পের সাথে সাথে নাটকও সাহিত্যেরই অন্তর্গত। সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে নাটক সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। তাই নাটক সম্বন্ধে জ্ঞান যেমন দরকার তেমনি নাটক যে শিক্ষাদানেও ব্যবহৃত হতে পারে তা বুঝতে পারাটাও একজন নাট্য শিক্ষার্থীর কাজ।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন স্কুল কলেজে নাটকের মাধ্যমে শিক্ষাদান করবার একটি প্রচেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে। বিষয়টিকে Extra curricular activities হিসেবে চর্চা না করিয়ে যদি Co-curricular activities হিসেবে চর্চা করা যায় তাহলে এর মাধ্যমে বেশ সুফল আনয়ন করা যেতে পারে। পঠিত কোন বিষয় যদি শিশুদের সামনে অভিনয়ের মাধ্যমে, দৃশ্যায়নের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় তাহলে উপস্থাপনার পর সে ঘটনা

শিক্ষার্থীরা অতি দ্রুত আয়ত্ত করে ফেলে এবং দীর্ঘদিন তা মনে ধরে রাখতে পারে অন্তত পড়ে মুখস্থ করার থেকে।

১৯৬০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটেনে শুরু হয় শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতির প্রয়োগ। পরবর্তী সময়ে বহু দেশে শিক্ষা বিস্তারে শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় এই পদ্ধতি। যাতে শিশুরা অপ্রকাশিত ও সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে এমন একটি অভিজ্ঞতা দিতেই এই পদ্ধতির যাত্রা। সেটা পছন্দের যে কোনো বিষয় হতে পারে। হোক না সেটি স্কুলের পাঠ্য বিষয়ের অথবা পাঠ্য বিষয় বহির্ভূত। আবার বিষয়গুলো হতে পারে পরিবেশগত, জাতিসত্তাগত, আঞ্চলিক ইতিহাস, ভাষা শিক্ষা, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়।

> শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শিশুদের নাটকে গঠনমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়া যাতে তারা নাট্য মুহূর্তগুলোকে ধরতে পারে, চরিত্রগুলোর সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে পারে, জটিল পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, পরিপক্ক বয়সে ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারে অথবা চরিত্রগুলোকে উপদেশ দেয় তারা শুধুই দর্শক।[৫]

বেলগ্রেড থিয়েটার ১৯৬৫ সালে শিক্ষার ক্ষেত্রে নাট্য কীভাবে অবদান রাখতে পারে এই অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। একটি বিকল্প নাট্যরীতি হিসেবে উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত সমাজে নাটকের মূল্যকে উপস্থাপন করার জন্য এর উদ্ভব হয় এবং এর মাধ্যমে সমাজ ও শিক্ষার উপকারী ও কার্যকরী ভূমিকা খোঁজার চেষ্টা করে। উল্লেখযোগ্যভাবে ব্রেখ্‌ট ও অগাস্তো বোয়ালের কাজের মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের শক্তি হিসেবে এ প্রবণতা দেখা যায়। শিল্পের গুরুত্বের দিক থেকে শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ কারণে যাতে শিশুরা নাটকের মাধ্যমে নিজস্ব জগতকে সহজে বুঝতে পারে ও চিনতে পারে।

নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুনত্বের ধারণার নাম শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি। একটি চলমান নাট্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই পদ্ধতিকে বেগবান করতে হবে। 'কারণ এটা শিশুদের স্কুলের পাঠ্যসূচিতে আছে এমন বিষয় বা জীবনের কোনো অভিজ্ঞতার সাথে মুক্ত সম্পর্কিত বিষয় কাজ করতে সক্ষম।'[৬]

> শিক্ষাদানের নাট্য পদ্ধতি প্রথাগত নাট্যের অন্তর্গত একটা ভিন্ন একক। প্রথাগত নাট্যে অভিনেতা তার চরিত্রে মগ্ন থাকে, মুখস্থ সংলাপ বলে, পোশাক, সেটাও আবহসংগীতের ব্যবহার থাকে। শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি প্রক্রিয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ তাদের নিজেদের জায়গা থেকেই তৈরি করে এবং চরিত্রের সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুশীলন তৈরি হয় তাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। এতে কোনো সেটের ব্যবহার থাকে না। তবে প্রোগ্রামের আকার, ধারণ, বিষয় ও বয়স সীমার কারণে তারতম্য ঘটে।[৭]

অভিনয়ের মাধ্যমে শিশুদেরকে মুখস্থ করালেই বরং উপকার হয়। কেননা শিশুরা অভিনয় করতে খুবই ভালবাসে। শিশুরা অভিনয়ে তিন বৎসর বয়স থেকেই আনন্দ পায়। তারা নিজেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অভিনয় করে। যেসব থিম বা নাটকে তারা অভিনয় করে সেসব থিম বা নাটকে যে কেবল নিজেদের অংশটুকুই মুখস্থ করে তা নয়, তারা প্রায় সবটাই মুখস্থ করে ফেলে। তাদের চিন্তায় বহুদিন ধরে নাটকটি স্পষ্ট হয়ে থাকে এবং আনন্দ দান করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পাঠ আয়ত্ত করার জন্য মুখস্থ না করিয়ে নাচ, গান এবং নাটকের মত সাংস্কৃতিক আয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। ইংল্যান্ডে বেলগ্রেড থিয়েটার ১৯৭০ সালে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই থিয়েটার প্রক্রিয়াকে TIE [Theater in Education] নাম দিয়ে এই কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। পরবর্তী সময়ে এই ধারণার প্রয়োগ প্রসার লাভ করতে থাকে। আমরা হাতের কাজকে এবং কায়িক শ্রমকে জাতি হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করতে শিখিনি যা গঠনমূলক উন্নয়ন কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। তাই সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের সমন্বয় সাধনের জন্য প্রয়োগমুখী বা কর্মমুখী শিক্ষা পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দেয়া জরুরি।

মানুষের জীবনকে যদি তিনটি স্তরে ভাগ করা হয় তাহলে দেখতে পাই এর প্রথম স্তরে আছে পারিবারিক জীবন, দ্বিতীয় হয় শিক্ষাজীবন এবং সর্বশেষ কর্মজীবন। প্রথম স্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিশুর বিকাশ সাধনের জন্য এবং শিশু মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে এটা প্রমাণিত যে, মানুষ তার জীবনের প্রথম চার বছরে যা শেখে পরবর্তী বারো বছরেও তা শিখতে পারে না। সুতরাং একটি শিশু জীবনের প্রথম পাঠ শুরু করে এই জীবনকে ঘিরে থাকা তার মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোন এদের কাছ থেকে। পারিবারিক পরিমণ্ডল তার চরিত্র গঠনে সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। উন্নত শিক্ষা ও পরিবেশে বেড়ে ওঠা একটি শিশু পরবর্তী সময়ে যখন শিক্ষাজীবনে প্রবেশ করে তখন গুণগতভাবে এ ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত শিশুর সঙ্গে তার পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। অর্থাৎ শিক্ষা পর্যায়ে প্রবেশের জন্য পরিবার প্রধান অবদান রাখে। বিশেষ করে মা-বাবা। কিন্তু একথা সত্য যে বাংলাদেশে শিক্ষাহীন পরিবার থেকে শুরু করে অধিকাংশ পরিবারের অবহেলার কারণে শিশুরা পরবর্তী জীবনে সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হতে স্কুলে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষার যে সময়টুকু তার গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। এই শিক্ষা একজন মানুষের পরবর্তী শিক্ষাজীবন-কর্মজীবন এক অর্থে সারাজীবনে প্রভাব বিস্তার করে। সৃষ্টিলগ্ন থেকে স্কুল-কলেজে গিয়ে মানুষ বিদ্যার্জন করেনি। তার শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল পারিবারিক পরিমণ্ডল। আর এখানেই তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটতে থাকে এবং পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে। একে আমারা শিক্ষার অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারা নামে অভিহিত করতে পারি। সভ্যতার বিবর্তনে শিক্ষা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলে নানাভাবে এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেছে। তাহলে জন্মের পর থেকে মানুষ প্রকৃতি থেকেই স্বাভাবিক নিয়মে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে; সে তা বোঝে না কিংবা বুঝতে পারে না। শিক্ষা গ্রহণ করে সে ক্রমশ মানুষ হয়ে ওঠে। শিক্ষার এ পন্থাকে আমরা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে পারি। প্রতিটি পরিবার শিশুর জন্য প্রথম শিক্ষালয়।

শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি'র বিচিত্রতা বোঝার জন্য তিনটি প্রোগ্রাম উল্লেখ্য—

১. শিক্ষার্থীদের গণিত সমস্যা সমাধান করার জন্য ১৯৬৭ সালে ৫-৭ বছরের শিশুদের নিয়ে ইউ ফিটস্ নামের এই প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হয়। শিশুদের খেলনা ঘর তৈরি করার জন্য অল্প ওজনের কাঠের টুকরা দিয়ে বর্ণিল সাজে সাজিয়ে ঘন ফলে পরিণত করে। দুইজন ভাড়ঁজাতীয় চরিত্র সারা হলঘর জুড়ে অনুষ্ঠানটি এক ঘণ্টাব্যাপী পরিচালিত করে ।

২. পিটপ্রোপ থিয়েটার ৯-১১ বছরের বাচ্চাদের নিয়ে ১৯৮৪ সালে তিনটি পর্বে ব্যাণ্ড অব ফ্রিডম নামক একটি প্রোগ্রাম করে। ১৮৬০ সালে ল্যাঙ্কাসয়ারের তন্তু সংকট, আমেরিকার সিভিল ওয়ারের আঞ্চলিক ইতিহাস এবং দক্ষিণের নিগ্রো দাসদের মুক্তির সংগ্রাম এই প্রোগ্রামের মূল বিষয়বস্তু ছিল। ছোট ছোট আকারে উপস্থাপিত নাটকসমূহ ট্রেইনার ও অংশগ্রহণকারীদের সহায়তায় প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হয়। তন্তুমিলের চালকদের বেকারত্বের কারণ, মিল মালিক ও মুক্ত দাসদের সংঘাতের কারণ যাতে শিশুরা বুঝতে পারে সেজন্যই এই প্রোগ্রামটির আয়োজন করা হয়েছিল।

৩. নাটকে প্রতিটি চরিত্রের বিকাশ, পরিবর্তন, নিজেরাই প্রকাশ করতে পারে এমন একটি আচরণ, ইস্যু এবং সংঘাত থেকে যাতে শিক্ষার্থীরা পূর্ণভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে সেই লক্ষ্যে ১৯৩০ সালের লন্ডনে ফ্যাসিবাদের কারণে যে বেকারত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তার উপরে মারচেস নামক একটি প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে ককপিট টিআইই কোম্পানি ১৯৭৭ সালে ১৬-১৯ বছরের শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করে। শিক্ষার্থীরা যাতে সাক্ষাৎকার দিতে সক্ষম হয় ।

শিক্ষাদানের নাট্যপদ্ধতি অন্য যে কোনো নাট্য আঙ্গিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধারণা। এর বৈশিষ্ট্য তা প্রমাণ করে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

ক. নির্দিষ্ট বয়স সীমায় এই নাট্যপদ্ধতি শিশুদের সাথে কাজ করে।

খ. শিশুদের পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত অথবা শিশুরা মুখস্থ সংলাপ না বলে বরং নিজেরাই তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ তৈরি করতে পারে এমন বিষয় নিয়ে নাট্য নির্মাণ করা যায়।

গ. শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি স্কুল ও স্কুলবঞ্চিত যে কোনো শিশুদের নিয়ে কাজ করতে পারে।

ঘ. শিক্ষকদের ভূমিকা হতে হবে অভিনেতা হিসেবে।

ঙ. শিশুদের এমনভাবে অভিজ্ঞতা দেওয়া যা তাদের মানসিক অবস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে।

চ. শিশুরা ঝুঁকি নিতে ও আলোড়িত হতে শিখতে পারে নাট্য মুহূর্তের অভিজ্ঞতা থেকে ।

> শিক্ষাদনের নাট্য পদ্ধতি এমন একটি অনুধাবনযোগ্য নাট্য মুহূর্ত যা অন্য যে কোনো প্রক্রিয়া থেকে আলাদা (এমনকি যে কোনো টিচিং মেথডের চাইতে) শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি দলগুলোর ধরন এমন। প্রথমত, শিক্ষকদের একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে তারা এর লক্ষ্য ও পদ্ধতি শিখতে পারে এবং এক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা কেমন হবে তাও আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয়ত, শিক্ষকগণ গবেষণা ফলোআপের জন্য নোট রাখবে। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যা ফলাবর্তন হিসেবে উপাত্ত পাওয়া যাবে তার মধ্য দিয়ে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক মুক্ত আলোচনার সুযোগ দিবে। অন্যদিকে কোম্পানির সদস্যগণ তাদের শিক্ষক অভিনেতার যাবতীয় দক্ষতা, গুণাবলি ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করত।[৮]

শিক্ষার জন্য যখন নাটক বা নাট্য উপস্থাপন করা হয় তখন নাটকের নাটকীয়তা অপেক্ষা শিক্ষণ অধিক জরুরি হয়ে থাকে। সেই সাথে বিষয়টি কোন পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপস্থাপন করা হচ্ছে সেটিও লক্ষণীয় বিষয়। অর্থাৎ সহজ, সরল ও আনন্দময় শিক্ষণের জন্যই শিক্ষাদানে নাট্যের ব্যবহার। শিক্ষার্থী যাতে লেখাপড়াকে পারস্পরিক আদান-প্রদান ভাবতে পারে, তারা যাতে পড়ার বিষয়কে খুব সহজেই ধারণ করতে পারে সেটিই মূলত লক্ষ রাখার বিষয়। শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি একটি চলমান প্রক্রিয়া। মঞ্চাভিনয় (performance) বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা (Devise) ও ফলাবর্তন (Follow-up) এই প্রক্রিয়ার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই প্রক্রিয়ায় বিষয় নির্ধারণ করা, পাণ্ডুলিপি রচনা করা, তাৎক্ষণিক উপস্থাপনের ক্ষমতা তৈরি হওয়া, ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রভৃতি বিষয়ে শিশু-কিশোরদের দক্ষতা তৈরি হয়। ফলে মননশীলতায় স্থায়ী প্রভাবক হয়ে ওঠে শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি।

সমীক্ষণঃ নাট্য তৈরির প্রক্রিয়া

মূল বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই নাটক নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ার আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বইয়ের গল্প অবলম্বনে একটি নাটক প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রথমেই ৮জন পর্যবেক্ষকের সমন্বয়ে একটি দলগঠন করা হয়। কাজটি শুরু হয়েছিল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে। রাজশাহীস্থ মির্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম পর্যবেক্ষণ করা হয় । এই স্কুলের বাচ্চাদের কাছেই সংগ্রহ করা হয় তৃতীয় শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত *আমরা বাংলা বই* এবং *বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচিতি* বইসমূহ। বইগুলো এনে দুটি দলে ভাগ হয়ে দুই বিষয়ের সকল বইয়ের গল্পগুলো পড়া হয়। এই গল্পগুলো পড়ে প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত গল্পগুলো নির্ধারণ করা হয়।

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচিতি থেকে–১.মিলে মিশে থাকা, ২.প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, ৩.মানুষের গুণ, ৪.বাংলাদেশের জনসংখ্যা, ৫.আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ৬.বিভিন্ন পেশার মর্যাদা, ৭.পরমতসহিষ্ণুতা

আমরা বাংলা বই থেকে–১.রাজা ও তিন কন্যা, ২.মোবাইল ফোন, ৩.হাত ধুয়ে নাও ৪.অবাক জলপান

এবার রওনা দেয়ার পালা। উদ্দেশ্য, রাজশাহী জেলার দুর্গাপুরের উজানখলসী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। তারিখ: ০১.০৮.২০১৬। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পৌঁছে (বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে পূর্বেই যোগাযোগ করা হয়েছিল) প্রথমেই শিক্ষার্থীদের সাথে পর্যবেক্ষকবৃন্দ খেলায় মেতে ওঠে। খেলার এক পর্যায়ে উপস্থিত সবাইকে চকলেট দেওয়া হয়। সেখানে লাল রঙের চকলেট ছিল ১০টি। খুঁজে বের করা হয় সেই ১০টি চকলেটকে কে পেয়েছে। এভাবে খেলার ছলেই নাটকের জন্য সেই ১০জনকে নিয়েই দল গঠন করা হয়। তারপর পর্যবেক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের সাথে আলেচনাপূর্বক ঐক্যমতের মধ্যে দিয়ে নাটক হিসেবে উপস্থাপনের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয় সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান'। শিক্ষার্থীদের সাথে নাটকের প্রায়োগিক দিকসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। তারপর নাটকটির চরিত্রগুলো দলের সকলকে ভাগ করে দেওয়া হয়। শুরু হয় মহড়া। খেলতে খেলতেই সংলাপ গুলো মুখস্থ করে ফেললো বাচ্চারা। এবার কিছু প্রপস তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হলো (প্রপসে্র ব্যবহার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল)। যেমনঃ পানির বোতল, কাপড়ের টোপল, লাঠি ইত্যাদি। এছাড়াও শিশুদের মাঝে আকর্ষণ তৈরি করার জন্য লাল রংয়ের ওড়না ব্যবহার করা হলো। যার মাধ্যমে বাড়ির দরজা, জানালা, মাথার ঝুড়ি ইত্যাদি তৈরির মহড়া চললো। সারাদিনব্যাপি মহড়া করে শিক্ষার্থীদের সামনে নাটকটি উপস্থাপন করা হয়। অর্থাৎ নাটকটি উপস্থাপনের মুহূর্ত পর্যন্ত বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন—

ক. শিক্ষার্থীদের সাথে খেলায় অংশগ্রহণ।
খ. নাটকের জন্য দলগঠন।
গ. ক্ষেত্র নির্বাচন।
ঘ. নাটকের বিষয় নির্বাচন।
ঙ. নাটকের প্রায়োগিক বিষয় নিয়ে আলোচনা।
চ. আনন্দদানের মাধ্যমে মহড়া পরিচলনা।
ছ. প্রস্তুতকৃত নাটকের প্রদর্শনী।

ফলোআপ

নাটকটি উপস্থাপনের পরই শুরু হয় মূল কাজটি। যে শিশুদের জন্য আয়োজন, তাদের কাছে এই গল্পের নাট্যিক উপস্থাপন কতটুকু বোধগম্য ও ফলপ্রসু হয়েছে তা জানাই মূল উদ্দেশ্য। সার্থকতার মাত্রা জানার জন্য শিশুদেরকে বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়। তারা অতি উৎসাহের সহিত প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দেয়। প্রশ্নগুলি ছিল ঐ গল্পের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। নমুনাপ্রশ্ন—

১. পথিক সকলের কাছে কি চেয়েছিল? উত্তর: জল
২. ঝুড়িওয়ালা কি মনে করেছিল? উত্তর: জলপাই
৩. পৃথিবীতে কয় ভাগ জল? উত্তর: তিন ভাগ
৪. হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন বিশ্লেষণ করলে কি হয়? উত্তর: পানি
৫. জলাতঙ্ক কি? তোমরা বলতে পারবে। উত্তর: পানি বাহিত রোগ
৬. মামা কোন পেশায় নিয়োজিত ছিল তোমরা বলতে পারবে? উত্তর: বিজ্ঞানী
৭. কুকুর কামড় দিলে কি হয়? উত্তর: জলাতঙ্ক
৮. জল অর্থ কি? উত্তর: পানি
৯. বৃদ্ধ কার কার তর্কাতর্কি দেখেছিল? উত্তর: পথিক ও ঝুড়িওয়ালা

প্রশ্ন-উত্তর পর্বই মূলত ফলো-আপ। প্রশ্ন করা ও উত্তর প্রাপ্তির মধ্য দিয়েই বুঝতে পারা যায় যে উপস্থাপন কতটুকু শিক্ষাপোযগী হয়েছে। উপস্থিত শিক্ষার্থীদেরকে যখন প্রশ্ন করা হচ্ছিলো তারা ভীষণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে

প্রশ্ন-উত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করছিল। তাদের উত্তরগুলোও ছিল মৌলিক ও স্ব-উৎসারিত। তাদের চোখে মুখে ছিল আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠার গভীর ছাপ। তারা নাটকটি দেখার ফলে নাটকের গল্পের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছিল। শিক্ষার্থী ও পর্যবেক্ষকবৃন্দের মাঝে এক ধরনের সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল যার ফলে তারা খুব সহজেই পর্যবেক্ষকবৃন্দের কথাগুলো গ্রহণ করতে পারছিল। ফলো-আপের এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সামান্য কিছু পুরস্কার ছিল যা তাদের উৎসাহ ও আগ্রহকে আরও তাড়িত করেছে। তাদেরকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে গল্পের অংশীদার করে তোলা হয়েছিল।

সুপারিশ

একটি স্বতন্ত্র নাট্য আঙ্গিক শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি। কিন্তু তার মানে অন্য নাট্য আঙ্গিকগুলোর কোনো মূল্য নেই এমনটি নয়। তবে অন্যান্য নাট্য আঙ্গিক থেকে প্রশ্নাতীতভাবে শিক্ষাদানের নাট্য পদ্ধতি'র অনেক সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ আছে। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এই নাট্য আঙ্গিক জায়গা করে নিয়েছে। শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি'র সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য পদক্ষেপগুলো নেওয়া প্রয়োজন। যেমন—

ক. প্রতিটি স্কুলে শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতির প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

খ. শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ. শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণের সময় মডেল নাটক তৈরি করে উপস্থাপন করা।

ঘ. নাটকবান্ধব শিক্ষক নিয়োগ দেয়া।

ঙ. পর্যাপ্ত শিখন সহায়ক উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

চ. সিমুলেশন গেমস্ এর ব্যবস্থা করা। (এ খেলায় শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনের বাস্তবতা উপলব্ধি করবে। সিমুলেশন অর্থ কৌশল। সিমুলেশন গেমস্ বা ভান খেলা প্রক্রিয়ায় শিক্ষাদান কৌশলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই অংশগ্রহণ করতে পারে।)

ছ. শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা। (এর ফলে ভালো অভিনেতাও তৈরি হবে।)

জ. ফলো-আপের ব্যবস্থা রাখা।

ঝ. মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে মনিটরিং টিম গঠন করা।

ঞ. স্কুল, স্কুলের বাইরে ও পথশিশুদের নিয়ে চিলড্রেনস থিয়েটার দল তৈরি করা। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শিশুদের নিয়ে এ থিয়েটার অগ্রসর হবে।

ট. অপেশাদার থিয়েটার হিসেবে ইয়ুথ থিয়েটার দল তৈরি করা। তরুণরা যাতে নিজেদের তৈরি পাণ্ডুলিপি কিংবা নির্দিষ্ট পাণ্ডুলিপি নিয়ে নাটক পরিবেশনা করতে পারে। তাহলে তরুণরা নিজেদের উপর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষার মান বৃদ্ধি হবে।

উপসংহার

মনে প্রশ্নের জন্ম জাগে, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব কি না? কিন্তু বহির্বিশ্বের দিকে তাকালে হয়তো আশার আলো জ্বলে উঠে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে (কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ইত্যাদি) শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতির প্রায়োগিক ভিত্তি নির্মাণ করতে পেরেছে। তা থেকে অনুপ্রাণিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতির প্রয়োগের সূচনা এদেশে অনেক আগেই হয়েছে, এখন প্রয়োজন প্রায়োগিক দিক কার্যকর ও সম্প্রসারণ। এই পদ্ধতির প্রায়োগিক দিক কার্যকর করতে শিক্ষাব্যবস্থাকে বদলে

দেয়ার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধুমাত্র সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সদিচ্ছা, সরকারি ও বেসরকারি সহায়তা এবং পৃষ্ঠপোষকতা। শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে অনিবার্য ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

[১] বার্ট্রাণ্ড রাসেল, *শিক্ষা প্রসঙ্গে*, শেখ মাসুদ কামাল অনূদিত, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৪), পৃষ্ঠা ৭১।

[২] শরীফা খাতুন, *দর্শন ও শিক্ষা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা ১০।

[৩] সরদার ফজলুল করিম, *এ্যারিস্টটল-এর 'পলিটিক্স'*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১), পৃষ্ঠা ৩১৪।

[৪] এ. এন. রাশেদা (সম্পাদিত), খান সারওয়ার মুরশিদ, *প্রধান অতিথির ভাষণ*, (ঢাকা: শিক্ষাবার্তা প্রকাষনা, ১৯৯৫), পৃষ্ঠা ১৫।

[৫] আব্দুল হালিম প্রামানিক সম্রাট, *বাংলাদেশে শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভাবনা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ২০।

[৬] তদেব, পৃষ্ঠা ২০।

[৭] তদেব, পৃষ্ঠা ২০।

[৮] তদেব, পৃষ্ঠা ২২।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

জীবনী-নাটক : *আরজ চরিতামৃত*

আশরাফিয়া ইসলাম তোশিবা*

Abstract: Biographical drama has been going on for many years as one of the genre of drama literature. Especially in the present time its practice is increasing. Dramatists compose biographical plays by passing on the meaning of literary meaning to the unique character of history. The biography is taken from drama history but it is not complete history. Again, this is not even the play of the protagonist's fiction. It combines the feel of the playwright with the original historical fact. It is as if the present theater has created a new stream of practice and drama. Therefore, research on the drama of this genre has become a necessity at the present time. In this context, what is biographical drama, its characteristic, tendencies, requirements, propriety judgments are essential. Exploring why this drama is distinct from other plays has become a priority here. In this article, what is the biographical drama and its 'Aroj Charitamrita' drama are discussed in this article.

ইতিহাস ও নাটক এক নয়। ইতিহাসকে আশ্রয় করে শিল্প সৃষ্টি হতে পারে, তবে শিল্প সাধারণত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে না। ইতিহাসের কাঠামোকে ভিত্তি করে শিল্প নির্মিত হয়। ইতিহাসকে অবলম্বন করে শিল্পী তার কল্পনার আস্তরণ লাগিয়ে নিখুঁত এক শিল্প তৈরি করেন। ফলে ব্যক্তির ইতিহাস কালের গণ্ডিতে আটকে যেতে পারে কিন্তু ব্যক্তিনির্ভর সাহিত্য কালাতিক্রম শিল্পরূপে বিবেচিত হয়। কোনো ব্যক্তির জীবনীকে সাহিত্যে রূপ দিতে হলে একজন শিল্পীকে ইতিহাসের সত্যের সাথে সংযোজন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে হয়। কারণ শিল্পী ইতিহাসের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করেন। আর তাই সাহিত্যের নানান শাখার মধ্যে জীবনীনির্ভর সাহিত্যও একটি প্রতিষ্ঠিত শাখা। বহুকাল থেকে জীবনীনির্ভর সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টা সাহিত্যিকদের মাঝে লক্ষণীয়। এরই ধারাবাহিকতায় আত্মজীবনী, জীবনীনির্ভর গল্প, উপন্যাস ও নাটক রচিত হয়েছে। ইতিহাসের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ আমাদের নিকট শ্রদ্ধেয় ও অনুকরণীয়। তাদের চিন্তা-চেতনা, দর্শন, জীবনবোধ উত্তর প্রজন্মকে অগ্রসর হবার অনুপ্রেরণা দান করে। অগ্রজদের জীবনের ঘটনাসমূহকে কালান্তরে দৃষ্টান্তরূপে রাখার প্রয়াসে জীবনীনির্ভর সাহিত্যের যাত্রা শুরু। এ যাত্রায় নেই সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য শাখা 'নাটক'। প্রাচীন গ্রীসে নাট্যোৎপত্তির কাল থেকে অদ্যাবধি জীবনীনির্ভর নাটক রচনা লক্ষযোগ্য। জীবনীনির্ভর নাটক *আরজ চরিতামৃত-এ* প্রতিফলিত স্বশিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক, দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনী অবলম্বন করা হয়েছে। একুশের শতকের বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় তা গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। সমকালে এসে কেন এ নাটক ও চরিত্র প্রাসঙ্গিক তা বিবেচনার দাবি রাখে। এ প্রসঙ্গে নাট্যজন মামুনুর রশীদ বলেন:

> আজকের দিনে যখন চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে অন্ধবিশ্বাসের পক্ষে তখন আরজ আলীর প্রশ্নগুলি বারবার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এই প্রাসঙ্গিকতাই উদ্বুদ্ধ করলো একজন নাট্যকারকে। নাট্যকার মাসুম রেজা তার একক চরিত্রনির্ভর নাটক রচনার ধারাবাহিকতায় লিখলেন *আরজ চরিতামৃত*।[১]

ইতিহাসের গর্ভে টিকে যাওয়া চরিত্রগুলির প্রতি আগ্রহ কখনো শেষ হবার নয়। বরং দেখা যায় সময়াবর্তে কিছু কিছু চরিত্র সম্পর্কে জানা অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই জানার দুর্নিবার আগ্রহ শিল্পী-সাহিত্যিকদের জীবনীসাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। জীবনীসাহিত্য আসলে কী? খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে কোন

* এম.ফিল গবেষক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিকে তুলনামূলক পূর্ণ ও সত্য তথ্য সহকারে উপস্থাপনকে জীবনী বলে। জীবনী শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Biography. এটি গ্রিক শব্দ bios ও grapheir থেকে এসেছে। bios অর্থ জীবন ও grapheir অর্থ লেখন। অর্থাৎ জীবনের পরিক্রমাকে লিখিতরূপে প্রকাশ করাই হল জীবনী বা Biography. আবার বাংলা অভিধান অনুসারে জীবনী অর্থ জীবনচরিত বা জীবনবৃত্তান্ত।

> A biography, or simply bio, is a detailed description of a persons life. It involves more than just the basic facts like education, work relationships and death; It portrays a person's experience of there life events unlike a profile or cut curriculum vitas a biography presents a subject's life story, highlighting various aspects of his or her life, including intimate details of experience and may include an analysis of subjects personality.[২]

অর্থাৎ জীবনী হল একজন মানুষের জীবনের বিস্তারিত উপাখ্যান। তাতে ব্যক্তির বেড়ে ওঠা, শিক্ষা, কর্ম ইত্যাদিসহ যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে একত্রিত করে উন্মোচিত হয়। জীবনীসাহিত্য মূলত ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপন, যেখানে শিল্পী নিজের রসবোধের মাধ্যমে বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনকে পাঠকের মননে সঞ্চারিত করে। সাহিত্যের আদি লগ্ন হতেই এ জীবনীনির্ভর সাহিত্য রচনার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কী পাশ্চাত্যে কী প্রাচ্যে সবখানেই সাহিত্যের এই শাখার চর্চা ছিল অনবদ্য। জীবনীর সমান্তরালে আত্মজীবনী রচনার চর্চাও উল্লেখ করার মতো। আত্মজীবনী শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Autobiography'. এই শব্দটির বুৎপত্তি হয়েছে গ্রীকশব্দ autos অর্থ নিজ, bios এর অর্থ জীবন grapheir অর্থ লিখা থেকে। এর অর্থ হল 'A self written account of the life of oneself.[৩] অর্থাৎ আত্মজীবনী হলো ব্যক্তির স্বরচিত জীবনচরিত বা আত্মকথা। জীবনীসাহিত্য বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের মতো বাংলা ভাষার সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যায় উনিশ শতকের আগে বাংলা ভাষায় কোন জীবনী লেখা হয় নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে গীতিকবিতায় স্বীয় পরিচয় তুলে ধরার একটা প্রয়াস লক্ষণীয় হলেও এগুলো আধুনিক ধারার জীবনী-সাহিত্যের মধ্যে পড়ে না। সাহিত্য হিসেবে জীবনীসাহিত্যের প্রকৃত উন্মেষ ঘটে উনিশ শতকে। 'বাংলায় প্রথম আত্মজীবনী রচনা করেন দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়'।[৪] উনিশ শতকে সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্রোহের ফলে জাতীয়তাবোধ ও অধিকার চেতনা জাগ্রত হলে জীবনী রচনার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, সকল জীবনী এক মাপের ও একই চরিত্রের নয়। জীবনী রচনার ক্ষেত্রে একেকজন একেক বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কখনো ব্যক্তিজীবনকে আবার কখনো কর্মজীবনকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় রচয়িতা সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থাতেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। ইতিহাসের সব চরিত্রই জীবনীমূলক রচনার জন্য নয়। যেসব চরিত্র সময়কে প্রভাবান্বিত করেছেন, মনুষত্যের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, সামাজিকভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তাদের চরিত্রসমূহকেই কালোত্তীর্ণ করবার উদ্দেশ্যে তাদের জীবনচিত্র লেখনি দ্বারা তুলে এনেছেন সাহিত্যিকগণ। এভাবেই বর্তমান সময় পর্যন্তও সাহিত্যের এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। জীবনের বিচিত্ররূপের এক শক্তিশালী সম্মিলন হল নাটক। নাটক সভ্যতার প্রথম প্রভাতে মানুষের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে উদ্ভূত হয়েছিল। আর সেই ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। নাটকের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন— ট্রাজেডি, কমেডি, ট্রাজিকমেডি, ঐতিহাসিক, সামাজিক, জীবনীমূলক বা চরিত নাটক। নাটক উদ্ভবের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, *মিশরের অ্যাবিডাস প্যাশন প্লে। এতে* দেবতা ওসিরিসের পুনরুত্থানের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।[৫] এরপর থেকে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে অদ্যাবধি। পাশ্চাত্যে বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে বহু নাটক লেখা হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শেকসপিয়রের নাটকগুলির, যেমন— *হ্যামলেট* (১৬০১), *ম্যাকবেথ* (১৬০৬), *জুলিয়াস সিজার* (১৫৯৯) ইত্যাদি। এ ব্যক্তিবর্গ ঐতিহাসিকভাবেই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাদের নিয়ে রচিত নাটকসমূহও নাটক হিসেবে সমান

গুরুত্বের। প্রাচ্যও পিছিয়ে নেই এই চর্চায়। জীবনীভিত্তিক নাটক রচনায় গিরিচন্দ্র ঘোষের নাম সর্বাগ্রে। গিরিশ ঘোষের *সিরাজউদ্দৌলা* (১৯০৫), ডি.এল রায়ের *সাজাহান* (১৯০৯), *চন্দ্রগুপ্ত* (১৯১১), উৎপল দত্তের *মধুসূদন* (১৯৫০) বিশ শতকের উল্লেখযোগ্য নাটক।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবন অথবা চরিত্র অবলম্বনে গল্প, উপন্যাস লেখা হয়েছে, সিনেমা, নাটক, যাত্রাপালাও চলছে অনেকদিন যাবত। বিশিষ্ট-ব্যক্তির জীবনকে উপজীব্য করে যেসব নাটক রচিত হয়েছে সেসব নাটককে জীবনী-নাটক বলা হয়। এই জাতীয় নাটকে নাট্যকার মূলত ব্যক্তির জীবনের সত্যঘটনাকে কেন্দ্র করে নাট্যকাহিনী নির্মাণ করেন। এ প্রসঙ্গে ড. দূর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বলেন:

> এই সমস্ত নাটকে সাধারণত সমাজের কোন একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবনীকে আশ্রয় করে তাকে বস্তুতান্ত্রিক পথে যতদূর সম্ভব অলৌকিকতাকে বর্জন করে রূপ দেয়া হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বা পূরাণ প্রসিদ্ধ তাঁর জীবনকে যদি অলৌকিকতামুক্ত বস্তুতান্ত্রিক পথে উপস্থাপনের প্রয়াস হয় তাহলেও তাকে চরিত নাটক বলা উচিত।[৬]

ব্যক্তির জীবন প্রবাহের নানান ঘটনা এ ধরনের নাটকে উপস্থাপন করেন নাট্যকার। নাট্যকারকে মনে রাখতে হয় জীবনের সকল ঘটনাকে দুই বা তিন ঘণ্টার নাটকে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। বাস্তবজীবন বড় গোলমেলে, তাতে অনেক অসংগতি থাকে। অনেক চরিত্রের উপস্থিতি থাকে যা হয়ত খুব একটা গুরুত্বপূর্ণও নয়। তখন নাট্যকারকে নাট্যকাহিনীর সংগতির দিকে লক্ষ রেখে সেসব চরিত্র, ঘটনা বাদ দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে শম্পা ভট্টাচার্য বলেছেন, 'জীবনীমূলক নাটকে মূলচরিত্রের সঙ্গে তাদের ঠাঁই দিতে গেলে নাটকের মূলসূত্রটি হারিয়ে যেতে পারে।'[৭] এখানে থেকে সম্পষ্টতই ধারণা পাওয়া যায় ব্যক্তিজীবনের সকল ঘটনা, সকল চরিত্র, সকল কর্ম জীবনী-নাটকে স্থান পায় না। তাতে নাট্যকাহিনীর গ্রন্থিবন্ধন হালকা হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। 'জীবনী নাটকে জীবনের সম্পূর্ণরূপ ফুটিয়ে তুললে সম্পূর্ণ জীবন পরিচয় পাওয়া যায় বটে, তাতে নাটকের হানি ঘটে। অতি বিস্তৃত ও বিচিত্রমুখী ঘটনা প্রবাহের মধ্যে নাটকে সংগতি ও কেন্দ্রবদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়, আসলে এসব নাটকে মানুষের জার্নিটাই হয়ে পড়ে মুখ্য কথা।'[৮] কোন জীবনী যখন নাটক হয়ে ওঠে তখন তার অন্যতম শর্ত হল দর্শককে আবিষ্ট করে রাখা অর্থাৎ নিরবিচ্ছিন্ন মনোযোগ ধরে রাখা। তাই নাট্যকারকে হয়ত সেই প্রয়োজনেই দু একটি কাল্পনিক চরিত্র বা ঘটনার অবতারণা করতে হয়। অ্যারিস্টটলের মতে 'unity of plot does not, as some persons think, consist in the unity of the here. For infinitely various are the incidents in one man's life which cannot be reduced to unity.'[৯] নাটকে ঘটনার ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ। অথচ জীবনী-নাটক রচনা করতে হলে ব্যক্তি জীবনের পরস্পর বিরোধী অথবা অসংগতিপূর্ণ ঘটনা নিয়েই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তুলে ধরতে হয়। তাই বলা যায় যে, জীবনী-নাটক বলতে বোঝায় অলৌকিকতাবর্জিত বিখ্যাত মণীষীদের বহুমুখী কর্মধারার এমন এক নাট্যরূপ যাতে ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মায়।

জীবনীভিত্তিক এ নাট্যরচনা ও মঞ্চায়নের জোয়ার বাংলাদেশের সাহিত্য ও থিয়েটার অঙ্গনে সমান্তরালে চলমান। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে শিল্প সাহিত্যের যে মুক্তচর্চা শুরু হয়েছে তাতে জীবনী-সাহিত্যও বিকশিত হয়েছে। বর্তমান সময়ের থিয়েটারের দিকে তাকালে এর প্রভাব লক্ষণীয়। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জীবনীনির্ভর নাটকের দিকে ঝুঁকে পড়েছে থিয়েটারপ্রেমীরা। আবার নাট্যকারগণ রচনা করছেন বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনীকেন্দ্রিক নাটক। এইসব রচনার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাচ্ছে ঐতিহাসিক চরিত্র, কবি-সাহিত্যিক, ধর্মীয় গুরু কিংবা সাধক-জীবন। বর্তমানে জীবনীভিত্তিক নাট্যচর্চার প্রসার ঘটেছে। বিগত দুই দশক ধরে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় জীবনী-নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ হয়েছে। যেসব ঘটনা একজন ব্যক্তিকে অনন্য করেছে এবং যা অন্যের মাঝেও পরিবর্তন আনতে পারে এমন ঘটনাই বাংলাদেশের জীবনী নাটকে যুক্ত হয়েছে।

> আর্কিওলজিক্যাল গবেষণা, রেডিও কার্বন ডেটিং এইসব পদ্ধতিতে এইসব নাটকে ব্যবহৃত উপাদান বা জনশ্রুতি কিছু প্রামাণ্য সত্য বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। তবে সবটা নয়, বাইবেলের গল্প বা রামায়ণ, মহাভারত ভিত্তিক চরিত নাটক এ জাতীয়। এসব সম্পূর্ণ ইতিহাস নয় বরং সম্ভাব্য ইতিহাস হলেও হতে পারে। আর এক ধরনের জীবনীমূলক নাটক আছে যাকে নেমসেক বায়োপিক ড্রামা নামে অভিহিত করা যায়।[১০]

বাংলাদেশেও এই 'নেমসেক বায়োপিক' বৈশিষ্ট্যের জীবনী-নাটক রয়েছে। এই ধরনের নাটকে মূলত ইতিহাসের কোন তথ্য, ঘটনা ইত্যাদি থাকে না, শুধু ইতিহাস থেকে উঠে আসা চরিত্রের নামটুকুই থাকে। ফলে এইসব নাটকের তেমন কোন তাৎপর্য থাকে না। তাই অনেক সমালোচক এটিকে জীবনী-নাটকের আওতায় ফেলতে চান না। বাংলাদেশের নাটকচর্চায় জীবনীভিত্তিক নাটকের সংখ্যা কম নয়। তার চেয়েও অধিক বিচার্য এই যে, সাহিত্য, ইতিহাস, সামাজিক, শিল্পমানে এটি এতটাই উত্তীর্ণ যে বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় এটি এক স্বতন্ত্র ধারা সৃজনে সহায়ক হয়ে উঠেছে জীবনী-নাটক। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য জীবনী-নাটকের একটি তালিকা এখানে উল্লেখ করা হল:

নাটক	নাট্যকার	মঞ্চায়ন/প্রকাশ
লেবেদেফ	মামুনুর রশীদ	১৯৯৫
ক্ষুদিরাম কথা	বজলুর রহমান জোয়ার্দার	১৯৯৫
রাজা প্রতাপাদিত্য	আশীষ খন্দকার	১৯৯৮
আরজ চরিতামৃত	মাসুম রেজা	১৯৯৯
সক্রেটিসের জবানবন্দী	শিশির কুমার দাস	১৯৯৯
আওরঙ্গজেব	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	২০০৪
বিনোদিনী	সাইমন জাকারিয়া	২০০৫
মহাজনের নাও	শাকুর মজিদ	২০০৫
মুজিব মানে মুক্তি	লিয়াকত আলী লাকী	২০০৮
এবং বিদ্যাসাগর	মান্নান হীরা	২০০৯
সম্রাট আশোক	স্বপন কুমার বড়ুয়া	২০০৯
বারামখানা	পান্থ শাহরিয়ার	২০১০
বাংলার মাটি, বাংলার জল	সৈয়দ শামসুল হক	২০১০
শেখ সাদী	অপূর্ব কুমার কুণ্ডু	২০১২
সিরাজ যখন নবাব	আব্দুল আজিজ	২০১৫
নভেরা	হাসনাত আবদুল হাই	২০১৬
দাঁড়াও... জন্ম যদি তব বঙ্গে	অপূর্ব কুমার	২০১৭
ট্রায়াল অফ সূর্যসেন	মাসুম আজিজ	২০১৮
হাছন জানের রাজা	শাকুর মজিদ	২০১৮
শ্রাবণ ট্রাজেডি	আনন জামান	২০১৮
লোকনায়ক	অনন্ত হীরা	২০১৯
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে	অংশুমান ভৌমিক	২০১৯

জীবনী-নাটক আমরা উপভোগ করি; শিক্ষাও গ্রহণ করি। উল্লিখিত নাটকসমূহের কাহিনী ও চরিত্র ইতিহাসের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের জীবনকে উপজীব্য করেই নাট্যকারগণ রচনা করেছেন। উল্লেখ্য, ইতিহাসের সব চরিত্রই নাটকের বিষয় হয়ে ওঠে না। কারণ টানটান উত্তেজনা, বহুরৈখিক জীবনাচরণ যেসব ব্যক্তিত্বের জীবনে উপস্থিত তাদেরকেই নাট্যকারগণ নাটক রচনার জন্য গ্রহণ করে থাকেন। কমল সাহা বলেছেন:

> মাইকেলের জীবন আর বিদ্যাসাগরের জীবন তো আর এক নয়। বনফুল মাইকেলের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সংঘাত তৈরি করতে পারেন বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিদ্যাসাগর চরিত্র সরলরৈখিক, নাটকীয়তা অল্প; কিন্তু মাইকেলের বাঁকে বাঁকে রোমাঞ্চ। একইরকমভাবে বিশ্ব ত্রাস হিটলার কেমন ফ্যাকাসে মলিন হয়ে যায় নটী বিনোদিনীর দাপটে।[১১]

বিদ্যাসাগরের জীবনের চাইতে মাইকেলের জীবনীতে বৈচিত্র্য বেশি বলেই মাইকেলের জীবন সম্পর্কে দর্শক ও পাঠকের আগ্রহও লক্ষ্যণীয়। তাই জীবনী-নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারকে গল্পের মাঝে নাটকীয়তার অনুসন্ধান করতে হয়। যেখানে থাকবে টানটান উত্তেজনা, উত্থান-পতন ও শিহরণ। এ জাতীয় নাটক সম্পর্কে হিমাদ্রি মণ্ডল বলেন, 'ব্যক্তির জীবন এবং সেই ব্যক্তির জীবন আশ্রিত সাহিত্য ব্যক্তির দুইরূপকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে।'[১২]

বরিশাল জেলার লামচরিতে জন্ম নেয় আরজ আলী মাতুব্বর (১৯০০-১৯৮৫)। সময়ের বিপরীত স্রোতে চলা, চিরজিজ্ঞাসু, স্বশিক্ষিত, শ্রমজীবী অথচ মুক্তবুদ্ধি চর্চায় ব্রতী, বিজ্ঞানমনস্ক দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর। লেখাপড়ার প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ কিন্তু লেখাপড়া চালিয়ে যাবার মত সংগতি ছিল না তাঁর। তাই তিনি স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। 'ইংরেজিতে সেল্ফ টট কথা বলে প্রচলিত যে কথাটি তা খাঁটি অর্থেই প্রযোজ্য আরজ আলী মাতুব্বরের ক্ষেত্রে।'[১৩] বই কিনে পড়বার মত আর্থিক অবস্থা ছিল না কিন্তু যেটা ছিল তা হল প্রবল আগ্রহ। তার মনে যেসব প্রশ্ন আছে তার যৌক্তিক উত্তর খুঁজে পেতে হবে। তাই পড়ার এই প্রবল ইচ্ছা প্রথমদিকে তিনি মিটিয়েছেন অন্যের পুরাতন বই চেয়ে নিয়ে। এ সম্পর্কে তিনি তার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন— 'বই কেনার সম্বল নেই বলে এপাড়া ওপাড়ার ছেলেদের পরিত্যক্ত ছেঁড়া বই সংগ্রহ করে পড়তে লাগলাম, পড়তে লাগলাম— পথে পড়ে থাকা টুকরো কাগজ কুড়িয়ে, এমন কি লবণ বাঁধা ঠোঙ্গার কাগজও। কোনরূপ লেখা থাকলেই তা হত আমার পাঠ্য।'[১৪]

বরিশালের বিভিন্ন লাইব্রেরি ঘুরে ঘুরে বই পড়তে থাকেন। এসময় তার পরিচয় হয় বি.এম. কলেজের অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির ও ব্যাপটিস্ট মিশন লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান মি. মরিসের সাথে। তারাও তাকে বিভিন্ন বই দিয়ে সহযোগিতা করেন। অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেব তো তাকে মৌখিকভাবেও বিভিন্ন বিষয় বুঝিয়েছেন। এভাবেই ধীরে ধীরে তিনি ব্যক্তিগত লাইব্রেরি গড়ে তুলতে আগ্রহী হন। প্রবল আগ্রহ নিয়ে বই সংগ্রহ করেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন একটি লাইব্রেরি'। 'দীর্ঘ একুশ বছর আপন কায়িক পরিশ্রমে ক্রমে সঞ্চিত অর্থে শুধুমাত্র বই রাখার জন্যই মজবুত দালান ঘর বানিয়েছিলেন। ১৩৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একটি শুধুমাত্র বই সাজানোর ঘর— আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী।'[১৫]

নির্ভেজাল, নির্ঝঞ্জাট এক পারিবারিক আবহ ছিল আরজ আলীর জীবনে। আরজ আলী মূলত কৃষিজীবী ছিলেন। তবে কৃষিকাজের ফাঁকে ফাঁকে জমি জরিপের কাজ শিখে ফেলেন। এই কাজের প্রতি তার আগ্রহ বাড়তে থাকলে এটিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। দ্রুতই বরিশাল অঞ্চলে তার পরিচিতি বাড়তে থাকে। এই পরিচিতির দরুণ তার কাজও বাড়তে থাকে এবং অর্থ উপার্জনও বাড়ে। তাতে করে তার পরিবার স্বচ্ছলভাবে দিন অতিবাহিত করতে পেরেছে। আরজ আলী মাতুব্বর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও এই পেশাতেই নিয়োজিত ছিলেন।

পাঠের অভ্যাস তাঁর যেমন তার চেয়ে অধিক তাঁর প্রশ্ন করার অভ্যাস। গ্রামের সকলে তার প্রশ্নের ভয়ে থাকতেন এবং প্রশ্নের সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত যুক্তি দিয়ে তর্ক চালিয়ে যেতেন। পরিণত বয়সে এসে তিনি তার এই প্রশ্নগুলিকে লিখিত রূপ দিলেন। প্রশ্নের বিশ্লেষণগুলো আরো যুক্তিগ্রাহ্যতায় প্রসারিত করতে সচেষ্ট হলেন। প্রকাশিত হলো আরজের এক নতুন সত্তা-লেখক-সত্তা। 'জীবনের বাস্তবতা থেকে অর্জিত এতটা সময় পরিসরের মধ্যে জমে ওঠা জিজ্ঞাসার এই পাণ্ডুলিপির মাধ্যমেই মাতুব্বরের সাহিত্যকর্মের সূচনা।'[১৬] তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল, উপস্থাপন সহজ-সরল, অতি প্রচলিত শব্দচয়ন তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা *সত্যের সন্ধানে (১৯৭৩)*, *সৃষ্টির রহস্য* (১৯৭৭), *অনুমান* (১৯৮৩) ইত্যাদি। তাঁর এই রচনাসমূহের প্রকাশ এত সহজ ছিল না। পাকিস্তানি সরকার তার লেখালেখি এমনকি কথা বলার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। সে সময় পাকিস্তান সরকারের স্থানীয় প্রশাসন তার গ্রন্থপ্রকাশ বন্ধ করে দেন এবং তা বলবৎ থাকে এদেশে পাকিস্তান সরকারের মৃত্যু পর্যন্ত।'[১৭] আরজ আলী মাতুব্বর প্রবল মনোবল এবং দৃঢ়চেতা মনের অধিকারী ছিলেন। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নিজের পথ তৈরি করে নিয়েছেন। তাঁর সত্য অনুসন্ধানী মন নিয়ে সবসময় সংকল্পে অটল থেকেছেন। নিজের আদর্শিক অবস্থান থেকে কখনো বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হননি। সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে এক চারিত্রিক মাহাত্ম্য অর্জন করেছিলেন।

আরজ আলী মাতুব্বর আমৃত্যু সনাতন সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে গেছেন। তিনি প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে, মানুষের অন্ধত্বের বিরুদ্ধে, কল্পকাহিনীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন করেছেন। যৌক্তিক, বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দিলে মেনে নিয়েছেন, উত্তর না মিললে পূর্বাপর অনুসন্ধান করে গেছেন। তিনি "ভিখারীর আত্মকাহিনী"তে উল্লেখ করেছেন:

> মন তার নিজ গরজে বা সখ করে অথবা খাম খেয়ালী রূপে কোন কিছু বিশ্বাস করে না, করতে পারে না। বিশ্বাস্য বিষয়টি যুক্তির সাহায্যে চেপে ধরে মনকে তা বিশ্বাস করায়। এছাড়া এক ধরনের বিশ্বাস আছে যাকে বলে 'অন্ধ বিশ্বাস', এতে কোন যুক্তি তর্কের বালাই নেই। আমার মন হল যুক্তিনির্ভর বিশ্বাসে বিশ্বাসী। নানাবিধ সমস্যার সমাধান যুক্তিভিত্তিক সমাধানসমূহ আমার মনোপূত হচ্ছিল। তাই ক্রমে আমি হয়ে উঠলাম যুক্তিবাদী।[১৮]

এই যুক্তিবাদী, নিভৃতচারী দার্শনিককে এদেশের বিদগ্ধজনেরা প্রথম চিনতে শুরু করে *সত্যের সন্ধানে* প্রকাশিত হবার পর। তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য অর্থ নয়, পরিচিতি নয়, একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানবসমাজের কল্যাণ। তিনি যা উদ্‌ঘাটন করেছেন তা যদি উত্তর প্রজন্মকে না দেওয়া যায় তবে সে সত্যসন্ধান বৃথা বলে তিনি মনে করেন। আর সেটি হবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় পাপ। তাই সে সকল বাধা, সরকারের নিষেধ উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বইটি প্রকাশ করে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আরজ আলী সম্পর্কে মন্তব্য করেন:

> তার বইয়ের প্রচ্ছদের ছবি আছে, যে প্রচ্ছদ তিনি নিজে এঁকেছেন। অন্ধকার আছে, কিন্তু তাকে মেনে নিচ্ছে না, প্রদীপের আলো যে জ্বেলেছেন তা নয়, টর্চের আলো ফেলেছেন। তাতে অন্ধকার যে পালিয়ে গেছে তা নয়। অন্ধকার রয়ে গেছে। কিন্তু একটা এলাকা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এইটেই তার কাজ। সবটা পারা যাবে না, যতটা পারা যায় আলো ফেলা, পরিষ্কার করা।[১৯]

এই উক্তি আরজ আলী মাতুব্বর সম্পর্কে আমাদের জানায় যে, তাঁর কার্যক্রমসমূহ নিজের জন্য ছিল না, সামগ্রিক সামাজের কল্যাণের জন্য ছিল। তিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন সমাজের অসংগতি; দূর করতে চেয়েছেন অন্ধবিশ্বাস আর অযৌক্তিক কল্প-কাহিনীতে ভর করে গড়ে ওঠে ধর্মান্ধতা। এই নিয়েই যুদ্ধ করে গেছেন আমৃত্যু। এ ভূমিকে ভালোবেসে, ভূমির মানুষদের ভালোবেসেই কাজ করে গেছেন সারাজীবন। এই মানুষটি সারা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়েছেন গরীব-দুঃস্থদের শিক্ষাবৃত্তির জন্য। গ্রামের

স্বশিক্ষিত, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক এই কৃষক জনকল্যাণে নিজের যাবতীয় সম্পত্তি তো বটেই, মৃত্যুর পর নিজের চোখ এবং মরদেহ দান করেছেন বরিশাল মেডিকেল কলেজে। যাতে তার দেহকে কাজে লাগিয়ে শৈল্যবিদ্যার্থীরা গবেষণা করতে পারে, শিখতে পারে। যে শিক্ষা তারা কাজে লাগাবে সাধারণের ক্ষেত্রে। 'একাশি বছরের বৃদ্ধ আরজ আলী মাতুব্বর এক দলিল সম্পাদন করিয়া মৃত্যুর পর চক্ষু ব্যাংকে তাঁহার চক্ষু দুইটি দান এবং বরিশাল মেডিকেল কলেজের জন্য মরদেহ দানের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করিয়া ব্যতিক্রমধর্মী ও সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়াছেন।'[২০] বেশ কিছু সম্মাননা তিনি পেয়েছিলেন। হুমায়ুন স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৮), উদীচী-বরিশাল শাখার পক্ষ থেকে সম্মাননা (১৯৮২), বাংলা একাডেমী সম্মাননা (১৯৮৫) ইত্যাদি। এই মহতী ব্যক্তিত্ব ১৯৮৫ সালে দেহ ত্যাগ করেন।

বৈচিত্র্যময় জীবন আখ্যানের অধিকারী কালোত্তীর্ণ দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর। পাশ্চাত্যের সক্রেটিস, গ্যালিলিওর মতো এই প্রাচ্যভূমিতে জন্ম হয়েছিল আরজ আলী মাতুব্বরের। বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী দার্শনিক হিসেবে তিনি এই উপমহাদেশে সুপরিচিত। তাঁর চিন্তা-চেতনা, দর্শন, শিল্প-সাহিত্যের চর্চা বিস্তর। আর সে জন্যই জীবনী-নাটক রচনার ধারাবাহিকতায় নাট্যকার মাসুম রেজা চরিত্র হিসেবে আরজ আলী মাতুব্বরকে বেছে নিয়েছেন। তাঁর জীবনাচরণকে রূপ দিয়েছেন নাটকে। নাটক *আরজ চরিতামৃত* (১৯৯৯)।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু-হত্যার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে। স্বাধীন হয়েও যেন স্বাধীন হতে পারল না বাংলার মানুষ। ধর্মব্যবসায়ীদের কাছে কুক্ষিগত হলো ক্ষমতা। মুক্তচিন্তা-মুক্তবুদ্ধির চর্চা ব্যহত হয়। এমন আচ্ছন্ন সময়ে আরজ আলী মাতুব্বরের মতো বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির জীবনীভিত্তিক সাহিত্য রচনা যেন সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর জীবনী নিয়ে ১৯৯৪ সালে নাট্যকার মাসুম রেজা নাটকটি রচনায় ব্রতী হন। 'টাঙ্গাইলের এক নিভৃত গ্রামে আরজ আলীর গ্রন্থ পাঠের অপরাধে এক যুবককে নির্বাসিত হতে হয়েছিল যে সময়ে সেই সময়ে মাতুব্বরকে নিয়ে নাটক মঞ্চায়ন কিছুটা দুঃসাহসের বিষয়ই ছিল।'[২১]

নাট্যকার নাটকের নাট্যঘটনা নির্মাণ করেছেন আরজ আলীর জীবনী নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করে। *আরজ চরিতামৃত* নাটকটির ঘটনা বা কাহিনী বিনির্মাণ হয়েছে সম্পূর্ণ সত্যকে অবলম্বন করে। এখানে কল্পাশ্রিত ঘটনাকে নাট্যকার স্থান দেন নি। নাটকটির শুরুতেই দেখা যায় সূত্রধর আরজের জিজ্ঞাসু বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে দিতে প্রারম্ভ করছেন এবং তাতে তার সঙ্গী হিসেবে আছে কোরাস দল। এরপর নাট্যকার মূল কাহিনী নির্মাণে অগ্রসর হয়েছেন। ভাবুক আরজের খোঁজে বন্ধু রজব আসে। তার সাথে চলে তার ঘুড়ি ওড়ানো দেখার আনন্দ ও স্বপ্ন বুননের গল্পকথা। এরপর করিম, শরিয়ত, তালেব চরিত্রের অবতারণা করেছেন। যেখানে করিম গ্রামে সবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে পাঠশালা খুলেছে তাই ছাত্র জোগাড় করছে। এ কথা শুনতেই তালেব ও শরিয়ত তাকে বিভিন্ন জ্ঞান দিতে শুরু করে।

> **শরিয়ত :** রাখো তোমার কলেরা। বলা নাই কওয়া নাই একটা লোক আচুক্কা মইরা যাবে কেন? তার যদি বড় পাপ না থাকে। তোমার মক্তবে কিন্তু আরবিকে বড় তমিজের সাথে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখবা। আরবি ছাড়া গোর আজাব মাফ পাবা না। মৃত্যুর পর বাংলা কও, ইংরেজি কও সব ভাষায় আরবি হইয়া যাবে।[২২]

এরপর নাট্যকার আরজের শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত করেন। তার পড়ার প্রতি আগ্রহ দেখে তাদের জ্ঞাতি চাচা মহব্বত তাকে প্রথম আদর্শলিপি বই কিনে দেন। আর লেখার কাগজের অভাবে লেখার অনুশীলন চলতে থাকে কলার পাতায়। আরজের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রশ্নও বেড়ে চলে। যেমন তেমন উত্তরে তার মন ভরে না, তার চাই যুক্তিনিষ্ঠ উত্তর। এভাবে দেখা যায় আরজ দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিয়ে বড় হচ্ছে কিন্তু তার সৃষ্টিশীল কর্ম বা চিন্তা (যেমন: ঘুড়ি তৈরি, জলের কল তৈরি ইত্যাদি) কোনটিই বন্ধ থাকে না। অর্থাভাবে একসময় তার পাঠশালার শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায় তখন সে নিজে নিজে বই পড়ার অভ্যাস শুরু করে। সে যেন

স্বচ্ছন্দে বাংলা পড়তে পারে তাই সে পুঁথিপাঠের দলে যোগ দেয়। সেখান থেকে অর্থ আয়ের সাথে সাথে পড়ার চর্চাও চলতে থাকে। এভাবে কাহিনী এগুতে থাকে তারপর আরজ আলীর মাতা লবেজান তার বিবাহ দেন।

পেশা হিসেবে 'আমিন' পেশা বেছে নিয়েছেন। কাহিনীর এক পর্যায়ে এসে দেখা যায় তার জ্ঞান চর্চা ও সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তাকে বিপদগ্রস্ত করে তুলছে। গ্রামের ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা ক্ষেপে ওঠে তার বিরুদ্ধে। তাকে বিভিন্নভাবে শায়েস্তার পথ অনুসন্ধান করে। তাকে পুলিশের ভয় দেখায়, হাজত বাসও করায়। এভাবেই ধীরে ধীরে এগুতে থাকে নাটকের কাহিনী। জীবনী-নাটকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, এই নাটকের সব ঘটনাই আরজ আলী মাতুব্বরের জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে। বরং গল্পের ছন্দ ঠিক রাখতে অনেক শাখা কাহিনী নাট্যকার মুন্সিয়ানার সাথে বাদ দিয়েছে।

জীবনীভিত্তিক নাটকের চরিত্রসমূহ হতে হয় সত্য চরিত্র। নাট্যকার নাট্যঘটনাকে দৃঢ় করতে দু একটি কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা করতে পারেন তবে তা কখনোই মুখ্য নয়। সেটি অবশ্যই হতে হবে গৌণ চরিত্র। *আরজ চরিতামৃত* নাটকে যে সমস্ত চরিত্র উঠে এসেছে তার সবগুলোর অস্তিত্ব ইতিহাসে বিদ্যমান। নাট্যঘটনাকে নাটকীয় করে উপস্থাপনের লক্ষে তিনি এখানে সূত্রধর, কোরাস, মুখোশধারী চরিত্রকে সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া, আরজ আলী, তার মা লবেজান, দুলাভাই হামেদ, জ্ঞাতি চাচা মহব্বত, আরজের স্ত্রী লালমননেছা, বন্ধু রজব, গ্রামের দফাদার চিন্তাপতি, নকাই, করিম, শরিয়ত, তালেব প্রমুখ সকল চরিত্রের বাস্তব ভিত্তি আরজ আলীর জীবনে আছে। তাঁর জীবনীগ্রন্থেও চরিত্রগুলোর উল্লেখ করা আছে। *আরজ চরিতামৃত* নাটকের চরিত্রসংখ্যা ৩২। মঞ্চে প্রবেশানুক্রমে– ১. সূত্রধর ২. কোরাস ৩. আরজ ৪. গায়েন ৫. রজব ৬ নকাই ৭. করিম ৮. শরিয়ত ৯. তালেব ১০ লবেজান ১১. মহব্বত ১২. হামেদ ১২. চিন্তাপতি ১৪. তালেবুল ১৫. নুরজাহান ১৬. রহিম ১৭. লালমন ১৮. সূর্যমনি ১৯. জাহান ২০. মৃধা ২১. স্ত্রী ২২. ফারাজি ২৩. আজমত ২৪. মুন্সি ২৫. ফজলু ২৬. মেঝ দারোগা ২৭. সেপাই ২৮. এসপি ২৯. কাজী ৩০. জব্বার ৩১. যুবক ৩২. কাদের। অনেকগুলো চরিত্রের উপস্থিতি থাকলেও এখানে মুখ্য চরিত্র হল আরজ আলী। তার জীবনকে যৌক্তিক, সময় পরম্পরায় এবং ঘটনাক্রম অনুযায়ী উপস্থাপনের জন্য যেসব আনুষঙ্গিক চরিত্রের প্রয়োজন হয়েছে নাট্যকার সেসব চরিত্রকেই এখানে এনেছেন। তবে অনুষঙ্গ চরিত্রগুলির মধ্যে কেউই আরজকে ছাপিয়ে যায় নি বরং তাকে তার চরিত্রকে মহিয়ান করতে সহায়ক হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে আরজ আলী মাতুব্বর দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন প্রণয়াসক্ত হয়ে। জীবনী-নাটকে সাধারণত এ জাতীয় পর্বকে উপেক্ষা করা হয় না। একটি ঘটনা ও চরিত্র নাট্যকার মাসুম রেজা করেন নি কোথাও। নাটকে উপস্থিত চরিত্রগুলির বাস্তবভিত্তি প্রমাণ করে যে নাট্যকার আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনীকে পর্যালোচনা করেই নাটকীয় রূপদান করেছেন। এই নাটকের মুখ্য চরিত্র আরজ আলী। নাট্যকার এই নাটকে ব্যক্তি আরজ ও দার্শনিক আরজ দুইরূপে সমানভাবে অঙ্কিত করেছেন। জীবনের উত্থান-পতনে কী দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন তাই ছিল এই নাটকে আরজ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার পারিবারিক রূপ, সামাজিক সম্পর্ক, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম-আকাতরে যেন মিশেছে এই চরিত্রে। আর নাট্যকার এখানেই চরিত্র রূপায়ণে সার্থক হয়েছেন।

দ্বন্দ্ব হল নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাঠককে নাটকের প্রতি আকর্ষিত করতে নাট্যকারের অন্যতম হাতিয়ার হল নাট্যদ্বন্দ্ব নির্মাণ। নাট্যদ্বন্দ্ব নাট্যকার তৈরি করে থাকেন কাহিনীর বিন্যাসের মাধ্যমে, চরিত্রের উত্থান পতনের মাধ্যমে। *আরজ চরিতামৃত* নাটকে নাট্যকার বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়েই নাট্যদ্বন্দ্ব তৈরিতে আগ্রহ দেখিয়েছেন বলেই মনে হয়। কারণ তিনি ঘটনার বাঁক নিতে চরিত্রগুলোই ব্যবহার করছেন। যেমন মৃধা তাকে ভয়-ভীতি দেখানোর উদ্দেশ্যে মেজো দারোগা ও সেপাইকে নিয়ে আসে এবং এতে করে আরজের জীবনে এক নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারে তাকে দমাতেই এই অপচেষ্টা এবং তাকে একরকম হাজত বাস করতে হয়। পরে মুচলেকার বিনিময়ে ছাড়া পান তিনি। এই নাট্যঘটনা এক

চমক সৃষ্টির প্রয়াস। একঘেঁয়েমি কাটিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় নাট্যকার মেজো দারোগা, সেপাই, মুন্সি প্রভৃতি চরিত্রকে ব্যবহার করেছেন। আরজ আলীর জীবনকাহিনী নানা দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হয়েছে। দীর্ঘ এক জীবনের দ্বান্দ্বিকতাকে ছোট একটি ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলা যোগ্যতার বিষয়ই বটে। নাট্যকার সেটি প্রমাণ করতে পেরেছেন নিঃসন্দেহে।

নাট্যবিচারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল Climax বা চূড়াস্পর্শী নাট্যদ্বন্দ্ব। অর্থাৎ এই বিন্দুতে এসে নাটক সর্বোচ্চ উত্তেজনায় পৌঁছায়। চরিত্র তার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটায়, নাট্যকাহিনী অনুভূতির শীর্ষচূড়ায় অবস্থান করে, ভাষা-ছন্দ-লয়ে যেন সর্বোচ্চ গতিতে থাকে। এমন টানটান উত্তেজনার পূর্ণ মুহূর্তকে Climax বলা হয়ে থাকে। এটিই নাটকের মহামুহূর্ত। এরপর থেকেই মূলত নাটক পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। যে নাটকে নাট্যকার Claimax সৃষ্টি করতে পারেন না তা সার্থক নাটক হয় না। *আরজ চরিতামৃত* নাটকে নাট্যকার যর্থাথরূপেই এটি তৈরি করেছেন। আরজের বাল্যকাল, পড়ালেখা, কর্মজীবন, পারিবারিক জীবন, জ্ঞান চর্চা, তার গ্রামের মঙ্গলার্থে লাইব্রেরি নির্মাণ, সাহিত্য রচনা এমন ঘটনাপরম্পরায় নাট্যকার আলোচ্য নাটকের কাহিনী এগিয়ে নিয়েছেন। এমতাবস্থায়, *আরজ চরিতামৃত* নাটকটি ক্লাইমেক্সে পৌঁছায় যখন আরজ আলী তার প্রথম বই *সত্যের সন্ধানে* প্রকাশের চেষ্টা করেন। তখন নাট্যঘটনা চরম উত্তেজনায় পৌঁছায়। আরজ যখন ছাপার কাজ শুরু করেন তখন দেখা যায় যে, কিছু যুবক এসে ছাপার কাজে বাধা দেয়। তখন আরজ আলীর সাথে তাদের তর্কের সৃষ্টি হয় এবং এক পর্যায়ে তারা আরজ আলীকে মারধর শুরু করে।

> **আরজ :** আইন ছাড়া একটা কিছু বন্ধ রাখতে বললেই বন্ধ রাখতে হবে।
>
> **যুবক ১ :** হবে, হবে, (গলা চেপে ধরে) হবে। না হলে তোমারে চলে যেতে হবে জাহান্নামে। বল ফরায়াজের কাজ ভিন্ন অন্য কিছু করবো না। কোন বই পড়বো না লিখবো না। যতক্ষণ না বলবি তোর মুক্তি নাই। এইভাবেই মরে যেতে হবে তোরে।[২৩]

এই যে হঠাৎ কিছু চরিত্রের আক্রমণ এটিই পাঠক মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কী হয়, কী হবে এক দারুণ দোলাচলে ফেলে দেন নাট্যকার। এখানেই নাটকটি চরম উত্তেজনাকর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এরপর থেকে নাটকটিকে তিনি পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন।

প্রত্যেক নাটকই নাট্যকার রচনা করেন বেশ কিছু দর্শনকে মাথায় রেখে। নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার তার দর্শন, চিন্তা, জীবনবোধকে পাঠকের মাঝে সঞ্চারিত করেন। *আরজ চরিতামৃত*ও এর ব্যতিক্রম নয়। এই নাটকের ক্ষেত্রে পাঠক ও দর্শকের দুটি দর্শনের বোধে জারিত হন। একটি হলো আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শন, অন্যটি হলো নাট্যকারের দর্শন। এই নাটকের নাট্যকার আরজের দার্শনিক দিকটিই বেশি উন্মোচিত করেছেন। আরজর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কৌতুহলী মানুষের জীবন, সৃষ্টিশীল আরজ, পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল আরজকে প্রকাশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন একজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীন মানুষ কীভাবে নিজেকে স্বশিক্ষিত করতে পারেন এবং চিন্তার একাগ্রতা মানুষকে কোথায় পৌঁছে দিতে পারে। আরো স্পষ্ট হয়েছে বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদিতা, সহনশীলতা সমাজের কত কূপমণ্ডুকতা ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারে। নাট্যকার এ নাটকে সমাজের যে অন্ধকার দিকটি তুলে এনেছেন এবং তার দূর করার জন্য আরজ আলীর যে প্রয়াস তিনি বর্ণনা করেছেন তাই মূলত আরজ দর্শনরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্ধ সংস্কারের বাস্তবতা যে আজও সমাজের অস্থিমজ্জায় ঢুকে আছে তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিপরীত স্রোতের মাধ্যমে সমাজকে ও বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকে, যুক্তি ও প্রগতিবাদিতাকে আরজকথায় প্রতিষ্ঠিত করেছেনে নাট্যকার। অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্বাস ও যুক্তিই হতে পাওে মানবজীবনের মুক্তির পথ– এই দর্শন-ই *আরজ চরিতামৃত* নাটকের নিগূঢ় সত্য।

নাটকটি বর্ণনাত্মক ও সংলাপধর্মী এ যুগপৎ ধারায় রচিত। একদিকে বর্ণনার ক্ষেত্রে সূত্রধর, গায়েন, কোরাস ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন আর অন্যদিকে বাকি চরিত্রগুলোকে সংলাপধর্মী করে গড়ে তুলেছেন। এ থেকে স্পষ্ট যে, নাট্যকার নাটকটিকে সার্বজনীন করার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গীতের প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কাহিনীর যোগসূত্র, সময়ের ব্যবধান, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ইত্যাদি প্রকাশের জন্য নাট্যকার এ সঙ্গীতের সুনিপুণ প্রয়োগ করেছেন। আরজের মরণোত্তর দেহদানের ওছিয়তনামার মধ্যে দিয়ে নাটকটি শেষ করেছেন। হয়ত সাধারণ কেউ হলে মৃত্যুকে টেনে আনতেন। এখানেই নাট্যকারের অসাধারণত্ব। তিনি আরজের মৃত্যু দেখান নি। কারণ আরজ আলীরা মরে না। এরা সময়ের স্রোতের মতো কালান্তরে ভেসে চলে। যুগেযুগে এরা নতুনরূপে আবির্ভূত হয়। আরজ আলী মাতুব্বর দেহ রাখতেন পারেন, মরতে পারেন না। তিনি সদাজীবিত আছেন তার লেখায়, দর্শনে, বোধে, একাগ্রতায়, সংগ্রামে। প্রতিনিয়ত স্ববোধে শাণিত করছে আমাদের। এই বোধ-ই চিরজাগ্রত হয়ে আছে পাঠক ও দর্শক মনে। আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনে সবচেয়ে বড় দর্শন হল একই বিষয়ের দুটি সত্য থাকতে পারে না। একটি বিষয়ের একটিই সত্য। তা সময়ের সাথে পরিবর্তন হতে পারে। তবে সে সত্য হতে হবে বিজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য। ফলে তিনি হয়ে উঠেছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। আর এই অনিবার্য সত্যকেই নাট্যকার আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনীভিত্তিক নাটক রচনা মধ্যে দিয়ে পাঠক মনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

সমকালে জীবনী-নাটকের গুরুত্ব বেড়েছে। জাতীয় চেতনা সৃজনে দৃষ্টান্তরূপে কোনো কোনো মানুষের জীবনী সহায়ক ভূমিকা পালন করে। গণমানুষের কাছে চেতনার নায়কদের জীবনচরিত দৃশ্যমান হলে তার প্রভাব পড়ে জনমানসে। তাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিনের অন্ধসংস্কারের বাস্তবতা থেকে মুক্তির নিশানা অন্বেষণ না করলে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়ই পশ্চাৎপদ হয়। এমন ভাবনার তলদেশ থেকেই বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় মামুনুর রশীদ, মাসুম রেজা, শাকুর মজিদ, অনন্ত হীরা প্রমুখ এমন নাটক রচনায় ও পরিবেশনায় অধিক তৎপর। নাটক যেহেতু দৃশ্যশিল্প সেহেতু সাহিত্যপাঠের পাশাপাশি তা মঞ্চের দাবি রাখে। যান্ত্রিক জীবন-বাস্তবতায় দৃশ্যশিল্পে মানুষের আগ্রহ বেশি। আর দৃশ্যশিল্পরূপে নাটক গণমানুষের মধ্যে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সে প্রয়োজনেই সাহিত্য থেকে মঞ্চে রূপায়ণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাট্যকারগণ। জীবনীভিত্তিক রচিত নাটকসমূহ পাঠ করে চেতনায় এক ধরনের বোধ জাগে। একইসঙ্গে নাটকটি মঞ্চায়িত হলে সে বোধে শাণ দেয়ার কাজটি হয়ে যায়। বলাবাহুল্য বাংলাদেশের জীবনী-নাটকগুলো মঞ্চে এসেছে সদর্পে। প্রসঙ্গত বলা দরকার এ প্রবন্ধটি সাহিত্যবিচেনায় বিবেচিত, পরবর্তী ভাবনা হলো মঞ্চমূল্য। নাটকের ক্ষেত্রে সাহিত্য পূর্ণতা পায় মঞ্চে উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের মঞ্চনাট্যচর্চায় জীবনী-নাটকের সংখ্যা কম নয়। এ ধারাটি এ সময়ে গ্রহণীয় ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সমকালীন বাংলাদেশেন মূল্যবোধের ঘাটতি বেড়েছে; বেড়েছে অন্ধত্ব, অবিশ্বাস ও প্রতিক্রিয়াশীলতা। রাষ্ট্র ও সমাজদেহে তা এক ধরনের ক্ষতের জন্ম দিয়েছে। এ সময়ে প্রগতির ধারায় চেতনা শাণিত করা জরুরি। ফলে জাতীয় চেতনা সৃষ্টিতে এমন মানুষের জীবনচরিত দৃষ্টান্তরূপে আনা জরুরি। ফলে আরজ চরিতামৃত নাটকের প্রয়োগ সাহিত্যে ও মঞ্চ উভয়ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বলতে দ্বিধা নেই, যুক্তি-বুদ্ধির বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন বিবেচনায় মাসুম রেজার *আরজ চরিতামৃত* অগ্রগণ্য ভূমিকায় মান্যতা পাবার দাবি রাখে।

তথ্যনির্দেশ

[১] মামুনুর রশীদ, *আরজ চরিত্রামৃত*, (ঢাকা: যুক্ত, ২০১৩), পৃ. ভূমিকা ৭-৮

২ https://enm.wikipedia.orgwiki/Biography 11/01/2020, 7.54

৩ www://en.m.wikipedia-org/wiki/Autobiography,12.10am.12.01.2020

৪ কমল সাহা, "চরিত-নাটক", *বহুরূপী*, প্রভাত কুমার দাস (সম্পাদিত), (কলকাতা: ৭ লোয়ার রেঞ্জ, ২০১৭), পৃ. ৪২২

৫ জিয়া হায়দার, *থিয়েটারের কথা* (প্রথম খণ্ড), (ঢাকা: পড়ুয়া, ২০০৮), পৃ. ২৭

৬ ড. দূর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ব বিচার*, (কলকাতা: মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ভাদ্র-১৪০১), পৃ. ২৫৬

৭ শম্পা ভট্টাচার্য, "অথ চরিতকথা", *বহুরূপী*, প্রভাত কুমার দাস (সম্পাদিত), (কলকাতা: ৭ লোয়ার বেঞ্চ, ২০১৭), পৃ. ৩৯৫

৮ তদেব, পৃ. ৩৯৬

৯ উদ্ধৃত, ড. দূর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ব বিচার*, (কলকাতা: মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ভাদ্র-১৪০১), পৃ. ২৫৬

১০ শম্পা ভট্টাচার্য, "অথ চরিতকথা", *বহুরূপী*, প্রভাত কুমার দাস (সম্পাদিত), (কলকাতা: ৭ লোয়ার বেঞ্চ, ২০১৭), পৃ. ৩৯৭

১১ কমল সাহা, "চরিত-নাটক", *বহুরূপী*, প্রভাত কুমার দাস (সম্পাদিত), (কলকাতা: ৭ লোয়ার রেঞ্জ, ২০১৭), পৃ. ৪২২

১২ হিমাদ্রি মন্ডল, "ব্যক্তির দুইরূপ: রামমোহনের জীবন ও রামমোহন নাটক", *বহুরূপী*, প্রভাতকুমার দাস (সম্পাদিত), (কলকাতা: ৭ লোয়ার রেঞ্জ, ২০১৭), পৃ. ৪১০

১৩ আরজ আলী মাতুব্বর, *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-৩*, (ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ১৯৯৭), পৃ. ৪৬

১৪ আইয়ুব হোসেন, *জীবনী গ্রন্থমালা আরজ আলী মাতুব্বর*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ১৩

১৫ তদেব, পৃ. ২০

১৬ তদেব, পৃ. ৩৯

১৭ আরজ আলী মাতুব্বর, *মুক্ত-মন*, (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী), পৃ. ১১

১৮ আরজ আলী মাতুব্বর, *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-৩*, (ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ১৯৯৭), পৃ. ৮৩

১৯ আরজ আলী মাতুব্বর *স্মারক গ্রন্থ*, (সম্পাদক মোজাফফর হোসেন), (ঢাকা: বিজ্ঞান পরিষদ, ২০০১), পৃ. ৪৩-৪৪

২০ আরজ আলী মাতুব্বর, *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, (ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০১২), পৃ. ২০৭

২১ মাসুম রেজা, *আরজ চরিতমৃত*, (ঢাকা: যুক্ত, ২০১৩), পৃ. ১০

২২ তদেব, পৃ. ১৮

২৩ মাসুম রেজা, *আরজ চরিতমৃত*, (ঢাকা: যুক্ত, ২০১৩), পৃ. ১০১-১০২

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

গম্ভীরা উৎসবের নাট্যিক পরিবেশনা: ছদ্মবেশী

মুহম্মদ আলমগীর পিএইচডি*

Abstract: The popular *Gambhira* song of Maldah of West Bengal (India) and Chapai Nawabganj of Bangladesh has attained a significant place in the rich heritage of Bengali drama. In the Maldah region it is used as a kind of performance, in the form of *Chadmabeshi*, to observe *Caitra Sankranti* (the last day of Bengali year and the beginning of the new year). It is related to the life of *Shiva*. The background, subject matter, characteristics and intention of the concerned people expressed through the ritualishtic performance of *Chadmabeshi* have added a distinct dimenssion to the already rich tradition of Bengali drama. The relation between *Chadmabeshi* and the *Shiva* festival of *Caitra Sangkranti* and related subject matters to it are discussed in this paper.

ভূমিকা

সাধারণভাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ এবং বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলের জনপ্রিয় একটি ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিক 'গম্ভীরা।'[১] বিশেষভাবে মালদহ অঞ্চলে চৈত্রসংক্রান্তির আগে ও পরে শিবকেন্দ্রিক যে ধর্মীয় উৎসব পালিত হয় তাই গম্ভীরা। গম্ভীরা উৎসব প্রধানত চার দিনের। তবে একদিন থেকে সাতদিন পর্যন্ত এ পূজা ও উৎসবের প্রচলন লক্ষ করা যায়।[২] আদ্যের গম্ভীরার লেখক হরিদাস পালিত প্রদত্ত গম্ভীরা উৎসবের সূচি এরূপ- ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০শে চৈত্র যথাক্রমে 'ঘটভরা', 'ছোট তামাসা', 'বড় তামাসা', 'আহারা' ও 'চড়ক পূজা।' তবে চৈত্রমাস ৩১ তারিখের হলে উৎসবের সূচি একদিন পিছিয়ে ২৭ তারিখ থেকে শুরু হয়।[৩] উক্ত উৎসবের ধারাবাহিকতায় মালদহ জেলার মালদহ থানার (যা পুরাতন মালদহ নামে পরিচিত) পুরাতন মালদহ পৌরসভার ৩, ৪, ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ শে বৈশাখ ও ০১ লা জ্যৈষ্ঠ (অথবা তার অনতি পরে যে কোনো একদিন) মোট ০৫ দিন গম্ভীরা উৎসব পালিত হয়।[৪] পাঁচদিন ব্যাপী এই উৎসবের চতুর্থদিন (আহারা) অর্থাৎ-৩১শে বৈশাখ বিকাল ৫-৬টা (সন্ধ্যার প্রাক্কাল হতে) রাত ৮-৯ টা পর্যন্ত শোভাযাত্রাসহ সঙ জাতীয় যে গান-বাদ্য-অভিনয়াদি হয়ে থাকে তাকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় 'ছদ্মবেশী।'[৫] ছদ্মবেশী শেষে রাত ১০ টার পর শুরু হয় গম্ভীরা নাচ ও গম্ভীরা সঙ্গীত। ছদ্মবেশীতে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ বিভিন্ন বেশ ধারণ করে পৌরাণিক-ঐতিহাসিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ইত্যাদি বিষয়কে উপজীব্য করে কখনো নির্বাক কখনো বা সবাক অভিনয়ের মাধ্যমে খণ্ড খণ্ড নাট্য পরিবেশন করে। প্রদ্যোত ঘোষ, শচীকান্ত দাস প্রমুখ গম্ভীরা গবেষকগণ এই পরিবেশনাকে 'As you like' অভিধায় অভিহিত করেছেন।[৬] অন্যদিকে গম্ভীরা গবেষক পুষ্পজিৎ রায় স্থানীয় জনমতকে প্রাধান্য দিয়ে এই পরিবেশনাকে 'ছদ্মবেশী' অভিধা প্রদানে আগ্রহী-যা যথার্থ ও যৌক্তিক।[৭] গম্ভীরা উৎসবের ছদ্মবেশী পরিবেশনার উক্ত প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিকভাবেই অনুসন্ধিৎসু মনে বেশ কিছু প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন: 'ছদ্মবেশী' গম্ভীরা উৎসবের কোন অঙ্গের রূপান্তর? ছদ্মবেশী পরিবেশনার সঙ্গে যুক্ত পাণ্ডুলিপি, মঞ্চ, প্রপস, পোশাক পরিকল্পনা, সেট, মেকআপ, আলো ইত্যাদির প্রকৃতি কেমন? একটি বিশেষ অঞ্চলে ছদ্মবেশী প্রচলনের কারণ কী? ছদ্মবেশীর আকর্ষণ ও জনপ্রিয়তার কারণ কী? ইত্যাদি। গম্ভীরা উৎসবের গবেষণার ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে সার্বিক কোনো পর্যালোচনা পরিলক্ষিত হয় না। সংগত কারণে বিষয়টি আলোচনার অপেক্ষা রাখে এবং ক্ষেত্রসমীক্ষণের মাধ্যমে গম্ভীরা উৎসবের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণকৃত প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে উক্ত জিজ্ঞাসাসমূহের জবাব আলোচ্য প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ধর্মীয়ভাবে পালিত গম্ভীরা-উৎসবে পরিবেশিত হয় বলে 'ছদ্মবেশী' প্রত্যয়টি সম্যক উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের জন্য গম্ভীরা এবং গম্ভীরা-ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অঞ্চল, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী, গাজনের শোভাযাত্রা ও সঙ সজ্জা, ছদ্মবেশ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

গম্ভীরা

'গম্ভীরা' শব্দের অর্থ নিয়ে বিতর্ক আছে।[৮] গম্ভীরার আদি গবেষক হরিদাস পালিত বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসন্ধান করে গম্ভীর শব্দের তিনটি অর্থ পেয়েছেন- শিব, শিবমন্দির ও পদ্মফুল। সুতরাং তাঁর মতে "...'গম্ভীর' শোভিত 'গম্ভীর' মধ্যে 'গম্ভীর' দেবের পূজাস্থল বলিয়া এই মহোৎসবের নাম গম্ভীরা উৎসব এবং এই উৎসব স্থলের নাম গম্ভীরা হওয়াই সম্ভব।"[৯] গবেষক প্রদ্যোত ঘোষ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন– উত্তরবঙ্গের ধর্মঠাকুরের পূজারীবৃন্দ ধর্মঠাকুরের পূজায় গামারী (সংস্কৃত গম্ভারী, emelina arborea) কাঠের পিঁড়ি ব্যবহার করে এবং উক্ত সূত্রেই 'গম্ভারী' থেকে 'গম্ভীরা' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়েছে।[১০] এ প্রসঙ্গে গবেষক পুষ্পজিৎ রায়ের অভিমত-

> এই (গম্ভীরা) উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু ছিল শিব। সেই শিবের পূজা গম্ভীরা নামক মণ্ডপে বা গৃহে। আর উৎসবের অঙ্গ নাচ, গান, আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি হত গম্ভীরা মণ্ডপ লাগোয়া উঠোনে। সেই সূত্রে শিবের পুজো অনুষ্ঠান ইত্যাদি বা শিব কেন্দ্রিক এই উৎসব লোক মুখে এক সময় গম্ভীরা নামে পরিচিত লাভ করে।[১১]

গম্ভীরা উৎসবের ৪র্থ দিন অর্থাৎ আহারার রাতে মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত গম্ভীরাগান পরিবেশিত হয়। গম্ভীরা গান আদিতে 'বোলবাই', 'বোলবাহি', 'বোলাই' ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। হরিদাস পালিত 'বোলবাহি' নামীয় 'গম্ভীরা-সঙ্গীতে' বন্দনা, ঠুংরিগান, চারিয়াড়ি, বোলাই ইত্যাদি গানের প্রচলন লক্ষ করেছেন।[১২] পুষ্পজিৎ রায় 'বোলবাই', 'বোলবাহি' ইত্যাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ ও প্রয়োগ বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন '...সংকীর্ণ ও সীমিত ধারার বোলবাহি গান গম্ভীরাগানের বিশাল ব্যাপ্তিতে' সমন্বিত হয়েছে।[১৩] প্রদ্যোত ঘোষের মতে 'আলকাপ, রামপ্রসাদী, বাউল, কীর্তন' ইত্যাদি গানের সুরের সমন্বয়ে গম্ভীরাগানের সুর সৃষ্টি হয়েছে।[১৪]

গম্ভীরার গবেষকগণ গম্ভীরাগানের ছয়টি অঙ্গের কথা বলেছেন- মুখপাদ, বন্দনা, ডুয়েট (দ্বৈতসঙ্গীত), চারইয়ারী (চারজনের একসঙ্গে গান), পালাবন্দীগান, খবর বা রিপোর্ট।[১৫] পুষ্পজিৎ রায়ের পর্যবেক্ষণে গম্ভীরাগানের প্রধান চারটি অঙ্গ-বন্দনা, ডুয়েট, চারইয়ারী ও রিপোর্ট। এর বাইরে অনিয়িমিতভাবে একাধিক চরিত্র সমন্বয়ে ছোটো ছোটো লোকধর্মী পালাগান পরিবেশিত হয়।[১৬]

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চলে বর্তমানে সাধারণভাবে যে গম্ভীরাগান পরিবেশিত হয় তার পাঁচটি অঙ্গ–বন্দনা, ডুয়েট, চারইয়ারী, রিপোর্ট ও টপ্টিং- যা গম্ভীরা উৎসবের গানের প্রায় অনুরূপ।[১৭] তবে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মালদহের খ্যতিমান গম্ভীরা ব্যক্তিত্ব অমর মণ্ডল, অসীম রায় প্রমুখ এই মতামত প্রদান করেছেন যে, বর্তমানে গম্ভীরার উক্ত ৫টি অঙ্গ একত্রে প্রায় কোনো আসরেই পরিবেশিত হয় না। অর্থাৎ একই আসরে পাঁচটি অঙ্গের ৩ বা ৪টি পরিবেশিত হয় এবং বন্দনা অবশ্যই থাকে।[১৮] আর ১৯৪৭ সালে মালদহ থেকে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে যে গম্ভীরা গান পরিবেশিত হয় তা উক্ত গানের ডুয়েট বা দ্বৈত সঙ্গীত মাত্র।[১৯] বর্তমানে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে প্রচলিত দুই চরিত্র বিশিষ্ট গম্ভীরাগান ঐতিহ্যগত দিক থেকে গম্ভীরা উৎসবের অংশ হলেও বিষয় ও পরিবেশনার দিক বিবেচনায় তা গম্ভীরা উৎসবের ডুয়েট থেকে এতই দূরবর্তী যে তাকে এখন গম্ভীরা উৎসবের অংশ হিসেবে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।[২০] প্রদ্যোত ঘোষ মনে করেন- চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলের গম্ভীরাগানের মুসলিম লেখক-গায়কগণ তাঁদের ধর্মীয় সংস্কৃতির শব্দ হিসেবে গম্ভীরায় শিবের পরিবর্তে 'নানা' ব্যবহার করেছেন।[২১] গম্ভীরায় শিবের

পরিবর্তে 'নানা' শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্য একটি ব্যাখ্যাও প্রণিধানযোগ্য। মালদহ অঞ্চলের মানুষ গঙ্গার গর্ভজাত পলিদ্বারা গঠিত গঙ্গা-মহানন্দার মধ্যবর্তী এই অঞ্চলকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে। সুতরাং গঙ্গা হচ্ছে মায়ের মা-'নানি।' তাই গঙ্গাপতি শিব হচ্ছে মালদহবাসীর 'নানা।'[২২]

সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী

সাধারণত গঙ্গা ও পদ্মার পূর্বতীর তথা পূর্বভাগে গম্ভীরা উৎসব পালিত হয়। অবশ্য গঙ্গা-পদ্মার পশ্চিমতীরেও অল্পবিস্তর অনুরূপ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। হরিদাস পালিতের পর্যবেক্ষণে জানা যায়, নদী ভাঙন বা অন্য কোনো কারণে গঙ্গা-পদ্মার পূর্ব ভাগ থেকে যারা পশ্চিমভাগে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে কেবল তারাই গম্ভীরা উৎসব পালন করে।[২৩]

হরিদাস পালিত যখন গম্ভীরার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে তৎপর ছিলেন তখন অনেকেই গম্ভীরাকে 'কোঁচ-প'লের গান ও উৎসব' রূপে উপহাস করেছে। তিনি গম্ভীরা উৎসবে 'নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশী এবং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য-গণের' উপস্থিতির কথা উল্লেখ করলেও 'পৌণ্ড্রক বা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহাধিক্য' লক্ষ্য করেছেন।[২৪] প্রদ্যোত ঘোষ মাঠ পর্যায়ের পরিসংখ্যানের মাধ্যমে মালদহ জেলার ১৯৪টি গম্ভীরা উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে 'তিওর, নাগর, চাঁই, বিন্দ, সদগোপ, পোলিয়া ও রাজবংশী'দের সংখ্যাধিক্যের উল্লেখ করেছেন।[২৫] পুষ্পজিৎ রায় গম্ভীরা উৎসবকে বলেছেন- '...কোচ-ক্ষত্রিয়-রাজবংশি-দেশি-পলি-গোষ্ঠীর সম্মিলিত উৎসব...।'[২৬] গৌরী শংকর ভট্টাচার্য 'রাজবংশী, চাঁই, কোচ, মহলী ও ভূমিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে' গম্ভীরা উৎসব পালিত হতে দেখেছেন।[২৭]

গাজন

গাজন মূলত 'চৈত্রসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত শিব বিষয়ক কৃত্য।'[২৮] হরিদাস পালিতের অভিমত এই যে, কোলাহল, সন্ন্যাসী ও ঢক্কাদি বাদ্যের ঐকতানে এই উৎসব সম্পাদিত হয় বলে তা গাজন নামে অভিহিত।[২৯] শিবের গাজন বা আদ্যের গাজনই বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে নীলের গাজন বা নীলপূজা, পশ্চিমবঙ্গে দেল পূজা।[৩০] উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি অঞ্চলে তা 'গমীরা' নামে পরিচিত।[৩১] এই পূজা চৈত্র মাসে হয় বলে দেশভাগের (১৯৪৭) ফলে টাঙ্গাইল থেকে পশ্চিমবঙ্গের নদিয়ার ফুলিয়ায় অভিবাসনকারী তাঁতিসমাজে তা চৈত্রপূজা।[৩২] গাজন সাধারণত চৈত্র মাসের দ্বিতীয় পক্ষেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠসংক্রান্তিকে কেন্দ্র করেও কোথাও কোথাও এই অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়। বাংলার যে সকল গ্রামে 'শিব মন্দির' বা 'শিবথান' আছে সেই গ্রামের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী উক্ত তিন সংক্রান্তির যে কোনো একটিতে গ্রামবাসী বাৎসরিক উৎসব রূপে গাজনের অনুষ্ঠান করে। সাধারণত চৈত্রের শেষ দিনে গাজন শেষ হয়।[৩৩] গাজন উৎসবের সূচনায় কেবল নিয়ম রক্ষার্থেই শিবের বন্দনা গীত হয়। বন্দনার পর গাজনের মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবহুল প্রায় ত্রিশ চল্লিশটি খণ্ড খণ্ড বিষয় পরিবেশিত হয়।[৩৪]

শোভাযাত্রা ও সঙ

ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যে নৃত্যগীতসহ সচল সামাজিক ও ধর্মানুষ্ঠানকে 'যাত্রা' বলা হয়- যেমনঃ রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি। সম্রাট অশোক এইসব যাত্রার বিপক্ষে অনুশাসন জারি করা সত্ত্বেও পরবর্তী পর্যায়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজে তা স্বীকৃত হয়েছে।[৩৫] চৈত্রসংক্রান্তির সূর্যোৎসবকে কেন্দ্র করে সংক্রান্তির দিন বিভিন্ন গ্রামের শোভাযাত্রা সেই অঞ্চলের বিখ্যাত কোনো শিবমন্দিরে গিয়ে সমবেত হয়। যেমন- এক সময় কলকাতা ও হুগলী থেকে ৪০ কি. মি. দূরে তারকেশ্বরের শিবমন্দির ছিল সকলের গন্তব্য। এই সময় শিব ভক্তগণ 'হরগৌরী, শিব, কালী, ভূত প্রেতিনী, ভল্লুক, সন্ন্যাসী, ফকির' ইত্যাদি বেশে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতো।[৩৬] আবার 'এই সময়টিই বাংলার শ্রেষ্ঠ লৌকিক নৃত্যোৎসবের কাল।' কারণ-

> বাংলার পূর্ব থেকে পশ্চিম, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত, সর্বশ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যে তার (শিবের) গাজন অনুষ্ঠান হয় এবং এই উপলক্ষে নানা প্রকার গীত-নৃত্যেরও আয়োজন হয়ে থাকে। এই সময় প্রায় সর্বত্রই, কেবল ছৌ এবং গম্ভীরার অঞ্চল ছাড়া, মুখোস পরার পরিবর্তে নানা ধরনের নৃত্যে যোগদানকারীরা তাদের মুখে রঙ মেখে নানা পৌরাণিক চরিত্র অনুযায়ী সাজসজ্জা গ্রহণ করে।[৩৭]

গাজন কেন্দ্রিক কৃত্য 'সঙ' শব্দের অর্থে বৈচিত্র্য দেখা যায়।[৩৮] সেলিম আল দীনের মতে সঙ হচ্ছে– 'অদ্ভুত পোশাক পরিহিত কৌতুককারী।'[৩৯] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত অনুযায়ী সঙের উদ্দেশ্য হলো বৎসরব্যাপী ঘটে যাওয়া সমাজের প্রচলিত নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন ঘটনার ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনা।[৪০] গাজন চলাকালীন প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যারাতে পৌরাণিক ধারায় ধর্মীয় নিয়ম মেনে সঙসজ্জা অনুষ্ঠিত হয় এবং মাত্র একদিন– চৈত্রসংক্রান্তির পূর্ব দিন ধর্মীয় আবহের বাইরে লৌকিক ধারায় সঙযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন একদল হর-গৌরী সেজে পাড়ায় পাড়ায় নেচে 'ভুক্তা' (সিধা হিসেবে তোলা চাল, ডাল, তেল, আনাজপাতি ইত্যাদি) তুলে। অন্যদল 'যেমন খুশি সেজে' (as you like?) অর্থাৎ ছদ্মবেশে সমগ্র এলাকায় নাচ-গান-কৌতুক ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় করে।[৪১]

ছদ্মবেশ

সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত *সরল বাঙ্গালা অভিধানে* ছদ্মবেশ শব্দের প্রদত্ত অর্থ সমন্বিত করে পাওয়া যায়– অন্য লোক বা লোকসমাজের সঙ্গে প্রতারণার অভিপ্রায়ে নিজ রূপ বা ভাব গোপন রেখে অন্যের রূপ বা ভাব ধারণ।[৪২] বাংলা একাডেমির *বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধানে* ছদ্ম শব্দজাত ছদ্মবেশ সংক্রান্ত শব্দ নিম্নরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–

> ছদ্মবেশ- পরিচয় গোপন করার জন্য কৃত্রিম বেশ ধারণ, ভণ্ডামি, লুকানো অবস্থা; ছদ্মবেশধারী- কপট বেশ ধারণকারী; ছদ্মবেশী- কপট লোক, কপট বেশ ধারণকারী; ছদ্মব্যবহার- কপট আচরণ; ছদ্মভাবে- গোপনে; ছদ্ম-লক্ষণ- ভুয়া বৈশিষ্ট্য; ছদ্মসাজ- পরিচয় গোপন করার উপযুক্ত সাজ; ছদ্মী- ছদ্মবেশধারী।[৪৩]

ভারতীয় পুরাণে ছদ্মবেশের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় পুরাণে শিব যুগপৎ অরূপ ও সরূপ। উপনিষদে আছে–

> তাঁহার হাত নাই, তথাপি তিনি সমস্ত গ্রহণ করেন অর্থাৎ সমস্ত ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার পা নাই অথচ তিনি দূরগামী, তাঁহার চক্ষু নাই অথচ তিনি সমস্ত দেখেন, তাঁহার কান নাই অথচ তিনি সমস্ত শোনেন যদিও সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না। ব্রহ্মবিদগণ তাঁহাকে মহান ও আদি পুরুষ বলিয়া থাকেন।[৪৪]

এই কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় শিবপুরাণে– 'তিনি (শিব) সরূপ অর্থাৎ তাঁর দেহ, হাত, পা প্রভৃতি সকল অঙ্গই তাঁর আছে। আবার তিনি অরূপ, তাঁর কোন প্রকৃতরূপ নেই।'[৪৫] শিবকে নানারূপে পূজা করার মাহাত্ম্য ও ছদ্মবেশের গুরুত্ব উক্ত সূত্রেই নিহিত। হরিদাস পালিত ছদ্মবেশের শাস্ত্রীয় প্রমাণ শেষে ছদ্মবেশীদের অভিনয়াদিতে 'শিবের অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভে'র কথা বলেছেন।'[৪৬] উক্ত প্রেক্ষিতে *ভারতীয় পুরাণ* বিশেষ করে *শিব পুরাণ* থেকে শিবের কয়েকটি ছদ্মবেশ ধারণ উদাহৃত হতে পারে। শিবকে পতিরূপে পাবার জন্য পার্বতীর কঠোর তপস্যা দেখে দেবগণ ও ঋষিগণ শিবকে তা জানালে তিনি পার্বতীকে পরীক্ষা করার জন্য জটিল নাম ধারণ করে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ঢুলু ঢুলু পদক্ষেপে পার্বতীর সামনে হাজির হন। জটিলরূপী বৃদ্ধশিব পার্বতীকে শিবের রূপ ও গুণ সম্পর্কে নানা অপকথা বললেও ক্রুদ্ধ পার্বতী ঘোষণা করে 'শিব যে রূপই হন না কেন, তিনি আমার সর্বাপেক্ষা অভিলষিত। একমাত্র তিনিই আমার অভীষ্টতম পতি।' পার্বতীর আচরণে সন্তুষ্ট শিব তখন বৃদ্ধের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে স্বরূপ ধারণ করেন।[৪৭]

পরবর্তী পর্যায়ে শিব মহাসমারোহে পার্বতীকে বিয়ে করতে আসার সময় পার্বতীর মাতা মেনকা জামাই দেখার জন্য গৃহের ছাদে অবস্থান করছিলেন। দৈববলে শিব মেনকার 'অহংকারের কথা' জানতে পেরে প্রথমে নিজের আটপৌরে রূপটি দেখালেন এবং তা দেখে মেনকা শিবের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে অপরূপ সজ্জিত শিবকে দেখে মেনকার মনে হলো- '... এহেন পুরুষকেও (শিবকে) যে আমার কন্যা বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছে, ধন্য সেই কন্যা পার্বতী।' অবশ্য শিবের প্রতি বিরূপ আচরণের জন্য মেনকা এবং মেনকার সঙ্গে ছলনা করার জন্য শিব লজ্জিত হয়েছেন।[৪৮] এই পুরাণেই শিব-অর্জুনের যুদ্ধে শিব ব্যাধের বেশে অর্জুনের সম্মুখীন হয়েছে।[৪৯] শিবের ছদ্মবেশ ধারণের অন্য একটি প্রসঙ্গে দেখা যায়- নিজেদের শ্রেষ্টত্ব ও প্রভুত্ব নিয়ে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রবল দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়লে এর প্রতিবিধান কল্পে শিব উভয়ের 'রণস্থলের সন্নিকটে গিয়ে শূন্যে গুপ্তভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছায় সহসা আদি অন্তহীন বিশাল এক অনলস্তম্ভ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মাঝখানে স্থাপিত হলো।' উক্ত অনলস্তম্ভই শিব লিঙ্গ। পরে সেই অনলস্তম্ভ থেকে শিব নিজরূপে আবির্ভূত হন।[৫০] শিবের ছদ্মবেশ ধারণের পরবর্তী বিষয়টি তার পরকীয়ার সঙ্গে জড়িত-আড়ি দৈত্য হিমালয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদা শিব-পার্বতীর গুহার নিকট চলে আসে। সে শিব-পার্বতীর বিহার দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করলে পার্বতীর দুই সখী ও শিবের অনুচর বীরক তাকে বাধা দেয়। পরে আড়ি দৈত্য সাপের বেশে গুহার মধ্যে প্রবেশ করে গৌরীরূপ ধারণ করে শিবকে শয্যায় আহ্বান করে। শয্যায় গিয়ে শিব বুঝতে পারে তাঁর শয্যাসঙ্গিনী গৌরীতো নয়ই— এমনকি কোনো নারীই নয়। শিব ছদ্মবেশধারী আড়ি দৈত্যকে চিনতে পেরে হত্যা করে। পরে আড়ি দৈত্যের ভাই গৌরীরূপেই শিব সন্নিধানে গেলে এবার শিব প্রথমেই গৌরীরূপী দৈত্যকে চিনতে পারে। কিন্তু ইতোমধ্যেই পার্বতীর এক সহচরী শিবের সঙ্গে অন্য নারীকে দেখে গুহার বাইরে গিয়ে পার্বতীকে জানায়। শিবকে কামাচারে সহায়তা করার জন্য গৌরী বীরককে মর্তে জন্মগ্রহণের শাপ দেয়। কিন্তু গুহায় ফিরে সেখানে কোনো নারীকে না দেখে পার্বতী তার ভুল বুঝতে পেরে বীরককে শাপমোচনের পথ বাতলে দেয়। বীরকের শাপমোচনকৃত রূপই নন্দী।[৫১]

ভারতীয় পুরাণের ঐতিহ্য মেনেই বাংলার মধ্যযুগের গেয় কাব্য মঙ্গলকাব্য ধারায় শিব-গৌরীর ছদ্মবেশের নানা কাণ্ড পরিলক্ষিত হয়। রামেশ্বরের *শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়নে* দেখা যায়– পদ্মার সঙ্গে পরামর্শক্রমে গৌরী 'মূর্ত্তি ফের্‌্যা' বাগদিনী রূপ ধারণ করে এবং বাগদিনী বেশেই শিবের মন হরণ করে উপহার হিসেবে শিবের আংটি গ্রহণ করে।[৫২] পরে বাগদিনী প্রসঙ্গ ও শাঁখা পরাকে কেন্দ্র করে শিব রাগের বশে কার্তিক গণেশসহ গৌরীকে বাপেরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে মনঃকষ্টে ভোগে।[৫৩] উক্ত পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের আশায় নারদের পরামর্শে শিব গৌরীর পিত্রালয় গমন ঠেকানোর জন্য পথে বাঘরূপ ধারণ করে। এই প্রয়াস ব্যর্থ হলে শিব ঝড় বৃষ্টি সৃষ্টির মাধ্যমে পথে একখানা ঘরে গৌরীর অবস্থান নিশ্চত করে নিজে বৃদ্ধবেশে গৌরীর সঙ্গে কথা বলে।[৫৪] তাতেও কাজ হলো না দেখে শিব মাঝির ছদ্মবেশে সন্তানসহ গৌরীকে নৌকায় মায়া নদী পার করার সময় ছলনা করে।[৫৫] শেষ পর্যন্ত গৌরী পিত্রালয়ে গমন করার পর শিব শাঁখারি বেশে গৌরীর পিত্রালয়ে আগমন করে। দাম্পত্য কলহ শেষে হর গৌরীকে বাগদিনী বেশে শয্যায় আমন্ত্রণ জানালে বাগদিনী বেশেই গৌরী হরকে তৃপ্ত করে।[৫৬]

জগজ্জীবন ঘোষালের *মনসামঙ্গল* কাব্যে দেখা যায় দুর্গা গোয়ালিনী ও কুচুনীর ছদ্মবেশে শিবের ঔরসে যথাক্রমে গণেশ ও কার্তিকের জন্ম দেয় এবং উভয়ক্ষেত্রেই শিব তার ভ্রষ্টাচার স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।[৫৭] বিপ্রদাসের *মনসাবিজয়*-এ শিব ডোমনিবেশী গৌরীকে শয্যায় গ্রহণ করে এবং যথারীতি শিব গৌরীর হাতে বমাল ধরা পড়ে যায়। দেবেশ রায় শিবের ভ্রষ্টাচার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন- 'শিবের এমন কাণ্ডকারখানা হয়তো লৌকিক ধারার সঙ্গে পৌরাণিক ধারার মিশ্রণে খানিকটা গ্রাহ্যও ছিল।' কিন্তু *মনসাবিজয়*-এ বিপ্রদাস কেবল শিবের ভ্রষ্টাচার প্রদর্শনেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি দেখিয়েছেন, অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শিব ইঁদুরের বেশ ধারণ করে গৌরীর কাঁচুলি কেটে দেয় এবং কারিগরের বেশে সেই কাঁচুলি রিপু করার জন্য

গৌরীর দরজায় উপস্থিত হয়। গৌরী রিপু করাতে সম্মত হলে শিবরূপী কারিগর রিপুর মূল্য হিসেবে গৌরীর রতিক্রিয়া দাবি করে। উক্ত বিনিময়ের শর্তে রিপু কর্মের পর গৌরী কারিগরের সঙ্গে রতিকর্ম সম্পন্ন করে। গৌরীর ভ্রষ্টাচার সম্পর্কে দেবেশ রায় মন্তব্য করেন 'গৌরীর পাতিব্রত্যের পৌরাণিকতা বিপ্রদাস অনায়াসে ধ্বসিয়ে দিলেন।'[৫৮]

ছদ্মবেশী পরিবেশনা

১৪২৫ (২০১৮) ও ১৪২৬ (২০১৯) বঙ্গাব্দের ৩১ শে বৈশাখ অর্থাৎ বৈশাখ সংক্রান্তিতে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার মালদহ থানার (যা পুরাতন মালদহ নামে পরিচিত) পুরাতন মালদহ পৌরসভার ৩, ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত 'ছদ্মবেশ' ধারণ ও প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রসমীক্ষণের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় উক্ত ৩টি ওয়ার্ডে প্রায় ৪ কি.মি. রাস্তায় ছদ্মবেশের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রধান দুটি রাস্তা সংলগ্ন ১৫টি মন্দিরের সামনে ছদ্মবেশীগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। প্রতিযোগীগণ নিজ বাড়ি থেকে ছদ্মবেশ ধারণ করে যে কোনো মন্দিরের সামনে গিয়ে তার পরিবেশনা প্রদর্শন শেষে অন্য মন্দিরের দিকে চলে যায়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। কোনো প্রতিযোগী যদি দেখেন এক মন্দিরের সামনে প্রতিযোগীর সংখ্যা বেশি তবে সে পাশের মন্দিরের দিকে গমন করে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে সংখ্যাধিক্যের কারণে সব সময় সকল প্রতিযোগী ১৫টি মন্দিরের সব কয়টিতেই তাদের পরিবেশনা প্রদর্শন করতে পারে না। এক্ষেত্রে বর্তমানে শোভাযাত্রা বা সঙসজ্জার আড়ালে প্রতিযোগীদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য থাকে প্রতিযোগিতা। বয়স অনুযায়ী ছদ্মবেশ প্রতিযোগিতায় দুটি দল– অনুর্ধ ১৫ এবং তদুর্ধ। পুরস্কার প্রদান করা হয় দুটি বিষয়ে– ভাস্কর্য ও সাধারণ ছদ্মবেশ। ১৪২৬ বঙ্গাব্দের ১৫টি প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে চ্যাম্পিয়ন অব দা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সতীর দেহত্যাগ ছদ্মবেশধারী ৮ বছরের সঞ্চিতা কুণ্ডু। অবশ্য ১৫টি মন্দিরেই ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়।

১৪২৬ (২০১৯) সালের ছদ্মবেশ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন অব চ্যাম্পিয়ন সঞ্চিতা কুণ্ডু

ছদ্মবেশীর বিষয় ও আঙ্গিক অনুধাবনের জন্য ১৪২৫ বঙ্গাব্দের (২০১৮) পরিবেশিত কয়েকটি ছদ্মবেশের নমুনা মনোনিবেশ দাবি করে।

উল্লেখ্য যে, পুরাতন মালদহের শর্বরী মহল্লার দুর্গামন্দির সংলগ্ন খোলা জায়গায় এবং উপর শর্বরী মহল্লার দামোদর মন্দিরের সামনে থেকে ছদ্মবেশীদের পরিবেশনা গৃহীত হয়েছে। উক্ত দুই জায়গায় ছদ্মবেশ পরিবেশনার পৃষ্ঠপোষক যথাক্রমে পুরাতন মালদহ পৌরসভা ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, মালদহ জেলা শাখা। নমুনাসমূহের নামকরণের ক্ষেত্রে অভিনয়াদির বিষয়, বিচারকবৃন্দের বিচারকার্যে ব্যবহৃত শিরোনাম এবং ক্ষেত্রসমীক্ষকের বোধ সমন্বিত হয়েছে।

১. ভাগাড় কাণ্ড-১

মেয়ে: কাক্কু, তোমাকে আজ আমার বাড়ি যেতে হবে। তোমাকে এক্ষণি যেতে হবে কাক্কু। কালকে রাত্রের বেলা আমার বর আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। এই হাবুদার বউ আছে না, ওই যা আমার বরকে বলেছে আমি কলকাতায় গেছিলাম, কলকাতায় আমি হোটেল ভাত মাংস কিছুই খাইনি। ও মিথ্যা কথা আমার বরকে বলে দিয়েছে হাবু দার বৌ। আর আমার বর আমাকে বার করে দিয়েছে। তুমি যায়ে বুঝায় কাকু, চলো কাকু, চলো কাকু বুঝায় গা। আমি দু দিন থেকে খাইনি কাকু না খেয়ে আছি, তুমি চলো কাকু, চলো কাকু, তুমার পা ধরছি, কাকু চলো, কাকু চলো।

২. ভাগাড় কাণ্ড-২

দিনমজুরী: আমার মালিক আমাকে দিয়ে পাঠালো বড়ো বড়ো রেস্টুরেন্টে, বড়ো বড়ো হোটেলে, আমি যেখানে যেতাম সেখান থেকে আমাকে পুলিশ ধাওয়া করেছে। মালিক বিদেশে পালিয়ে গেছে। আমাকে একটু বাঁচান না বাবুরা, আপনারা। আমি আর কুনু দিন এ কাজ করবো না দাদা। আমি এবার কথা দিচ্ছি দাদা, আমি এবার থেকে রেকসা চালিয়ে খাবো, তবুও আমি হোটেলে রেস্টুরেন্টে এইসব মরা মুরগি আর বেচবো না। আমার মালিক পালিয়ে গেছে দাদা। আজকের পর থেকে আমি আর এসব বেচবো না। আমি কথা দিচ্ছি স্যার- আমি আর এ কাজ করবো না। আমি এ আর ব্যাচবো না। আমাকে পুলিশ খুঁজছে। আমার পরিবার আছে। আমি আর এ কাজ করবো না। আমি কথা দিচ্ছি স্যার- আমি আর এ কাজ করবো না। আমাকে পুলিশ খুঁজছে, আমার মালিক পালিয়ে গেছে। আমার সংসার আছে, আমার ছেলে মেয়ে আছে স্যার। আমি আর এ কাজ করবো না স্যার। আমরা দিনমজুরী স্যার।

৩. ভাগাড় কাণ্ড-৩

স্বামী: হায়রে কি হয়ে গেলো। বাপুরে আমার বৌয়ের কি হয়ে গেলো। ডাক্তার বাবু আমার বউকে দেখেন। এই রিপোর্ট করতে ফটো করতে বলেছিলেন করিয়ে এনেছি।

ডাক্তার (১০-১১ বছরের ছেলে): আপনার বৌয়ের এই অবস্থা কেমন করে হলো?

স্বামী: আর বলেন না, এই যে নিয়েগেছিলাম কলকাতাতে আইপিএল খেলা দেখতে। ওখানে খেলা দেখতে গিয়ে বউ

ও গুলো কি বলছে, যেন চিকেন বিরানী না কি খায়েছে।

ডাক্তার: আমি যা ধারণা করেছিলাম তাই হয়েছে, কি বললেন কি খাইয়েছিলেন।

স্বামী: ঐ যে চিকেন বিরানী না কি বলছে ও গুলা খায়েছিলো।

ডাক্তার: চিকেন!

স্বামী: হ্যাঁ

ডাক্তার: ঐ গুলা চিকেন ছিলো না, ঐ ভাগাড়ের পচা কুত্তা আর বিড়ালের মাংস ছিলো।

স্বামী: হাইরে বাপরে বাপরে।

ডাক্তার: ঐ খেয়ে আপনার বউ যেখানে সেখানে ঠেং তুলে মুতছে আর সবাইকে খামচে বেড়াচ্ছে।

স্বামী: (পা তুলে কুকুরে প্রসাব করার ভঙ্গিরত স্ত্রীকে ধরে) থামো থামো। (তারপর ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে) হাইরে বাপরে, আমার বউয়ের কার যে নজর লাগে গেলো এগুলা কি খালোরে বাপরে বাপরে। কি করবো এখন আমি ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার: হাতে একদম সময় নেই, তাড়াতাড়ি একটা অটো রিজার্ভ করে আপনারা হাসপাতালে যান, আমি পেছনে আসছি।

স্বামী: চলো গো, হায়রে বাপরে বাপরে, হামার বৌয়ের কি যে হয়ে গেলো।

ডাক্তার: তাড়াতাড়ি নিয়ে যান, বেশি দেরি করলে অসুখ আরো বড় হবে।

স্বামী: চলো চলো...

৪. সেলফি

রোগী: ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু। দেখুন না আমার কি অবস্থা হয়েছে। আমার এতো সুন্দর চেহারা সেলফি তুলতে তুলতে কি অবস্থা হয়েছে। আমি প্রায় প্রতিদিনি আমার ছবি ফেসবুকে পোস্ট করতাম, কতো না লাইক পেয়েছি, এখন আমার কী হবে! একটু দেখুন না ডাক্তার বাবু, আমি যাতে আবার আগের মতো হয়ে যায়। একটু দেখুন না।

নার্স: আচ্ছা আচ্ছা। ডাক্তার বাবু আপনি একটু চেকআপ করুন।

ডাক্তার (১০-১১ বছরের ছেলে): আপনার এ অবস্থা কী করে হলো?

রোগী: আর বলবেন না। আমার বাবা আমাকে কতো সখ করে একটি রেডমি ফোন কিনে দিয়েছিলো। তা নিয়েতো আমি সব সময় ছাদে সেলফি তুলতাম। সেলফি তুলতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে আমার এ অবস্থা।

ডাক্তার: আচ্ছা পেছনে ঘুরুন আপনি। নার্স ইনজেকশনটা দিয়ে দেন।

নার্স: আচ্ছা ডাক্তার বাবু। ইনজেকশনটা দিয়ে দিলাম।
রোগী: আমি ঠিক হয়ে যাবো তো ডাক্তার বাবু।
ডাক্তার: হে হে, সে ঠিক হয়ে যাবেন।
রোগী: তা হলে একটা সেলফি হয়ে যাক।
নার্স: আবার এ অবস্থায় সেলফি।

৫. ফেসবুক ম্যানিয়া

মেয়ে: বাবা বাবা।

বাবা: ধত, কী হলো রে।

মেয়ে: কি হলো রে মানে কখন থেকে ডাকছি তোমাকে। কি করছো গো! কখন থেকে ডেকেই যাচ্ছি ডেকেই যাচ্ছি বাবা, বাবা। কিসের এতো হোয়াট্‌স এপ ফেসবুক করবে বুড়া মানুষ। এই আমার বাড়িতে আমার বর দেখছি হোয়াট্‌স এপ ফেসবুক, হোয়াট্‌স এপ ফেসবুক সারাদিন একি জিনিস চলছে। এগুলো কী! কোথাও যদি ঘুরতে যাচ্ছি, ঘুরতে যাওয়ার আনন্দ নাই। ফটো তুলো, ফটো সেন্ড করো। তাতে কটা লাইক পড়লো, কে কে কমেন্ট করলো। বিয়ে বাড়িতে খেতে যাচ্ছি, খাওয়ার দিকে মন নাই, ছবি তুলতে ব্যস্ত। মাকে বলছি এসব কথা– মা বলছে– তোর বাবাও করছে এগুলো।

(মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত বাবার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে): এ কী! আমার বাবা রিটায়ার্ড করেছে। বাবা রিটায়ার্ড করেছে, ভাবলাম বাবা বুড়া মানুষ, একটা মোবাইল কিনে দেই, এনড্রোয়েড মোবাইল। আমি বাবাকে হাতে ধরে ফেসবুক একাউন্ট খুলে দিলাম, ফেসবুক পর্যন্ত শিখালাম, হোয়াট্‌স এ্যাপ করতে শিখালাম। ঠিক আছে লোকের সাথে কমিউনেট করুক। ও মা! কমিউনেট করবে কি, সারাদিন ওই নিয়েই মেতে আছে। বাবার আজকে সাড়ে চারশ পাঁচশো ফ্রেন্ড। বাপরে! তাদেরকে গুড মর্নিং আর গুড নাইট বলতে বলতে বাবুর দিন যাই না। অ্যাঁ! এগুলো কী!! বাড়িতে কবার মাকে গুড মর্নিং বলোগো? বাড়িতে কোনো কথা বললে ঠিক মতো কথা বলে না, শুধু উহ আহ উহ আহ। আমরা যে এসেছি– কখন আলি? কি খেলি? ওগুলো জানার দরকার নাই। সময় কোথায়! সময় নাই, এগুলো করে বেড়াচ্ছে। এতে কি তোমার মান সম্মান থাকছে? বাড়িতে দুটো লোক আসছে, তাদের সাথে ভালো করে কথা বলছো না। আমার শ্বশুর আসছে– বাবাকে বলছে বিয়াই কেমন আছেন? উফ! আরে বসেন পর্যন্ত বলে না। এ কি? এগুলো কোন ভদ্রতা? একদিন বাবা আমাদের শিখিয়েছে ভদ্রতা, সভ্যতা কাকে বলে। আজকে বাবার কী অবস্থা!

(পুনরায় বাবাকে লক্ষ করে): তোমাকে জ্ঞান দিচ্ছি না বাবা। তুমি রাগ করবা না। তুমি আমার কথাটা ভেবে দেখার চেষ্টা কর। এই নিয়ে প্রতিটা ঘরে ঘরে অশান্তি, ঘরে ঘরে সুখ শান্তি নষ্ট হচ্ছে। মানুষের কাছে আপন লোক কে রে। বাড়ির লোকের সাথে একটা কথাও বলো না। তোমার ফেসবুক ফ্রেন্ডরাই তোমার খাবার পৌঁছাবে।

বাবা: ঠিক ঠিক রাগের কথা নয়। ঠিক বলেছিস। একদিন আমি সবাইকে বলেছি এডিকশন একদম ভালো নয়। আজকে আমি নিজেই এডিকশন হয়ে গেছি। ছি... চল মা বাড়ি চল...।

৬. পরিচ্ছন্নতা

ঝাড়ুদার: এই যে মাসি মা ও কাকি মা–

আপনারা যে রাস্তা ঘাটে নোংরা ফেলছেন তার চেয়ে

ভালো হয় আপনারা বাড়ির পাশে একটি করে ডাস্টবিন

রেখে দিলে বা একটি করে নোংরা ফেলার বালতি রাখলে।

না হলে, আপনাদের বাড়িতে অসুখ ছড়াবে এবং

আপনাদের শরীরেও অসুখ ছড়াবে।

তই বলছি ডাস্টবিনে নোংরা ফেললে ভালো হবে।

তাহলে নোংরাও ছড়াবে না এবং অসুখও হবে না।

৭. ট্রাফিক সচেতনতা

রিপোর্টার: গত একমাসে এখানে ৪টি এক্সিডেন্ট হয়েছে। বিনা হেলমেটে, সিট বেল্ট ছাড়া মানুষ গাড়ি চালাচ্ছে। তাই একদল ছোকরা তারা এসে মানুষকে সচেতন করছে।

একদল ছোকরা (তৃতীয় লিঙ্গের বেশে সজ্জিত পুরুষ): হাই হাই হাই।

ছোকরা সর্দার: ছোন আমি কি বলছি ছোন। সবাই একসাথে বল।

সমবেত কণ্ঠ: বাককা বাকুম, বাকুম বাকুম

বাককা বাকুম, বাকুম বাকুম

পথে ঘাটে দেখে শুনে চল

নইলে ছবি হয়ে যাবি রে।

বাককা বাকুম, বাকুম বাকুম

পথের দিকে তাকিয়ে আছে তোর মা, বোয়েরা (বৌ)

আসবি কখন ফিরে তুই বলছে ছেলে মেয়েরা

পথের দিকে তাকিয়ে আছে তোর মা, বোয়েরা

আসবি কখন ফিরে তুই বলছে ছেলে মেয়েরা

ছোকরা সর্দার: এই পিংকি।

পিংকি: হ্যাঁ বল।

ছোকরা সর্দার: দাঁড়ানারে।

পিংকি: আরে বলনারে।

ছোকরা সর্দার: এই চিকনাকে দেখছিস।

(গাড়ি চালকের উদ্দেশ্যে) এই চিকনা গাড়ি তো (মটর সাইকেল) কিনেছো, গাড়িতো চালাচ্ছো কিন্তু হেলমেট পরে কই চালাচ্ছো। এই চিকনা হেলমেট না পরে গাড়ি চালালে এক্সিডেন্ট হতে পারে। আর এক্সিডেন্ট হলে কি হবে জানিস? সালমান খানের মতো মুখটা আছে না, সেটা চ্যাপ্টা হয়ে যাবে রে।

(আরোহীর মাথায় হেলমেট পরিয়ে)

সমবেত কণ্ঠ: হেলমেট পোশাক পরে চল

সিট বেল্ট লাগিয়ে চল ও গাড়ি ওয়ালে

কে বলবে কখন যাবি তুই চলে

জেব্রা ক্রসিংয়ে পারাপার

না হলেতো ফিরবি নাকো আর।

ছোকরা সর্দার: এই চিকনিকে দেখছিস- আগে জীবন বাঁচাও, পরে মোবাইল বাঁচাও।

... ...।

৮. ভোট রঙ্গ

Presiding Officer: Good Afternoon sir. Good afternoon everybody. My self Ranjit Das. Actually according to Election Commissioner I selected as a post of presiding officer. ভাবতে পারবেন! ভাবতে পারবেনা না, কি সিসুয়েসন! কি সিসুয়েসন!! দেট ইজ ওয়েস্ট বেঙ্গল!!! দেট ইজ ডেমোক্রেসি!!!! স্যার হোয়াট দ্যা ডেমোক্রেসি? হোয়াট ইজ দ্যা ডেমোক্রেসি? ডেমোক্রেসি মিনস ফর দা পিপুল অফ দা পিপুল বাই দা পিপুল। জনগণের দ্বারা ছরকার জনগণের দ্বারা পরিচালিত ছরকার, জনগণের ছরকার। আজকে কি অবস্থা? আমি বসে আছি, আমার চোখের সামনে ব্যালট বাক্স উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলো। ফেলে দিলো। দেখেছেন, কি অবস্থা হয়েছে আমার? ভাবা যায়! আমরা কোন রাজ্যে বাস করছি। আপনি ন্যাদেরল্যান্ডে গিয়ে দেখুন, ...গিয়ে দেখুন এই সিসুয়্যাশন পাবেন না। আমি ভাবছি এই জাগাতে আর থাকা যাবে না। আমি একটা ভালো ফ্যামেলি বিলং করি, এসব খারাপ ফ্যামেলি থেকে আমি উঠে আসি নি। কিন্তু এই ধরনের এক্সেপটেসন, না না ইমপোছিবুল ইমপোছিবুল।

৯. নারীর সংগ্রাম

শাশুড়ি: বৌ পটল কাটছো? এইভাবে কেউ পটল কাটে লম্বা লম্বা করে? গোল গোল করে কাটো– গোল গোল করে। বাবা-মা কিছু শিখাই নি নাকি। এটা আমার বাড়ি, আমি যা বলবো তাই হবে। দেখতে হবে না কার বৌমা, আমার বৌমা, আমি যা বলবো তাই হবে।

বৌ: মা আমি কলেজের পড়াটা শেষ করতে চাই। বিয়ের আগেই তো বলেছিলাম যে, আমি কলেজের পড়াশোনাটা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।

শাশুড়ি: এ্যাঁ! নিজের পায়ে দাড়াতে চাও! নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছো নাতো কি আমার পায়ে দাঁড়িয়ে আছো, এ্যাঁ! আর পড়াশোনা করতে যাবে তো বাড়ির কাজ কর্ম কে করবে শুনি!

বৌ: কেনো মা, আমিই করবো।

শাশুড়ি: হ্যাঁ, কলেজে পড়াশোনা করতে যেতে চাও? না কি ফস্টি নস্টি করতে যেতে চাও? বিয়ে হবার পরও শিক্ষা হয় না দেখি সত্যি। দেখো বৌমা আমার কিছু শর্ত আছে।

বৌ: কী শর্ত মা।

শাশুড়ি: তুমি যদি শর্ত মানো তবে তোমার পড়াশোনা চালু রাখতে পারবা।

বৌ: আচ্ছা বলুন, কী শর্ত।

শাশুড়ি: প্রথম হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে ঘরটর ঝাড়ু দিবে, তারপর সমস্ত ঘর লেপবে। লেপা হয়ে গেলে ভালো মন্দ রান্না করবে, বিশেষ করে আমার মাছের মন্ডুটা ভালো করে রান্না করবে। তারপর জামা কাপড় খাচার (কাচা) পর যদি তোমার সময় থাকে তাহলে তুমি তোমার পড়াশুনা করতেই পারো।

বৌ: আচ্ছা মা, আপনি যা বলবেন, আমি তাতেই রাজি মা।

শাশুড়ি: ঠিক তো।

বৌ: ঠিক আছে মা।

শাশুড়ি: ঠিক আছে যাও, তাহলে পড়াশোনা কর গিয়ে। আমার বৌমা, আমি যা বলবো তাই হবে, হ্যাঁ।

(দৃশ্যান্তর)

বৌ: মা, আমি চাকরি পেয়েছি মা।

শাশুড়ি: বা বৌমা বা, আমি জানতাম তুমি চাকরি পাবে। ওই জন্যই তো আমি তোমাকে পড়াশোনার জন্য উৎসাহ দিতাম। কে আছিস রে, আশে পাশে কে আছিস, আয় আমার বৌমার জন্য একটু মিষ্টি নিয়ে আয়। দাঁড়াও আমি মিষ্টি নিয়ে আসি কেমন, হ্যাঁ দাঁড়াও।

বৌ: কি, দেখলেন তো– একমুহূর্তে বদলে গেলো সবকিছু। যে শাশুড়িমা আমাকে পড়ার অনুমতি দিচ্ছিল না– আজকে আমার সফলতার সে ক্রেডিট নিতে চাচ্ছে। আমাদের নারীদের জীবন হচ্ছে সংগ্রামের জীবন। আমার মতোন আপনার মেয়েদেরও লেখাপড়া শেখান। কারণ সংগ্রামে বাঁচতে গেলে শিক্ষিত হওয়াটা খুব জরুরি। আমাদের নারীদের সংগ্রাম শুরু হয় গর্ভাবস্থায় থেকে।

১০. মুখোশ

ধর্ষণকারী পুজারী: হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। এসব শুনলেও পাপ, এসব শুনলেও পাপ।

পাকড়াওকারী: হরে কৃষ্ণ অ্যাঁ, ধর্মের নামে এসব হচ্ছে!

ধর্ষণকারী পুজারী: না না না। হরে কৃষ্ণ।

পাকড়াওকারী: বুড়া বয়সে ভিমরতিতে ধরেছে তোমায়? ধর্মের নামে এসব হচ্ছে অ্যাঁ!

ধর্ষণকারী পুজারী: না না। আমি আর করবো না! হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। এবারের মতো আমাকে ছেড়ে দাও।

পাকড়াওকারী: আমি আর করবো না! চল চল চল বুড়ো। বুড়ো বয়সে ভিমরতিতে ধরেছে তোমায়।

ধর্ষণকারী পুজারী: এসব সত্যি না, মিথ্যা। আমি সত্যি বলছি। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।

পাকড়াওকারী: ধর্মের নামে এসব?

ধর্ষণকারী পুজারী: ও মা, আমি আর করবো না। এবারের মতো ছেড়ে দাও। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।

পাকড়াওকারী: চল চল থানাতে দেবো তোকে।

ধর্ষণকারী পুজারী: সত্যি বলছি। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। এসব শুনাও পাপ। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। ওরে বাপরে। (মার খেয়ে)

পাকড়াওকারী: চল চল। আজ তোকে থানাতে দেবো।

১১. নরকযাত্রা

পুরোহিতঃ আমি হচ্ছি ভারতীয় গরুর পুরাণ। মা মেয়েকে ছায়ান্নম প্রজাম। ধর্ম ধর্ম পরিচাত্যি। যারা যারা পাপ করবে সেই পাপের শাস্তি আমার মধ্যে লিখা রয়েছে। যে জনপ্রতিনিধি মানুষকে প্রতারিত করবে, যারা ঘুষ খাবে, যারা নির্যাতন করবে তাদের শাস্তি হচ্ছে ক্রিমি ভোজানাম্য। সারা শরীর থেকে রক্ত চুষে চুষে খেয়ে নিবে। হে গরু বাহু জম্রু বাহু নিয়ে এসো সেই অধম কে।

মনে রাখবেন যারা মিথ্যা কথা বলবে, যারা শোষণ করবে, যারা ঘুষ খাবে তাদের একটাই শাস্তি ক্রিমি ভোজানাম। সারা শরীর থেকে রক্ত চুষে খাবে। নিয়ে যাও নরকে তাকে। হা হা হা। আমি ভারতীয় গরুর পুরাণ আর একটি কথা বলে যাচ্ছি যারা শিশুদের ধর্ষণ করবে, তাদের নির্যাতন করবে, মেয়ে কে মেয়ে বলে ভাববে না, তার শাস্তি হচ্ছে পুন্যাভাটাম তাকে গরম জ্বলে ফুটানো হবে, ভাজা হবে, নিয়ে আসো তাকে। হা হা হা। দেখুন আপনারা। হা হা হা, ই হা হা হা, ই হা হা হা। নিয়ে যাও নরকে তাকে।

১২. আত্মঘাতীর বোধোদয়

পেতআত্মাঃ আমি এক অতৃপ্ত ভূত (আত্মা) আমি আত্মহত্যা করে যে পাপ করেছি সেই ভুলটা যেন কেউ না কর। এই কাজটা করে আমি আমার মা বাবাকে কতটা কষ্ট দিয়েছি, তাদের শরীর থেকে প্রাণ নামক জিনিসটাই কেড়ে নিয়েছি। তা এখন আমি ভাল ভাবেই বুঝতে পারছি। তারা বেঁচে আছে শুধুই প্রাণহীন হয়ে। আমি আমার এক সামান্য অযৌতিক (অযৌক্তিক) জেদের জন্য বাবা-মার সাথে ঝামেলা করে আত্মহত্যার পথকে সহজ বলে বেছে নিয়েছিলাম। বাবা-মার কোল শূন্য ও তাদের হাসি খুশির সম্বল কেড়ে নিয়ে গেলাম-

যদিও আজ আমি অক্ষম তবুও ছেলে মেয়েদের কাছে একটা অনুরোধ করতে চাই যে ধৈর্য্য ধর, নিজের উপর, বাবা-মার উপর বিশ্বাস রাখ যে তোমাদের মনের ইচ্ছাকে পূর্ণ করবার জন্যই এই পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছে। তারা যদিও অক্ষম হয়, তবুও নিজেকে সেই যোগ্যতাই নিয়ে যাও যেখানে পৌঁছে তুমি তোমার এবং অপরের সব ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে সক্ষম হতে পার-

নৈতিক উপদেশ: আত্মহত্যা মহা-পাপ যা করলে পরিবারের একে অপরের দুঃখের কারণ হয়ে দাড়ায় ও পৃথীবিতে (পৃথিবী) মানব রূপে জন্মানর উদ্দেশ্য বৃথা হয়ে যায় ॥

১৩. সাম্প্রদায়িকতা

হা হা হা, আমি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হা হা হা। যে সম্প্রদায়ে একবার পদার্পন করি সেই সম্প্রদায়কে আমি ছিন্ন ভিন্ন করে দিই। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে হা–হা–কার নামিয়ে আনি। আমার আগমনে সব এলাকায় হা–হা–কার শুরু হয়ে যায়। আমি মাঝে মাঝে সারা পৃথিবী জুড়ে তছ নছ করে বেড়ায়। ই হা হা হা। ফ্রান্স, ব্রাজিয়া (ব্রাজিল?), ইরাক, জাপান, ভারত কোনো দেশ আমার হাত থেকে পার পাইনি।

১৪. মানবতা

মানবতা-১

মানবতা-২

নিম্নলিখিত বক্তব্য লিখিত কাগজ ভাস্কর্যের পেছনের পর্দায় সাঁটানো)

"না মুসলমান-না শিখ-না খ্রিস্টান,/আমি মানুষ,/ আমার ধর্ম **মানবতা**"

ছদ্মবেশীর বিষয় ও পরিবেশনশৈলী

ছদ্মবেশীতে প্রদর্শিত বিষয়, আঙ্গিক ও পরিবেশনশৈলী অভিনব। ক্ষেত্রসমীক্ষণকৃত নমুনাসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ছদ্মবেশীর বিষয়, আঙ্গিক ও পরিবেশনশৈলী নিম্নে প্রদত্ত হলো–

বিষয়

ছদ্মবেশী পরিবেশনায় বিষয় হিসেবে দেখা যায় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সমকালীন প্রসঙ্গ। যেমন পৌরাণিক বিষয় হিসেবে দেখা যায় রাধা-কৃষ্ণ, দুর্গার অসুরবধ, সতীর দেহত্যাগ, কালীয়দমন, সীতার বনবাস, হনুমানের লঙ্কাজয় ইত্যাদি। ঐতিহাসিক বিষয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মাগান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, লোকনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সমকালীন প্রসঙ্গে উপস্থাপিত হয় 'ছদ্মবেশী' অনুষ্ঠানের আগের বছরের উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তু– বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্নীতি, সামাজিক সমস্যা ও সচেতনতা ইত্যাদি।[৫৭]

ক্ষেত্রসমীক্ষণকৃত ছদ্মবেশীতে পরিবেশিত নমুনাসমূহে হোটেল-রেস্টুরেন্টে মরা পশুর মাংস বিক্রয়, ভোট গ্রহণে কারচুপি, ধর্ষণ, পরিবেশ, জাতিগত দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সমকালীন প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। এ কথা স্বীকার্য

যে, দেশ ও সমাজের প্রথাগত রীতি ও কল্যাণ ভাবনা যখন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থে ব্যবহৃত হয় তখন উক্ত পরিস্থিতি সমাজের সিংহভাগ মানুষের মনে চাপ সৃষ্টি করে এবং সহজ কোনো উপায়ে চাপ মুক্তির সুযোগ থাকে না বলে বিকল্প পথে চাপ মুক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়। ছন্দবেশীতে সমকালীন প্রসঙ্গের অবতরাণার মূলেও রয়েছে ভুক্তভোগী মানুষের চাপমুক্তির প্রত্যাশা। ছদ্মবেশীতে অংশগ্রহণকারীগণ চাপমুক্তির পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক উপায়ে সমকালীন অনাচার থেকে সমাজকে কলুষমুক্ত দেখতে চায়। ফলে ছদ্মবেশী পরিবেশনা কেবলই 'যেমন খুশি তেমন সাজ' নয়– নিছক বিনোদন নয়– সামাজিক সংযোগ সুরক্ষার পর্যাপ্ত উপকরণে সমৃদ্ধ এই পরিবেশনার কার্যকারিতা ব্যাপক ও গভীর।[৬০]

অভিনয়শৈলী

ছদ্মবেশীতে পরিবেশিত নমুনাসমূহ পর্যালোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ছদ্মবেশীর পরিবেশনা কোনো দীর্ঘব্যাপ্তির নাট্যের পরিবেশনা নয়, বরং সামাজিক সচেতনতা সম্পর্কিত বিভিন্ন নির্ধারিত বিষয়ের ছোট ছোট খণ্ড দৃশ্য বা অনুদৃশ্যের নাট্যিক পরিবেশনা। এ নাট্যিক পরিবেশনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংলাপাত্মক এবং এর অভিনয় নিষ্পন্ন হয়েছে চরিত্রাভিনয়রীতিতে। তবে অভিনয়ে ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের স্টাইলাইজড পারফরমেন্সের প্রভাবও ছদ্মবেশীর অভিনয় শৈলীতে বিদ্যমান। তাই অ্যাকশন ও এক্সপ্রেশনে বাস্তবতার অতিরঞ্জন একটি বিশেষমাত্রায় উপস্থাপিত। তবে বাস্তবানুগ অভিনয়ধারাও কোনো কোনো নাট্যিক পরিবেশনায় লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া কোনো কোনো পরিবেশনা একক চরিত্রের অভিনয়ক্রিয়ায় একক- কথনে/সংলাপে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। যেমন: ভাগাড় কাণ্ড ১, ভাগার কাণ্ড ২, পরিচ্ছন্নতা, ভোটরঙ্গ, নরকযাত্রা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি। এমনকি এই পরিবেশনায় চরিত্রের সংলাপবিহীন একক অভিনয় বা হাব-ভাব সহযোগে নির্বাক অভিনয়ও প্রত্যক্ষ করা গেছে। যেমন: আত্মঘাতীর বোধোদয়। এছাড়া ছদ্মবেশীর কোনো কোনো নাট্যিক পরিবেশনা নৃত্য-গীত-বাদ্য ও হাব-ভাব সহযোগে উক্তি-প্রত্যুক্তি আকারে পরিবেশিত হয়েছে। যেমন: ট্রাফিক সচেতনতা।

মঞ্চ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে চতুর্দিক দর্শক পরিবেষ্টিত ভূমিসমতল চৌকোন খোলামঞ্চে ছদ্মবেশী প্রদর্শিত হয়েছে।[৬১] এই মঞ্চের সুবিধাজনক স্থানে বিচারক এবং বিশিষ্টজনের আসন নির্দিষ্ট থাকে। স্থানভেদে বা পরিবেশিত স্থানের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী কখনো কখনো ভূমিসমতল বৃত্তাকার খোলামঞ্চেও এর পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। মঞ্চের সুনির্ধারিত কোনো মাপ লক্ষ করা যায় না, যেখানে পরিবেশিত হচ্ছে তার অবস্থানগত দিক বিবেচনা করে এই আয়তাকার বা বৃত্তাকার অভিনেয় মঞ্চের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নির্ণয়ের প্রয়াস দেখা যায়। ধর্মীয় আবহ যুক্ত থাকায় মন্দিরের সম্মুখে অনাড়ম্বরভাবে এই পরিবেশনা পরিবেশিত হওয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ মন্দিরের সম্মুখে রাস্তা ব্যতীত কোনো ফাঁকা জায়গা না থাকায় ছদ্মবেশী রাস্তাতেই পরিবেশিত হয়। অধিকাংশ বাংলা ঐতিহ্যবাহী নাট্য সাধারণত দোহার ও বাদ্যযন্ত্রীর মঞ্চোপরিবেশনসহ পরিবেশিত হয় – কিন্তু ছদ্মবেশীতে তেমনটি লক্ষ করা যায় না। যে নাট্যে নৃত্য-গীত-বাদ্যের ব্যবহার রয়েছে সেখানে বাদ্যযন্ত্রী ভ্রাম্যমাণ অভিনয় সহযোগী হিসেবে মঞ্চে প্রবেশ করে এবং পরিবেশনা শেষে মঞ্চ ত্যাগ করে। যেমন: ট্রাফিক সচেতনতা। মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চোপকরণও অত্যন্ত নিরাভরণ। কোনো কোনো পরিবেশনায় ভ্যান, অটোরিক্সা, মোটর সাইকেল প্রভৃতি পরিকল্পনা-মাফিক সাজিয়ে ভ্রাম্যমাণ সেটের একটি অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। যেমন: সেলফি, নরকযাত্রা ইত্যাদি। তবে মঞ্চপরিকল্পনায় কখনো কখনো বাস্তবধর্মী সেটের প্রচলনও কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু নিরাভরণ শূন্যমঞ্চই (empty-space) এই পরিবেশনার প্রধান প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

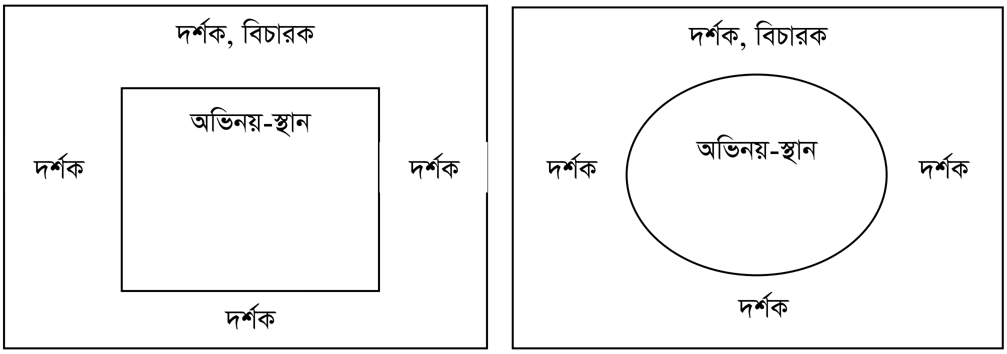

চিত্র: ছদ্মবেশীর মঞ্চ

পোশাক ও রূপসজ্জা

ছদ্মবেশীর পরিবেশনায় অভিনেতার পোশাকসজ্জা অত্যন্ত সরল, বাহুল্যবর্জিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিনেতার চরিত্রের সঙ্গে মানানসই দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য পোশাক ব্যবহারের প্রবণতা এখানে মুখ্য। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনে পোশাক পরিকল্পনায় সুস্পষ্ট ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। দেব-দেবী, ভূত-প্রেত বা সিম্বলিক চরিত্রের ক্ষেত্রে এই বিশেষ পোশাক নির্মাণ ও সজ্জার গুরুত্ব চোখে পড়ে। এছাড়া কোনো কোনো পরিবেশনায় নিউট্রাল বা চরিত্র-নিরপেক্ষ পোশাকপরিকল্পনাও দেখা যায়। দৈনন্দিন ব্যবহার্য পোশাক ব্যবহারের প্রবণতা থাকলেও পোশাক-পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে কখনো কখনো প্রতীকায়নের প্রবণতাও বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। যেমন: আত্মঘাতীর বোধোদয়, সাম্প্রদায়িকতা, মানবতা-১, মানবতা-২ ইত্যাদি।

রূপসজ্জার ক্ষেত্রে ছদ্মবেশীর পরিবেশনায় তিন ধরনের সজ্জা লক্ষ করা যায়– স্ট্রেট মেকাপ, ক্যারেক্টার মেকাপ ও ফ্যান্টাসি মেকাপ। তবে কোনোরূপ মেকাপ ছাড়াও এই পরিবেশনা হতে দেখা যায়। নারী-অভিনেতারা সাধারণত দৈনন্দিন জীবনে যে ধরণের রূপসজ্জা গ্রহণ করে থাকে এই নাট্যিক পরিবেশনাতেও তারা একই ধরণের রূপসজ্জায় সজ্জিত হয়ে অভিনয় সম্পন্ন করে থাকে। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের সজ্জাকে সাঙ্গীকৃত করে ছদ্মবেশীতেও পুরুষকে নারীর বেশ ধারণ করতে দেখা যায়। যেমন– ভাগার কাণ্ড-১ এবং ভাগার কাণ্ড-৩। ফ্যান্টাসি মেকাপের ক্ষেত্রে সাধারণত জিংক অক্সাইড, রেড অক্সাইড, কাজল, বিভিন্ন ধরণের রঙ ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষণীয়।

প্রপ্স

এই নিরাভরণ/অনাড়ম্বর পরিবেশনায় যেটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তা হলো অভিনয়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভার বা প্রপস্-এর ব্যবহার। অভিনয়ের বাস্তবধর্মীতার চিন্তাপ্রসূত পরিবেশনায় কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রপসের এই ব্যবহার বলে প্রতীয়মান হয়। প্রপস্ হিসেবে দেখা যায়– ডাক্তারি পেশার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সামগ্রী, ছেঁড়া-জুতার মালা, গামছা, লাঠি, দড়ি, জপের মালা, ঝাঁটা, খুন্তি, খড়গ, হাতপাখা, বটি, থালা, হাতব্যাগ, মোবাইল প্রভৃতি। যেমন: মুখোশধারী, ভাগাড় কাণ্ড-২, ভাগাড় কাণ্ড-৩, সেলফি, ফেসবুক ম্যানিয়া, পরিচ্ছন্নতা, নারীর সংগ্রাম, নরকযাত্রা ইত্যাদি।

আলো

ছদ্মবেশী পরিবেশনায় আলোক সম্পাতের কোনো ব্যবস্থা নেই অর্থাৎ পরিবেশনাটি ফ্লাট লাইটে মঞ্চায়ন করা হয়।

ছদ্মবেশী পরিবেশিনার অভিনয়াদিতে অর্থাৎ অভিনয়, মঞ্চ ব্যবস্থাপনা, পোশাক, রূপসজ্জা, আলোক পরিকল্পনা ইত্যাদিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের পরিবেশনরীতি অনুসৃত হয়েছে।[৬২] ছদ্মবেশীর বিষয় ও পরিবেশনশৈলী পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে এই কথা যায় যে, ছদ্মবেশীর বিষয় ও পরিবেশনার সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের বিষয় ও পরিবেশনার সাদৃশ্য রয়েছে।

ছদ্মবেশের উদ্ভব

গম্ভীরা উৎসবের ছদ্মবেশী প্রত্যয়টির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং পরিবেশনশৈলী আলোচনা শেষে এবার ছদ্মবেশীর উদ্ভব ও বিকাশের সূত্রসমূহ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ছদ্মবেশী পরিবেশনার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় 'ছদ্মবেশ', 'আত্মপাপ স্বীকার' ও 'প্রতিযোগিতা'– এই তিনটি বিষয় ছদ্মবেশী পরিবেশনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ছদ্মবেশী পরিবেশনায় উক্ত তিনটি বিষয়ের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

শোভাযাত্রা-সঙসজ্জার রূপান্তর ও ছদ্মবেশী

গম্ভীরা উৎসবের শোভাযাত্রার ঐতিহ্য অনুসরণে দেখা যায় বৈদিক যুগে শোভাযাত্রা সঙযাত্রা ইত্যাদি তেমন না থাকলেও পৌরাণিক যুগে তা ব্যাপকতা লাভ করে। এই সময় হতেই সাধারণ মানুষ তথা প্রাকৃতজন শোভাযাত্রায় প্রাকৃত জীবনের নানা অনুষঙ্গ যোগ করতে শুরু করে। ফলে আজকের গম্ভীরা উৎসব বৈদিক হয়ে পৌরাণিক শোভাযাত্রা ও উৎসবকে ধারণ করে।[৬৩] শোভাযাত্রা ও সঙযাত্রায় প্রাকৃতজন সম্পৃক্তির উক্ত সূত্র ধরেই গম্ভীরা উৎসবের 'ছদ্মবেশী' প্রত্যয়টির উৎস ও রূপান্তর লক্ষণীয়।

অধিকাংশ গবেষকের মতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে প্রচলিত চৈত্র সংক্রান্তি কেন্দ্রিক শিব উৎসব বা পূজা-পার্বণই উত্তরবঙ্গ তথা মালদহ অঞ্চলে 'গম্ভীরা' নামে পরিচিত।[৬৪] এই গম্ভীরা উৎসব পালনে সময় ও অন্যান্য বিষয়ে নমনীয়তা দেখা যায়।[৬৫] ফলে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয়ভাবে গম্ভীরা উৎসব হয়ে থাকে।[৬৬] লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে গম্ভীরা উৎসব পালনের কথা বলা হলেও হরিদাস পালিত, প্রদ্যোত ঘোষ প্রমুখ গবেষকবৃন্দ গম্ভীরা অনুষ্ঠানের দিন পরিবর্তনের মধ্যে গম্ভীরায় পূজিত দেবতার লৌকিক চরিত্র লক্ষ্য করেছেন।[৬৭]

ভারতবর্ষের ধর্ম-কর্মের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়– ভারত তথা বাংলার জনজাতির পালিত কৃত্যের সঙ্গে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত হয়ে যে ধর্মীয় বোধ ও কাঠামো নির্মিত হয় তাই পূর্ব ভারত তথা বাংলার নিজস্ব ধর্ম হিসেবে অভিহিত হয়েছে।[৬৮] বাঙালির ধর্মকর্মের ঐতিহ্য অনুসন্ধানে দেখা যায়, '...বাঙালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোমের, এক কথায় বাঙলার আদিবাসীদেরই পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয় বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস।'[৬৯] পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ঋতু পরিবর্তনের কারণে আদিম মানুষের কৃষিকর্মের প্রধান নিয়ামক ছিল সূর্য। ফলে দেবতা হিসেবে সূর্য সেকালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পূজিত হত।[৭০] পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতোই ভারতের আদিম অধিবাসীবৃন্দ (অনার্য বা দ্রাবিড়) 'বৃক্ষ–পশু–লিঙ্গ–লিঙ্গ প্রতীক ও সূর্য পূজক' ছিলো।[৭১] পূর্বভারতের ধর্মীয় কৃত্যের সমন্বয়ের এক পর্যায়ে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে প্রচলিত ধর্মঠাকুরের পূজা ও চৈত্র মাসে শিব কেন্দ্রিক নীল বা চড়কপূজা বাংলায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।[৭২] পরবর্তী পর্যায়ে বাংলায় পূজিত শিবের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও নাথ ধর্মসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের

বিভিন্ন লোকধর্মের উপাদান সংযুক্ত হয়।[৭৩] সংগত কারণে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে শিব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ দেবতার মর্যাদা লাভ করে।[৭৪] এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম ডব্লিউ হান্টারের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য- 'যে সকল সংস্কার আর্য ও আদিবাসীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করেছে, শিব পূজা তার মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।'[৭৫] অবশ্য গম্ভীরার মতো উৎসবে শিব ব্যতীত অন্যান্য লৌকিক দেবতার উপস্থিতি দুর্লক্ষ নয়। লোকায়ত বাংলার চৈত্রসংক্রান্তি কেন্দ্রিক 'জাতীয় উৎসব'– শিবের ধর্মীয় কৃত্য– বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে চড়ক-গাজন-নীলপূজা-দেলপূজা-গমীরা-চৈত্রপূজা-গম্ভীরা ইত্যাদি যে নামেই অভিহিত হোক না কেন এইসব উৎসবের কৃত্যের সময়, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী, শোভাযাত্রা, সঙসজ্জাসহ আরও কিছু বিষয়ে যুগপৎ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।[৭৬] কারণ গম্ভীরায় কালক্রমে শৈব প্রভাব প্রাধান্যলাভ করলেও এর মজ্জায় মজ্জায় বৌদ্ধতান্ত্রিকতার স্বাক্ষর রয়ে যায়। এই স্বাক্ষর এত সূক্ষ্ম যে তা নির্ণয় করা সব সময় সহজ নয়। উল্লেখ্য যে রাজা লক্ষণ সেনের আমলে গম্ভীরা উৎসবে সাজসজ্জা ও অন্যান্য উপকরণ প্রয়োগের মাধ্যমে বৌদ্ধ উৎসব ও শৈব উৎসবের মধ্যে বিভাজনের সচেতন চেষ্টা হয়েছিল।[৭৭]

আদ্যের গম্ভীরায় দেখা যায়, বড় তামাসার অংশ হিসেবে দিবা দ্বিপ্রহরের পর এবং আহারার দিন তৃতীয় প্রহরে ভক্তগণের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।[৭৮] প্রদ্যোত ঘোষ বড় তামাসার দিনে দ্বিপ্রহরে শোভাযাত্রার কথা এবং আহারার দিনে সঙ যাত্রার কথা বলেছেন।[৭৯] পুস্পজিৎ রায়ের পর্যবেক্ষণে বড় তামাসার দিনে সঙের গান বের হতো এবং পূর্বে বড় তামাসার দিন শোভাযাত্রার রীতি থাকলেও এখন তা নেই। কেবল দু একটি জায়গায় শিব ভক্ত গ্রামবাসী 'শিবনাথ কি জয়' ধ্বনিসহ গম্ভীরা মণ্ডপ পরিভ্রমণ করেন।[৮০] হরিদাস পালিত গম্ভীরার শোভাযাত্রাকে সঙযাত্রা না বললেও তিনিসহ আরও দু'একজন শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের সজ্জাকে 'সং সাজা' বলেছেন।[৮১] হরিদাস পালিত গম্ভীরার বড় তামাশা ও আহারার শোভাযাত্রায় লক্ষ করেছেন– 'ভূত, প্রেত, প্রেতিনী, বাজিকর ও বাজিকর-স্ত্রী, কেহ রামাত, কেহ তুবড়ীওয়ালা, কেহ সাঁওতাল প্রভৃতি যাহার যাহা ইচ্ছা সে অদ্ভূত বেশভূষা করিয়া এক গম্ভীরা হইতে গম্ভীরান্তরে গমন করে।'[৮২] গাজনের শোভাযাত্রার মধ্যে সঙ সেজে নৃত্য গীতাদির যে ঐতিহ্য রয়েছে তা গম্ভীরার সঙ ও নৃত্যগীতের অনুরূপ। হরিদাস পালিত শিবের গাজনের ৫ম পর্ব 'উপবাসে'র শোভাযাত্রার নৃত্যের সঙ্গের গম্ভীরার নৃত্যের সাদৃশ্য খুঁজে পেলেও ৪র্থ পর্বের 'মহাহবিষ্যে' সারারাত ধরে যে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি হয় তা গম্ভীরার 'পৌরাণিক ও তান্ত্রিক' নৃত্যের মতো নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[৮৩] সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন স্বল্প শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় বাঙলায় প্রচলিত সঙ ও লেটো গান পনেরো শতকের দিকে পাঁচালির প্রভাবে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে (উনিশ শতকে) তা যাত্রার উপসর্গরূপে দেখা দেয়।[৮৪] সৈয়দ জামিল আহমেদ সঙের অবশেষের মধ্যে গম্ভীরার উদ্ভব লক্ষ করেছেন।[৮৫] উপর্যুক্ত সাক্ষ্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নাচ-গান-সজ্জা সম্পন্ন কৃত্যাদি সঙের প্রভাবে ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যে রূপলাভ করেছে।[৮৬] যেমন- রশীদ হারুন দেখিয়েছেন– কীভাবে 'পুতুল নাচ' সঙের ঐতিহ্যের প্রভাবে 'পুতুল নাট্য' হয়ে উঠেছে।[৮৭] গাজন ও গম্ভীরার শোভাযাত্রা ও সঙের ক্রমবিকাশ এই অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে যে, গাজন ও গম্ভীরার শোভাযাত্রা ও সঙের পরিবর্তনের ফলে গম্ভীরা উৎসবের অঙ্গ হিসেবে 'ছদ্মবেশী' পরিবেশনাটি উদ্ভাবিত হয়েছে।[৮৮]

আত্মপাপ স্বীকার ও ছদ্মবেশী

গম্ভীরা উৎসবের অন্যতম দিক হলো আত্মপাপ স্বীকার ও তার প্রতিকার। উক্ত পাপ স্বীকারোক্তি বৌদ্ধ আদর্শ থেকে আগত।[৮৯] গম্ভীরায় আত্মপাপ স্বীকার ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

> গোপনে কেহ কোন অপরাধ করিলে, অপর ব্যক্তি গম্ভীরা মণ্ডপে, বহুজনসমক্ষে সেই অপরাধী ব্যক্তির অপরাধের পূর্ণ-ইতিহাস রঙ্গালয়ের অভিনয়ের ন্যায় অভিনয় করিয়া দেয়। ইহাতে অপরাধী লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে এবং দশের নিকট তাহার আচরিত গুপ্ত রহস্যের উজ্জ্বল অভিনয় দর্শনে ভবিষ্যতের জন্য কেবল

> যে ঐ ব্যক্তিই সাবধান হয়, তাহা নহে। অপরাপর ব্যক্তিও ঐ প্রকার কোন অপরাধ গোপনে বা প্রকাশ্যে আচরণ করিতে আদৌ সাহসী হয় না।[৯০]

কালের পরিক্রমায় পাপ স্বীকারোক্তিতে মানুষের মধ্যে কুণ্ঠা ও অনীহা দেখা দেয়। গম্ভীরা উৎসবের প্রাথমিক যুগে উৎসব চলাকালীন সমাজের বিচার কাজও সম্পন্ন হতো। সেখানে অপকর্ম অনুযায়ী মানুষের শাস্তিরও ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে প্রকাশ্যে মানুষের শাস্তি বিধানে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। সমাজের এই অবস্থায় গম্ভীরা পরোক্ষভাবে অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে সমাজকে কলুষমুক্ত রাখতে সহায়তা করেছে। বর্তমানেও গম্ভীরার শোভাযাত্রা ও সঙ অর্থাৎ ছদ্মবেশী এবং গম্ভীরা গানের বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের অপরাধমূলক কাজের প্রতিরূপায়ণ করা হয়– যা আত্মপাপ স্বীকারের নামান্তর মাত্র। এখানে অপরাধী সরাসরি পাপ স্বীকার করে না বটে কিন্তু পবিত্র দায়বোধ থেকে পরিবেশক অপরাধীর অভিনয়ের মাধ্যমে দেশ ও সমাজকে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি দানের লক্ষ্যে দশজনের কাছে জাতির পাপমুক্তির আশা করে। কখনো কখনো গম্ভীরার মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তি বিষয়টিকে সহজভাবে না নিতে পেরে গুন্ডামিসহ প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে গম্ভীরা আয়োজকদের হেনস্থা করতে সচেষ্ট হলেও পরিণামে তা ব্যর্থ হয়।[৯১] উদারহণ হিসেবে ছদ্মবেশীর ক্ষেত্রসমীক্ষণকৃত পরিবেশনা ভাগাড়কাণ্ড-২, ভোট রঙ্গ, আত্মঘাতীর বোধোদয় ইত্যাদির কথা বলা যায়। গম্ভীরার শোভাযাত্রা ও সঙসজ্জার কৃত্যাদি আত্মপাপ স্বীকারের যে ঐতিহ্য বহন করছে সেই সূত্রেই ছদ্মবেশীর আত্মপাপ স্মরণ বিষয়টি বিবেচিত হতে পারে।

ছদ্মবেশ প্রতিযোগিতা ও ছদ্মবেশী

মালদহের গম্ভীরা উৎসবে একটি বিশেষ দিনে গম্ভীরার সঙ অনুষ্ঠিত হয়।[৯২] সাধারণত গম্ভীরা পূজার চতুর্থ দিনে এই সঙ উৎসব পালিত হয়। পুরাতন মালদহ অঞ্চলে বৈশাখসংক্রান্তিতে তা পালিত হয়।[৯৩] মালদহের ইংরেজ বাজারের হাটখোলা, পুরাটুলী (পুড়াটুলী?) ও জামতলাতে ১৬ই বৈশাখ সঙ উদযাপিত হয়।[৯৪] দু একটি অঞ্চলে সঙের প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে এবং 'এই প্রতিযোগিতা খুবই আকর্ষণীয়। আবালবৃদ্ধবনিতা বিভিন্নরূপে নিজেকে সাজিয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে।'[৯৫] হরিদাস পালিত মনে করেন একমাত্র প্রতিযোগিতার কারণেই সেকালে গম্ভীরা উৎসব শিল্প-সুষমা লাভ করেছিল।[৯৬] অন্যদিকে সঙযাত্রায় যখন প্রতিযোগিতা ছিল তখন সঙসজ্জার নিয়মাবলি কঠোরভাবে মেনে চলা হতো।[৯৭] গম্ভীরাগানের প্রতিযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই বিশ শতকের প্রথম দুই দশক পর '...গম্ভীরার পূজা ও তৎসংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম হ্রাস পেয়ে সঙ্গীত ও নৃত্যের দিকটা প্রধান হয়ে উঠেছে।'[৯৮] সংগতকারণে এই কথা স্বীকার্য যে, গাজন ও গম্ভীরা উৎসবের সজ্জা, গম্ভীরাগান, শোভাযাত্রা ও সঙসজ্জার প্রতিযোগিতার মধ্যেই গম্ভীরা উৎসবের অঙ্গ ছদ্মবেশীর প্রতিযোগিতার বীজ উপ্ত ছিলো।[৯৯]

উপসংহার

ছদ্মবেশী পরিবেশনার শোভাযাত্রা ও সঙসজ্জা, আত্মপাপ স্বীকার ও ছদ্মবেশ প্রতিযোগিতা যে চৈত্রসংক্রান্তি কেন্দ্রিক শৈব উৎসব তথা গম্ভীরার ঐতিহ্যবহন করছে তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। অর্থাৎ বাংলার চৈত্রসংক্রান্তি কেন্দ্রিক শৈব উৎসবই 'ছদ্মবেশী' পরিবেশনার মূল অনুঘটক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় প্রাকৃতজনের কৃত্য ও রুচিই নাট্যরীতি উদ্ভবের মূলে সক্রিয়ভাবে কাজ করে।[১০০] এ কথা আজ প্রমাণিত যে, প্রাকৃতজনের কৃত্যের সংস্কৃত ও যুগোপযোগী শিল্পিত রূপই দেশ-কাল-পাত্রকে অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী তার সৌরভ ও সৌন্দর্য ছড়িয়ে দেয়।[১০১] পরিবেশন শিল্পকলার অন্যতম প্রবক্তা Richard Schechner মনে করেন পরিবেশনা শিল্পকলা আনন্দ-বিনোদন প্রদান, সৌন্দর্য সৃষ্টি, সংহতি সৃষ্টি, শান্তি দান ও শিক্ষা দিয়ে শুভ-অশুভের বোধ জাগ্রত করে মানুষের মধ্যে আত্মসত্তা ও জাতিসত্তার বোধ সৃজনের মাধ্যমে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। তাঁর মতে আট প্রকার পরিবেশনা শিল্পের মধ্যে অন্যতম কৃত্যমূলক

পরিবেশনা (in ritual-sacred and secular)। তিনি ২০,০০০-৩০,০০০ বৎসর পূর্বের সমাধীস্থলে কৃত্যমূলক পরিবেশনার বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ করেছেন। Richard Schechner কৃত্যমূলক পরিবেশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে এগারোটি বিষয়ের (theme) উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে আদি পরিবেশনা, পরিবেশনার নির্দিষ্ট স্থান ও কাল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল সামাজিক কাঠামোয় নাট্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে আদি পরিবশেনায় নবতর মাত্রা সংযোজন ইত্যাদি অন্যতম।[১০২] তিনি মানব সমাজের ক্রমবিকাশে পরিবেশনা শিল্পকলার যে ভূমিকা লক্ষ করেছেন এবং কৃত্যমূলক শিল্পকলায় যে বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ করেছেন– গম্ভীরা উৎসবের 'ছদ্মবেশী' পরিবেশনায় সেইসব বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রায় উপস্থিত। কাজেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চলের পুরাতন মালদহের গম্ভীরা উৎসবে চতুর্থ দিন অর্থাৎ বৈশাখ সংক্রান্তিতে পরিবেশিত সঙসজ্জা পরিবেশনাটি 'ছদ্মবেশী' অভিধায় গৃহীত হতেই পারে। বস্তুত 'ছদ্মবেশী' ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যধারায় একটি মূল্যবান সংযোজন। 'ছদ্মবেশী' চৈত্রসংক্রান্তির আবহমান ঐতিহ্যকে সাঙ্গীকৃত করেই পরিবেশনার মাহাত্ম্যে ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের ধারায় সঞ্জীবনী সুধা দান করে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে স্থান করে নিবে– একথা অনুমান করাই সঙ্গত।

তথ্যনির্দেশ

১ ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পাঁচটি থানাই ১৮১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন মালদহ জেলার অংশ ছিল। সুতরাং বলা যেতে পারে গম্ভীরা মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত।

হরিদাস পালিত তাঁর *আদ্যের গম্ভীরা* গ্রন্থে সরাসরি গম্ভীরার সঙ্গে লোকনাট্যের সম্পর্কের কথা না বললেও একথা বলেছেন যে, গম্ভীরা গানের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে 'লোকেরা স্ত্রী পুরুষাদি বেশে' সজ্জিত হয়ে অভিনয় করে। গম্ভীরা উৎসবের মধ্যে লোকনাট্যের উপাদান পরবর্তী পর্যায়ের গবেষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, ফণীপাল সম্পা. (কলকাতা: বলাকা, ২০১৩), পৃ. ৫৩; প্রদ্যোত ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা: পুনর্বিচার*, পৃ. ৮৪-৮৫; সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ* (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৮), পৃ. ১৩০; সেলিম আল দীন, "মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য", *সেলিম আল দীন রচনা সমগ্র-৪*, সাইমন জাকারিয়া সম্পা. (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯), পৃ. ৩৩৭; সঞ্জীব নাথ, *বাংলার লোকনাট্য: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য* (কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৩), পৃ. ৬৬ ও ৬৭; পুষ্পজিৎ রায়, *গম্ভীরা* (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৯), পৃ. ১৮; গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা* (কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), পৃ. ৫৩৯

২ প্রদ্যোত ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা: পুনর্বিচার* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৩), পৃ. ১৭

৩ হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ৩৭; প্রদ্যোত ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা: পুনর্বিচার*, পৃ. ১৭; পুষ্পজিৎ রায়, *গম্ভীরা*, পৃ. ০৮; পল্লব সেনগুপ্ত, *পূজা-পার্বণের উৎসকথা* (তৃতীয় সংস্করণ; কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০১), পৃ. ২৪৪-৪৫

৪ মালদহ জেলার পুরাতন মালদহের কালাচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত ১৫.০১.২০২০ তারিখের বৈঠক থেকে জানা যায় ৩১শে বৈশাখের পরের গম্ভীরা উৎসবের অঙ্গটির নাম 'সারিগান।' কালাচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাহুলরঞ্জন দাসের (৫২) আয়োজনে উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদহের গম্ভীরা ব্যক্তিত্ব অরুণ বসাক (৭৫), সুনীলকুণ্ডু (৭৩), রবিশংকর ঘোষ (৪৫), এবং কালাচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক সৌমিত্র দাস (৪৫)।

৫ পুষ্পজিৎ রায়, *গম্ভীরা*, পৃ. ৯

বাংলা একাডেমির *বিবর্তণমূলক বাংলা অভিধানে* ছদ্ম শব্দজাত ছদ্মবেশ সংক্রান্ত শব্দের অর্থ নিম্নরূপ:

ছদ্মবেশ- পরিচয় গোপন করার জন্য কৃত্রিম বেশ ধারণ, ভণ্ডামি, লুকানো অবস্থা; ছদ্মবেশধারী- কপট বেশ ধারণকারী; ছদ্মবেশী- কপট লোক, কপট বেশ ধারণকারী; ছদ্মব্যবহার- কপট আচরণ; ছদ্মভাবে- গোপনে; ছদ্ম-লক্ষণ- ভুয়া বৈশিষ্ট্য; ছদ্মসাজ- পরিচয় গোপন করার উপযুক্ত সাজ; ছদ্মী- ছদ্মবেশধারী।

বিবর্তণমূলক বাংলা অভিধান, ১ম খণ্ড, গোলাম মুরশিদ সম্পা. (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৩)

[৬] প্রদ্যোত ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা: পুনর্বিচার*, পৃ. ১২৮; শচীকান্ত দাস, *মুখোশ সংস্কৃতি ও নৃত্য* (কলকাতা: বইওয়ালা, ২০১৫), পৃ. ১৬৬

[৭] পুষ্পজিৎ রায়, "গম্ভীরায় গণতন্ত্রের প্রসঙ্গ" *মুখোশের কথা ও অন্যান্য* (কলকাতা: শ্রীভারতী প্রেস, ২০১৭), পৃ. ২৫৪-৫৫

[৮] 'গম্ভীরা শব্দের অর্থটি খুব স্পষ্ট নহে।' আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* (৩য় সংস্করণ; কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬), পৃ. ১৯৪

[৯] হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ৩১

[১০] প্রদ্যোত ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা: পুনর্বিচার*, পৃ. ৫

[১১] পুষ্পজিৎ রায়, *গম্ভীরা*, পৃ. ৩

[১২] হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ৫৩ ও ৫৭

[১৩] পুষ্পজিৎ রায়, *গম্ভীরা*, পৃ. ১৬-২০

[১৪] প্রদ্যোত ঘোষ, "গম্ভীরা", *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পা. (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০১২), পৃ. ১১৭

[১৫] প্রদ্যোত ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা: পুনর্বিচার*, পৃ. ৭৮

[১৬] পুষ্পজিৎ রায়, *গম্ভীরা*, পৃ. ২২-২৩

[১৭] বিপ্লব চক্রবর্তী, *মালদা জেলার থিয়েটার চর্চায় গম্ভীরা* (নদিয়া: তবুও প্রয়াস, ২০১৮), পৃ. ১৬; অমরচন্দ্র কর্মকার, *গঙ্গা-মহানন্দার দোয়াব অঞ্চল: কালে কালোত্তরে* (মালদহ: সূর্যাবর্ত, ২০১৫), পৃ. ১৪৫;

[১৮] সাক্ষাৎকার: অমরমণ্ডল (৬০+, সরকারি চাকুরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত, বিশিষ্ট গম্ভীরা শিল্পী, অন্বেষা সাংস্কৃতিক মঞ্চের (১৯৮৯-৯০, মানিকপুর, মাদাপুর, মালদহ) প্রধান পুরুষ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২৪.০৫.২০১৭; অসীম রায়, (৫৮+, ব্যবসায়ী) বিশিষ্ট গম্ভীরা শিল্পী, ফুলবাড়ী গম্ভীরা দলের (১৯৯৮) প্রধান পুরুষ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২৫.০৫.২০১৭।

[১৯] সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর: বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, পৃ. ৩১

[২০] সেলিম আল দীন, "মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য", *সেলিম আল দীন রচনা সমগ্র-৪*, পৃ. ৩৩৭

[২১] প্রদ্যোত ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা: পুনর্বিচার*, পৃ. ১৩০

[২২] নিতাই দাস, "পুরাতন মালদহের গম্ভীরা", *ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে পুরাতন মালদহ*, রাধাগোবিন্দ ঘোষ সংকলিত (পুরাতন মালদহ: দেবদেউল গ্রন্থ প্রকাশন সমিতি, ১৯৯৯), পৃ. ২৩৭

[২৩] হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ৩২; প্রদ্যোত ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা: পুনর্বিচার*, পৃ. ৪

হরিদাস পালিত বাংলার অন্যত্র চৈত্রসংক্রান্তি কেন্দ্রিক গম্ভীরা জাতীয় উৎসবের প্রচলন লক্ষ করেছেন:

দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় গম্ভীরা উৎসবের মতো একটি উৎসব পালিত হয়। তাছাড়া উৎকল, মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান, নবদ্বীপ, হুগলী, চব্বিশ-পরগণা, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর ইত্যাদি জেলাতে গম্ভীরা উৎসবের মতো যে উৎসব পালিত হয় তা 'গাজন' নামে খ্যাত। হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ৩২।

[২৪] হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ২৪ ও ৩৪

[২৫] প্রদ্যোত ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা: পুনর্বিচার*, পৃ. ২

[২৬] পুষ্পজিৎ রায়, *গম্ভীরা*, পৃ. ৩৮।

[২৭] গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা* (কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), পৃ. ৫৩৯

[২৮] সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, পৃ. ১৩৫; হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ.৭৯

[২৯] হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ৬৬

[৩০] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসংস্কৃতি* (নয়া দিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ২০১৭), পৃ. ৬৬

[৩১] প্রদ্যোত ঘোষ, "গমীরা", *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পা., পৃ. ১১৪

[৩২] মনোহর বসাক, *উদ্বাস্তু তাঁতিদের চৈত্রপূজা* (কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৬), পৃ. ১৫

৩৩ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, পৃ. ৬৬-৬৭

গাজন শেষ হয় চৈত্রের শেষ দিনে (কোথাও বা পয়লা বৈশাকে) তার আগে যে কোনওদিন শুরু করা যায়। সেই অনুযায়ী কেথাও দীর্ঘ গাজন– দশ বারোদিন আগে আরম্ভ হয়, কোথাও বা চার পাঁচ দিন আগে। মনোহর বসাক, *উদ্বাস্তু তাঁতিদের চৈত্রপূজা*, পৃ. ১৮

৩৪ মহীতোষ খাঁড়া, "গাজন" *লোকসংস্কৃতি বিশ্বকোষ*, দুলাল চৌধুরী ও পল্লবসেন গুপ্ত সম্পা. (দ্বিতীয় সংযোজন; কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০১৩), পৃ. ২২৯

৩৫ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫), পৃ. ৪৮৩।

৩৬ হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ৬৯; আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, পৃ. ৬৮-৬৯

৩৭ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, পৃ. ১১৯

৩৮ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গীয় শব্দকোষ* অভিধানে সঙ শব্দটির নিম্নোক্ত অর্থ করেছেন:

আপনার বাস্তবিক রূপ ঢাকার নিমিত্ত ধৃত-কৃত্রিম বেশ; হাস্যোদ্দীপক বেশধারী; চঙ। কৌতুকজনক অভিনয়: তামাশা। রঙ্গস্থলে বিস্তৃত আকারে বা অঙ্গভঙ্গিতে দর্শকের কৌতুকজনক হাস্যোদ্দীপক অভিনেতা। কৌতুককর হাস্যজনক বিষয়ের বা সামাজিক কুৎসিত বিষয়ের প্রতিমুর্ত্তি বা চিত্র। সং দেওয়া– রঙ্গস্থলে সং-অভিনেতার অভিনয় করান। সং সাজা– সং এর বেশ ধারণ করা। সং সাজান– সং এর বেশ ধারণ করান।

৩৯ সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, পৃ. ৩২৫

প্রসঙ্গক্রমে একটি সঙের উপস্থাপনা লক্ষণীয়:

প্রায় তিন দশক আগে মটর ইংরেজবাজারে সঙ বের করেছিলেন। একটা ছাগলের গায়ে চাকা চাকা লাল ছাপ দিয়ে তাঁকে সমস্ত শহর পরিভ্রমন করান। উৎসুক জনতাকে বলতে থাকেন– 'এই চকরা-বকরী সমস্ত বাঁদর খ্যায়াছে।' রসোপলব্ধির জন্য এর পূর্ব ইতিহাস জানা প্রয়োজন। ননী চক্রবর্তী নামে এক শিকারী মালদহের বানরকুলকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করেন বন্দুকের গুলিতে এবং সরকার কর্তৃক পুরস্কৃতও হন। কারণ বানরগুলো মালদহের শস্যাদি উদরস্যাৎ করছিল। এই ঘটনার পিছনে অর্থনৈতিক কারণ যাই থাকুক না কেন, নিরীহ শাখামৃগদের বর্বরোচিত নিধনে লোকসমাজ ব্যথিত হয়েছিল। এখানে চক্রবর্তী হলো চক্রা বকরী [ছাগল]। প্রদ্যোত ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা: পুনর্বিচার*, পৃ. ১২৭।

৪০ "Although the swang is something new in the folk literature of Bengal and India, it has had a long history and its roots go back to the history past- back to the folk-songs and folk-poetry such as were current amongst all racial and linguistic groups in India- the Non- Aryan Tribes as well as Aryans both included." উদ্ধৃত: সুবোধ সেন, *উত্তরবঙ্গের লোকনাটক ও জনজীবন* (কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০২) পৃ. ২৭

৪১ মনোহর বসাক, *উদ্বাস্তু তাঁতিদের চৈত্রপূজা* পৃ. ৫২-৫৩

৪২ *সরল বাঙ্গালা অভিধান*, সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত (অষ্টম সংস্করণ; কলকাতা: নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫), পৃ. ৫৫১

৪৩ *বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান*, (প্রথম খণ্ড), গোলাম মুরশিদ সম্পা. (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৩), পৃ. ৯৮২

৪৪ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩/৫২, *উপনিষদ* (অখণ্ড সংস্করণ), অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ এবং মহেশচন্দ্র ঘোষ অনূদিত ও সম্পা. (কলকাতা: হরফ, ১৯৯৪), পৃ. ৩৭৮

৪৫ শিব পুরাণ, সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ অনূদিত (কলকাতা: প্রত্যয় প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ২৯

৪৬ হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ১২২

৪৭ শিব পুরাণ, পৃ. ১৮-১৯

৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-৩০

৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২

৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২০

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-২১৮

[৫২] রামেশ্বর, *শিব সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন*, শ্রী যোগিলাল হালদার সম্পা. (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭), পৃ. ২৮২-৮৩

[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭-৮৯

[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫-৯৬

[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫-০৬

[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০-৪২

[৫৭] জগজ্জীবন ঘোষাল, *মনসামঙ্গল*, শ্রী সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ দাস সম্পা. (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০), পৃ. ৭৪-৭৬

[৫৮] দেবেশ রায়, *উপন্যাস নিয়ে* (তৃতীয় সংস্করণ; কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬), পৃ. ৩০

[৫৯] বর্তমানে প্রচলিত গম্ভীরার কৃত্য ছদ্মবেশীতে– 'পুরাণকাহিনী থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের মনীষী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের বেশ ধারণ করা হয়। কুসংস্কার, দূষণ, বেকারের জ্বালা, বাজার দর, ভোট, মন্ত্রী, প্রশাসন- এসব বিষয় থাকেই। ইদানীং দেখা যাচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, মহানন্দা বাঁচাও নিয়ে নক্শা।' পুষ্পজিৎ রায়, *মুখোশের কথা ও অন্যান্য*, পৃ. ২৫৪-৫৫

[৬০] পুষ্পজিৎ রায়, "লোকায়ত পারফরম্যানস প্রসঙ্গে", *নন্দন*, অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী সম্পা. (কলকাতা: ৫৩ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, আগস্ট, ২০১৮), পৃ. ৫৬

[৬১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে প্রায় ব্যবধানহীন এই জাতীয় মঞ্চের বেশ প্রশংসা করেছেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "রঙ্গমঞ্চ", 'বিচিত্র প্রবন্ধ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড (১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ; কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৯৫), পৃ. ৬৮০

[৬২] সেলিম আল দীন, "মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য", *সেলিম আল দীন রচনা সমগ্র-৪*, পৃ. ৩৩৪

[৬৩] হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ১২৪-২৫

[৬৪] হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ২৯ ও ৩২; নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, ৪৮৫-৮৬; আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, পৃ. ৬৬; পল্লব সেনগুপ্ত, *পূজা-পার্বণের উৎসকথা*, পৃ. ২২২; প্রদ্যোত ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা: পুনর্বিচার*, পৃ. ০৭

[৬৫] পুষ্পজিৎ রায়, *গম্ভীরা*, পৃ. ১০

[৬৬] এই প্রসঙ্গে গম্ভীরা গবেষকগণের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

চৈত্র মাসের শেষ পাঁচ দিন। তবে বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসেও কোথাও কোথাও গম্ভীরা হয়। হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ১২ ও ৩৪

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এমনকি আষাঢ় মাসেও গম্ভীরা হতে দেখা যায়। পুষ্পজিৎ রায়, *গম্ভীরা*, *লোকসংস্কৃতি*, পৃ. ০৭

চৈত্রে শুরু হয়ে বৈশাখের প্রথম পর্যন্ত গম্ভীরা চলে। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, পৃ. ৫৩৮; চৈত্রের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত গম্ভীরা হয়। সুবোধ সেন, *উত্তরবঙ্গের লোকনাটক ও জনজীবন*, পৃ. ২৬; চৈত্র সংক্রান্তির তিন/চার দিন পূর্ব থেকে শ্রাবণ-ভাদ্র পর্যন্ত গম্ভীরা উৎসব পালিত হয়। সঞ্জীব নাথ, *বাংলার লোকনাট্য: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*, পৃ. ৬৫; প্রদ্যোত ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা: পুনর্বিচার*, পৃ. ১৭; চৈত্র সংক্রান্তির চারদিন আগে, তবে বছরের অন্যান্য সময়েও হতে পারে। পল্লব সেনগুপ্ত, *পূজা-পার্বণের উৎসকথা*, পৃ. ২৪৪

[৬৭] হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ৩৪; প্রদ্যোত ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা: পুনর্বিচার*, পৃ. ১৭; শচীকান্ত দাস, *মুখোশ সংস্কৃতি ও নৃত্য*, পৃ. ৩৫

[৬৮] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (ষষ্ঠ সংস্করণ; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮), পৃ. ১০

[৬৯] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, পৃ. ৪৭৮

[৭০] মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *যার যা ধর্ম* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪), পৃ. ৩৫২

[৭১] সেলিম আল দীন, "নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণ", *সেলিম আল দীন রচনা সমগ্র ৩*, সাইমন জাকারিয়া সংকলিত (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১), পৃ. ৩৬৪

[৭২] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, পৃ. ৪৮৫

---

[৭৩] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৯৬

[৭৪] পল্লব সেনগুপ্ত, *পূজা-পার্বণের উৎসকথা*, পৃ. ২১৯

বাঙলায় সকল পুরুষ দেবতাকে শিব এবং সকল দেবীকে চণ্ডীরূপে চিহ্নিত করার প্রবণতা লক্ষণীয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, পৃ. ৩৫; পল্লব সেনগুপ্ত, *পূজা-পার্বণের উৎসকথা*, পৃ. ২২০; শিব ও বিষ্ণু ধর্মঠাকুরের রূপান্তর মাত্র। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, পৃ. ৪৮৫-৮৬

[৭৫] উইলিয়াম ডব্লিউ হান্টার, পল্লীবাংলার ইতিহাস, ওসমান গনি অনূদিত (প্রথম বিদ্যপ্রকাশ সংস্করণ; ঢাকা: বিদ্যপ্রকাশ, ২০১২), পৃ. ৯৭

[৭৬] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, পৃ. ১১৯; আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৮৪; পল্লব সেনগুপ্ত, *পূজা-পার্বণের উৎসকথা*, পৃ. ২২৫

[৭৭] হারিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ১২০ ও ১৭১

[৭৮] হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ৫১ ও ৫৩

[৭৯] প্রদ্যোত ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা: পুনর্বিচার*, পৃ. ২২, ২৪ ও ১২৬

[৮০] পুষ্পজিৎ রায়, *গম্ভীরা*, পৃ. ০৯ ও ১২

[৮১] হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ১২০; পল্লব সেনগুপ্ত, *পূজা-পার্বণের উৎসকথা*, পৃ. ২২৪

[৮২] হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ৫১

[৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯

[৮৪] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১১, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, পৃ. ২১৬

'এ রীতির (নেটো) নাট্য সঙ নামেও পরিচিত।' সেলিম আল দীন, "মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য", *সেলিম আল দীন রচনা সমগ্র ৪*, পৃ. ৩৫৫

[৮৫] সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর: বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, পৃ. ৩০

[৮৬] সঙ, *লোকসংস্কৃতি বিশ্বকোষ*, পৃ. ২২৬।

[৮৭] '...পুতুল নাট্য সচরাচর মৌখিক রীতির, তবে এর মূল টেক্সট হচ্ছে 'সঙ' অংশ। 'সঙ' অংশে সংযোজক রূপেই এর কাহিনি কাঠামো উপস্থাপিত হয় সংলাপের মাধ্যমে।' রশীদ হারুন, *বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাট্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৪), পৃ. ৩৫

[৮৮] পুষ্পজিৎ রায়, *গম্ভীরা*, পৃ. ০৯; সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১১

'...গম্ভীরা উপলক্ষে অধুনালুপ্ত সং-এর মধ্যে নাটকীয়তা ছিল। গম্ভীরার গান, মনে হয়, খুব পুরনো নয়; আদিতে সং-ই ছিল পরে তা 'গান'-এ পরিণত হয়েছে। পরে এই গানের সঙ্গে সংলাপ যুক্ত হয়ে তা নাটকীয় হয়ে উঠেছে। গম্ভীরা গানের উপস্থাপনায় লোকনাট্যের চরিত্রটি ফুঠে ওঠে।' মনীন্দ্রলাল কুনডু, *বাঙালির নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ* (কলকাতা: সাহিত্যলোক, ২০০০), পৃ. ২০০।

[৮৯] হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ১৩৯; পুষ্পজিৎ রায়, *মুখোশের কথা ও অন্যান্য*, পৃ. ২৫০

[৯০] হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ৮১

[৯১] পুষ্পজিৎ রায়, "গম্ভীরায় গণতন্ত্রের প্রসঙ্গ" *মুখোশের কথা ও অন্যান্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮-২৫৫

[৯২] ডা: দেবপ্রসাদ সাটিয়ার, "স্মৃতির আলোয়ঁ চারুগোপাল শেঠ", *ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে পুরাতন মালদহ*, পৃ. ১০৬

[৯৩] প্রদ্যোত ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা: পুনর্বিচার*, পৃ. ১৬, ১২৮; পুষ্পজিৎ রায়, "গম্ভীরায় গণতন্ত্রের প্রসঙ্গ" *মুখোশের কথা ও অন্যান্য*, পৃ. ২৫৪; শচীকান্ত দাস, *মুখোশ সংস্কৃতি ও নৃত্য*, পৃ. ১৬৬

[৯৪] শচীকান্ত দাস, *মুখোশ সংস্কৃতি ও নৃত্য*, পৃ. ১৬৬

[৯৫] নিতাই দাস, "পুরাতন মালদহের গম্ভীরা", *ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে পুরাতন মালদহ*, পৃ. ২৩৮; পুষ্পজিৎ রায়, *গম্ভীরা*, পৃ. ০৯

[৯৬] হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, পৃ. ৮৪ ও ৮৫

---

[৯৭] মনোহর বসাক, *উদ্বাস্তু তাঁতিদের চৈত্রপূজা*, পৃ. ৬৪

[৯৮] হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা*, ফণীপাল সম্পা. সম্পাদকের কথা, পৃ. ১১

[৯৯] পুষ্পজিৎ রায়, *মুখোশের কথা ও অন্যান্য*, পৃ. ২৫৫

[১০০] সেলিম আল দীন, "মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য", *সেলিম আল দীন রচনা সমগ্র-৪*, পৃ. ৩২৫

[১০১] সেলিম আল দীন, "নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণ", *সেলিম আল দীন রচনা সমগ্র* ৩, পৃ. ৩৫৯

[১০২] Richard Schechner, *Performance Studes: An Introduction* (thrid edition; Routledge: 2013), p. 31, 46, 52, 57

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

কবি হাকিম সানায়ির *হাদিকাতুল হাকিকাহ* : একটি পর্যালোচনা

ড. সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ*

Abstract: Sanai is one of the earlier Sufi poets. He was born in the province of Ghazna in southern Afghanistan in the middle of the 11th century and probably died around 1150. Rumi acknowledged Sanai and Attar as his two primary inspirations, saying, "Attar is the soul and Sanai its two eyes, I came after Sanai and Attar." Sanai was originally a court poet who was engaged in writing praises for the Sultan of Ghazna. Sanai soon went on pilgrimage to Mecca. When he returned, he composed his Hadiqatu'l Haqiqat or The Walled Garden of Truth. Sanai wrote an enormous quantity of mystical verse, of which From *The Walled Garden of Truth or The Hadiqat al Haqiqa* is his master work and the first Persian mystical epic of Sufism. Dedicated to Bahram Shah, the work expresses the poet's ideas on God, love, philosophy and reason. From *The Walled Garden of Truth* has been consistently read as a classic and employed as a Sufi textbook.

ভূমিকা

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্য পরিমণ্ডলে গৌরবময় আসনে সমাসীন করার প্রেক্ষিত বিবেচনায় সুফিকবি হাকিম সানায়ি শীর্ষস্থানীয়। সুফিবাদের উৎকর্ষ সাধনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন তিনি। ইরানের অন্যান্য সুফিকবিদের মাঝে আবু সাঈদ আবুল খায়ের (জন্ম: ৯৬৭ খ্রি.-মৃত্যু: ১০৪৯ খ্রি.), শেখ ফরিদ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (জন্ম: ১১৪৫ খ্রি.-মৃত্যু: ১২২১ খ্রি.), মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (জন্ম: ১২০৭ খ্রি.-মৃত্যু: ১২৭৩ খ্রি.), শেখ সা'দি শিরাযি (জন্ম: ১২১০ খ্রি.-মৃত্যু: ১২৯১-৯২ খ্রি.) এবং আব্দুর রহমান জামি (জন্ম: ১৪১৪ খ্রি.-মৃত্যু: ১৪৯২ খ্রি.) প্রমুখ স্বনামধন্য। তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সুফিবাদী দর্শন লাভ করে এক নব দিগন্ত। ফারসি সুফিকবিদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় আবু সাঈদ আবুল খায়েরের নাম সর্বাগ্রে থাকলেও প্রথম সার্থক সুফিকবি হিসেবে কবি হাকিম সানায়ি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল। তিনিই প্রথম আধ্যাত্মিক বিষয়াবলি পূর্ণাঙ্গরূপে কবিতায় চিত্রায়িত করেন। কবির জীবদ্দশায় সমকালীন শাসক বাহরাম শাহ (জন্ম: ১০৮৪ খ্রি.-মৃত্যু: ১১৫৭ খ্রি.) গযনবির সান্নিধ্য লাভ করেন। কবি হাকিম সানায়ির (জন্ম: ১০৮০ খ্রি.-মৃত্যু: ১১৩১ খ্রি.) সময়কালে বাদশাহ ও আমিরদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। শুধুমাত্র সুলতান মাহমুদের (জন্ম: ৯৭১ খ্রি.-মৃত্যু: ১০৩০ খ্রি.) রাজদরবার অলংকৃত করেন প্রায় চারশত কবি।

হাকিম সানায়ির সংক্ষিপ্ত জীবনপরিক্রমা

কবি হাকিম সানায়ির পুরো নাম 'হাকিম আবুল মাজ্‌দ মাজদুদ বিন আ'দম সানায়ি'।[১] উপাধি খাতমুশ শোআরা অথবা ফাখরুল আরেফিন।[২] তবে সানায়ি নামেই তিনি সমধিক খ্যাত ছিলেন। তিনি হাসান নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কারো কারো মতে তার মূল নাম হাসান।[৩] যদিও তিনি সমসাময়িক যুগে মাজদুদ বিন আ'দম সানায়ি নামেই সমধিক খ্যাত ছিলেন। তবে কোন কোন কাসিদায় তার নাম হাসানও ব্যবহৃত হয়েছে।[৪] কবি হাকিম সানায়ির পিতার নাম 'আ'দম'। কবির মাতৃপরিচয় সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা তার কবিতার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়। সানায়ি হিজরি পঞ্চম শতাব্দির মধ্যভাগে আনুমানিক ৪৩৭ হিজরি/ ১০৪৫ খ্রিস্টাব্দে বৃহত্তর পারস্যের

---

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্তমান অফিগানিস্তানের গযনি শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] কবি হাকিম সানায়ির শিক্ষাজীবন ও শিক্ষকদের সম্বন্ধে তেমন নির্ভরযোগ্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি শৈশব ও যৌবনকালে স্বীয় জন্মভূমি গযনিতেই জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেন।[৬] তৎকালীন যুগে 'শেখ আবু ইউসুফ ইয়াকুব হামেদানি' (জন্ম: ১০৬২ খ্রি.-মৃত্যু: ১১৪১ খ্রি.) নামক একজন প্রসিদ্ধ পির ছিলেন। সানায়ি তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ইমাম গায্যালিও (জন্ম: ১০৫৬ খ্রি.-মৃত্যু: ১১১১ খ্রি.) এই মহান সাধকের শিষ্য ছিলেন।[৭] কবি সানায়ি শুরুতে গযনির সুলতান ও দরবারের সভাসদদের প্রশংসায় কাসিদা রচনা করতেন। এ সময়ের কাসিদাগুলোর মূল বিষয়বস্তু ছিল গযনির তৃতীয় সুলতান বাহরাম শাহ্ বিন মাসউদ (জন্ম: ১০৮৪ খ্রি.-মৃত্যু: ১১৫৭ খ্রি.) ও তাঁর দরবারের মন্ত্রীদের প্রশংসা যাতে তিনি দরবারে উচ্চাসন পান এবং উপঢৌকন লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ের কবিতাগুলিতে এ ধরণের কাসিদা লক্ষ্য করা যায় না। ধারণা করা হয় রাজদরবারের লোকেরা তাঁর কবিতার যথার্থ সম্মান প্রদান করেন নি। সম্ভবতঃ এ কারণেই সানায়ি মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিলেন। ফলে তিনি এক পর্যায়ে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং সুফিদের দলে গিয়ে যোগ দেন।[৮] কিবি নিজেই এ সম্পর্কে বলেন:

شاه خرسنديم جمال نمود   جمع و منع و طمع محال نمود.[৯]

'বাদশাহর সৌন্দর্য আপ্লুত করেছে আমাকে
নিষেধাজ্ঞা ও লোভের সম্মিলন অসম্ভব করেছে।'

সানায়ি আধ্যাত্ম সাধনায় আত্মনিয়োগের পর সুলতান ও দরবারের সভাসদবর্গের প্রশংসায় রচিত কাসিদাগুলো দূরীভূত করে দেন এবং মাত্র বাইশটি কাসিদা ও গযল যা সম্রাট বাহরাম শাহ্ এর প্রশংসায় রচিত এবং যেগুলো তিনি গযনিতে প্রত্যাবর্তনের পর রচনা করেছিলেন শুধুমাত্র সেগুলোই তাঁর *দিভানে* অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই গযনি ত্যাগ করেন এবং জীবনের সিংহভাগ সময় তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন শহর বিশেষতঃ বাল্খ, সারখাস, হিরাত ও নিশাপুর পরিভ্রমণে অতিবাহিত করেন।[১০] ১১০৫ খ্রিস্টাব্দে বাল্খে উপনীত হন।[১১] অতঃপর জীবন সায়াহ্নে গযনিতে প্রত্যাবর্তন করেন। সানায়ি ধর্মপরায়ণ, সৎ ও উদার প্রকৃতি, সংযমী ও সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে শিয়া মাযহাবের আনুসারী ছিলেন।[১২] সানায়ির মৃত্যু তারিখ নিয়ে অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হলেও গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ৫৪৫ হি./ ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[১৩]

কবি হাকিম সানায়ির রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে *ديوان (কবিতা সংকলন), حديقة الحقيقه و شريعة الطريقه সত্যের বাগান এবং পথের আইন, طريق التحقيق (গবেষণার পথ), سير العباد الى المعاد (বান্দার পরকালের পথেচলা), عقل نامه বিবেকনামা, عشق نامه প্রেমনামা, تجريمة العلم/تحريمة الكلام (জ্ঞানের অপরাধিকরণ/বক্তৃতা নিষিদ্ধ)* প্রভৃতি। তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহে আল কুরআন ও আল হাদিসের মর্মবাণী অনুসৃত হয়েছে। তাঁর কাব্যে তাওহিদ, রাসূলের (স.) প্রশংসা, সৃষ্টির রহস্য, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, প্রেম-ভালবাসা এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোমুগ্ধকর চিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। তাঁর কাসিদা, গযল, মসনভি, কেতআ, তারজিবান্দ, তারকিববান্দ ও রুবাঈ কবিতার ছত্রে-ছত্রে আল কুরআন ও হাদিসের মর্মবাণীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কবিতায় আধ্যাত্মিক প্রেম বৈচিত্র্যময় অনুভূতিতে বিধৃত হয়েছে। তিনি তাঁর কাব্যচর্চার প্রারম্ভে গযনি রাজদরবারের অন্যান্য কবিদের ন্যায় বিশেষ করে ফাররোখি (জন্ম: ৯৮০ খ্রি.-মৃত্যু: ১০৩৭-৩৮ খ্রি.) ও উনসুরিকে (জন্ম: ৯৮০ খ্রি.-মৃত্যু: ১০৩৯ খ্রি.) অনুসরণ করে ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসায় কবিতা রচনা করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি কুরআন ও হাদিসকে মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করে এরফান ও তাসাউফ এর আলোকে তাঁর কাব্যসম্ভার রচনা করেন। ফারসি ভাষায় আধ্যাত্মিক কাব্য রচনা করে অনেকেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। আধ্যাত্মিক কবি হিসেবে

সুফিবাদী কাব্য রচনা করে যে তিন জন কবির বিশ্বখ্যাতির শীর্ষে অবস্থান কবি হাকিম সানায়ি তাঁদের অন্যতম। অন্য দু'জন যথাক্রমে শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার এবং মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি। তিনিই প্রথম ফারসি সাহিত্যে সার্থক সুফিবাদী কাব্যের সূচনা করেন। পরবর্তীতে শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের মাধ্যমে এ কাব্য পূর্ণতা লাভ করে। সর্বোপরি মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির মাধ্যমে তা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়। সানায়ির কাব্যসাহিত্যে সুফিবাদী চিন্তা-দর্শনের বিষয়ের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কাব্যে আল্লাহর প্রশংসা, না'তে রাসূল (স.), ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা, দৃষ্টান্ত ও শিক্ষামূলক কবিতা, উপদেশ ও নসিহত, ধর্মীয় দর্শন ও মাযহাব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী, ধর্মীয় মাসলা-মাসায়েলের সমাধানে কবির দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তি প্রদর্শন, ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি আহ্বান, দুনিয়া ও দুনিয়াবী বিলাসিতার প্রতি বিমূখতা, খোদাভীতির প্রতি অবিচলতা, কৃচ্ছ্রতাসাধন, বাহ্যিকতা পরিহার ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যের প্রতি গুরুত্বারোপ প্রভৃতি বিষয়ের সমাহার ঘটেছে। সানায়ির কাব্যে আল্লাহ, সৃষ্টিজগৎ, মানুষ, বিবেক, প্রেম এবং পরকাল সম্পর্কে দার্শনিক তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি আল-কুরআনে বিধৃত মৌলিক বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করেন। শরিআতের বিধানসমূহ অনুসরণ ও আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের শিক্ষা রয়েছে তাঁর কাব্যে। নিম্নে কবি হাকিম সানায়ির *হাদিকাতুল হাকিকাহ:* একটি পর্যালোচনা' বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপনা করা হলো:

কবি হাকিম সানায়ির *হাদিকাতুল হাকিকাহ*

সানায়ির সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ *মসনভি* গ্রন্থ *حديقة الحقيقه و شريعة الطريقه (সত্যের বাগান এবং পথের আইন)*। একে *الهی نامه (ইলাহিনামা)* ও *فخری نامه (গর্বনামা)* ও বলা হয়।[১৪] কোথাও *حديقة الحقيقه و طريقة الشريعه الطريقه (সত্যের বাগান এবং আইনের পথ)* এমন নামও ব্যবহার হয়েছে।[১৫]এ গ্রন্থটি এরফানি তথা আধ্যাত্মিক সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচিত। পরবর্তীকালে সুফিকবিগণ এ গ্রন্থটিকে সুফি কাব্যের উৎস গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেন। বিশেষকরে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি তাঁর *মসনভি* রচনায় সানায়ির এই *হাদিকাতুল হাকিকাহর* দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন। অপরদিকে এই গ্রন্থটিকে সানায়ির জ্ঞানকোষের বিশ্বকোষ হিসেবে তুলনা করা হয় এর কারণ স্বরূপ বলা যায় এর ছড়ানো-ছিটানো বিষয়াবলী ও দুর্বোদ্ধতা। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন :

گرچه بسيار ديده ای تاليف   هيچ ديدی بدين صفت تصنيف
هرچه دانسته ام ز نوع علوم   كرده ام جمله خلق را معلوم
هرچه دانسته ام ز نوع علوم   كرده ام جمله خلق را معلوم
آنچه نص است و آنچه اخبار است   وز مشايخ هر آنچه آثار است
اندرين نامه جملگی جمع است   مجلس روح را يكی شمع است.[১৬]

'যদিও অনেক রচনাকর্ম দৃষ্টিগোচর হয়
রচনাকর্মের বৈশিষ্ট্য ব্যতীত কিছুই চোখে পড়েনা,
আছে খোদাভীরুদের হৃদয়ে ভালবাসা
নিত্য নতুন ও সুস্বাদু কথামালা যা কোনভাবেই ভিত্তিহীন নয়।
জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখায় যতই বিচরণ করলাম
সবখানেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করলাম,

যা কিছুই নির্ভরযোগ্য বক্তব্য তাই সংবাদ
আর জ্ঞানীরা যা কিছুই বলে তাই সাহিত্যকর্ম,
তাঁদের রচনার সর্বাঙ্গই গ্রহণীয়
যেন আত্মার বৈঠকে একটি মোমবাতি।'

এ গ্রন্থটি বাহরে খাফিফে মোতাজাম্মান ওজনে রচিত।[১৭] এ গ্রন্থে ১০টি অধ্যায়ে প্রায় ১০,০০০ পংক্তি রয়েছে।[১৮] এ প্রসঙ্গে কবি নিজেই এ গ্রন্থের শেষের দিকে বলেছেন :

عددش هست ده هزار ابیات   همه امثال و پند و مدح و صفات.[১৯]

এর পরিমাণ দশ হাজার পংক্তি,
সবগুলোই দৃষ্টান্ত, উপদেশ, প্রশংসা ও গুণকীর্তন।

আব্দুল লাতিফ ইবনে আব্দিল্লাহ আল-আব্বাসি *حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه* এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন, যিনি মুগল সম্রাট শাহ্‌জাহান এর আমলে তাঁর রচনাবলি প্রণয়ন করেন।[২০] এ গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা, মহিমা কীর্তন ও তাওহিদ এর বর্ণনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল্লাহ তাআলার মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বর্ণনা, তৃতীয় অধ্যায়ে না'তে রাসুল (সঃ) ও তাঁর সাহাবিদের মর্যাদার বর্ণনা, চতুর্থ অধ্যায়ে বিবেকের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা, পঞ্চম অধ্যায়ে জ্ঞানের মর্যাদা এবং ইশকের অর্থ ও উহার অবস্থার বর্ণনা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে নেশাগ্রস্থ আত্মা, উহার মর্যাদা এবং পরিপূর্ণ বিবেকের বর্ণনা, সপ্তম অধ্যায়ে নভোমণ্ডল ও সৌরজগতের বর্ণনা এবং অন্তর, প্রেম ও ঘনিষ্ঠতার মর্যাদার বর্ণনা, অষ্টম অধ্যায়ে বাহরাম শাহ গযনবি, তাঁর স্ত্রীগণ ও তাঁর দরবারের সভাসদদের প্রশংসা, নবম অধ্যায়ে প্রজ্ঞা, প্রবাদ ও প্রবচন এর বর্ণনা এবং দশম অধ্যায়ে স্বীয় অবস্থান ও পুস্তকের মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে।[২১]

এটি কবি ৫২৫ হি.শা./১১৪৬ খ্রিস্টাব্দে গযনির বাদশাহ্‌ বাহরাম এর নামে উৎসর্গ করেন। আর *হাদিকাতুল হাকিকাহ ওয়া শারিয়াতুত তারিকাহ* সানায়ির শ্রেষ্ঠ রচনা (Master Piece) বলে অভিহিত হয়ে থাকে।[২২] সানায়ি এ গ্রন্থটি ৫২৪ হি.শা./১১৪৫ খ্রিস্টাব্দের অযার মাসে রচনা শুরু করে এক বছর পর ৫২৫ হি.শা./১১৪৬ খ্রিস্টাব্দের দেই মাসে রচনা সমাপ্ত হয়।[২৩] এ প্রসঙ্গে কবি নিজেই এ গ্রন্থের শেষের দিকে বলেছেন :

شد تمام این کتاب در مه دی   که در آذر فکندم این راپی
پانصد و بیست و چار رفته زعام   پانصد و بیست و پنج گ شت تمام.[২৪]

'দেই মাসে এ গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয়,
অযার মাসে এ গ্রন্থের রচনা শুরু করেছিলাম।
পাঁচশত চব্বিশ সালে রচনা শুরু করেছিলাম,
পাঁচশত পঁচিশ সালে রচনা সমাপ্ত হয়।'

যখন এ গ্রন্থটি রচনা সমাপ্ত হলো গযনির আলেম সমাজ সানায়ির উপর চড়াও হলেন এবং এ গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। বাধ্য হয়ে তৎকালীন সম্রাট গ্রন্থটিকে পর্যালোচনা ও এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বাগদাদের খলিফার নিকট প্রেরণ করলেন, যেখানে তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের অবস্থান ছিল। বাগদাদের খলিফা তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলেম বোরহানউদ্দিন আবুল হাসান আলী বিন নাসির গযনবিকে (জন্মঃ ১১০৫ খ্রি.-মৃত্যুঃ ১১৯৭ খ্রি.) এ দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তিনি গ্রন্থটি ভালভাবে

পর্যালোচনার পর এ রায় ঘোষণা করলেন যে, *হাদিকাতুল হাকিকাহ ওয়া শারিয়াতুত তারিকাহ* এর মধ্যে ইসলামি শরিয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক কোন কিছু নেই। অতঃপর গযনির আলেম সমাজ সানায়িকে মেনে নেয়।[২৫] সানায়ির এই বিখ্যাত গ্রন্থটি সর্বপ্রথম হিন্দুস্তানের বোম্বে থেকে ১২৭৫ হি./১৮৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দে, লাহোর থেকে ১২৯০ হি./১৮৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে এবং ১২৯৫ হি./ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মৌ থেকে প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৩০৪ হি./১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মৌ থেকে পূনরায় প্রকাশিত হয়।[২৬] পরবর্তীকালে ১৩২৯ হি./১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে J.Stephenson কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুদিত The First Book of the Hadiqatu'l Haqiqat…of the Hakim Abu'l Majd Majdud Sana'i of Ghazna.নামে প্রকাশিত হয়।[২৭]

প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক আব্দুল লতিফ সানায়ির এ গ্রন্থটির একখানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করে এর নাম দেন *لطائف حدائق من نفائس الدقائق (মূল্যবান সময় হতে কমল উদ্যানের পথে)*।[২৮] ১৩৭৪ হি./ ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে মোদাররিস রেজভির সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয় এবং ১৩৮২ হি.শা./ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ড. মারইয়াম হোসাইনীর সম্পাদনায় এটি পুণরায় প্রকাশিত হয়।[২৯] মাওলানা রুমি *حديقة الحقيقه و شريعة الطريقه* সম্বন্ধে বলেন,

این حکایت ها از اسرر خفی است   این سخن ها از حدیقه مثنوی است.[৩০]

'এই কাহিনীসমূহ যা গোপন রহস্যে পূর্ব,
এ বক্তব্যসমূহ যা *মসনভি হাদিকার* মধ্যে রয়েছে।'

পবিত্র কুরআন মজিদের প্রভাবেই কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করে যুগে যুগে অসংখ্য কবি সমাদৃত হন। হাকিম সানায়িও এ ধারার এক খ্যাতিমান প্রতিভা। তার কাব্যগ্রন্থসমূহে আল কুরআনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কাব্যবিষয় ও নান্দনিক আবেদনকে সুদৃঢ় করে তোলে।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ.[৩১]

'সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। এটা আমার প্রতিশ্রুতি, আর অমি প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করি।'

সানায়ি বলেন:

در نوردد ز پیش ستر دخان   يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ رو برخوان
عارفان چون دم از قدیم زنند   ها و هو را میان دو نیم زنند
نه به ارکان ثبات اوقاتش   نه مکان جای هستی ذاتش.[৩২]

'ধুম্র কুণ্ডলীর আবরণের মাঝে ভাজ করেন,
আমি সেদিন আসমানকে ভাঁজ করব কুরআনের আয়াত থেকে জেনে নাও।
আধ্যাত্মিক সাধকগণ যখন প্রাচীন সম্পর্কে ভাবেন,
তখন তারা সবকিছুর মাঝে স্রষ্টাকে দেখতে পান।
তাঁর সময় কোন উপাদানের সাথে সম্পৃক্ত নয়,
তাঁর সত্তাও নয় কোন স্থানের সাথে সম্পৃক্ত।'

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন :

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. [৩৩]

'আমার কাছে কথা রদ-বদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুমকারীও নই।'

সানায়ি বলেন :

همه هستند و از همه همه دور — در نبی خوانده تصیر الامور
زو بد و نیک قوت و حولست — امر او مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ است
امر او را تغیری نبود — خلق را جز تحیرّی نبود. [৩৪]

'সবাই সেদিন সবার থেকে দুরে চলে যাবে,
কুরআনে পড়েছ 'তাসীরুল উমুর' অর্থাৎ সবই তাঁর কাছে পৌঁছে।
তাঁর থেকেই ভাল-মন্দ হয়, তিনি সকল শক্তির আধার,
তাঁর বিধান হল, কথার কোন রদ-বদল হয় না।
তাঁর আদেশের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না,
সকল সৃষ্টি আশ্চর্য হয়ে যায়।'

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন :

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. [৩৫]

'মহাপবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্র ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি। যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শোনেন ও সব কিছু দেখেন।'

সানায়ি বলেন :

بار گیرش سوی ابد معراج — نردبامش سوی ازل منهاج
گفت سبحانش الذی اسری — شده زانجا بمقصد اقصی
در شب از مسجد حرام بکام — رفته و دیده و آمدم بمقام. [৩৬]

'তার বাহন স্থায়িত্বের দিকে উড্ডীন করেনি,
আর তার ছাদও পায়নি আদিকালের রাস্তা।
বল, তিনি পূত-পবিত্র যিনি রাতে ভ্রমণ করায়েছেন,
ঐখান থেকে শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে।
রাতে তিনি মসজিদে হারাম থেকে ভ্রমণ শুরু করেছেন,
গেছেন, দেখেছেন এবং ফিরেও এসেছেন।'

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.[৩৭]

'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।'

সানায়ি বলেন :

چون تو بیماری از هوا و هوس　　رحمت العالمین طبیب تو بس

هر کرا از جلال مایه بود　　خرد مصطفاش دایه بود

بست دیوار بهر منت را　　سیرت او سرای سنت را.[৩৮]

'যেহেতু তুমি কু-প্রবৃত্তির রোগে আক্রান্ত,
জেনে রেখো ! পৃথিবীর রহমত তোমার চিকিৎসক।
যার পিছনে আল্লাহর সাহায্য থাকবে,
রাসূলের (স.) জ্ঞান ধাত্রীর মত কাজ করবে।
অনুগ্রহের জন্য দেওয়াল হবে,
তার চরিত্র হবে পথের দিশারী।'

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন :

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. [৩৯]

'তাঁরা উভয়ে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হয়ে যাব।'

সানায়ি বলেন :

انبیا ز آسمان پیاده شدند　　ازو ساده بسوی ساده شدند

از پی خجلت آدم از دل و جان　　بر درت رَبَّنَا ظَلَمْنَا خوان. [৪০]

'নবীগণ আকাশ হতে প্রেরিত হয়েছেন,
সধারণেরা অতি সাধারণ হয়েছে।
আদম (আ.) লজ্জিত হয়ে অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলেছেন,
হে প্রতিপালক ! আমি নিজের উপর জুলুম করেছি।'

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন :

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ إِنَّ البْطِلَ كانَ زَهوقًا. [৪১]

'বলুন ! সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।'

সানায়ি বলেন :

با مدیـحش مدایح مطلق   زهق الباطل است و جاء الـحق.[৪২]

‘প্রশংসাকারীর সাথে নিরঙ্কুশ প্রশংসা কর,

মিথ্যা অপসৃত আর সত্য সমাগত।’

حديقة الحقيقه و شريعة الطريقه পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

কবি হাকিম সানায়ির রচনাবলি জীবনঘনিষ্ঠ ও বাস্তবমুখী। কবিতার মাধ্যমে মানবজীবনের সাথে সম্পৃক্ত অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি চিত্রিত হয়। এরই বহিঃপ্রকাশে *হাদিকাতুল হাকিকাহ*-তে আল্লাহ ও রাসূলের (স.) প্রশংসা, নীতি-নৈতিকতা, প্রেম-ভালবাসাসহ বিভিন্ন দর্শন ও প্রজ্ঞার মত নানাবিধ বিষয়াদি ব্যাপকভাবে স্থান পেয়েছে। এতে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক বিভিন্ন ধরণের চিন্তা-দর্শনের পাশাপাশি অধ্যাত্মবাদ তথা সুফিবাদী চিন্তা-দর্শনের বহিঃপ্রকাশে পবিত্র কুরআন, রাসূলের (স.) মুখ নিঃসৃত পবিত্র হাদিস, ইসলামি ঐতিহ্য, তাকওয়া ও পরহেযগারি, নৈতিকতা ও আত্মিক পরিশুদ্ধি, মানবিক সমস্যা এবং প্রকৃত হকের রহস্যের সন্ধান, ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা, দৃষ্টান্ত ও শিক্ষামূলক কবিতা, উপদেশ ও নসিহত, ধর্মীয় দর্শন ও মাযহাব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি, ধর্মীয় মাসলা-মাসায়েলের সমাধানে কবির দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তি প্রদর্শন, ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি আহ্বান, দুনিয়া ও দুনিয়াবি বিলাসিতার প্রতি বিমুখতা, খোদাভীতির প্রতি অবিচলতা, কৃচ্ছ্রতাসাধন অবলম্বন, বাহ্যিকতা পরিহার ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের প্রতি গুরুত্বারোপ প্রভৃতি বিষয়ের সমাহার ঘটেছে। এতে তিনি তাসাউফের বিষয়সমূহকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে রূপক ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন।[৪৩] এতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়বস্তু, ত্যাগ ও শিক্ষামুলক উপমায় ভরপুর যাতে মনোরম, প্রাঞ্জল ও উন্নত ভাষার প্রয়োগ, নতুন নতুন শব্দের প্রয়োগ, নতুন নতুন বাক্যের প্রয়োগ এবং প্রচুর পরিমাণে আরবি ভাষার প্রয়োগ ঘটেছে। এ ছাড়াও এতে ব্যাপক পরিমাণে কাহিনী, উপমা, বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিপ্রয়োগ, স্বীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার চূড়ান্ত ফলাফল ও সমসাময়িক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জ্ঞানের তাত্ত্বিক পরিভাষার প্রয়োগ ঘটেছে।[৪৪] এতে আল্লাহ ও রাসূলের (স.) প্রশংসার পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরামগণের মর্যাদা বিশেষকরে চারজন খলিফার মর্যাদার বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এতে বিবেক, জ্ঞান, প্রেম-ভালবাসা, ন্যায়নিষ্ঠতা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্থান লাভ করেছে। তাঁর সাহিত্যকর্ম ফারসি সাহিত্যের বিকাশে বিশেষকরে ফারসি সুফি সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে ফারসি সুফিসাহিত্যের অনেক কবিসাহিত্যিক তাঁকে অনুসরণ করে খ্যাতি অর্জন করেন। ফারসি সাহিত্যের যে সকল কবি সাহিত্যিক তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (জন্ম: ১১৪৫ খ্রি.-মৃত্যু: ১২২১ খ্রি.), মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (জন্ম: ১২০৭ খ্রি.-মৃত্যু: ১২৭৩ খ্রি.), শেখ সা'দী (জন্ম: ১২১০ খ্রি.-মৃত্যু: ১২৯১-৯২ খ্রি.), হাফিয শিরাযি (জন্ম: ১৩১৫ খ্রি.-মৃত্যু: ১৩৯০ খ্রি.), মাওলানা আব্দুর রহমান জামি (জন্ম: ১৪১৪ খ্রি.-মৃত্যু: ১৪৯২ খ্রি.), সালমান সাবজী (জন্ম: ১৩১০ খ্রি.-মৃত্যু: ১৩৭৭ খ্রি.) ও মজির উদ্দিন বিলাকানি (মৃত্যু: ১১৯২ খ্রি.), জামাল উদ্দিন মোহাম্মাদ আব্দুর রাজ্জাক (মৃত্যু: ১১৯২ খ্রি.) এবং তাঁর ছেলে কামাল উদ্দিন ইসমাঈল (জন্ম: ১১৭৩ খ্রি.-মৃত্যু: ১২৩৮ খ্রি.), ফাযল বিন ইয়াহইয়া বিন সাআদ (জন্ম: ১২১০ খ্রি.-মৃত্যু: ১২৯১ খ্রি.), মোখতারি গযনবি (জন্ম: ১০৭৪ খ্রি.-মৃত্যু: ১১৪৯ খ্রি.), ইমাম আলী বিন হাসিম হারবি (মৃত্যু: ১২২০-২২ খ্রি.), আবুল আলা গাঞ্জুবি (জন্ম: ১০৯৬ খ্রি.-মৃত্যু: ১১০৬ খ্রি.), হাকিম নিজাম উদ্দিন গাঞ্জুবি (জন্ম: ১১৪১ খ্রি.-মৃত্যু: ১২০৯ খ্রি.), খাকানি শিরওয়ানি (জন্ম: ১১২০ হতে ১১২৭ খ্রি. এর মধ্যে-মৃত্যু ১১৮৬-৮৭ হতে ১১৯৯ খ্রি. এর মধ্যে), শাহ নেয়ামাতুল্লাহ ওলি (জন্ম: ১৩৩০ খ্রি.-মৃত্যু: ১৪২৯ খ্রি.) ও কবি ইরাকি (মৃত্যু: ১২৮১ খ্রি.) অন্যতম।[৪৫] এ ক্ষেত্রে রচনাশৈলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন শাবকে ইরাকি বা ইরাকি রচনাশৈলীতে কবি হাকিম

সানায়ির লেখা ধর্মীয় কবিতা শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার ও মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির পর্যায়ে আধ্যাত্মিক কবিতায় পরিণত হয়। এ ধারা অবলম্বন করে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি আধ্যাত্মিক গযল এবং শেখ সা'দি প্রেমময় গযলকে উচ্চস্তরে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে হাফিয এ দু'টিকে সমন্বয় করে 'গাযালে রেনদান' তথা তপস্যাধর্মী গাযালে রূপান্তরিত করেন।[৪৬] তাছাড়া পরবর্তী অন্যান্য প্রায় সকল কবিসাহিত্যিকের প্রতি কমবেশি তাঁর প্রভাব রয়েছে। সানায়ির কাব্যের দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন কবি খাকানী।[৪৭] এ সকল আধ্যাত্মিক কবিসাহিত্যিকদের বদৌলতেই ফারসি সাহিত্যের কাঠামোতে অধ্যাত্মবাদের পরিভাষাসমূহ যেমন: خرابات مغان (পীরের পানশালা), میی مغان (পিরের শরাব), مغانه (পিরের ধরণ), پیر ازرق پوش (নীল পোশাক পরিহিত পির), خرقه (লম্বা ঢিলাঢালা জামা বিশেষ), صوفی (আধ্যাত্মিক ব্যক্তি), فقر (নিঃস্বতা) ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে থাকে।[৪৮] শুধু তাই নয়; এ সকল কবিসাহিত্যিক তাঁদের আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে কাব্যাকারে উপস্থাপন করতে সামর্থ হয়েছেন। তাঁরা শুধুমাত্র কবিই ছিলেন না; বরং তাঁরা এমনই প্রতিভাবান দার্শনিক কাব্যশিল্পী ছিলেন যে তাঁদের গ্রন্থসমূহে যুগের চাহিদানুযায়ী আধ্যাত্মিক দর্শনের গূঢ় রহস্যাবলী কাব্যাকারে প্রকাশিত হয়েছে।[৪৯] কবি সানায়ির পরবর্তীকালে যে সকল বিখ্যাত কবিসাহিত্যিক তাঁর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হলো।

শাহ নেয়ামাতুল্লাহ ওলি কবি হাকিম সানায়ি সম্পর্কে বলেন:

گر سنایی سوی غزنی می رود　　　بو علی سینا به سینا مایل است.[৫০]

'যদি সানায়ি গযনির দিকে প্রত্যাবর্তন করে,
তবে আবু আলি সিনা সিনাই পর্বতের দিকে অগ্রসর হবে।'

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি কবি সানায়ি সম্পর্কে বলেন:

اگر عطار عاشق بود سنایی شاه و فائق بود　　　نه آنم من نه اینم من، که گم کردم سر و پا را.[৫১]

'যদি আত্তার আল্লাহপ্রেমিক হন, তবে সানায়ি হবেন সে প্রেমিকদের বাদশাহ
আমি না এদিকে আর না আমি ঐদিকে, আমি সব কিছু হারিয়ে ফেলেছি।'

মাওলানা রুমি অন্যত্র বলেন:

عطار شیخ ما و سنائیست پیشرو　　　ما از پی سنائی و عطار امدیم.[৫২]

'আত্তার আমাদের মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শক, সানায়ি অগ্রদূত
আমরা আত্তার ও সানায়ির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি মাত্র।'

মাওলানা রুমি আরো বলেন:

عطار روح بود و سنائی دو چشم او　　　ما از پی سنائی و عطار آمدیم. [৫৩]

'আত্তার আত্মা স্বরূপ এবং সানায়ি তার দু'টি চক্ষুস্বরূপ
আমরা আত্তার ও সানায়ির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি মাত্র।'

মাওলানা রুমি নিম্নোক্ত পংক্তিতে বলেন:

ترک جوشی کرده ام من ناتمام　　　ازحکیم غزنوی بشنو تمام.[৫৪]

‘আমি অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেছি,
গযনীর এই বিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে পরিপূর্ণ কথা শ্রবণ কর।’

মাওলানা রুমি অন্যত্র বলেন,

هر که سخننان سنائی را به جذّ نـمام   مطالعه کند بر سرّ سنای سخن ما واقف شود.[৫৫]

‘যে ব্যক্তি সানায়ির কথামালাকে গুজব রটনাকারী বলে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন,
সানায়ির সুশোভিত কথার মর্মোদ্ধার তখন হয়ে যায়।’

খাকানি শিরওয়ানি সানায়ি সম্পর্কে বলেন:

بدل من آمدم اندر جهان سنائی را   بدین دلیل پدر نام من بدیل نـهاد.[৫৬]

‘আমি সানায়ির পরিবর্তে এ পৃথিবীতে এসেছি,
এ জন্যই আমার পিতা আমার নাম বেদিল রেখেছেন।’

খাকানি শিরওয়ানি নিজেকে সানায়ির যোগ্য উত্তরসুরি হিসাবে উপস্থাপন করে বলেন:

چون زمان عهد سنائی در نوشت چو شد   آسمـان چون من سخن گستـر بزاد
چون بغزنیـن شاعری شد زیر خاک   خاک شروان شاعری نوتر بزاد
بلبلی زین بیضهٔ خاکی گذشت   طوطی نو زین کهن منظر بزاد
مفلقی فرد ار گذشت از کشوری   مبدعی فحل از دگر کشور بزاد.[৫৭]

‘যখন কালের আবর্তে সানায়ির যুগ লিখিত হয়েছে,
তখন আকাশও আমার মত বিস্তৃত কথার জন্ম দিয়েছে।
যখন গযনিতে একজন কবি কবরস্থ হল,
তখন শিরওয়ানের মাটি একজন নতুন কবির জন্ম দিয়েছে।
এ শুভ্র মাটি থেকে একটি বুলবুলির বিদায় হয়েছে,
নতুন তোতার জন্ম দিয়েছে এ পুরাতন ভূমি।
আকাশ তুল্য এক ব্যক্তিত্বের বিদায় হল একটি দেশ থেকে,
অন্যদেশে আরেকটি কিংবদন্তীর জন্ম দিল।’

আবুল আলা গাঞ্জুবি সানায়ি সম্পর্কে বলেন:

چو شد روان عمادی به من گذاشت شرف   چو رفت جان سنائی به من بـماند سنا
تبارک الله پنجاه و پنج بشمردم   به شست ناشده پشتم چو شست گشت دوتا.[৫৮]

‘আমার হৃদয় থেকে সকল সৌভাগ্য প্রস্থান করলো,
যখন সানায়ির কষ্টদায়ক বিদায় হলো
বরকতময় আল্লাহ তাআলা পঞ্চান্ন গণনা করলাম,
তার প্রস্থানের সময় ষাট নয়; এ দু’য়ের চক্রে।’

কবি উসমান মোখতারি গযনবি সানায়ি সম্পর্কে বলেন:

سنائی را صلتها بخش تا او این چنین مدحی　　بپردازد که همتا نیست اندر شعر ز اقرانش
نبینی کو چنین گوید بهر بیتی که بر خواند　　کند تحسین ز بس معنی ز جنّت جان حسّانش
فرو اندیش تا او را چه قادر خاطری باشد　　که در معنی و لفظ خوش مسلّم کرد عثمانش
گرامی تر ز من شخصی هم از من هست نزد تو　　گهی کت رای من خیزد ببین آنروی خندانش.[৫৯]

‘সানায়িকে বলা হয় বন্ধুত্ব সৃষ্টিকারী, তিনি এমন অভিনব প্রশংসা করতে জানেন,
যাতে সমসাময়িক অন্যান্য কবিগণ একেবারে অক্ষম।
তুমি কি দেখতে পাওনা তার প্রতিটি চরণে প্রশংসার ফুলঝুড়ি
তিনি সৌন্দর্য বর্ণনায় এতটাই পারদর্শী, যেন স্বর্গ থেকে হাস্‌সান বিন সাবেত (রা.) বর্ণনা করছেন।
তিনি তার চিন্তা চেতনায় একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব,
তার শব্দ ও অর্থের ব্যাপারে তাকে উসমান গণির (আ.) যোগ্য উত্তরসুরি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।
মনে রেখো, ব্যক্তিত্বের বিচারে তিনি আমার অনেক উর্ধ্বে,
তার বংশীয় উৎকৃষ্টতা আমাকে খুব বেশি টানে।’

ইমাম আলি বিন হায়সাম হারবি সানায়ি সম্পর্কে বলেন:

سنائی سنای خرد را سزاست　　جمالش جهان را کمال و بهاست
اگر شخصش از خاک دارد مزاج　　پس اخلاق او نور کلّی چراست
چنو در بزرگان بزرگی که دید　　چنو از عزیزان عزیزی کجاست.[৬০]

‘সানায়িকে জ্ঞানের পারিজাত পুষ্প বলাই যুক্তিযুক্ত,
তার সৌন্দর্য পৃথিবীকে পরিপূর্ণ ও মূল্যবান করেছে।
তার ব্যক্তিত্ব মাটির মত কমল,
তার চরিত্র আলোকিত ও অনুপম।
তাকে দেখা যায় বড়দের সমাবেশে,
তার মত প্রিয় আর কোথায় আছে।’

ফজল বিন ইয়াহইয়া সানায়ি সম্পর্কে বলেন:

شعر تو روحانیان گر بشنوند از روی صدق　　بامک برخیزد از ایشان کی سنائی مرحبا
حجّتی بر خلق علم زین دو فعل خوب خویش　　شاعری بی دل طمع و پارسائی بی ریا
عیسی عصری که از انفاس روحانیت هست　　مردگان آزو معلولان غفلت را شفا
بس طبیب زیر کی زیراکه بی نبض و دلیل　　درد هر کس را ز راه نطق می سازی دوا.[৬১]

'তোমার আধ্যাত্মিক কবিতাগুলো যদি সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে পাঠ করা হয়,
তাহলে লোমকূপ দাড়িয়ে যায়, হে সানায়ি ! তোমাকে স্বাগতম।
তার এ সুন্দর দু'টি কাজের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে তিনি সৃষ্টিজীবের জন্য প্রমাণস্বরূপ,
তিনি নির্লোভ কবি ও একনিষ্ঠ ধর্মগুরু।
তিনি ঈসার (আ.) সমসাময়িক আত্মা ধারণ করেছেন,
মৃত আত্মা তাদের অলসতার অসুস্থতা থেকে সানায়ির মাধ্যমে সুস্থতা লাভ করে।
তিনি একজন চতুর চিকিৎসক; যিনি অসুস্থের নাড়ি পরীক্ষা ছাড়াই,
শুধু কথার মাধ্যমেই তাদের সুস্থ করে তোলেন।'

উপসংহার

ফারসি আধ্যাত্মিক কাব্যসাহিত্যের বিকাশে কবি হাকিম সানায়ির *হাদিকাতুল হাকিকাহ* এক অমূল্য রত্নভাণ্ডার। এতে আল-কুরআন ও আল-হাদিসের মর্মবাণী, আল্লাহর প্রশংসা, তাওহিদ, রাসূলের (স.) প্রশংসা, সৃষ্টির রহস্য, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, প্রেম-ভালোবাসা এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোমুগ্ধকর চিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। এছাড়া ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা, দৃষ্টান্ত ও শিক্ষামূলক কবিতা, উপদেশ ও নসিহত, ধর্মীয় দর্শন ও মাযহাব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি, ধর্মীয় মাসলা-মাসায়েলের সমাধানে কবির দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তি প্রদর্শন, ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি আহ্বান, দুনিয়া ও দুনিয়াবী বিলাসিতার প্রতি বিমূখতা, খোদাভীতির প্রতি অবিচলতা, কৃচ্ছ্রতাসাধন অবলম্বন, বাহ্যিকতা পরিহার ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের প্রতি গুরুত্বারোপ প্রভৃতি বিষয়ের সমাহার ঘটেছে। *হাদিকাতুল হাকিকাহ*-তে রয়েছে আল্লাহ, সৃষ্টিজগৎ, মানুষ, বিবেক, প্রেম এবং পরকাল সম্পর্কে দার্শনিক তত্ত্ব। এক্ষেত্রে আল-কুরআনে বিধৃত মৌলিক বিধান যথাযথভাবে অনুসৃত হয়। শরিআতের বিধানসমূহ অনুসরণ ও আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের শিক্ষা রয়েছে তাঁর *হাদিকাতুল হাকিকাহ*-তে। কবি হাকিম সানায়ি তাঁর কবিতার মাধ্যমে তাসাউফের গুঢ় রহস্যাবলি প্রকাশ করেন। তিনি এ গ্রন্থে তাসাউফের বিষয়সমূহকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে রূপক ঘটনাবলিরও বর্ণনা করেছেন। সানায়ির দার্শনিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীকালে অনেক কবিসাহিত্যিক কাব্যচর্চা করে সমাদৃত হন। আর একজন খ্যাতিমান কবি হিসেবে এখানেই তার সাফল্য। ইরানের বিখ্যাত কবিরা তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ সুফিবাদী দর্শন ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ বদিউযযামান ফোরুযানফার, *সোখান ভা সোখানওয়ারান* (তেহরান: চাপখানেয়ে গুলশান ১৩৬৯ হি.শা./ ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ২৫৪; A. J. Arberry, *Classical Persian Literature* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1958.), p. 88.

২ ড. সাইয়্যেদ যিয়া উদ্দিন সাজ্জাদি, *মোকাদ্দামে-ঈ বর মাবানিয়ে এরফান ভা তাসাউফ* (তেহরান: এন্তেশারাতে সামত, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১১৮।

৩ *সোখান ভা সোখানওয়ারান*, পৃ. ২৫৪-২৫৫।

৪ ড. যবিহ উল্লাহ সাফা, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, দ্বিতীয় খণ্ড (তেহরান: এন্তেশারাতে ফেরদৌস, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ৫৫২।

[৫] *মোকাদ্দামে-ঈ বর মাবানিয়ে এরফান ভা তাসাউফ*, পৃ. ১১৭।

[৬] ড. যাহরা দার্‌রি, *শরহে দাশভারিহায়ে আয হাদিকাতুল হাকিকাহ সানায়ি* (তেহরান: এন্তেশারাতে যাভ্‌ভার, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৮।

[৭] মুহাম্মাদ মনসুর উদ্দিন, *ইরানের কবি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ৪৪৬;

[৮] ড. মু. মঈন, *ফারহাঙ্গে ফারসি*, ৫ম খণ্ড (তেহরান: মোয়াসসেসেয়ে এন্তেশারাতে আমির কবির, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৮০৩।

[৯] আবুল মাজ্‌দ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি, গযনবি, *হাদিকাতুল হাকিকাহ ভা শারিআতুত তারিকাহ* (তেহরান: এন্তেশারাতে কেতাখানেয়ে সানায়ি, ১৯৮৪ খ্রি.) পৃ. ৭০৭।

[১০] *ফারহাঙ্গে ফারসি*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮০৩; লায়লা সুফি, *জিন্দেগিনামে শায়েরানে ইরান*, (তেহরান: এন্তেশারাতে জাজরামি, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৭৬।

[১১] এন্দ্রেই এডওয়ার্ডভীচ বার্টেলস, সিরূস ঈযাদি (অনু:), *তারিখে আদাবিয়াতে ফারসি*, (তেহরান: এন্তেশারাতে হিরমান্দ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২০৪।

[১২] ড.যবিহ উল্লাহ সাফা, *গাঞ্জে সোখান*, ১ম খণ্ড (তেহরান: এন্তেশারাত দানেশগাহে তেহরান, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ৩১১।

[১৩] মাজদুদ বিন আ'দম সানায়ি, *দিভানে হাকিম আবুল মাজ্‌দ মাজদুদ বিন আ'দম সানায়ি গযনবি*, মোদাররেস রেজভি সম্পা. (তেহরান: এন্তেশারাতে কেতাখানেয়ে সানায়ি, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৪৫ (ভূমিকা)।

[১৪] *শরহে দাশভারিহায়ে আয হাদিকাতুল হাকিকাহ*, পৃ. ৮।

[১৫] *শরহে দাশভারিহায়ে আয হাদকাতুল হাকিকাহ সানায়ি*, পৃ. ৮।

[১৬] *তদেব*, পৃ. ৯।

[১৭] ড. যবিহ উল্লাহ সাফা, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, খোলাসে ১ম খণ্ড (তেহরান: এন্তেশারাতে কোকনুস, ১৩৭৮ হি.শা./ ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২৭৫।

[১৮] *সোখান ভা সোখানওয়ারান*, পৃ. ২৫৮, মির্যা মকবুল বেগ বাদাখশানি, *আদাব নামে ইরান* (লাহোর: আসেফ জাভিদ, তা.বি.), পৃ. ৩১৫।

[১৯] *সোখান ভা সোখানওয়ারান*, পৃ. ২৫৮।

[২০] *ইসলাম বিশ্বকোষ*, ২৪শ খণ্ড (প্রথম ভাগ), পৃ. ৪১১।

[২১] *হাদিকাতুল হাকিকাহ ভা শারিয়াতুত তারিকাহ আবুল মাজ্‌দ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি গযনবি*, পৃ. ৫৮; *সোখান ওয়া সোখানওয়ারান*, পৃ. ২৫৮।

[২২] আব্দুস সাত্তার, *ফারসি সাহিত্যের কালক্রম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ.৩৫।

[২৩] *সোখান ভা সোখানওয়ারান*, পৃ. ২৫৮।

[২৪] *হাদিকাতুল হাকিকাহ ভা শারিআতুত তারিকাহ আবুল মাজ্‌দ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি গযনবি*, পৃ. ৭৪৭।

[২৫] *সোখান ভা সোখানওয়ারান*, পৃ. ২৫৮, *ইসলাম বিশ্বকোষ*, ২৪শ খণ্ড (প্রথম ভাগ), (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৪১১।

[২৬] *শরহে দাশভারিহায়ে আয হাদিকাতুল হাকিকাহ সানায়ি*, পৃ. ৯।

[২৭] *ইসলাম বিশ্বকোষ*, ২৪শ খণ্ড (প্রথম ভাগ), পৃ. ৪১২।

[২৮] *তারিখে আদাবিয়াতে ফারসি*, পৃ. ২২০।

[২৯] *শরহে দাশভারিহায়ে আয হাদিকাতুল হাকিকাহ সানায়ি*, পৃ. ৮২৫।

[৩০] ড. আলি আসগর হালাবি, *এরফান ভা আহওয়ালে আরেফান* (তেহরান: এন্তেশারাতে আসাতির, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৪২৭।

[৩১] *পবিত্র কুরআনুল করিম*, ২১ নং সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৪।

[৩২] *হাদিকাতুল হাকিকাহ ভা শারিআতুত তারিকাহ আবুল মাজ্‌দ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি গযনবি*, পৃ. ৬৫।

[৩৩] *পবিত্র কুরআনুল করিম*, ৫০ নং সূরা ক্বাফ, আয়াত: ২৯।

[৩৪] *হাদিকাতুল হাকিকাহ ভা শারিআতুত তারিকাহ আবুল মাজ্‌দ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি গযনবি*, পৃ. ১৫৮।

---

[৩৫] *পবিত্র কুরআনুল করিম*, ১৭ নং সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত: ০১।

[৩৬] *হাদিকাতুল হাকিকাহ ভা শারিআতুত তারিকাহ আবুল মাজ্দ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি গযনবি*, পৃ. ১৯৫।

[৩৭] *পবিত্র কুরআনুল করিম*, ২১ নং সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭।

[৩৮] *হাদিকাতুল হাকিকাহ ভা শারিআতুত তারিকাহ আবুল মাজ্দ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি গযনবি*, পৃ. ২০৩।

[৩৯] *পবিত্র কুরআনুল করিম*, ৭ নং সূরা আরাফ, আয়াত: ২৩।

[৪০] *হাদিকাতুল হাকিকাহ ভা শারিআতুত তারিকাহ আবুল মাজ্দ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি গযনবি*, পৃ. ২০৭-২০৮।

[৪১] *পবিত্র কুরআনুল করিম*, ১৭ নং সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৮১।

[৪২] *হাদিকাতুল হাকিকাহ ভা শারিআতুত তারিকাহ আবুল মাজ্দ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি গযনবি*, পৃ. ২৪৪।

[৪৩] *ইসলাম বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), পৃ. ৬২২।

[৪৪] *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, ১ম খণ্ড, খোলাসে *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৫.

[৪৫] *জিন্দেগনামে শায়েরানে ইরান*, পৃ. ৭৯।

[৪৬] *ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৮৫।

[৪৭] *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, ১ম খণ্ড, খোলাসে *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬।

[৪৮] *ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৮২।

[৪৯] R.A. Nicholson, *The Mystics of Islam* (London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1963), p. 106.

[৫০] *তাহকিক দার আহওল ভা নাকুদে আছার ওয়া আফকারে শাহ নেয়ামাতুল্লাহ ওলি*, পৃ. ৪২৯।

[৫১] ড. রেযা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (তেহরান: এন্তেশারাতে অহাঙ্গ, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ২৮০।

[৫২] *লোগাত নামেয়ে দেহখোদা*, ৩৪খণ্ড, পৃ. ৩১০।

[৫৩] Afzal Iqbal, *The Life and Works of Muhammad Jalal-ud-Din Rumi* (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1964), p. 83.

[৫৪] *দিভানে হাকিম আবুল মাজ্দ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি গযনবি*, পৃ. ৫৮ (ভূমিকা)।

[৫৫] *এরফান ভা আহওয়ালে আরেফান*, পৃ. ৪২৭।

[৫৬] খাকানি শিরওয়ানি, *দিভানে খাকানি শিরওয়ানি*, ড. মির জালাল উদ্দিন কাজাজি সম্পা. ২য় খণ্ড (তেহরান: নাশরে মারকাজ, ১৩৭৫ হি.শা./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১১৩৯; *দিভানে হাকিম আবুল মাজ্দ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি গযনবি*, পৃ. ৫৭ (ভূমিকা)।

[৫৭] *সোখান ভা সোখানওয়ারান*, পৃ. ৬৩৫; *দিভানে খাকানি শিরওয়ানি*, পৃ. ১১৩৬।

[৫৮] *সোখান ভা সোখানওয়ারান*, পৃ. ৬৩৫।

[৫৯] *দিভানে হাকিম আবুল মাজ্দ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি গযনবি*, পৃ. ৫৬ (ভূমিকা)।

[৬০] *তদেব*, পৃ. ৫৬ (ভূমিকা)।

[৬১] *তদেব*, পৃ. ৫৫ (ভূমিকা)।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

পারস্য কবি দাকীকী : কাব্য ও শিল্পরূপ

ড. মো. শফিউল্লাহ[*]

Abstract: Daqiqi is one of the most prominent Samanid poets of Iran. He was the first poet who undertook the versification of the National epic of Iran. The Full name of the poet is **Abu Mansoor Mohammad Bin Ahmad Daqiqi**. The exact date of his birth is not known but he was certainly born in the first half of the 4th century A. H./ 10 Century A. D. Because of his patrons Mansoor bin Nuh reigned from 350 to 366 A. H. There is a controversy regarding the birth place of the poet. Awfi calls him a native of Tus, Aazer, of Samarqand while according to Hidayat he hailed from Balkh. Daqiqi was a follower of the religion Zoroaster and he was Proud for being a follower of it. Some scholars, however, do not believe him to be a Zoroastarian, because his name appears to be that of Muslim. Daqiqi starts his career as a poet at a very early age and he was renowned for his compositions. According Firdausi, Daqiqi was killed in his youth by his salve with whom he had fallen in love. The Qasidas, Ghazals and Fragments of Daqiqi are preserved in the memoirs. But the most important work on which the fame of Daqiqi rests in the Gustasap Namah, which is a part of *Shahnamah* of Firdausi. His verses are marked by originality of ideas, novelty of expression and flight of imagination. A true of melody and rhyme adds a particular Charm to his Poetry.

ভূমিকা

কবি দাকীকী ফারসি সাহিত্যের সামানী যুগের একজন বিখ্যাত কবি। যাকে সামানী যুগের রুদাকীর পর দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়।[১] তাঁর সম্পর্কে Tanwir Ahmad ব্যক্ত করেনঃ “Daqiqi was undoubtedly one of the greatest poets of the 10th century A. D.”[২] তিনি ফারসি সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা।[৩] তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে। তাঁর জন্মস্থান সমরকন্দ, বোখারা ও বাল্‌খ বলা হয়ে থাকে। তিনি প্রাচীন ইরানের বাল্‌খ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] তিনি মাসনভী, কাসিদা, গজল ও কেতআ কবিতা রচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তবে তিনি বীরত্বগাঁথা রচনায় সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেন।[৫] বিশ্ববিশ্রুত মহাকাব্য *শাহনামা* রচয়িতা মহাকবি ফেরদৌসী *শাহনামা* রচনায় কবি দাকীকীর শুধু পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্ষান্ত হননি; বরং কবি দাকীকীর কবিতা নিজ *শাহনামায়* অন্তর্ভূক্ত করে কবি দাকীকীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে কাব্যে শিল্পনৈপুণ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করেন ও তাঁকে চির অমর করে রাখেন। সামানী যুগের কবি রুদাকী, যাকে ফারসি কাব্য সাহিত্যের জনক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়; সেই কবি রুদাকীর পরেই সামানী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন দাকীকী।[৬] আমির মনসুর বিন নূহ সামানী (৩৫০-৩৬৬ হিজরী শতাব্দী মোতাবেক ৯৬১-৯৭৬ খ্রি.) দাকীকীর কবিত্বের যশ ও খ্যাতির কথা শুনে তাঁকে নিজ দরবারে আমন্ত্রণ জানান। রাজ দরবারে কাব্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ পেয়ে তিনি কাব্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। আমির মনসুরের মৃত্যুর পর তার পুত্র নূহ বিন মনসুর সিংহাসন আরোহণ করেন। নূহ বিন মনসুরের নির্দেশক্রমে কবি দাকীকী *শাহনামা* রচনা আরম্ভ করেন; কিন্তু *শাহনামা* রচনা পূর্ণ করার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। মাত্র এক হাজার শ্লোক রচনা হতেই তিনি নির্মমভাবে এক গোলামের হাতে নিহত হন।[৭] তাঁর রেখে যাওয়া এক হাজার কবিতাই পরবর্তীতে মহাকবি ফেরদৌসীকে *শাহনামা* রচনায় অনুপ্রেরণা দান করে।[৮]

---

[*] প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এ সম্পর্কে A.J. Arberry বলেনঃ “Daqiqi was not in fact the earliest epic poet of Persia, Though his verses, incorporated in the work of his successor Firdausi.”[৯]

কবি পরিচিতি

কবি দাকীকীর পুরা নাম হলো আবু মনসুর মুহাম্মদ বিন আহমদ দাকীকী।[১০] তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে জানা যায় না।[১১] দাকীকীর জন্মস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক মোহাম্মদ উফী তাঁকে ইরানের তুস নগরের অধিবাসী বলে গণ্য করেন।[১২] ইতিহাসবিদ রেজাকুলি হেদায়াত তাঁর *মুজমাউল ফুছাহা* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, কবি দাকীকীকে কোন কোন ঐতিহাসিক বাল্‌খের অধিবাসী বলে বাল্‌খী বলে উল্লেখ করেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে সমরকন্দের অধিবাসী বলে সমরকন্দী বলে উল্লেখ করেন। আর কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে বোখারার অধিবাসী বলে মন্তব্য করেন।[১৩] তবে ইরানের আধুনিক ঐতিহাসিক ড. রেযা যাদেহ শাফাক তাঁর *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* নামক গ্রন্থের দাকীকী অংশের শিরোনামে তাঁকে তুসী বলে উল্লেখ করেন এবং জন্মস্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁকে বাল্‌খের অধিবাসী হিসেবে ‘বাল্‌খী’ বলে মত প্রকাশ করেন।[১৪] তাঁর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এত টুকু জানা যায় যে, তিনি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[১৫] ধর্মীয় মতাদর্শের দিক থেকে তাঁকে ‘মাযহাবে যারতুশ্‌ত’[১৬] এর অনুসারী বলে ধারণা করা হয়ে থাকে।[১৭] দাকীকী স্বীয় কবিতায় যারতুশ্‌ত ধর্মের প্রবর্তক যারতুশ্‌ত সম্পর্কে সুউচ্চ প্রশংসা করায় ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ তাঁকে যারতুশ্‌ত ধর্মের অনুসারী বলে মন্তব্য করেন।[১৮] আর তিনি যেহেতু অগ্নি উপাসক ছিলেন; ফলে এ থেকে ধারণাটির ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়।[১৯] এ প্রসঙ্গে কবি দাকীকীর কবিতার একটি শ্লোক ঃ

یزدان که هرگز نبیند بهشت + کسی کو ندارد ره زرد هشت[20]

আল্লাহকে কেউ কখনো বেহেশতে দেখতে পাবে না;
যতক্ষণ না সে যারতুশ্‌ত ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন না করবে।

উপরোক্ত শ্লোক থেকে বুঝা যায় যে, তিনি যারতুশ্‌ত ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তবে কেউ কেউ তাঁর নামটি মুসলিম নাম বলে তাঁকে মুসলিম ধর্মের অনুসারী বলেও মন্তব্য করেন।[২১] তাঁর জন্ম তারিখের ন্যায় তাঁর মৃত্যু তারিখও জানা যায় না; তবে মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো তিনি ৩৬৭ হি. শা./ ৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২২]

কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ

ছোট বেলা থেকেই কবি দাকীকী কাব্যচর্চার আত্মনিয়োগ করেন। মাআরাউন্নাহার (ট্রান্সঅক্সিয়ানায়) এলাকায় চুগানিয়ান আমীরদের একটি ছোট রাজ্য ছিল। দাকীকী সেই চুগানিয়ান আমীরদের রাজদরবারে কাব্যচর্চা আরম্ভ করেন। এখান থেকেই তাঁর কাব্য ও কবিত্বের খ্যাতি বহু দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। চুগান আমীরদের মধ্যে বিশেষত ফখরুদ্দৌলাহ আবু সাঈদ মনসুর তাঁকে বিভিন্ন সময় উপহার-উপঢৌকনে ধন্য করতেন।[২৩]আমীর মনসুর বিন নূহ বিন সামানী কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁকে নিজ দরবারে ডেকে নেন।[২৪] তিনি রাজদরবারে কাব্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ পেয়ে কাব্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। আমীর মনসুর বিন নূহ সামানীর পর তার পুত্র নূহ বিন মনসুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। নূহ বিন মনসুরের নির্দেশক্রমে কবি দাকীকী *শাহনামা* রচনা আরম্ভ করেন।[২৫] এই *শাহনামা* রচনা করার সময় তিনি তাঁর প্রিয় এক তুর্কী গোলামের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। তাই *শাহনামা* রচনা সমাপ্ত করার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি; তখন মাত্র এক হাজার কবিতা রচনা হয়েছিল।[২৬]এ প্রসঙ্গে A.J. Arberry বলেনঃ "He had only

completed a thousand couplets however, when he was marderd by his favorite Turkish slave."[২৭] দাকীকীর শাহনামার এক হাজার কবিতার বিষয় ছিল প্রাচীন ইরানের বাদশাহ গাশ্তাসাবের রাজত্ব, যারতুশ্‌তের আবির্ভাব, ইরানের রাজা গাশ্তাসাব ও তুরানের বাদশাহ আরজাসাবের মধ্যকার যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনা।[২৮]

মহাকবি ফেরদৌসীর শাহনামা রচনায় দাকীকীর প্রভাব

মহাকবি ফেরদৌসী স্বয়ং তাঁর *শাহনামায়* কবি দাকীকীর *শাহনামার* কথা আলোচনা করতে গিয়ে ব্যক্ত করেন যে, "একদিন স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার হাতের মধ্যে শরাবের পেয়ালা, দাকীকী কোথায় থেকে যেন বের হয়ে এসে পানপত্র সম্পর্কে কথা-বার্তা বলতে আরম্ভ করলো এবং আমাকে বলল যে, তোমার হাতেও তো শরাবের পাত্র রয়েছে; কিন্তু সেটি কিয়ানী পদ্ধতিতে পান করতে হবে।"[২৯] এ কথার উদ্দেশ্য হলো এই যে, ইরানী প্রাচীন বাদশাহ কিয়ানী সম্পর্কে আমি এক হাজার কবিতা রচনা করেছি; সে কবিতাগুলো যদি তুমি পাও তাহলে তুমি তোমার *শাহনামায়* অন্তর্ভূক্ত করে নিও। এ স্বপ্নাদেশে আদিষ্ট হলে, কবি ফেরদৌসী দাকীকীর এক হাজার কবিতা স্বীয় *শাহনামায়* অন্তর্ভূক্ত করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বাস্তবায়ন করেন।[৩০] দাকীকীর কবিতা প্রসঙ্গে কবি ফেরদৌসী বলেন,

کنون رازها بازگویم ترا + حدیث دقیقی بگویم ترا
چنان دید گوینده یک شب بخواب + که یک جام می داشتی چون گلاب
دقیقی ز جائی پدید آمدی + بدآن جام می داستانها زدی
به فردوسی آواز دادی که می + مخور جز به آئین کائوس کی[৩১]

এখন গোপন রহস্যগুলো আমি তোমাকে খুলে বলছি;
দাকীকীর কথা আমি তোমাকে বলছি।
এক রাতে স্বপ্নে এরূপ বর্ণনাকারীকে দেখলাম;
গোলাপজলের ন্যায় একটি মদের পানপাত্র হাতে।
দাকীকী কোন এক স্থান থেকে বের হয়ে আসলো;
মদের পানপাত্রের কাহিনী বর্ণনা করা অবস্থায়।
ফেরদৌসীকে সম্বোধন করে বল্ল যে, মদ পান করো না;
যদি পান করো তাহলে কাইকাউসের (কিয়ানী বংশের বাদশাহ) পদ্ধতিতে পান করো।

কাব্য পরিচিতি

কবি দাকীকী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হলো আধ্যাত্মিকতা, প্রাচীন পারস্য সম্রাটদের জীবনবৃত্তান্ত, প্রতাপশালী বীরদের শৌর্য-বীর্য, রণপ্রস্তুতি, রণকৌশল, প্রেম-বিরহ, প্রাকৃতিক দৃশ্য, শরাবের আলোচনা, নারীর রূপ বর্ণনা ইত্যাদি বিষয় তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। তাঁর কবিতার বিষয়বৈচিত্র প্রসঙ্গে আবদুস্ সাত্তার বলেন: "দাকিকীর কবিতায় বিচিত্রধর্মী তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। নিসর্গ প্রীতি, প্রেম-বিরহ এবং আধ্যাত্মিকতা সবই তাঁর কাব্য-কর্মে বাঙ্কময়।"[৩২] দাকীকীর কবিতা রচনার সংখ্যা খুব বেশি নয় এবং কাব্যগ্রন্থের সংখ্যাও পরিলক্ষিত হয় না; তবে তিনি যতটুকু রচনা করেছেন ততটুকু রচনাতেই ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য ও সৃজনশীল কাব্য প্রতিভা বিদ্যমান থাকায়, ফারসি কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় চির অমর হয়ে রয়েছেন। তাইতো তাঁর কাব্যশিল্পের জলন্ত প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়ে বিশ্ববিশ্রুত মহাকাব্য শাহনামার রচয়িতা মহাকবি ফেরদৌসী বলেন ঃ

جوانی بیامد گشاده روان + سخن گفتن خوب و طبع روان [৩৩]

একজন সুপ্রশস্ত ও গতিময় যুবকের আবির্ভাব হয়েছে;
স্বভাবতই তাঁর বক্তব্য সাবলীল, গতিময় ও সুন্দর।

তাঁর কাসিদা, কেতআ, ও গজল কবিতা *লুবাবুল আলবাব*, *মুজমাউল মুছাহা*, *তারিখে বাইহাকী*, *তারজুমানুল বালাগাহ্* ও *হাদায়িকুস সাহার* ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থাবলিতে পাওয়া যায়।[৩৪] তবে দাকীকীর চিরস্মরণীয় সেরা কৃতিত্ব হলো এক হাজার বীরত্বগাঁথা কবিতা যে কবিতাগুলো ফেরদৌসী তাঁর *শাহনামায়* অন্তর্ভূক্ত করে কবি দাকীকীকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন।[৩৫] কবি দাকীকীর *শাহনামার* শ্লোক সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। মহাকবি ফেরদৌসীর মতে তাঁর শাহনামার শ্লোক সংখ্যা ছিল এক হাজার। মহাকবি ফেরদৌসীর ভাষায় ঃ

ز گشتاسب و ارجاسب بیتی هزار + بگفت و سر آمد براو روزگار [৩৬]

গাশ্তাসাব ও আরজাসাব সম্পর্কে এক হাজার শ্লোক;
তিনি রচনা করলেন ও তাঁর চির বিদায়ের সময় হয়ে গেল।

ঐতিহাসিক মোহাম্মদ উফী এর মতে দাকীকীর *শাহনামার* কাব্য সংখ্যা ছিল বিশ হাজার, ঐতিহাসিক হামদুল্লাহ মাস্তুফির মতে তাঁর *শাহনামার* শ্লোক সংখ্যা ছিল তিন হাজার এবং কারো কারো মতে তাঁর *শাহনামার* শ্লোক সংখ্যা ছিল দশ হাজার।[৩৭] তবে ইরানীরা প্রাচীনকাল থেকেই সংখ্যার আধিক্যতা বুঝানোর ক্ষেত্রে 'হেযার' (হাজার) শব্দটি ব্যবহার করে আসছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে, মহাকবি ফেরদৌসী তাঁর কবিতায় যে 'হেযার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা সংখ্যার আধিক্যতা বুঝানোর জন্য। তাঁর গজল কবিতার ক্ষেত্রে গযনবী যুগের বিখ্যাত কবি উনসুরী প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর গজলের অনুকরণ করেন।[৩৮] *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম* গ্রন্থের প্রণেতা আবদুস্ সাত্তার তাঁর গজল রচনার ক্ষেত্রে মন্তব্য করেনঃ "গজল বা গীতি কবিতা রচনায় তাঁর দক্ষতা তুলনাহীন।"[৩৯] ফারসি সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টিতে তাঁর কাব্যে প্রাচীন ইরানীদের ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান রয়েছে।[৪০] তবে তাঁর অন্যান্য কাব্যের তুলনায় বীরত্বগাঁথাগুলোর রচনারীতি অনেকাংশে দুর্বল।[৪১] তৎকালীন প্রচলিত অলংকার শাস্ত্রীয় উপাদানগুলোও তিনি যথাযথভাবে তাঁর বীরত্বগাঁথাগুলোতে ব্যবহার করেন নি; কিন্তু মহাকবি ফেরদৌসী তাঁর শৈল্পিক বর্ণনার মাধ্যমে তা যথাযথভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তবে কবি দাকীকী তাঁর গজল ও কেতআ কবিতা রচনার মাধ্যমে তাঁর কাব্য রচনারীতির দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন।[৪২]

কাব্য প্রতিভা

দাকীকীর কবিতা পাঠে পরিলক্ষিত হয় যে, তার কাব্যে সৃজনশীল প্রতিভা বিদ্যমান রয়েছে। বীরত্বগাঁথা কবিতায় তিনি এমন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেছেন; যে বিষয়টি মহাকবি ফেরদৌসী পর্যন্ত অনুকরণ করেছেন। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় কবি ফেরদৌসীর পূর্ণ দক্ষতা ও পরিপূর্ণতা রয়েছে; কিন্তু রণক্ষেত্রে রণপ্রস্তুতিতে শৌর্য-বীর্যের চিত্র উপস্থাপনে ব্যতিক্রমধর্মী বর্ণনা সর্বপ্রথম তাঁর বীরত্বগাঁথা কবিতায় পরিলক্ষিত হয় এবং বলা হয়ে থাকে যে, এ ক্ষেত্রে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও একক কৃতিত্বের দাবীদার। [৪৩] তাঁর কেতআ কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়; তাহলো তাঁর কেতআ কবিতাতে গজল কবিতার ন্যায় প্রিয়সীর সৌন্দর্য, শরাব, প্রাকৃতিক দৃশ্যের আলোচনা এবং সূক্ষ্ম উপমা ব্যবহার করা হয়েছে।[৪৪]

কাসিদা রচনা

কবি দাকীকী কাসিদা রচনায় অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। উপদেশ, দানশীলতা, পথনির্দেশনা সমন্বিত বক্তব্য মূলত এ বিষয়গুলোই তাঁর কাসিদার মূল বিষয় ছিল।[৪৫] তিনি কাসিদা রচনার ক্ষেত্রে কবি রুদাকীর অনুকরণ করেন। প্রথমে তাশবীব লেখেন। অতঃপর এর পর মাদ্‌হ বা মামদুহের (প্রশংসিত ব্যক্তি) প্রশংসা করেন। অতঃপর দোয়া এর মধ্য দিয়ে কাসিদা সমাপ্ত করেন।[৪৬] উল্লেখ্য যে, কাসিদার গুরুত্বপূর্ণ অংশ পাঁচটি যথা-তাশবীব, গুরিয, মাদ্‌হ, আর্‌যে হাল ও দোয়া।[৪৭] কবি দাকীকী কাসিদার গুরুত্বপূর্ণ অংশ মাদ্‌হে মামদুহ্ বা প্রশংসিত ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন। আর যদি প্রশংসিত ব্যক্তি কোন বাদশাহ হোন; সে ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসা করার পাশাপাশি আবশ্যকীয় গুণাবলী উপস্থাপন করেছেন। যথা নিম্নোক্ত কাসিদায় কবি দাকীকী উল্লেখ করেন যে, বাদশাহর তিনটি গুণ আবশ্যকীয় প্রথমত সাহসিকতা, দ্বিতীয়ত দানশীলতা, এবং তৃতীয়ত জ্ঞানী। যদি এই তিনটি গুণের কোন একটি গুণ কোন বাদশাহর ভিতর বিদ্যমান না থাকে তাহলে সে বাদশাহর গুণাবলীতে অপূর্ণতা থেকে যায়।[৪৮] কবি দাকীকীর ভাষায় ঃ

زبان سخن گوی و دست کشاده + دلی همش کینه همش مہربانی

کرابخت و شمشیر و دینار باشد + وبالا تن نہم و نسبت کیانی

خرد باید آنجا وجود و شجاعت + فلک کی دهد مملکت رایگانی[৪৯]

যার রয়েছে আকর্ষণীয় বক্তব্য, এবং দানশীলতা;
যার হৃদয়ের সর্বত্র রয়েছে দয়া আর মায়া, এমনকি ঈর্ষার স্থানটুকুতেও রয়েছে দয়া।
যার সখা হবে সৌভাগ্য, তালোয়ার এবং মুদ্রা;
সুটাম ও সুউচ্চ দেহের অধিকারী হবে এবং হবে কিয়ানী বংশোদ্ভূত।
হবে সে জ্ঞানী ও সাহসী;
আসমান (আল্লাহ্‌র ফায়সালা) তখন নির্দিধায় তাকে দিবে রাজত্ব।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা

প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি এমন নিপুণহস্তে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন যে বর্ণনা পাঠে হৃদয় উদ্দীপ্ত ও চমৎকৃত হয়ে প্রাণে আনন্দের ঢেউ খেলে। তখন মনে হয় যেন সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে। যেমন তিনি তাঁর একটি কাসিদায় বষন্তকালের প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নমুনাস্বরূপ উপস্থাপন করা হলো ঃ

بر آفگند ای صنم ابر بہشتی + زمین را خلعت اردی بہشتی

بہشت عدن را گلزار ماند + درخت آراسته حور بہشتی

زمین برسان خون آلوده دیبا + هوا بر سان نیل اندوده دشتی

بطعم نوش گشته چشمۂ آب + برنگ دیدۂ آهوی دشتی[৫০]

ওহে! মূর্তি তুমি বেহেশতী মেঘমালার ন্যায় ছায়া বিছিয়ে আছো;
জমিনকে বেহেশতী পুরস্কারস্বরূপ বিশেষ সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত করেছো।
বেহেশতে আদন এর ন্যায় বাগ-বাগিচা;
বেহেশতী হুরের ন্যায় বৃক্ষরাজি সুসজ্জিত হয়ে আছে।
জমিন রঙিন রেশমী কাপড়ে আবরণকৃত;
চারণভূমির নীল আবরণের উপর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে।

ঝর্ণার পানিতে সুপেয় পানির স্বাদ রয়েছে;
বণ্য হরিণের চোখের ন্যায় (স্বচ্ছ পানি)।

উপমা উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ

যে কোন কবির কাব্যিক সৌন্দর্য্য নির্ভর করে মূলত তাঁর কবিতায় উপমা ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে। উপমা ব্যতীত কবিতা সাজ-সজ্জাবিহীন সৌন্দর্য্যের ন্যায়।[৫১] সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কবিতায় উপমা ব্যবহার আবশ্যকীয়। কবি দাকীকী উপমা ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। কবিতায় উপমা ব্যবহারে তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

بپوشیده شد چشمهٔ آفتاب + زپیکان های درخشان چو آب
تو گفتی هوا ابر آرد همی + وزآن ابر املاس بارد همی[৫২]

সূর্যের চোখ আড়ালে হয়েছে;
স্বচ্ছ পানির ন্যায় চকমকে ও ঝকঝকে শরীর কাঠামো তার।
তুমি বলবে যে বাতাসে মেঘমালার শুভাগমন ঘটেছে;
আর মেঘমালা থেকে বৃষ্টির স্বচ্ছ ও সুপেয় পানি বর্ষিত হচ্ছে।

প্রিয়সীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা

প্রিয়সীর সৌন্দর্য্য বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি পারদর্শিতার পরিচয় দেন। ফারসি কবি সাহিত্যিকদের কাব্য সাহিত্যে যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় তন্মধ্যে প্রেম সম্পর্কিত আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। প্রেমের আলোচনার ভেতর স্থান পায় প্রিয়সীর সৌন্দর্য্যের বর্ণনা। তিনি প্রিয়সীর সৌন্দর্য্য চমৎকারভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যে শব্দ ও ভাষা যেভাবে প্রয়োগ করা দরকার ঠিক সে শব্দ ও ভাষা সেইভাবেই প্রয়োগ করে আকর্ষণীয়ভাবে প্রিয়সীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেছেন। নমুনাস্বরূপ তাঁর কবিতার একটি শ্লোক উপস্থাপিত হলো ঃ

یاری گزیدم از همه خلقان پری نژاد + زآن شد ز پیش چشم من امروز چو پری[৫৩]

সকলের মাঝ থেকে আমি আমার প্রিয়সী চয়ন করেছি; যেন পরী বংশোদ্ভূত,
তার পরীর মত দেখতে সুন্দর চেহারা প্রতিনিয়ত যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে।

নারীর রূপ বর্ণনাকেন্দ্রিক একটি অপূর্ব প্রেমের কবিতার কয়েকটি লাইনের অনুবাদ ঃ

"তোমার চুলের মতো কালো এই রাত
তোমার মুখের মতো দীপ্ত এই দিন।
তোমার ঠোঁটের ওই সুদৃশ্য চত্বরে
শিল্পীর শৌকর্য ভরা মুক্তোর বিস্ময়।
হরিণীর দু'টি ছোখ তোমার দু'চোখে,
অথবা সে নার্সি সাসী চোখের ভিতরে।"[৫৪]

শরাবের আলোচনা

কবিতা রচনার সূচনালগ্ন থেকেই শরাবের আলোচনা কবিতার আলোচ্য বিষয়ে ও কবিতার অলংকারে পরিণত হয়।[৫৫] প্রথম দিকে ইউনানী ও আরব কবিগণ শরাবের আলোচনা কবিতার আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এর পর ইরানী কবিগণ কবিতার আলোচ্য বিষয় হিসেবে শরাবের আলোচনা গ্রহণ

করেন।[৫৬] কবি দাকীকীর নিকট শরাব একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় জিনিস। তিনি স্বয়ং মদ্যপায়ী ছিলেন। এ কারণে কবি দাকীকী শরাবের বিষয়টি অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাই কবি দাকীকীর কবিতায় শরাবের আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। ইরানি কবি সাহিত্যিকগণ প্রেম সম্পর্কিত আলোচনার পাশাপাশি শরাবের আলোচনাও নিজেদের কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান দিয়ে কবিতার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছেন। শরাবের যেমন আকর্ষণ রয়েছে তাঁদের নিকট ঠিক তেমনিভাবে তাঁদেরকে শরাবের আলোচনাও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে লক্ষ্য করা যায়। কবি দাকীকীর ভাষায় শরাবের আলোচনা ঃ

دقیقی چار خصلت برگزیده است + بگیتی از همه خوبی و زشتی
لب یاقوت رنگ و ناله چنگ + می خون رنگ و کیش زرد هشتی[৫৭]

দাকীকী চারটি বৈশিষ্ট গ্রহণ করেছেন;
ধরণীর সকল সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্য থেকে।
ইয়াকুত পাথরের ঠোঁটের সৌন্দর্য এবং চাঙ্গ[৫৮] নামক বাদ্যযন্ত্রের সুর;
রক্তের ন্যায় লাল মদ, এবং কীশ ধর্মের আটকোণ বিশিষ্ট হলুদ কক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

সূক্ষ্ম ও দার্শনিক চিন্তা-চেতনা

তিনি দার্শনিক চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাব্য পাঠে অনুমিত হয় যে, তিনি সূক্ষ চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন। জীবনের প্রতিটি বিষয়কে তিনি যুক্তির মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে অন্ধ বিশ্বাসে ভাগ্যের উপর ভরসা করে কাল বিলম্ব করে বসে থাকলে হবে না; বরং নিজ চেষ্টায় জীবনকে উন্নত করতে হবে। কবির ভাষায় ঃ

گویند صبر کن که تورا صبر بدهد + آری دهد و لیک به عمر دگر دهد
من عمر خویش را به صبوری گذاشتم + عمر دگر بیایدت تا صبر بر دهد.[৫৯]

জ্ঞানীগণ বলেন যে, ধৈর্য ধারণ করো তাহলে ধৈর্যের ফল পাবে;
ওহে শিক্ষাগুরু ধৈর্যের ফল পাবে ঠিক; কিন্তু তা পাবে পরজনমে।
আমি নিজ জীবনকে ব্যয় করলাম ধৈর্যের মাঝে;
তাই ধৈর্যের ফল লাভ করতে হলে আরেকটি জীবন ফিরে পাওয়া উচিৎ।

উপরোক্ত কবিতায় কবি সূক্ষ্মভাবে বুঝাতে চেয়েছেন যে, শুধু পরকালের কল্যাণের আশায় বসে থাকলে হবে না; বরং ইহজগতের কল্যাণকেই বেশি প্রাধান্য দিতে হবে অর্থাৎ ইহকালকে দিয়েই পরকালকে জয় করতে হবে। মূলত তিনি ছিলেন প্রকৃতিবাদী কবি। অপরদিকে তাঁর উপরোক্ত কবিতায় প্রকৃতিবাদে বিশ্বাসের বিষয়টিও ফুটে উঠেছে। ফারসি সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর কবিতাতেই সর্বপ্রথম প্রকৃতিবাদে বিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠে।[৬০]

ছন্দবদ্ধ কবিতা

তাঁর কবিতা ছন্দবদ্ধ। তাঁর কবিতায় আকর্ষণীয় ছন্দমিল রয়েছে। তাঁর কবিতা পাঠে সুরের বিশেষ ঝঙ্কারের সৃষ্টি হয়। এতে সঙ্গীতের সুরের ন্যায় ধ্বনি সৃষ্টি হয়। পাঠকমহল তাঁর কবিতা পাঠে আকৃষ্টি হয় এবং শ্রোতামণ্ডলী কবিতা পাঠের শ্রুতিমাধুর্যে আকৃষ্টি হয়। তাই তাঁর কবিতায় চমৎকার ছন্দমিল ও উচ্চারণে স্বরমাধুর্যের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে Tanwir Ahmad ব্যক্ত করেন ঃ “A tune of melody and rhyme adds a particular charm to his poetry”[৬১]

কল্পনাপ্রবণতা

কবিদের বিশেষ বৈশিষ্ট হলো কল্পনার উপর নির্ভর করে কবিতা রচনা করা। আর কবিদের সেই কল্পনাই বাস্তবতার ন্যায় সচ্ছ সমোজ্জ্বল। মূলত কবিগণ বাস্তবতার সাথে মিল রেখে কল্পনার জগতে অবগাহনলিলায় মেতে উঠে কবিতা রচনা করেন যা জীবনবাস্তবতাকে সুন্দরভাবে বুঝতে ও হৃদয়োঙ্গম করতে সহায়তা করে। কবি দাকীকীর মাঝেও কবিদের এ বিশেষ বৈশিষ্টটি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট হলো কল্পনাপ্রবণতা। কোন কোন কবিতা তিনি কল্পনার উপর নির্ভর করে রচনা করেছেন। কল্পনার জগতে উড়াল দিয়ে তিনি বিষয়ের উপস্থাপনায় অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁর কবিতার বিষয়গুলোতে মৌলিক ধারণা পাওয়া যায় ও এর পাশাপাশি কল্পনাপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।[৬২]

খাঁটি ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা

সামানী যুগের কবিসাহিত্যিকগণ আরব কবিদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ফলে তাঁদের কবিতায় আরবী শব্দের বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। তবে দাকীকীর কবিতা আরবী শব্দের সেই প্রভাব-প্রচলন থেকে মুক্ত[৬৩]। তাই তিনি খাঁটি ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করে মূলত ফারসি ভাষার লালন করেন।[৬৪] তিনি খাঁটি ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করে পরবর্তী কবিসাহিত্যিকদেরকে খাঁটি ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দান করেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহাকবি ফেরদৌসী খাঁটি ফারসি ভাষায় মহাকাব্য *শাহনামা* রচনা করেন।

কবিতার ভাব ও ভাষা

তিনি কবিতার বিষয়গুলো সহজ ও সুন্দর ভাষায় চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।[৬৫] তাঁর কবিতার ভাষা সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল। মূলত তিনি ছিলেন আবেগপ্রবণ, ভাবপ্রবণ ও কল্পনাপ্রবণ কবি সেহেতু তাঁর কবিতার ভাষা সহজ-সরল হলেও তাতে ভাবের উম্মাদনা ও কল্পনার লিলায়িত তরঙ্গ বিক্ষেপ রয়েছে।[৬৬] তিনি ভালবাসার আকর্ষণীয় ঘটনাগুলো সুমধুর ভাষায় উপস্থাপন করতে অভ্যস্ত ছিলেন।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, কবি দাকীকী ছিলেন একজন প্রতিভাবান কবি। তার কাব্য প্রতিভার আলোকচ্ছটায় আলোকিত হয়েছে ফারসি সাহিত্যজগত। তিনি ফারসি সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা। বিখ্যাত ফারসি সাহিত্য সমালোচক A.J.Arberry তাঁকে সামানী যুগের ফারসি সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ মহাকাব্য রচয়িতা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। A.J. Arberry এর ভাষায় ঃ "It was in the reign of Amir Mansur and of his son Nuh 2nd reigned(976-99) that the first great experiment in epic poetry was attempted, and the first and last great Persian epic was largely drafted" ।[৬৭] তাঁর মহাকাব্যে যুদ্ধময়দানের কৌশল, রণপ্রস্তুতি, বীরদের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনের চিত্র আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।[৬৮] দাকীকী একজন স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কবি ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন বৈচিত্র্যময় প্রতিভার অধিকারী তেমনি তাঁর কাব্যকর্মও বিচিত্র স্বাদে ভরপুর। তিনি কাসিদা রচনাতেও নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন। রাজা-বাদশাহদের প্রশংসার পাশাপাশি তিনি তাঁদের গুণাবলীর বিষয়টিও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা, প্রিয়সীর সৌন্দর্য্যের বর্ণনা, উপমা উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ, শরাবের আলোচনা, সূক্ষ্ম ও দার্শনিক চিন্তা-চেতনা, কল্পনাপ্রবণতা, প্রকৃতিবাদ, ইরানীদের ধ্যান-ধারণা, ভালবাসার ঘটনাগুলো আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন ইত্যাদি বিষয়বৈচিত্র্য সহজ-সরল ও খাঁটি ফারসি ভাষায় তাঁর ছন্দবদ্ধ কবিতায় সুমধুর ভাষায় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে চমক সৃষ্টি করেছেন। তাই সব শেষে বলা যেতে পারে যে, তিনি ফারসি সাহিত্যের সূচনাপর্ব বা ক্রমবর্ধমান যুগের একজন প্রথিতযশা কবি ছিলেন; তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান ফারসি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ ড. রেযা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (তেহরান :এনতেশারাতে অহাঙ্গ, ১৩৬৯ হি. শা./১৯৯০খ্রি.),পৃ. ৫৪; অধ্যাপক ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, *ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২২৬-১০০০খ্রিষ্টাব্দ)* (ঢাকা : বার্ড পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ২০২১খ্রি.), ১১৩।

২ Tanwir Ahmad, *A Short History of Persian Literature* (Calcutta: Naz Publishing Center, 2nd edition, 1991), p. 66.

৩ A.J.Arberry, *Classical Persian Literature in Iran* (London: George Allen and Unwin LTD, Ruskin House, Museum street), p.41.

৪ মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানী, *আদাব নামেয়ে ইরান* (লাহোর ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সী , ২য় সংস্করণ, তাবি), পৃ. ১০২।

৫ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ১০৩।

৬ ড. রেযা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পৃ. ৫৪।

৭ পারভীন শাকীবা, *শে'রে ফারসি আয অগায তা এমরোয* (তেহরান : এনতেশারাতে হিরমান্দ, ১৩৭৩ হি. শা./১৯৯৪খ্রি.),পৃ. ৪৭; অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, *ইরানের কবি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮খ্রি.) পৃ. ১৮।

৮ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ১০৩; ড. রেযা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পৃ. ৫৫।

৯ *Classical Persian Literature in Iran* .p.41-42.

১০ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ১০২; *A Short History of Persian Literature*, p. 65.

১১ Joel Waiz Lal, *An Introductory History of Persian Literature* (Delhi: The Imperial Book Depot Press, 1925), p. 73.

১২ বদিউয্যামান ফোরুযানফার, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (তেহরান: ওযারাতে ফারহাঙ্গ ও এরশাদে ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৩ হি. শা./ ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১০৯।

১৩ ড. রেযা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পৃ. ৫৪।

১৪ *তদেব*।

১৫ আবদুস্ সাত্তার, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম* (ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ.৬।

১৬ মাযহাবে যারতুশ্ত: ইরানের প্রাচীন অধিবাসীগণ 'মাযহাবে যারতুশ্ত' বা যরথুস্ত্র ধর্মের অনুসারী ছিলেন। প্রাচীন ইরানের হাখামানশী যুগে যারতুশ্ত নামে এক ব্যক্তি মাযহাবে যারতুশ্ত এর প্রবর্তক ছিলেন। যারতুশ্ত এর আবির্ভাব প্রসঙ্গে গবেষকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে অধিকাংশ গবেষক এ কথার উপর একমত যে যারতুশ্ত এর আবির্ভাব হয় ৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এবং তিনি ৫৮৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। যারতুশ্তকে প্রাচীন ফার্স অধিবাসীরা নিজেদের পয়গাম্বর বলে মনে করত। [*আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ৮]।

১৭ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ১০৩; *Classical Persian Literature in Iran* .p.41.

১৮ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ১০৩; *Classical Persian Literature in Iran* .p.41; ড. রেযা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পৃ. ৫৫।

১৯ *ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২২৬-১০০০খ্রিষ্টাব্দ)*, ১১৫।

২০ *শে'রে ফারসি আয অগায তা এমরোয* পৃ. ৪৮।

২১ বদিউয্যামান ফোরুযানফার, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পৃ. ১০৮; *A Short History of Persian Literature*, p.65.

২২ বদিউয্যামান ফোরুযানফার, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পৃ. ১০৮; *An Introductory History of Persian Literature*, p.75; আজিমুল হক জোনাইদী ও মোহাম্মদ তাহের ফারুকী, *মোখতাসার তারিখে আদাবে ফারসি*, (পেশাওর: ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সী, ১৯৬০ খ্রি.), ১৪১।

[২৩] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ১০২; *An Introductory History of Persian Literature,* p.73; *ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২২৬-১০০০খ্রিষ্টাব্দ)*, ১১৪।

[২৪] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ১০২; *ইরানের কবি*, পৃ. ১৫।

[২৫] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ১০২-১০৩; *মোখতাসার তারিখে আদাবে ফারসি*, পৃ. ১৪০; *ইরানের কবি*, পৃ. ১৫-১৬।

[২৬] *Classical Persian Literature in Iran* .p.41; *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ১০৩; *An Introductory History of Persian Literature,* p.74; *ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২২৬-১০০০খ্রিষ্টাব্দ)*, ১১৪।

[২৭] *Classical Persian Literature in Iran* .p.41.

[২৮] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ১০৩।

[২৯] *তদেব*, পৃ. ১০৪-১০৫।

[৩০] *তদেব*, পৃ. ১০৫।

[৩১] *তদেব*, পৃ. ১০৪।

[৩২] *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, পৃ. ৭।

[৩৩] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ১০৩; *A Short History of Persian Literature,* p.66.

[৩৪] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ.১০৫।

[৩৫] *তদেব*।

[৩৬] বদিউয্যামান ফোরুযানফার, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পৃ. ১১১।

[৩৭] *তদেব*।

[৩৮] ড. রেযা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পৃ. ৫৫।

[৩৯] *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, পৃ. ৭।

[৪০] Ahmad Tamimdari, *A Histori of Persian Literature,* Translated. Ismail Salami (Tehran: Catural Studies, The Center for International, 2002), p.74.

[৪১] ড. আহমদ তামীম দারী, *তারিখে আদাবে ফারসি*, তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনু.) অনূদিত গ্রন্থ-*ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৭ খ্রি.), পৃ.৭৭।

[৪২] *ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২২৬-১০০০খ্রিষ্টাব্দ)*, পৃ. ১১৬; *A Histori of Persian Literature,* Translated. Ismail Salami, p.74-75.

[৪৩] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ১০৩-১০৪।

[৪৪] ড. রেযা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পৃ. ৫৬।

[৪৫] *ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২২৬-১০০০খ্রিষ্টাব্দ)*, পৃ. ১১৫।

[৪৬] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ১০৫।

[৪৭] প্রফেসর মো.মঈযুদ্দিন, *রাহনুমায়ে সুখান* (ঢাকা : আরেফিন প্রেস, ১৯৬০খ্রি.), পৃ.৫২।

[৪৮] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ১০৫।

[৪৯] ড. রেযা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পৃ. ৫৫-৫৬; *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ১০৫-১০৬।

[৫০] ড. রেযা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পৃ. ৫৬।

[৫১] *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ.৯০।

[৫২] *তদেব*, পৃ.১০৪।

[৫৩] *তদেব*, পৃ.১০৬।

[৫৪] *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, পৃ. ৭।

৫৫ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ.৮৮।

৫৬ *তদেব*।

৫৭ *শে'রে ফারসি আয অগায তা এমরোয*, পৃ. ৪৮; *A Short History of Persian Literature,* p.65.

৫৮ চাঙ্গ: প্রাচীন ইরানের একটি প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের নাম হলো 'চাঙ্গ'। ফারসি সাহিত্যে এ ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক উল্লেখ রয়েছে। সাসানী সম্রাটগণ যখন নৌকায় চড়ে শিকারে বের হতেন তখন চাঙ্গবাদকগণ বাদ্যযন্ত্রটি বাজিয়ে আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করতেন। এটি ৬৪ তার বিশিষ্ট হয়ে থাকে এবং আঙ্গুল দিয়ে বাজানো হয়। এ বাদ্যযন্ত্রকে হার্‌পও বলা হয়।[*ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত(২২৬-১০০০খ্রিষ্টাব্দ)*, ফুটনোট অংশ, পৃ. ১১।]

৫৯ বদিউয্‌যামান ফোরুযানফার, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পৃ. ১১৪; *মোখতাসার তারিখে আদাবে ফারসি*, পৃ. ১৪১।

৬০ *মোখতাসার তারিখে আদাবে ফারসি*, পৃ. ১৪০-১৪১।

৬১ *A Short History of Persian Literature,* p.67.

৬২ *Ibid.*

৬৩ *ইরানের কবি*, পৃ. ১৯।

৬৪ *মোখতাসার তারিখে আদাবে ফারসি*, পৃ. ১৪০।

৬৫ *An Introductory History of Persian Literature,* p.75.

৬৬ *A Short History of Persian Literature,* p.67.

৬৭ *Classical Persian Literature in Iran* .p.41.

৬৮ *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ১০৩।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

উর্দু নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ: একটি পর্যালোচনা

ড. মো. রশিদুল আলম*

Abstract: Urdu Drama evolved from the prevailing dramatic traditions of North India shaping Rahas or Rass as practiced by exponents like Nawab Wajid Ali Shah (1822-1887) of Awadh. His dramatic experiments led to the famous *Inder Sabha* of Amanat and later this tradition took the shape of Parsi Theatre. The plays of Agha Hashr (d. 1935), nicknamed the Indian Shakespeare, are a towering peak of Urdu drama of turn of the century. Written in 1922, the romantic tragedy *Anarkali* by Imtiyaz Ali Taj (d. 1970) acquired fame as it was screened several times in later years. Zarif (d. 1895), Talib (d. 1914), Hafiz Abdallah (d. 1922), Ahsan (d. 1935), Betab (d. 1945), Saadat Hasan Manto (d. 1955) and Ismat Chughtai (d. 1991) are a few of the modern playwrights actively contributing to Urdu drama.

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উর্দু সাহিত্যে নাটকের সূচনা হয়।[১] উর্দু নাটকের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয় কিন্তু ভারতের মাটিতে নাটকের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি এর অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা হয়। উপমা এবং ভাঁড়ামি নিষিদ্ধ ইসলামের দৃষ্টিতে। এ কারণে তারা নাট্যাভিনয়কে মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। এছাড়া আরবি ও ফারসি সাহিত্যে নাটকের কোন প্রতিফলন ছিলনা। ফলে দেখা যায় ধর্ম এবং থিয়েটারের মধ্যে সবসময় একটা প্রশস্থ প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান ছিল। মুসলমানরা দীর্ঘ দিন ভারতবর্ষ শাসন করার পরও নাট্যচর্চা তেমন বিস্তার লাভ করতে পারেনি।[২] এ প্রসঙ্গে ড. আবদুল আলীম নামী তার *উর্দু থিয়েটার (১ম খণ্ড)* গ্রন্থে আলোচনা করেন:

آج دنیائے فیشن کے لئے تھیٹر ایک اہم ضرررت بن گیا ہے جس میں بلا امتیاز ہر دوزن اور خورد و کلاں شائقین و تماشائی ایک دوسرے سے آزادانہ ملتے اور اپنے عادات و اطوار پر دوسروں کے اثرات قبول کرتے ہیں۔ان حالات میں یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہمارے بچے ہر وجہ سوسائٹی کے اثرات قبول نہ کریں۔ اور اس اسٹیج سے متاثر نہ ہوں ہمارے بچے جب اسکول اسٹیج میں داخل ہوتے ہیں تو تھوڑے ہی عرصہ کی افہام و تفہیم اور جذباتی کشمکش کے بعد پختہ ادا کار بن جاتے ہیں۔[৩]

উর্দু নাটক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সূচনালগ্ন থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত উর্দু নাটক পাঁচটি ধারায় প্রবাহিত। যথা: (ক) প্রাচীন সংস্কৃত নাটক (খ) ধর্মীয় হিন্দি নাটক (গ) লোক কাহিনি (ঘ) ইসলামি বিভিন্ন প্রকার বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনাবলী ও (ঙ) আধুনিক যুগে মঞ্চায়িত পাশ্চাত্য নাটক।[৪]

উর্দু নাটকের উন্নয়নে লক্ষ্মৌর শাহী দরবারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রভাব অপরিসীম। নাটক মঞ্চায়নের জন্য তারা বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগীতা করত। রাজা-বাদশাহরা শুধু নাটক উপভোগই করতেন না, বরং এর উন্নয়নের জন্য সবকিছুই করার চেষ্টা করতেন।[৫]

১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উর্দু নাট্যচর্চার পথ সুগম হয়। এই কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল জন গিলক্রিষ্টের (১৭৫৯-১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দ) পরামর্শে মির্যা কাযেম আলী জোয়ান ১৮০১

* সহযোগী অধ্যাপক, উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

খ্রিষ্টাব্দে কালিদাসের বিখ্যাত নাটক *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* এর উর্দু অনুবাদ করেন। অনেকের মতে, প্রথমে ব্রজ ভাষায় নওয়াজ কবিশার ১৭১৬ খ্রিষ্টাব্দে *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* এর অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তীতে এর ভাষান্তর থেকে মির্যা কাযেম আলী জোয়ান উর্দু ভাষায় *শকুন্তলা* নামে নাটকটি অনুবাদ করেন। নাটকটি মৌলিক সৃষ্টি না হলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, উর্দু নাটকের প্রাথমিক নমুনা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে এ নাটকের মাধ্যমে পাওয়া যায়।[৬]

উর্দু নাটকের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আনজুম আরা আনজুম তার গ্রন্থ *আগা হাশ্‌র কাশ্মীরি আওর উর্দু ড্রামা* তে বলেন:

اردو ڈرامے کے اولین نقوش مثنوی کے طرز خاص کے مر ہون منت ہیں۔[৭]

লক্ষ্মৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ (১৮২২-১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) রাধা কৃষ্ণের কাহিনি অবলম্বনে *রহস* (১৮৪২-১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) নাটক রচনা করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে উর্দু নাট্যসাহিত্যের সূচনা করেন। নাটকটি কায়সার বাগের রাজকীয় মঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ করা হয়। নাটকটির গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা দেখে ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আমানত লক্ষ্মৌভী *ইন্দরসভা* রচনা করে মঞ্চস্থ করেন। *ইন্দরসভা* নাটকটি পূর্বের নাটক *রহস* এর চেয়েও বেশি মঞ্চসাফল্য লাভ করে। *ইন্দরসভা* নাটকটি ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে পাক-ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হতে থাকে। *ইন্দরসভা* এর সফলতা উর্দু নাট্যসাহিত্যের সূচনায় এক নতুন দিকনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। এ নাটকে যেমন রয়েছে সাহিত্যিক মান তেমনি রয়েছে সাংস্কৃতিক মূল্য।[৮]

আনজুম আরা আনজুম তার গ্রন্থ *আগা হাশ্‌র কাশ্মীরি আওর উর্দু ড্রামা* তে *ইন্দরসভা* নাটক সম্পর্কে বলেন:

اندر سبھا موسیقی، رقص اور دل چسپ قصہ کا مجموعہ ہے۔ اس میں ایکٹ کی تقسیم تو نہیں مگر اسٹیج سے کردار کا ناظریں کے سامنے سے دور ہوجانے اور دوسرے کردار کے اسٹیج پر آجانے سے منظر کی تقسیم احساس دلایا جاتا تھا۔[৯]

ইন্দরসভা নাটকটি যদিও কাব্যধর্মীতাকে লালন করে কিন্তু এর মধ্যে নাটকের নাটকীয়তার সব লক্ষণই বিদ্যমান। ফলে *ইন্দরসভা* নাটকটি উর্দু নাট্যসাহিত্যের সূচনায় অগ্রণি ভূমিকা পালন করে। যদিও সার্থক নাটকের সকল গুণ আমরা *ইন্দরসভা* নাটকের মধ্যে খুঁজে পাই না। তবুও মুসলমান-হিন্দু উভয় সংস্কৃতির বিষয়বাস্তবতাকে সামনে রেখে পরিবেশিত হওয়ার কারণে ভারতবর্ষে এ নাটকটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যদিও *শকুন্তলা* কে অনেকেই উর্দু নাটকের সূত্রপাত বলেন।

বররে সগীর কা উর্দু ড্রাম গ্রন্থে ড. সেলিম কোরায়েশী বলেন:

مختلف روایات سے اس میں (ناٹک ساگر میں) یہ ثابت کیا گیا ہے کہ کالید اس کے سنسکرت ناٹک شکنشتلا کا ترجمہ اردو ڈراما اور اسٹیج کی تاریخ میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک بیان ہے کہ فرخ سیر کے عہد میں اس کے درباری شاعر نواز نے اس کا ترجمہ فارسی میں کیا اور دوسری روایت ظاہر کرتی ہے کہ یہ ترجمہ 'مروجہ اردو' میں تھا۔ در حقیقت یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ یہ ترجمہ فارسی میں کیا گیا اور نہ اس وقت اردو کسی شکل میں رائج ہی تھی۔ اصل اس ترجمہ کی زبان برج بھاشا ہے۔ غالبامر وجہ اردو کے ذکر نے یہ غلط فہمی پیدا کی ہے کہ شکنتلا اردو کا پہلا ڈراما ہے۔[১০]

রহস ও *ইন্দরসভা* নাটক দুটির মঞ্চ সাফল্য দেখে কিছু সংখ্যক পারসি যুবক ইরানের বিভিন্ন প্রকার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি অবলম্বনে নাটক রচনা করে মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করেন। ফলে ক্রমান্বয়ে এই

জনপ্রিয়তাকে ভিত্তি করে উপমহাদেশের বিভিন্ন শহরে যেমনঃ কলকাতা, ঢাকা, দিল্লী, লাহোর, জয়পুর, রামপুর, আগ্রা, আলীগড়, জাদবপুর, মীরাঠ, লক্ষ্ণৌ, হায়দারাবাদ, বোম্বে প্রভৃতি শহরে ইংরেজি মঞ্চের ন্যায় অসংখ্য মঞ্চ বা 'থিয়োট্রিক্যাল কোম্পানী' প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।[১১] এই কাজে সর্বপ্রথম পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রথম অবস্থানে থাকার গৌরব অর্জন করে এবং সেখানে সফলতার সাথে নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক ইশরত রহমানী বলেছেন:

لطف کی بات یہ ہے کہ اردو ڈرامے کا سال آغاز بہ یک وقت ۱۸۵۳ ؁ء میں ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اندر سبھا لکھنو اور اسکے مضافات میں کھیلا جارہا تھا اور اسکی دھوم اطراف و جوانب میں پھیلی ہوئی تھی اس زمانہ میں مشرقی بنگال کے دارالحکومت ڈھاکہ میں اردو ڈراما اسٹیج ہونا شروع ہوا اور پارسی تھیٹر کے اسٹیج پر اردو کا پہلا ڈراما بھی اسی سال کھیلا گیا۔[১২]

১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে উর্দু নাটকের উৎপত্তি হয়। যখন *ইন্দরসভা* লক্ষ্ণৌ ও তার আশেপাশে মঞ্চায়িত হচ্ছিল এবং তার জনপ্রিয়তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল ঐ সময় পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় উর্দু নাটকের মঞ্চায়ন শুরু হয় এবং ঐ সময়ে পার্সি নাট্যমঞ্চেও উর্দু নাটকের মঞ্চায়ন শুরু হয়। যদিও ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে থেকে ঢাকায় বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হত। সে সময়ের উর্দু ভাষীরা বাংলা নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে তারাও উর্দু নাট্যচর্চা শুরু করেন। *রহস* ও *ইন্দরসভা* নাটক দুটির মঞ্চ সাফল্য দেখে ঢাকায় উর্দু নাটকের প্রতি তাদের আগ্রহ আরো বেশি গুণে বাড়িয়ে দেয়। এ সময় ঢাকায় উর্দু ভাষার বেশ প্রভাব ছিল। সে সময় অধিকাংশ অভিজাত শ্রেণির লোকেরা উর্দু ভাষায় কথা বলাকে তাদের আভিজাত্যের অংশ বলে মনে করতেন। ফলে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় *রহস* ও *ইন্দরসভা* নাটক দুটির মঞ্চ সাফল্য দেখে তারা আরো বেশি উৎসাহিত হয়। লক্ষ্ণৌ ভ্রমণের সময় ঢাকার নবাব ও মুর্শিদাবাদের কিছু সাহিত্যিক *রহস* ও *ইন্দরসভা* সহ অন্যান্য নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে তারা অভিভূত হয়ে যান। এ সময় ঢাকায় কানপুরের অধিবাসী শেখ ফয়েয বখশ সহ লক্ষ্ণৌ ও কানপুরের বেশকিছু অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পী বসবাস করত। প্রথম দিকে এ সকল অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পীরা বাংলা নাটক উর্দুতে অনুবাদ করে নাট্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে এসে ঢাকার নবাব শেখ ফয়েয বখশ কে একটি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী করতে বলেন। নবাবের আগ্রহের কারণে তিনি 'ফারহাত আফযা থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী' নামে থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। কানপুরের অধিবাসি মুনশি নবাব আলী নাফিস কে এই কোম্পানীতে নাট্যকার হিসেবে নিয়োগ দেন। যিনি কোম্পানীর জন্য নিয়মিত উর্দু নাটক রচনা করতেন।[১৩] এ সময় *ইন্দরসভা* নাটকের অনুকরণে শেখ পীর বখশ কানপুরী ঢাকায় বেশ কিছু নাটক রচনা করেন। *ইন্দরসভা* নাটকের অনুকরণে লেখা *নাগর সভা* নাটকটি বেশ খ্যাতি লাভ করে। 'ফারহাত আফযা থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী' তে নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। এই নাটক ছাড়াও কোম্পানীটি অন্যান্য নাট্যকারদের নাটকগুলো মঞ্চস্থ করে। *নাগর সভা* নাটকটির জনপ্রিয়তা দেখে সে সময় ঢাকাতে আরো বেশকিছু থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৪] ফলে বিভিন্ন জায়গা থেকে জনপ্রিয় অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পীরা এ সমস্ত থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।[১৫]

ঢাকার উর্দু নাটকের জনপ্রিয়তার কথা ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে চারেদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন নতুন নতুন শহরে থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। গাশতী বা ভ্রাম্যমান নামে কিছু কোম্পানী গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে উর্দু নাটক মঞ্চস্থ করত। এই ভ্রাম্যমান কোম্পানীগুলো শুধু উর্দু নাটকের উন্নতি করেনি বরং মানুষের মাঝে উর্দু নাটকে বিশেষ স্থান তৈরিতে সহায়তা করেছে। উর্দু নাটকের উন্নয়নে মুসলমানদের পাশাপাশি সে সময়ের প্রভাবশালী কিছু হিন্দুরাও এগিয়ে আসেন। হিন্দু ধনকুবের পুতু বাবু ও রতু বাবু ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করেন যার নাম 'হুসন আফযা

থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী'। এই কোম্পানীতে হাকীম হাসান মির্জা বরক লক্ষ্ণৌভীর *হুসন আফযা* ও *গুলশান এ জঁফেযা* নাটক দুটি মঞ্চস্থ করে বেশ প্রশংসিত হন।[১৬]

ঢাকার স্বনামধন্য নাট্যকার আহমদ হাসান ওয়াফের *বিমার এ বুলবুল* (১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) নাটক রচনা করে উর্দু নাট্যসাহিত্যে বেশ খ্যাতি লাভ করেন। উর্দু নাট্য সাহিত্যের অবস্থান ও সাহিত্যিক মূল্যমান বৃদ্ধিতে এই নাটকের অবদান অনস্বীকার্য। নাটকটি ঢাকায় নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়। ঢাকার নাটকে *ইন্দরসভা* অনুকরণে কাব্যাকারে এতদিন নাটকগুলো রচনা করা হত। কিন্তু নাট্যকার আহমদ হাসান ওয়াফের তার নাটক *বিমার এ বুলবুল* এ কাব্যের সাথে গদ্যকেও সংযুক্ত করেছেন। ফলে তার এই নাটকের দ্বারা ঢাকার উর্দু নাটকের নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যপক পরিবর্তন হয়।[১৭] ঢাকার নবাব সৈয়দ মোহাম্মদ আযাদ (১৮৪৬-১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ), নবাব স্যার আহসানউল্লাহ বাহাদুর এবং মির্যা ওলী জান কমর উর্দু নাটকের উন্নয়নে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিভিন্ন সময়ে তারা অর্থনৈতিক সহযোগিতার পাশাপাশি বেশ কিছু উর্দু নাটক রচনা করে মঞ্চস্থ করেছেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বর্তমানে সৈয়দ মোহাম্মদ আযাদ এর *নবাবী দরবার* (১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) ছাড়া অন্য কোন লেখকের নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় না।[১৮] হাকীম হাবিবুর রহমান সৈয়দ মোহাম্মদ আযাদের *নবাবী দরবার* সম্পর্কে বলেন:

نہایت پیاری اردو میں ظریفانہ ڈرامہ ہے، جس میں رئیسوں کے مشاغل، مصاحبیں کے ہتھکنڈے، بیگمات کی تباہ کن رسمیں عرضکہ بہت سے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ زبان بہت دل چسپ اور بے حد شوخ ہے۔ پہلے یہ افسانہ ۱۸۷۸ ء میں 'اودھ پنچ' میں شائع ہو تا رہا۔ خیال ہے کہ اردو زبان میں یہ پہلاڈرامہ ہے ' جو اگرچہ کسی اسیٹج پر نہیں آیا لیکن اس کے بات الگ الگ بہت بار اسیٹج ہوئے۔[১৯]

লক্ষ্ণৌ, কানপুর এবং বেনারসে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর উর্দু নাট্যচর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে য়ায়। কিন্তু পূর্ব বাংলায় ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উর্দু নাট্যচর্চা চলতে থাকে। ফলে এ সময়ে এখানে আরো অনেক থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে 'লায়ন থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী' এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের নাচঘর (রঙ্গশালা) এর মধ্যে লাল মোহন শাহের 'নাচ মন্দির' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বোম্বেতে পাশ্চাত্য নাট্যমঞ্চের অনুকরণে বেশ কিছু থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ঢাকাতে উর্দু নাটকের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে এবং বোম্বে উর্দু নাটকের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। যদিও হাকীম হাবীবুর রহমান (১৮৮১-১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) সে সময়ে কয়েকটি উর্দু নাটক রচনা করে এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। *গরীব এ হিন্দুস্থান* তার একটি রাজনৈতিক নাটক, যা তিনি মঞ্চস্থ করেছিলেন। কিন্তু তার একার পক্ষে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ঢাকায় উর্দু নাট্যচর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকায় উর্দু নাট্যচর্চা বন্ধ হয়ে গেলেও উর্দু নাট্যমঞ্চের প্রাথমিক উন্নতিতে ঢাকার যে অবদান রয়েছে, তা উর্দু নাট্য সাহিত্য চিরস্মরণী করে রাখবে।[২০]

উর্দু নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বেতে একটি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যেখানে উর্দু নাটকের পাশাপাশি অন্য ভাষার নাটকও দেখানো হত। ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে 'বোম্বে থিয়েটার' নামে একটি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে উর্দু নাটক পরিবেশন ছাড়াও সংগীত ও আসবাবপত্রের নিলামের কাজে মঞ্চটি ব্যবহৃত হত। কিন্তু ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে এখানে নিয়মিতভাবে উর্দু নাটকের পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষার নাটক মঞ্চস্থ শুরু হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এখানে বিভিন্ন ভাষার প্রায় ২৭৮টি নাটক মঞ্চস্থ হয়। পরিতাপের বিষয় মঞ্চটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়লে জগন্নথ শংকর শেঠের আন্দোলনের মুখে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহযোগিতায় ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কারের মধ্যে দিয়ে আবার 'বোম্বে থিয়েটার জাদীদ' নামে নতুন করে যাত্রা শুরু করে। প্রথম দিকে ইংরেজি নাটক প্রদর্শন

করা হত। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে উর্দু থিয়েটারের 'বাবা এ আদম' দাদা ভাই রতন জী ঠুঠী সর্বপ্রথম উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত নাটক *ইন্দরসভা* মঞ্চস্থ করেন। অনেকের মতে, ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর ভাওয়াজিলাও এর নাটক *রাজা গোপী আওর জলনধর* সর্বপ্রথম এখানে মঞ্চস্থ করা হয়। বোম্বের নাট্যমঞ্চে এভাবেই উর্দু নাটকের উৎপত্তি ঘটে।[২১] বোম্বেতে অনেকে নাটকগুলোর জনপ্রিয়তা দেখে থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর প্রতি আকৃষ্ট ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে শুধুমাত্র বোম্বেতেই প্রায় ১৯টি নতুন থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে উর্দু নাটকই বেশি মঞ্চস্থ হত। এ সমস্ত থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর মালিক ছিলেন যরথ্রুস্ত ধর্মালম্বী ও অগ্নিপূজক পারস্যের কিছু যুবক। যদিও প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকগুলো মঞ্চস্থ হত, কিন্তু পরবর্তীতে উর্দু নাট্যসাহিত্যে উন্নয়নে এই থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই কোম্পানীগুলো যেহেতু ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হচ্ছিল সেহেতু অল্পদিনের মধ্যে আরো কয়েকটি নতুন নতুন থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়।[২২]

***পার্সি সম্প্রদায়**[২৩] ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নাট্যচর্চাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে বোম্বেতে থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করে। উর্দু নাটকের পরবর্তী সমৃদ্ধ এসব ব্যবসায়ী পার্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। পার্সি নাট্যপ্রতিষ্ঠান ও তাদের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় উর্দু নাটকের প্রসার হয়েছিল। উর্দু নাট্যমঞ্চের প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম ফেষ্টনজী ফ্রামজী এবং তার কোম্পানীর নাম ওরিজিন্যাল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী (Original Theatrical Company), যা ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। কার্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিল। খোরশেদজী বালীওয়ালা, কাউসজী, জাহাঙ্গীর প্রমুখ ছাড়াও তিনি নিজেই এই কোম্পানীর একজন স্বনামধন্য অভিনেতা ছিলেন। রওনক বেনারসী ও হোসনী মিয়া জরীফ এই কোম্পানীর প্রধান নাট্যকার ছিলেন। রওনক বেনারসী তার জীবনে খোরশেদজী বালীওয়ালা, কাউসজী, জাহাঙ্গীর প্রমুখ ছাড়াও তিনি নিজেই এই কোম্পানীর একজন স্বনামধন্য অভিনেতা ছিলেন। রওনক বেনারসী ও হোসনী মিয়া জরীফ এই কোম্পানীর প্রধান নাট্যকার ছিলেন। রওনক বেনারসী তার জীবনে প্রচুর নাটক রচনা করেছেন। তন্মধ্যে *লায়লা মজনু* (১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ), *বে নজীর বদরে মুনীর* (১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ), *আনজাম-এ উলফাত* (১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ), *ভুলে মিঞা* (১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ), *পুরান ভগত* (১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ),

সাইফুস্ সুলাইমান (১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ), *আশেক্ব সাদেক্ব* (১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ) *ফাসানা-এ আজায়েব* (১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ), *ফারীব মহব্বত* (১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ), *ইনসাফ-এ মাহমুদ শাহ গজনবী* (১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ), *খাওয়াব-এ মহব্বত* (১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ), *খাওয়াবগাহ ইশক্ব* (১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ), *তালাস্সুম জুহরা* (১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ), *আজায়েব-এ পরীস্থান* (১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ), *আনজাম-এ মহব্বত* (১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ), *কালী কা ভুগ* (১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ), *নূরুদ্দীন আওর হাসান ফিরোজ* (১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ), *সংগীন বাকাওলী*, *হাতেম বিন তাঈ*, *ফারীব-এ ফেতনা*, *জফা-এ সেতামগর*, *চাম্বিলী গোলাব* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[২৪] জরীফের নাটকের মধ্যে *নতীজা-এ ইসমত*, *খোদা দোস্ত*, *চান্দনী*, *তুহফা-এ দিলকুশা*, *বুলবুল-এ বীমার*, *তুহফা-এ দিলপযীর*, *শিরী ফরহাদ*, *আলী বাবা*, *নকশ-এ সোলাইমানী*, *গুপীচান্দ*, *চাঁদবিবি*, *হুসন আফরোয*, *গুল ওয়া সানোবার*, *ফারীব-এ ফেতনা*, *আকবর-এ আযম*, *ইশরত সভা*, *ফরখ সভা*, *নাসের হুমায়ন*, *হাওয়াই মজলিস*, *হাতেম তাঈ*, *বদরে মুনীর*,*লাল গওহর*, *গুল বাকাওলী*, *খোদাদাদ*, *নৈরংগ-এ ইশক্ব* প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৫]

---

* **পার্সি সম্প্রদায়:** ইরানে বসবাসকারী সম্প্রদায়। এরা অগ্নিকে দেবতা ভাবতো। তারা অগ্নিপূজক ছিল। এরা ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল। এই সম্প্রদায়ের কিছু যুবক শ্রেণি উর্দু নাটকের উন্নয়ণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করে।

ফ্রামজীর মৃত্যুর পর খোরশেদজী বালীওয়ালা এবং কাউসজী ভিন্ন ভিন্ন থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। খোরশেদজী বালীওয়ালা ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে দ্যা ভিক্টোরিয়া থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী (The Victoria Theatrical Company) প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজেও একজন কৌতুক অভিনেতা ছিলেন। তিনি ছাড়াও এ কোম্পানীতে যারা অভিনয় করতেন, তাদের মধ্যে রুস্তমজী, মিস খোরশেদ, মিস মেহতাব, জমশেদ জী, দাদা ভাই রতন জী ঠুঠী, মিস যোহরা এবং এক ইউরোপীয়ান মিস মেরী মিন্টন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তালেব বেনারসী (১৮৫২-১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ) এই কোম্পানীর প্রধান নাট্যকার ছিলেন। তার হাতে উর্দু নাটকের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি *ইন্দর সভা* দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পরেও সর্বপ্রথম উর্দু নাট্য মঞ্চকে গদ্য আকারে জনসম্মুখে পরিচিত করে তোলেন।[২৬] তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে *চমন-এ ইশক্* (১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দ), *নিগাহ-এ গাফলত* (১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দ), *দিলবর ওয়া দিল সের* (১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ), *বকরম বিলাস* (১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ), *চেরাগ-এ চীন* (১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ), *আশেক্ব কা খুন, আলী বাবা চলিশ চোর, ফাসানা-এ আজায়েব* (১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দ), *খাযানাহ-এ গায়েব* (১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ), *কারিশমা ওয়া কুদরত* (১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দ), *তেলসমাতে গুল* (১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দ), *মহারাজা গুপীচান্দ* (১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ), *লাইল ওয়া নাহার* প্রভৃতি নাটক লিখে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।[২৭]

কাউসজী খটাও আলফ্রেড থিয়েটিক্যাল কোম্পানী (Alfred Theatrical Company) নামে একটি মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিয়োগান্তক বা ট্রাজেডি নাটকে অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গোলজার খান, মধুরাম, মাস্টার মোহন, মাস্টার মনিচর জী, মিস জোহরা, মিস গওহর প্রমুখ এই প্রতিষ্ঠানের নামজাদা নাট্যশিল্পী ছিলেন। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে কাউসজী'র মৃত্যুর পর তার পুত্র জাহাঙ্গীরজী কয়েকবছর পরিচালনা করার পর কলকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মি. মিডনের নিকট কোম্পানীটি বিক্রি করে দেন।[২৮] আহসান লক্ষ্মৌভী (১৮৫৯-১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ) এই কোম্পানীর একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ছিলেন। নাটক রচনা ছাড়াও তিনি ভাল গায়ক এবং সংগীত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। উর্দু নাটকের উন্নতিতে তার অবদান অপরিসীম। প্রাচীন নাটকের ত্রুটিগুলোকে তিনি দূর করেছেন। জন্মসূত্রে লক্ষ্মৌর বাসিন্দা হওয়ায় তিনি উর্দু ভাষা ও নাট্য রচনারীতি উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিলেন। ফলে তার মাধ্যমে উর্দু নাট্যজগৎ উপকৃত হয়। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপিয়ার-এর *রোমিও জুলিয়েট, হ্যামলেট, মার্চেন্ট অব ভেনিসসহ* বেশকিছু নাটকের উর্দু অনুবাদ করেন। কিন্তু অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি স্বীয় পরিবেশের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখেছেন। এমনকি জনগণকে খুশি করার জন্য ট্রাজেডিকে কৌতুক নাটকে রূপান্তর করতেও পিছুপা হয়নি।[২৯] তার রচিত নাটকগুলোর মধ্যে *ইশ্ক্ব-এ গুলনার-এ ফিরোয* (১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দ), *যিহর ইশ্ক্ব* (১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ), *অথেলো* (১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দ), *বযম-এ ফানী* (১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দ), *কংক তারা* (১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দ), *খুন না হক্ব* (১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দ), *দিল ফুরুশ* (১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ), *ভুল ভুলিয়াঁ* (১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ), *শরীফ বদ মাআ'শ* (১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ), *চন্দ্রাবলী* (১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ), *তায নেকী* প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩০]

আহসান লক্ষ্মৌভীর পর পণ্ডিত নারায়ণ প্রসাদ বেতাব দেহলভী আলফ্রেড থিয়েটিক্যাল কোম্পানী নাটক রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক মির্যা গালিবের শিষ্য ছিলেন। তিনি বোম্বে থেকে *'শেক্সপিয়ার'* নামে একটি পত্রিকা বের করতেন। পত্রিকায় ইংরেজি সাহিত্যের বহু প্রসিদ্ধ নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হত। উর্দু হিন্দি ব্যতীত আরবি-ফারসি ভাষার উপর তার বেশ দখল ছিল।[৩১] তার রচিত নাটকগুলোর মধ্যে *কতল-এ বে নযীর* (১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ), *কৃষ্ণ আওতার* (১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ), *কসুটী* (১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ), *হুসন ফিরিংগ* (১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ), *মিঠা যহর* (১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ), *যহরী সাঁপ* (১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ), *ফুট কা ফল* (১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ), *ফারীব নজর* (১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ), *মহাভারত* (১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ), *গোরখ ধান্দা* (১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ), *রামায়ন* (১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ), *অমৃত* (১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ), *ফারীব-এ-মহব্বত, মাদার ইণ্ডিয়া আওর সমাজ* বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।[৩২] আহসান লক্ষ্মৌভী ও বেতাব দেহলভী ছাড়া এ সময়

যাঁরা নাট্যচর্চা করতেন, তাদের মধ্যে আব্দুল লতীফ শাদ, মুরাদ লক্ষ্মৌভী, ফায়েক লক্ষ্মৌভী, আসগর নিজামী, আলী রহমত, শামস লক্ষ্মৌভী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৩৩]

মুহাম্মদ আলী নাখোদা নামক এক ব্যক্তি নিউ আলফ্রেড থিয়েটিক্যাল কোম্পানী (New Alfred Theatrical Company) নামে প্রতিষ্ঠান চালু করেন। বিখ্যাত শিল্পী সোহরাবজী এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের অংশীদারও হয়েছিলেন। তারই প্রচেষ্টায় কোম্পানীটি পরবর্তী সময়ে আহমদাবাদে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সোহরাবজী ছাড়া আব্বাস আলী ও অমৃত লাল কেসু এ প্রতিষ্ঠানের নামজাদা অভিনেতা ছিলেন।[৩৪] এই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নাটক রচয়িতা হলেন আগা মুহাম্মদ শাহ হাশর কাশ্মীরী (১৮৭৯-১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনি উর্দু সাহিত্যের প্রথম সার্থক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সমৃদ্ধ নাটক রচনা করেন।[৩৫] অনুবাদের কাজেও তার অস্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। *আফতাব-এ মহব্বত* (১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) তার প্রথম নাটক। বেনারস থাকাবস্থায় ১৮ বছর বয়সে তিনি আহসান লক্ষ্মৌভীর বিখ্যাত নাটক *চন্দ্রাবলী*'র জবাবে এ নাটক লিখেছিলেন। নিউ আলফ্রেড থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর পূর্বে তিনি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কাউসজী খটাও-এর আলফ্রেড থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ কোম্পানীর সাথে যুক্ত থাকাবস্থায় *মারে আসতীন* (১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দ), *মুরীদ শক* (১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ), *আসীর হিরস* (১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ), *মিঠী ছুরি* (১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ) *শহীদ নাজ* (১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ) প্রভৃতি নাটক রচনা করেছিলেন। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে নিউ আলফ্রেড থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীতে চলে আসেন। এই কোম্পানীর জন্যেও তিনি কিছু নাটক লিখেছিলেন। তার মধ্যে *খাওয়াব-এ হস্তী* (১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ) ও *খুবছুরত বালা* (১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৬]

আগা মুহাম্মদ শাহ হাশর কাশ্মীরী (১৮৭৯-১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) নিউ আলফ্রেড থিয়েটিক্যাল কোম্পানীর সাথে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে সম্পর্কচ্ছেদ করে তিনি নিজেই হায়দারাবাদে একটি 'দেশীয় থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করেন। খুব বেশিদিন তিনি কোম্পানীটি চালু রাখতে পারেন নি। 'Indian Shakespeare Theatrical Company' নামে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে লাহোরে তিনি আবার একটি প্রতিষ্ঠান করেন। প্রচুর আর্থিক ক্ষতির কারণে এই কোম্পানীটিও তাকে বন্ধ করে দিতে হয়। অবশেষে তিনি কলকাতায় মি. মিডনের সাথে চলচ্চিত্রের কাজে যোগদান করেন। তার গ্রন্থগুলোর মধ্যে *ভারত মণি* (১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ), *ইয়াহুদী কী লাড়কী* (১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ), *শে'র কী গরজ*, *বন দেবী* (১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ), *হিন্দুস্থান* (১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ), *ভাগীরথী গঙ্গা* (১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ), *তুর্কী হুর* (১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ), *আঁখ কা নিশা* (১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ), *রুস্তম সোহরাব* (১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ), *দিল কী পিয়াস*, *ইশক্ব আওর ফরয* (১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ), *আনোখা মেহমান*, *শিরী ফরহাদ*, *আওরত কা পিয়ার*, *সফীদ খুন*, *খুদপুরুস্ত*, *শাম জওয়ানী*, *তাছাব্বুর ওয়াফা*, *নারা-ই তাওহীদ* প্রভৃতি উর্দু নাট্য সাহিত্যের অমূল্য রত্ন।[৩৭] চরিত্রে প্রবল দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করার কারণে অনেকে তাকে বাংলার বিখ্যাত নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষের সাথে তুলনা করেছেন। এ ছাড়া উর্দু নাট্য সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি ও পরিধি বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তাকে ইংরেজি সাহিত্যের বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপিয়ারের সাথে তুলনা করে 'ইণ্ডিয়ান শেক্সপিয়ার' বলা হয়ে থাকে।[৩৮]

আরজু লক্ষ্মৌভী এ যুগের একজন অন্যতম নাট্যকার ও কবি ছিলেন। বর্ণনারীতি ও ভাষার শৈল্পিকতার দিক থেকে তার নাটকগুলো অত্যন্ত উচুঁ মাপের ছিল। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে আলফ্রেড থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর সাথে যুক্ত থাকলেও পরবর্তীতে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষ্মৌর 'মনসুর নগর ড্রামাটিক ক্লাব' এবং ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে 'আলফিনি স্টন থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী' তে নিয়মিত নাট্য রচনার কাজ করতেন। তার রচিত নাটকগুলোর মধ্যে '*দিল জলী বেরাগন*' (১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ), '*হুসন কী চিংগারী*' (১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ), '*চেরাগ-এ তাওহীদ*', '*চান্দ গ্রহণ*', '*জামে যহর*', '*ফকীর কে তিন ফিরে*', '*দুরখী তাছভীর*', '*ছদা-এ দরবেশ*' প্রভৃতি বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল।[৩৯]

থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর মঞ্চকে সামনে রেখে উর্দু নাটক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে থাকে। উপরের উল্লেখিত কোম্পানীগুলো ছাড়া অন্য যে সকল কোম্পানী উর্দু নাটকের উৎপত্তিতে বিশেষ অবদান রেখেছিল সেগুলোর মধ্যে বোম্বের 'ওল্ড পারসি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী', 'শেক্সপিয়ার থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী', 'জমাদার থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী', 'ইম্পেরিয়াল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী', 'ইণ্ডিয়ান শেক্সপিয়ার থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী'; দিল্লীর 'জুবিলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী', 'পারসি আলেকজাণ্ডার থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী', 'জাওজী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী', 'প্রীতি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী'; যাদবপুরের 'রাজপুতানা মালওয়া থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী'; আগ্রাহর 'লাইফ অব ইণ্ডিয়া থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী', 'দ্যা বে নযীর ষ্টার অব ইণ্ডিয়া থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী'; ফতেপুরের 'ইণ্ডিয়ান ইম্পেরিয়াল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী'; হায়দারাবাদের 'দ্যা মুন অব ইণ্ডিয়া থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী', 'হায়দাবাদ ড্রামাটিক ক্লাব', 'বালরোম থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী', 'ডালমণ্ডি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী'; কলিকাতার 'মিডন থিয়েটার্স লিমিটেড', এগুলোর আবার কয়েকটি শাখা কোম্পানী ছিল। যেমন: 'পারসি কোরণথিন থিয়েটার', আলফিনেস্টন থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী', 'আলফ্রেড থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী', 'মুসলিম ইন্সটিটিউট থিয়েটার', 'জাহাঁ আরা থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী', 'হাশর ড্রামাটিক ক্লাব'; পাঞ্জাবের 'অ্যালবার্ট থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী', 'প্রেম পার্চারলী নাটক মণ্ডলী'; মীরাঠের 'বিয়াকল ভারত থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী', 'ভারত দিয়াকল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী'; লাহোরের 'গ্লোব থিয়েটার অব পাঞ্জাব', 'সিতারাম থিয়েটার', 'পাঞ্জাব রিফরমার থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে সুনাম অর্জন করে।[৪০]

'কুতুব খানা-এ ইণ্ডিয়া' অফিসে উপরে উল্লেখিত থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর বিভিন্ন নাট্যকারদের নাট্য গ্রন্থসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। নাট্য গ্রন্থের মধ্যে গোলাম হোসাইন জরীফের *আনজাম-এ সাখাওয়াত*, মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ কায়েসের *আনজাম-এ নেক ও বদ*, *নৈরংগ-এ উলফাত*, *পসবন্দীদা জাহাঁ*, *জলসা-এ পরীস্তান*; ফকীর মুহাম্মদ তেগের *আনজাম-ওলফত*, *বেনযীর ওয়া বদরে মুনীর*; ফিরোজ শাহ খানের *ভুল ভুলিয়াঁ*; হাকীম নিজামীর *দারেগ-এ ফুরুক্কত*, আহমদ হাসান ওয়াফের-এর *বীমার-এ বুলবুল*; হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহর (ইম্পেরিয়াল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী ও লাইট অব ইণ্ডিয়া থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন) *জশন-এ পরীস্তান*, *তামাশা-এ দিলপযীর*, *ফরখ সভা হাফেয*, *আনজাম-এ সেতাম*, *আশিক্ব জানবায*, *যোহরা ওয়া বহরাম*, *গঞ্জীনা-এ মহব্বত*, *ইনসাফ-এ মাহমুদ*, *নূরজাহাঁ*, *ফাসানা-এ গমগীন*, *লায়লা মজনু*; মির্যা নযীর বেগের (লাইট অব ইণ্ডিয়া ও দ্যা ষ্টার অব ইণ্ডিয়া থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর সাথে জড়িত ছিলেন) *তলসমাতি পিতলা*, *গুলশান-এ পাকদামিনী*, *রামলীলা*, *লাল ওয়া মন*, *নৈরংগ-এ ইশক্ব ওয়া হায়রত আঙ্গিজ*; মুনশি গোলাম আলী দিওয়ানার (আলেকজাণ্ডার থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর সাথে সম্পৃক্ততা ছিল) *তায়ীদীয দানী*, *মহর জিয়া*; মুনশি মুহাম্মদ ইবরাহীম মুহশী আনবানুবীর *আতিশী নাগ*, *নিগাহ-এ নায*, *হাসিন কাতিল*, *শকুন্তলা*, *রসীলা জোগী*, *দুশমন ঈমান*, *গরীব হিন্দুস্তান*, *হামারা খোদা*, *চমকতী বিজলী*, *সনম কা পূজারী*, *খুন জিগর*, *সুনহারী খিঞ্জর*; মাস্টার রহমত আলীর (অ্যালবার্ট থিয়েটার ও ওল্ড পারসি থিয়েটারের সাথে জড়িত ছিলেন) *দরদ-এ জিগর*, *বাওয়াফা কাতিল*, *মহব্বত কা ফুল*, *জালাউ আশিক্ব*,; ইশরাত হোসাইনের *ঈমান*, *ইত্তেহাদ*, *ওয়াতন*, *গায়েবী*, *তলোয়ার*, *ফারীবী*, *আওরত*, *ইনসাফ*; মীর গোলাম আববাসের *নৈরংগ-এ সেতামগড়*, *নৈরংগ-এ নাম*, *দুঃখীয়া দুলহান*, *যিঞ্জীর গওহর*, *নূর জাহাঁ*, *জাহাঁ আরা*, *নূর-এ ইসলাম*, *খাযানা-এ দ্বীন*, *নয়ী জিন্দেগী*, *শাদী কী পহেলী রাত*, *এক হী পয়সা*, *আব কিয়া হুগা*, *শান-এ রহমত*, *মমতাজ*, *ফরয-এ ওয়াফা*; মুনশি মুহাম্মদ আব্দুল আযীয যায়েক লক্ষৌভীর *নূর আরব*, *ফখর আরব*, *কনস বধু*; রিয়ায উদ্দীনের *শিরী ফরহাদ*, *মালন কী বেটী*; মুনশি আনোয়ার উদ্দীন মুখলেছের *হারজীত*, *ধুপ ছাওঁ*, *কালী নাগীন*, *কীমতী আসুঁ*; সৈয়দ আববাস আলীর *গুল রোয রয়না*, *জাম-এ জাহাঁনুমা* প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখিত নাট্যকারদের নাট্যগ্রন্থের মাধ্যমে উর্দু নাটকের উন্নতির রাস্তা অনেকটা সুগম হয়। ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যবহার শুরু হলে মঞ্চ নাটকের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা

তুলনামূলকভাবে কমে যেতে থাকে। মঞ্চস্থ হওয়া উর্দু নাটক চর্চার যে ধারা ছিল তা পরিবর্তন করে নতুন রূপে অর্থাৎ সাহিত্যিক রূপ ধারণ করে সামনের দিকে চলতে থাকে।[৪১]

ইমতিয়াজ আলী তাজ (১৯০০-১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ) সাহিত্য নাটকের একজন অন্যতম ও গ্রহণযোগ্য নাট্যকার ছিলেন। তিনি প্রথম দিকে বিভিন্ন থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর মঞ্চ নাটকের জন্য নাটক লিখতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সাহিত্য নাট্যচর্চার প্রতি তিনি অধিক আগ্রহী হয়ে পড়েন। তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল *আনার কলি* (১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ)। নাটকটি এত বেশি খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় বহুবার মঞ্চস্থ হয়। উর্দু সাহিত্যের অন্য কোন নাটক এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।[৪২] নাটকটির জনপ্রিয়তা দেখে অনেক নাট্যকার একই নামে নাটকটি রচনা করেন। কিন্তু তাজের *আনার কলি* নাটকের মত এত জনপ্রিয়তা কেউ অর্জন করতে পারেননি। লেখকদের মধ্যে মুহাম্মদ আব্বাস আলী আনজাম, আব্বাস আলী দেহলভী, শাগের নিজামী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তার অন্যান্য নাটকের মধ্যে *প্রীতি রাজ*, *দুলহান*, *কিসমত*, *করতবা কা কাজী*, *আমান ওয়া সখন* প্রভৃতির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৩]

নাট্য সাহিত্যে উন্নয়ন দেখে বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বেশকিছু কবি-সাহিত্যিকগণও নাটক রচনায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। তাদের একান্ত প্রচেষ্টায় উর্দু নাট্যসাহিত্য বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল। সে সমস্ত নাট্যকার ও নাটকের মধ্যে খাজা হাসান নিজামীর *জার্মান শাহজাদা কী তালাশ*, *তামাঁচা;* পণ্ডিত কৃষণ প্রসাদের *কুরবানী* (১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ), *মযবুর ওয়াফা* (১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ); পণ্ডিত ব্রজ মোহন কায়েফীর *দর্পণ*, *রাজ দুলারী* (১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ), *মুরারী দাদা* (১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ), *মিঠী ঈদ*, *তামছিলী মুশাআ'রা;* কাজী আব্দুল গাফফারের *সেব কা দারখ্ত* (১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ), *ফারীব;* নিয়াজ ফতেহ পুরীর *আসহাবে কাহফ* (১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ); সৈয়দ আবেদ আলী আবেদের *গুলনার*, *আম্মা*, *লালা সহরা*, *হেজাব যিন্দেগী*, *গুলহা-এ-বাহার*, *এক লাআ'ল বাকায়ুঁ হে*, *জাহাঁ আরা*, *চেঙ্গিস খান*, *রূপ মতি*, *দেহলী কা কতলে আম;* মুনশি প্রেমচাঁদের *শবতার*, *কারবালা* (১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ), *রুহানী শাদী* (১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ); পণ্ডিত ব্রজ নারায়ণ চকবশতের *কমলা* (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ); মাওলানা আব্দুল মজীদ দরীয়াবাদীর *যদ পাশীমাঁ* (১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ); লতীফ আহমদের *লালা রুখ;* মজনু গৌরখপুরীর *আবুল খামার*, *আগায-এ হস্তী*, *সালুমী*, *সীনাট জান*, *কংগ-এ সায়র;* প্রফেসর মুহাম্মদ মুজিবের *আযমায়েশ*, *আও ড্রামা কারেঁ*, *আনযাম*, *হিরোইন কী তালাশ*, *খানা-এ জংগী*, *খেতী;* ড. এজাজ হোসাইনের *আদবী ড্রামে*, ড. আব্দুল আলীমের *ইত্তেহাদ*, *তাজমহল*, আযীম বেগ তুগতাঈর *মির্যা জংগী*, আব্দুল গাফ্ফার মাদহুলীর *বাচ্চুঁ কা ইনসাফ*, *স্কুল কী যিন্দেগী*, *কুওমপুরুস্ত তোলাবা ইলম*, *মহব্বত;* মুফতী গওহর শাদানীর *রানা প্রতাপ*; প্রফেসর সৈয়দ আবেদ হোসাইনের *পরদা-এ গাফলত*, *শারীর লাড়কা*; শাহেদ আলী দেহলভীর *পারভীন ও সুরীয়া*, *নারগিস জামাল*, *আন্ধী গলী*, *খিড়কী*, *চীনী কী আঙ্গুঠী*; এনায়েতুল্লাহ দেহলভীর *হ্যামলেট*, *আনথনী ক্লিওপেট্রা*; নাসের শামস দেহলভীর *সাহর হুনে হাক*, *হুকুমত*, *কশমকশ*; মির্যা আদীবের *আনন্দ কুমার*, *মা*, *শাহানশাহ*, *দিওয়ার*, *বেটা*, *বহুন*, *পাহাড় কে দামান মে*, *ফেরাউন কে মেহবুবা*, *নাজাত* প্রভৃতি নাটক উর্দু নাট্যসাহিত্যের প্রসার আরো সমৃদ্ধি করেছে।[৪৪]

উর্দু নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার নাট্যসাহিত্যের বয়সের তুলনায় উর্দু নাট্যসাহিত্য বয়স খুবই সামান্য। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে উর্দু নাট্যসাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। উর্দু নাট্যসাহিত্যের শুরুর দিকে উর্দু নাটকের অভাব ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা বেশ সমৃদ্ধশালী। বর্তমান ঐতিহাসিক, লোককাহিনি, রোমান্টিক, ট্রাজেডী, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ সকল ধরনের বিষয় নিয়ে উর্দু নাট্যসাহিত্য বিদ্যমান। নাটকের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মঞ্চ সফলতা। এখানে সাহিত্যিক গুণের চাইতেও বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন মঞ্চ সফলতার উপর। তবে আধুনিক যুগে উর্দু নাটকের জনপ্রিয়তা দিনদিন বেড়েই চলেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ রামবাবু সাকসীনা, *তারিখ-এ আদব-এ উর্দু (গদ্যাংশ)* (লক্ষ্ণৌঃ মাকতুব-এ মুন্সী তেজকুমার প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬), পৃ. ১৪০।

২ আনজুম আরা আনজুম, *আগা হাশ্‌র কাশ্মীরী আওর উর্দু ড্রামা* (আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৭৯), পৃ. ২১।

৩ ড. আবদুল আলীম নামী, উর্দু থিয়েটার (প্রথম খণ্ড) (করাচীঃ পাকিস্তান আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, ১৯৬২), পৃ. ৩৫।

৪ (ক) ড. সালাম সান্দেলভী, *আদব কা তানক্বীদী মুতালেআ* (লক্ষ্ণৌঃ নাসীম বুক ডিপো লাটুশ রোড, ১৯৮৬), পৃ. ২৪৮; (খ) সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদী, *উর্দু মে ড্রামা নিগারী* (লাহোরঃ মুলক নযীর আহমদ তাজ বুক ডিপো, ১৯৬২), পৃ. ৭৭।

৫ সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদী, *উর্দু মে ড্রামা নিগারী*, পৃ. ৭৮।

৬ ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা কা এরতেকা* (আলীগড়ঃ এজুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৮৬), পৃ. ১২-১৩।

৭ আনজুম আরা আনজুম, *আগা হাশ্‌র কাশ্মীরী আওর উর্দু ড্রামা*, পৃ. ২৪।

৮ ড. সেলিম কোরায়েশী, *বররে সগির কা ড্রামা* (লাহোরঃ মাগরিবী পাকিস্তান উর্দু একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ১২১।

৯ আনজুম আরা আনজুম, *আগা হাশ্‌র কাশ্মীরি আওর উর্দু ড্রামা*, পৃ. ৩২।

১০ ড. সেলিম কোরায়েশী, *বররে সগির কা ড্রামা*, পৃ. ৪৯।

১১ (ক) আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত* (করাচীঃ বুকল্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৯২), পৃ. ৩৮; (খ) রামবাবু সাকসীনা, *তারিখ-এ আদব-এ উর্দু (গদ্যাংশ)*, পৃ. ১৪৭।

১২ ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা কা এরতেকা*, পৃ. ১২৫।

১৩ ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা কী তারীখ ওয়া তানক্বীদ* (আলীগড়ঃ মাকতুবা-এ আলফাজ শামশাদ মার্কেট, ১৯৮৭), পৃ. ১০৮-১০৯।

১৪ মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা* (কলকাতাঃ রীডার শুবা-এ উর্দু কলকাতা ইউনিভার্সিটি, ১৯৯০), পৃ. ২৫-৩২।

১৫ ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা কী তারীখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১০৯-১১০।

১৬ (ক) আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, পৃ. ৩৭; (খ) ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা কী তারীখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১১৩।

১৭ (ক) মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা*, পৃ. ৩২; (খ) ড. সেলীম আখতার, *উর্দু আদব কী মুখতাছার তারীন তারীখ* (লাহোরঃ সংগ-এ মাইল পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭), পৃ. ২৬৪-২৬৫; (গ) ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা কী তারীখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১১৩।

১৮ মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা*, পৃ. ৩২-৩৩।

১৯ সৈয়দ ইকবাল আযীম, *মাশরোকি বাঙ্গাল মে উর্দু* (ঢাকাঃ মাশরেকি অপেরা পাবলিশার্স, ১৯৫৪), পৃ.৮৫।

২০ মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা*, পৃ. ৩৪-৩৫।

২১ (ক) প্রফেসর মুহাম্মদ আসলাম কুরাইশী, *ড্রামা নিগারী কা ফন* (লাহোরঃ মজলিস-এ তারাক্কী-এ আদব, ১৯৬৩), পৃ. ৪০; (খ) ড. আতীয়া নাশ্‌শাত, *উর্দু ড্রামা রেওয়ায়েত আওর তাজরিবাহ* (লক্ষ্ণৌঃ নুসরাত পাবলিশার্স, ১৯৭৩), পৃ. ৭৯-৮০।

২২ ড. সেলীম আখতার, *উর্দু আদব কী মুখতাছার তারীন তারীখ*, পৃ. ২৬৫-২৬৭।

২৩ দিলীপ কুমার সাহা, *ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক বিকাশ* ১৭৭৩-১৯৪৭ (খুলনাঃ সৌরভ প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৭৫-৭৮।

২৪ (ক) ড. আতীয়া নাশ্‌শাত, *উর্দু ড্রামা রেওয়ায়েত আওর তাজরিবাহ*, পৃ. ১০০-১০১; (খ) ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা কী তারীখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১৬২।

২৫ (ক) ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা কী তারীখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১৬৮-১৬৯; (খ) ড. সালাম সান্দেলভী, *আদব কা তানক্বীদী মুতালেআ*, পৃ. ২৬১।

২৬ (ক) ড. সেলীম আখতার, *উর্দু আদব কী মুখতাছার তারীন তারীখ*, পৃ. ২৬৯; (খ) সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদী, *উর্দু মে ড্রামা নিগারী*, পৃ. ১১৯।

২৭ (ক) রামবাবু সাকসীনা, *তারিখ-এ আদব-এ উর্দু (গদ্যাংশ)*, পৃ. ১৪৯; (খ) ড. আতীয়া নাশ্‌শাত, *উর্দু ড্রামা রেওয়ায়েত আওর তাজরিবাহ*, পৃ. ১৬৪-১৬৫; (গ) ড. সালাম সান্দেলভী, *আদব কা তানক্বীদী মুতালেআ*, পৃ. ২৬২।

২৮ (ক) ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা কী তারীখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১৪৫; (খ) রামবাবু সাকসীনা, *তারিখ-এ আদব-এ উর্দু (গদ্যাংশ)*, পৃ. ১৪৯-১৫০।

২৯ (ক) ড. সেলীম আখতার, *উর্দু আদব কী মুখতাছার তারীন তারীখ*, পৃ. ২৭০; (খ) সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদী, *উর্দু মে ড্রামা নিগারী*, পৃ. ১২০; (গ) ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা কী তারীখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১৪৫।

৩০ (ক) রামবাবু সাকসীনা, *তারিখ-এ আদব-এ উর্দু (গদ্যাংশ)*, পৃ. ১৫০; (খ) ড. সালাম সান্দেলভী, *আদব কা তানক্বীদী মুতালেআ*, পৃ. ২৬৪; (গ) ড. আতীয়া নাশ্‌শাত, *উর্দু ড্রামা রেওয়ায়েত আওর তাজরিবাহ*, পৃ. ১৫১-১৫২।

৩১ সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদী, *উর্দু মে ড্রামা নিগারী*, পৃ. ১২১-১২২।

৩২ (ক) ড. সেলীম আখতার, *উর্দু আদব কী মুখতাছার তারীন তারীখ*, পৃ. ২২০; (খ) ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা কী তারীখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১৪৫।

৩৩ (ক) মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা*, পৃ. ২১; (খ) ড. সালাম সান্দেলভী, *আদব কা তানক্বীদী মুতালেআ*, পৃ. ২৬৩-২৬৫।

৩৪ সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদী, *উর্দু মে ড্রামা নিগারী*, পৃ. ১৭৫।

৩৫ (ক) আযীমুল হক জুনাইদী, উর্দু আদব কী তারীখ (আলীগড়: এজুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯০), পৃ. ২৫২; (খ) ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা কী তারীখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১৪৬; (গ) রামবাবু সাকসীনা, *তারিখ-এ আদব-এ উর্দু (গদ্যাংশ)*, পৃ. ১৫১।

৩৬ (ক) মির্যা আদীব, 'ড্রামে কা ফন' *তানক্বীদী মাক্বালাত*, গদ্যাংশ, পৃ. ৫০২-৫০৩; (খ) মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা*, পৃ. ২১।

৩৭ ড. আতীয়া নাশ্‌শাত, *উর্দু ড্রামা রেওয়ায়েত আওর তাজরিবাহ*, পৃ. ১৬৭-১৮৪।

৩৮ (ক) ড. সালাম সান্দেলভী, *আদব কা তানক্বীদী মুতালেআ*, পৃ. ২৬৬-২৬৮; (খ) সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদী, *উর্দু মে ড্রামা নিগারী*, পৃ. ১২৩; (গ) রামবাবু সাকসীনা, *তারিখ-এ আদব-এ উর্দু (গদ্যাংশ)*, পৃ. ১৫২।

৩৯ ড. সালাম সান্দেলভী, *আদব কা তানক্বীদী মুতালেআ*, পৃ. ২৬৮-২৬৯।

৪০ (ক) ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা তারীখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১৪৯; (খ) রামবাবু সাকসীনা, *তারিখ-এ আদব-এ উর্দু (গদ্যাংশ)*, পৃ. ১৫২-১৫৩; (গ) সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদী, *উর্দু মে ড্রামা নিগারী*, পৃ. ১৭৫-১৭৯।

৪১ (ক) ড. সালাম সান্দেলভী, *আদব কা তানক্বীদী মুতালেআ*, পৃ. ২৬০-২৬১; (খ) রামবাবু সাকসীনা, *তারিখ-এ আদব-এ উর্দু (গদ্যাংশ)*, পৃ. ১৫৩; (গ) সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদী, *উর্দু মে ড্রামা নিগারী*, পৃ. ১১৬-১২৬; (ঘ) ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা তারীখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১৭৮-২০৪।

৪২ (ক) সৈয়দ ইমতিয়াজ আলী তাজ, *আনার কলি* (লক্ষ্মৌ : উত্তর প্রদেশ, উর্দু একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ৪-৫; (খ) মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা*, পৃ. ২২।

৪৩ (ক) ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা কী তারীখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ২০৬-২০৮; (খ) ড. সালাম সান্দেলভী, *আদব কা তানক্বীদী মুতালেআ*, পৃ. ২৭২-২৭৩।

৪৪ (ক) সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদী, *উর্দু মে ড্রামা নিগারী*, পৃ. ২০০-২২২; (খ) ড. আতীয়া নাশ্‌শাত, *উর্দু ড্রামা রেওয়ায়েত আওর তাজরিবাহ*, পৃ. ১৯৯-২১৫; (গ) ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা তারীখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ২০৬-২৪৫; (ঘ) রামবাবু সাকসীনা, *তারিখ-এ আদব-এ উর্দু (গদ্যাংশ)*, পৃ. ১৫৪-১৫৬; (ঙ) ড. সালাম সান্দেলভী, *আদব কা তানক্বীদী মুতালেআ*, পৃ. ২৭১-২৭৪।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

আধুনিক উর্দু গদ্যসাহিত্যের বিবিধ শাখা: প্রাথমিক অনুসন্ধান

ড. মো. মোকাররম হোসেন মন্ডল*

Abstract: Urdu is one of the modern languages of the world. Like other languages and literature of the world, the literature of this language also relied only on poetry in its early stages. At that time the overall depiction of society and mankind was done through poetry. Prose fiction was limited to mere metaphors, love stories and religious teachings. However, the establishment of 'Fort William College' in Calcutta (1800AD) and the 'Sepoy Revolt' in India (1857 AD) was a turning point in Urdu prose fiction. Particularly because of this rebellion, the Renaissance began in the Indian subcontinent. As a result, Urdu literature also touches on this Renaissance. During this time, an education and social reform movement was formed under the leadership of Sir Syed Ahmed Khan, the father of modern Urdu Literature. As a result of that movement, Urdu prose literature became the simplest and simplest way to solve life's problems. With this movement, many of the literary writers of modern consciousness became involved. Under his leadership, Urdu prose literature was liberated from fiction and the creation and development of various branches of prose literature based on creative real society and life-fiction and non-fiction. The branches of prose, including novels, Dramas, short stories, criticisms, essays, papers, biographies, news, etc. are very rich in Urdu literature today. Which have attained the status of modern literature. This paper reviews the origins and development of various branches of modern Urdu prose literature.

পৃথিবীর আধুনিক ভাষাসমূহের মধ্যে উর্দু (اردو) হলো অন্যতম আধুনিক ভাষা। বিশ্বের অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের ন্যায় এ ভাষার সাহিত্যও প্রাথমিক পর্যায়ে শুধুমাত্র কাব্যকলা নির্ভর ছিল। সে সময় সমাজ ও মানবজাতির সামগ্রিক চিত্রাঙ্কন কবিতার মাধ্যমেই করা হতো। গদ্যসাহিত্য বলতে শুধুমাত্র কেচ্ছা-কাহিনি, প্রেম-প্রীতি ও ধর্মীয়শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে কালক্রমে কবিতার সাথে সাথে উর্দু গদ্যেরও অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮০০ খ্রি.) উর্দু গদ্যসাহিত্যের জন্য এক যুগান্তকারী ঘটনা। কেননা, এ যুগেই উর্দু গদ্যসাহিত্য পরিপক্বতা লাভ করে। আবার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে 'সিপাহী বিদ্রোহ' সংঘটিত হয়। এ বিদ্রোহের ফলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাঙ্গনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে নবচেতনার সৃষ্টি হয়। এই নবচেতনা ভারত উপমহাদেশে আধুনিক যুগের আবির্ভাব ঘটায়। উর্দু সাহিত্যেও এই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগতে থাকে। এসময় আধুনিক উর্দু সাহিত্যের জনক স্যার সৈয়দ আহমদ খানের (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রি.) নেতৃত্বে 'আলীগড় আন্দোলন' নামে একটি শিক্ষা ও সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে ওঠে। তাঁর মতে, জাতীয় ভাষার (উর্দু) উন্নতি না হলে কোনোদিন জাতির উন্নতি হবে না। এই লক্ষ্যে তিনি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রথম যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা হলো উর্দু গদ্যকে সহজ-সরলভাবে সমস্যা সমাধানের মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করা। কেননা, ঐ সময়ের উর্দু গদ্য এত কঠিন ছিল যে, তা সহজে কেউ বুঝতে পারত না। তাঁর প্রচেষ্টায় উর্দু গদ্য যাবতীয় সমস্যা সমাধানের বাহন হয়ে দাঁড়ায়। এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে কতিপয় আধুনিক চেতনাসম্পন্ন সাহিত্যিক ওৎপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উর্দু গদ্য প্রেম-প্রীতি ও কল্প-কাহিনির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে সমাজ

---

* সহযোগী অধ্যাপক, উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ও জীবনকেন্দ্রীক কথাসাহিত্য (Fiction) এবং অ-কথাসাহিত্য (Non-Fiction)-নির্ভর গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি ঘটে। নিম্নে আধুনিক উর্দু গদ্যসাহিত্যের বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হলো:

উপন্যাস

গদ্যসাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় শাখা হলো উপন্যাস সাহিত্য। যার মাধ্যমে মানবসমাজ ও পরিবারে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং মানুষের আবেগ-অনুভূতির পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি ফুঁটে উঠে।[১] উর্দু উপন্যাস সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। আধুনিক উর্দু উপন্যাসে মানবজীবন ও সমাজের প্রতিটি দিক নিখুঁতভাবে চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, আধুনিক উর্দু উপন্যাসের উৎপত্তি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে হলেও এর প্রাথমিক নমুনা দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত লেখক মোল্লা ওয়াজহী'র (১৫৫০-১৬৮১ খ্রি.) *সব রস* (১৬৩৫ খ্রি.) গ্রন্থে পাওয়া যায়। কাল্পনিক কাহিনির ওপর লিখিত হলেও এ গ্রন্থে উপন্যাসের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যাবলী বিদ্যমান রয়েছে। সে সময় দক্ষিণ ভারতে *মিরাজুল আশেক্বীন, হিদায়াতনামা, আহকামুস সালাত, দহ মজলিস* ও উত্তর ভারতে *গুলা-এ ইশক্ব, নও তরয-এ মুরাচ্ছা* প্রভৃতি কাহিনিগ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই ধর্মীয় উপদেশ ও সূফীদের জীবনচরিত গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[২] অতঃপর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় *বাগ ওয়া বাহার* (১৮০১খ্রি.), *আরায়েশ-এ মাহফীল* (১৮০২খ্রি.), *তোতা কাহিনি* (১৮০১খ্রি.), *শকুন্তলা* (১৮০১খ্রি.), *দাস্তানে আমীর হামযা* (১৮০১খ্রি.), *বুস্তানে খেয়াল* (১৮০১খ্রি.), *আলিফ লায়লা* (১৮০২খ্রি.), *রানী কেতকী* (১৮০৩খ্রি.), *ফাসানা-এ আজায়েব* (১৮৩১খ্রি.) এর মতো প্রভৃতি সার্থক গ্রন্থ অনূদিত হয়ে উর্দু কাহিনিঙ্গনে অন্তর্ভুক্ত হয়। পুরোপুরি উপন্যাস না হলেও উর্দু উপন্যাসের প্রস্তুতিপর্বে এ গ্রন্থগুলোর অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। কেননা, সত্যিকারার্থে এ গ্রন্থগুলো বিশেষ করে *ফাসানা-এ আজায়েবে*র মাধ্যমেই উর্দু ক্বেচ্ছা-কাহিনির সূত্রপাত হয়। এরপরই উর্দু উপন্যাস পরিপূর্ণভাবে আধুনিকতার দিকে মোড় নেয়।[৩]

আধুনিক উর্দু উপন্যাসের সকল শিল্পকৌশল এসেছে পাশ্চাত্য ভাবধারা থেকে। ডেপুটী নযীর আহমদ (১৮৩৬-১৯২২খ্রি.) প্রথম ব্যক্তি, যিনি স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আলীগড় আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাশ্চাত্য ভাবধারায় উর্দু উপন্যাসের সূত্রপাত করেন। তাঁর পূর্বে কেউ নিয়মতান্ত্রিকভাবে উপন্যাস রচনা করেননি। এজন্য তাঁকে উর্দুর প্রথম ঔপন্যাসিক মনে করা হয়। সমাজ ও সাধারণ জীবনকাহিনিকে তিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। *মিরাতুল আরূস* (১৮৬৯ খ্রি.), *বানাতুন নাস* (১৮৭৩ খ্রি.), *তাওবাতুন নাসুহ* (১৮৭৭ খ্রি.), *রুইয়া-এ সাদেকাহ* (১৮৭৮ খ্রি.), *ফাসানা-এ মুবতালা* (১৮৮৫ খ্রি.), *ইবনুল ওয়াক্ত* (১৮৮৮ খ্রি.) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।[৪] তবে অনেকে রতন নাথ সরশার (১৮৪৭-১৯০২ খ্রি.)-কে উর্দু সাহিত্যের প্রথম আধুনিক 'ঔপন্যাসিক' মনে করেন। তাঁদের মতে, তিনি নযীর আহমদের মতো ধর্মীয় গণ্ডীর মাঝে না থেকে প্রত্যেক পেশাজীবী ও সম্প্রদায়ের মানুষকে সামনে রেখে উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হলো লক্ষ্মৌর পতনশীল সমাজ। এই সমাজকে তিনি বিভিন্ন ঠাট্টা ও বিদ্রোপভাবে চিত্রায়ন করে পাঠকদের আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিখ্যাত উপন্যাস *ফাসানা-এ আযাদ* (১৮৮০ খ্রি.) লিপিবদ্ধ করে তিনি উর্দু উপন্যাস সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে *সাহরে কোহসার*, *জামে সরশার*, *কামিনী*, *খুদায়ী ফৌজদার*, *তুফানে বেতমীজী*, *রঙ্গ-এ সিয়ার* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫] রতন নাথ সরশারের পর উর্দু উপন্যাসকে আপন মহিমায় সুশোভিত করার ক্ষেত্রে আব্দুল হালিম শরর (১৮৬০-১৯২৬ খ্রি.) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষকরে তিনি প্রথম ঔপন্যাসিক, যিনি ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন চরিত্রকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে উপন্যাসের রূপ দেওয়ার সফল প্রয়াস চালিয়েছেন। এজন্য তাঁকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্থপতি বলা হয়।[৬] তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে *ফেরদৌসে বরী*, *হুসনে আঞ্জেলিনা*, *ফাতাহ-এ আন্দেলিস*, *যাওয়াল-এ বাগদাদ*, *আইয়্যামে আরব* প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি কিছু সামাজিক উপন্যাসও

লিখেছেন, যেগুলোর মধ্যে *দিলকশ*, *খাওফ নাক-এ মহব্বত*, *বদরুন্নেছা কী মহব্বত*, *হুসনা কা যাদু* প্রভৃতি তাঁকে অমর করে রেখেছে। উপন্যাসে বিশেষ অবদান রাখার জন্য স্কটল্যান্ডের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কট (১৭৭১-১৮৩২ খ্রি.)-এর সাথে তুলনা করে তাঁকে উর্দু উপন্যাসের 'ওয়াল্টার স্কট' বলা হয়।[৭]

উপর্যুক্ত তিনজন ঔপন্যাসিকের সঠিক নেতৃত্বে প্রাথমিক যুগে আধুনিক উর্দু উপন্যাস যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সমসাময়িক ও পরবর্তী ঔপন্যাসিকগণ শুধুমাত্র এ তিনজন পথিকৃৎকে অনুসরণ করে উর্দু উপন্যাসের উন্নতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। অনুসরণকারীদের মধ্যে হাকীম আলী তাবীব, মির্জা আব্বাস, মুনশি সাজ্জাদ হোসাইন ও নবাব সৈয়দ মুহাম্মদ আজাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষকরে মুনশি সাজ্জাদ হোসাইন (১৮৫৬-১৯১৫খ্রি.) *আওধপঞ্চ* (১৮৭৭খ্রি.) পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে কৌতুকপ্রদ ও ব্যাঙ্গাত্মক রচনা পরিবেশনসহ বেশকিছু ভালো লেখক ও উন্নত মানের ছাপা উর্দু সাহিত্যকে উপহার দেন।[৮] এসময়ের উর্দু উপন্যাসের আর একজন উজ্জল নক্ষত্রের নাম মির্জা মুহাম্মাদ হাদী রসুয়া (১৮৫৮-১৯৩১ খ্রি.)। তাঁর আবির্ভাবের ফলে উর্দু উপন্যাস নতুনভাবে সুসজ্জিত হয়। দৈনন্দিন সামাজিক জীবনপ্রবাহ থেকে তিনি উপন্যাসের উপজীব্য গ্রহণ করে সেগুলোকে বিভিন্ন রঙে রঙিন করে উপন্যাসে স্থাপন করেছেন। তাঁকে নব্য ঔপন্যাসিকদের পুরোধা বলা হয়। কেননা, উর্দু উপন্যাসের বিকাশের সূচনালগ্নে যে সমস্ত লেখক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাঁদের থেকে কিছুটা ভিন্নরূপ দান করে মির্জা রসুয়া আধুনিক উপন্যাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে সমুজ্জ্বল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রচিত *উমরাও জান আদা* আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে পরিগণিত হয়।[৯] এযুগে রাশেদুল খায়েরী (১৮৬৮-১৯৩৬খ্রি.) ছিলেন মৌলভি নযীর আহমদের সার্থক অনুসারী। নারী চরিত্র ও ট্রাজিক চরিত্র অঙ্কনে তিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। *বিনতুল ওয়াক্ত*, *জওহারে ক্বাদামত*, *মানাজিলুস সায়েরা*, *তুফানে হায়াত*, *হায়াতে সালেহা*, *সায়লাবে ইশক্ব* প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।[১০] মূলত ডেপুটী নযীর আহমদের হাত ধরে আধুনিক উর্দু উপন্যাসের বিকাশধারার যে প্রাথমিক পর্যায় শুরু হয়, তাঁর সফল সমাপ্তি ঘটে রাশেদুল খায়েরীর হাতে। এরপর উর্দু উপন্যাসের এক নব সূচনার আবির্ভাব ঘটে, যার স্থপতি হলেন মুনশি প্রেমচাঁদ (১৮৮-১৯৩৬ খ্রি.)। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি মানবজীবন ও সমাজবাস্তবতাকে একইসাথে সর্বপ্রথম উপন্যাসে তুলে ধরেন। তাঁর উপন্যাসে নিম্ন, মধ্য, সাধারণ, কৃষক, জমিদার, মহাজন, শাসকসহ সকল শ্রেণী-পেশাজীবী মানুষের জীবনচিত্র ফুঁটে ওঠেছে। তাঁর লিখিত *বাজার-এ হুসন*, *গুশা-এ আফিয়াত*, *নিরমলা*, *গোদান*, *চৌগান-এ হস্তী*, *ময়দান-এ আমল* প্রভৃতি উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাস। আধুনিক উর্দু উপন্যাসের বিকাশধারার যে পথ নযীর আহমদ শুরু করেছিলেন, তার পরিসমাপ্তি ঘটান মুনশি প্রেমচাঁদ।[১১] অতঃপর ভারতীয় উপমহাদেশসহ পৃথিবীব্যাপী জার্মান সাহিত্যিক কার্ল মার্ক্সের 'সাম্যবাদী' ও ফ্রয়েডের 'মনস্তাত্ত্বিক' আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ফলে 'আঞ্জুমানে তারাক্কী পসন্দ মুসান্নেফীন' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উর্দু কথাসাহিত্যে প্রগতিশীলতা ও মুক্তবুদ্ধিচর্চার আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে সাজ্জাদ জহীর, কৃষাণ চন্দ্র, ইসমত চুগতাই, সুদর্শন, আলী আব্বাস হোসাইন, কুররাতুল আইন হায়দার, নাসীম হেজাযী, রইস আহমদ জাফরী, এম আসলাম, আজিম বেগ চুগতায়ী প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে সহজ-সরল ও প্রাণবন্ত ভাষায় উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছেন। তবে এসমস্ত লেখক উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পে বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তথাপি বলা যায় যে, উর্দু উপন্যাসের সমৃদ্ধিতে তাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁদের বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা, বর্ণনা ভঙ্গি ও চরিত্র-চিত্রণ উর্দু উপন্যাসকে একটা খাঁটি শিল্পের মর্যাদা প্রদান করেছে।

নাটক

আধুনিক গদ্যসাহিত্যের শক্তিশালী একটি মাধ্যম হলো নাটক। মূলত ইহা মঞ্চে অভিনয়ের জন্য রচিত সংলাপ নির্ভর সাহিত্যকর্ম। যার পরিপূর্ণ সাহিত্যরস আস্বাদন মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমেই সম্ভব, পঠনের মাধ্যমে

নয়। এজন্য মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি অভিনয়শিল্পীদের মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক সাধারণের সামনে মূর্ত হয়ে উঠলে তাকে নাটক বলে।[১২] উর্দু সাহিত্যে নাটকের জন্ম হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রিন্সিপাল জন গীলক্রীষ্টের (১৭৫৯-১৮৪৭ খ্রি.) পরামর্শে কাযেম আলী জোয়ান ১৮০১ সালে সংস্কৃত ভাষার কবি ও নাট্যকার কালিদাসের বিশ্বনন্দিত নাটক *অভিজ্ঞান শকুন্তলম*-এর অনুবাদ করে উর্দু নাটকের সূত্রপাত করেন।[১৩] তবে রাধা কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি অবলম্বনে ১৮৪৫ সালে *রাধা কানাহইয়া* নামক নাটক রচনা করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সর্বপ্রথম উর্দু নাটক রচনা করেন লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ (১৮২২-১৮৮৭ খ্রি.)। নাটকটি *রহস* নামে কায়সার বাগের রাজকীয় মঞ্চে মঞ্চস্থ হলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এজন্য তাঁকে উর্দু নাটকের প্রথম শিল্পী মনে করা হয়।[১৪] নাটকটির জনপ্রিয়তা দেখে ১৮৫৩ সালে আমানত লক্ষ্ণৌভি (১৮১৫-১৮৫৯ খ্রি.) *ইন্দর সভা* নাটক রচনা করে মঞ্চস্থ করেন। নাট্যমঞ্চে পরিবেশিত প্রথম কাব্যিক নাটক হিসেবে নাটকটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[১৫] *রহস* ও *ইন্দর* সভা নাটক দু'টির মঞ্চ সাফল্যে প্রভাবিত হয়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন শহরে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোন থেকে পাশ্চাত্য থিয়েটারের ন্যায় অসংখ্য স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ 'থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী' প্রতিষ্ঠিত হয়। যেগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কাহিনির নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হতে থাকে। এসমস্ত থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর মধ্যে ঢাকার ফারহাত আফযা থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী, হুসন আফযা থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী, বোম্বের বোম্বে থিয়েটার, অরিজিনাল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী, দিল্লীর ভিক্টোরিয়া থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী, কলকাতার আলফ্রেড থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী, হায়দারাবাদের দেশীয় থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী, লাহোরের ইন্ডিয়ান সেক্সপিয়ার থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী, লক্ষ্ণৌর আলফিনিস্টন থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৬] এসমস্ত কোম্পানীর জন্য পীর বখশ কানপুরী, আহমদ হাসান ওয়াফের, নবাব সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ, রওনক বেনারসী, মিঞা হোসাইনী জরীফ, তালেব বেনারসী, আহসান লক্ষ্ণৌভি, বেতাব দেহলভী, আগা হাশর কাশ্মিরী, আরজু লক্ষ্ণৌভি প্রমুখ নাট্যকারগণ নাটক রচনা করে উর্দু মঞ্চ নাটকের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যবহার আরম্ভ হলে মঞ্চ নাটকের জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। তখন উর্দু নাটক তার প্লাটফর্ম পরিবর্তন করে নতুন আঙ্গিকে সাহিত্যিক রূপ ধারণ করে সামনের দিকে ধাবিত হয়।[১৭]

উপরন্তু ১৮৫৭ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ভারতীয় আর্থসামাজিক ও সাহিত্যজগতে মহা পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের ফলে উর্দু নাটককে ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থিয়েটারের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে একদল নাট্যকার 'সাহিত্য নাটক' রচনার কাজে হাত দেন। এ কাজের জন্য তাঁরা প্রথমে সহজ-সরল উর্দু ভাষা এবং চিত্তাকর্ষক কাহিনি বা প্লট নির্বাচন করেন। তাঁদের রচিত মৌলিক ও অনূদিত নাটকগুলো সাহিত্যবিচারে খুবই উৎকৃষ্ট। আধুনিক চেতনা ও প্রগতিধারার এসমস্ত নাট্যকারদের মধ্যে মুহাম্মদ হোসাইন আযাদ, মুহাম্মদ হাদী রুসওয়া, ইমতিয়ায আলী তাজ, সাজ্জাদ জহীর, সাআ'দাত হোসাইন মন্টু, খাজা হাসান নিজামী, ইশরাত রাহমানী, ইসমত চুগতায়ী, আহমদ নাদীম কাশেমী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে ইমতিয়ায আলী তাজ এমন এক নাট্যকার, যিনি *আনার কলি* (১৯৩২ খ্রি.) নাটক রচনা করে উর্দু সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। আজ অবধি এ নাটকের মতো জনপ্রিয়তা অন্য কোনো উর্দু নাটক অর্জন করতে পারেনি।[১৮] এছাড়া উর্দু নাটকের ক্রমবিকাশে রেডিও নাটকেরও গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৩৬ সালে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উপমহাদেশে 'রেডিও ড্রামা'র উৎপত্তি ঘটে। অতঃপর ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পূর্বে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র বিভিন্ন স্টেশন এবং দেশ ভাগের পর 'রেডিও পাকিস্তান করাচি', 'রেডিও পাকিস্তান লাহোর', 'অল ইন্ডিয়া রেডিও লক্ষ্ণৌ', 'অল ইন্ডিয়া রেডিও দেহলী', 'রেডিও কলকাতা' প্রভৃতি রেডিও সেন্টার থেকে নাটক সম্প্রচার হতে থাকে। রেডিওতে সম্প্রচারিত নাটকগুলো স্বল্প পরিসরে নির্মিত হলেও নাটকের সকল শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য এখানে বিদ্যমান ছিল। রফী পীরজাদা, শওকত থানভী, হাফিজ জাভেদ, আসলাম মালিক, ইসমত চুগতায়ী, রাজেন্দ্র সিং বেদী, সুলতান

ফায়ায প্রমুখ নাট্যকারগণ রেডিও নাটক রচনা করে অমর হয়ে আছেন।[১৯] মোটকথা, পৃথিবীর অন্যান্য নাট্য সাহিত্যের তুলনায় উর্দু নাটক নবীন হলেও এর অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় সাহিত্যিক মানসম্পন্ন নাটকের অভাব থাকলেও বর্তমানে এর কোনো অভাব নেই। কেননা, আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য নাটকের ন্যায় উর্দু ভাষায় সাহিত্য নাটকের দৌরাত্ম্য ক্রমান্নয়ে বেড়েই চলেছে।

ছোটগল্প

গদ্যসাহিত্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো ছোটগল্প। ধর্ম, নীতিকথা বা উপদেশমূলক কথাবার্তার বাইরে এসে শুধুমাত্র রক্তমাংসে গড়া মানবজীবনের কথা লিপিবদ্ধ করেও যে আর্ট সৃষ্টি করা যায়-এই ধারণার উপর ভিত্তি করে আধুনিক ছোটগল্পের উদ্ভব। ইহা এমন এক ধরনের কথা-শিল্প, যাতে স্বল্প পরিসরে বৈচিত্র্যময় মানবজীবনের বিশেষ কোনো দিক বা খণ্ড খণ্ড ঘটনার সার্থক রূপায়ন ঘটানো হয়। উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর পাশ্চাত্য সাহিত্য বিশেষকরে ইংরেজি ভাষার প্রভাবে আধুনিক উর্দু ছোটগল্পের আত্মপ্রকাশ ঘটে। যদিও ইতঃপূর্বে উর্দু সাহিত্যের উপাখ্যানমূলক প্রাচীন গ্রন্থসমূহে ছোটগল্পের প্রাথমিক নমুনা পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলোতে কাহিনির কোনো সুশৃঙ্খল রূপ ছিল না। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

آفسانہ مغرب میں بھی سب سے نئۓ اور کم عمر صنف ادب ہے۔ ہمارے ہاں آفسانے کی پیدائش ہی اس وقت ہوئ جب ہمارے ادیب مغربی ادب کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے اور اس سے مستفیض ہونے لگے تھے۔[২০]

> "ছোটগল্প পাশ্চাত্যেও সবচেয়ে নবীন এবং অল্পবয়স্ক সাহিত্য। আমাদের এখানে ছোটগল্পের সৃষ্টি ঐ সময় হয়েছে, যখন আমাদের সাহিত্যিকগণ পাশ্চাত্য সাহিত্যের খুব বেশি চর্চা শুরু করেন এবং সেখান থেকে উপকৃত হতে লেগেছিলেন।"

আধুনিক উর্দু ছোটগল্পের সূচনাকারী হলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। তাঁর রচিত 'গুযরা হুয়া যামানা' (১৮৭০খ্রি.) প্রবন্ধ উর্দু সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প।[২১] তিনি আধুনিক উর্দু ছোটগল্পের যে রূপরেখা সৃষ্টি করেছিলেন, তার পরিপূর্ণতা দেন মুনশি প্রেমচাঁদ (১৮৮০-১৯৩৬ খ্রি.) ও সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারম (১৮৮০-১৯৪৩ খ্রি.)। এ দু'জন ওস্তাদকে অনুসরণ করে সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে বাস্তবধর্মী ও রোমান্টিকধর্মী নামে দু'টো ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়। বাস্তবধর্মী লেখকগণ ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও গ্রামীণ পরিবেশকে আর রোমান্টিক ধারার লেখকগণ পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে রোমান্টিকতাকে পুঁজি করে ছোটগল্প রচনা করার সফল প্রয়াস চালান। তাঁদের প্রচেষ্টায় সংস্কারমূলক উর্দু ছোটগল্পের বিকাশ বেশ ত্বরান্বিত হতে থাকে। বাস্তবধর্মীলেখকদের মধ্যে প্রেমচাঁদ ছাড়াও সুদর্শন (১৮৯৫-১৯৪৭ খ্রি.), আজম করিভী (১৯৫৮ খ্রি.), আলী আব্বাস হোসাইনী (১৮৯৭-১৯৬৯ খ্রি.), রাশেদুল খায়েরী, সুলতান হায়দার জোশ (১৮৮৬-১৯৫১ খ্রি.), খাজা হাসান নিজামী (১৮৭৮-১৯৫৭ খ্রি.), আর রোমান্টিক লেখকদের মধ্যে সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারম ছাড়াও নয়ায ফতেহপুরী (১৮৪৭-১৯৬৬ খ্রি.), মজনু গৌরখপুরী (১৯০৪-১৯৮৮ খ্রি.), হাকীম আহমদ শুজা (১৮৯৩-১৯৬৯ খ্রি.), হেজাব এমতিয়াজ আলী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২২] এ সমস্ত লেখকদের মধ্যে অনেকে মৌলিক গল্প রচনার পাশাপাশি অনুবাদের মাধ্যমেও উর্দু ছোটগল্পের শৈল্পিক ক্রমোন্নতির পথকে প্রশস্ত করেছেন। এছাড়া সমসাময়িককালে সমাজ থেকে কুপ্রথা দুরীভূত করণ এবং ছোটগল্পের বিকাশে রম্য-সাহিত্যিকগণও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন। এসমস্ত রম্য লেখকদের মধ্যে আযিম বেগ চুগতায়ী (১৮৯৫-১৯৪১ খ্রি.), পাতরাস বুখারী (১৮৯৮-১৯৫৮ খ্রি.), শওকত থানভী (১৯০৫-১৯৬৩ খ্রি.), কনহিয়ালাল কাপুর (মৃ.১৯৮০খ্রি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৩]

অতঃপর ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষের সাহিত্যজগতে প্রগতিশীল আন্দোলন শুরু হলে উর্দু ছোটগল্প অন্যদিকে মোড় নেয়। যাকে সমৃদ্ধির যুগ বলা হয়। উর্দু ছোটগল্পের এই সমৃদ্ধিতে জার্মান সাহিত্যিক কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩খ্রি.)-এর 'সাম্যবাদী আন্দোলন' ও সিগমন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯ খ্রি.)-এর 'মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলন'-এর প্রভাব বেশ লক্ষণীয়। এ সমস্ত আন্দোলনের প্রভাবে ১৯৩৫ সালের পর ভারতবর্ষে নিয়মতান্ত্রিকভাবে মুক্তবুদ্ধির চর্চা আরম্ভ হয়। যার প্রতিফলন আমরা পরবর্তী সময়ের উর্দু ছোটগল্পে দেখতে পাই। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম গল্প সংকলন 'আংগারে'-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এর প্রতিটি গল্পে ইংরেজ সরকারের অত্যাচার ও জুলুম সম্পর্কে ভর্ৎসনা, ঘৃণা, ক্ষোভ এবং অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। সংকলনটি ১৯৩৩ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হলে এর রেখে যাওয়া নির্ভীকতার স্ফুলিঙ্গ পরবর্তী লেখকদের মাঝে বিস্ফোরিত হতে থাকে। ফলে আধুনিক যুগের লেখকরা জীবনের গভীরে পৌঁছে মনস্তাত্ত্বিকের মতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়সহ একেবারে ছোট ছোট ঘটনা নিয়ে ছোটগল্প রচনা শুরু করেন। এযুগের সুনামধন্য লেখকদের ক্ষুরধার কলমের ছোঁয়ায় উর্দু ছোটগল্প সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছে।[২৪] সাআ'দত হাসান মন্টু (১৯১৩-১৯৫৫ খ্রি.), কৃষাণচন্দ্র (১৯১২-১৯৭৭ খ্রি.), রাজেন্দর সিং বেদী (১৯১৫-১৯৮৪ খ্রি.), ইসমত চুগতাই, কুররাতুল আইন হায়দার, সোহাইল আজীম আবাদী, আহমদ নাদীম কাসেমী প্রভৃতি লেখকগণ ছোটগল্পের সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মোটকথা, উর্দু ছোটগল্প একসময় সাদাসিদা শৈল্পিক ভাবধারা ও সমাজ সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও আধুনিক যুগের লেখকগণ মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধিচর্চার মাধ্যমে জীবনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষয়াবলীর ওপর শিখা প্রজ্জ্বলন করেন এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতার ওপর শৈল্পিক নির্ভীকতার সীল বসিয়ে দেন। ফলে উর্দু ছোটগল্প ক্রমবিকাশের পথ অতিক্রম করে সমৃদ্ধির চরম পর্যায়ে পৌঁছে।

সমালোচনা সাহিত্য

আধুনিক সাহিত্যের সর্বাধিক উৎকৃষ্ট শাখা হলো সমালোচনা সাহিত্য। এর উৎপত্তি হয়েছে বলেই সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যের মর্যাদা পাওয়ার পাশাপাশি খুঁজে পেয়েছে তার প্রকৃত রূপ ও সৌন্দর্য। যদি মানুষের মধ্যে তাঁর আশেপাশের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং সে সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার শক্তি না থাকত, তাহলে মানবজীবনের উন্নতির চাবিকাঠি এত সহজ হতো না। ভালো-মন্দের এই বিচারশক্তির নামই সমালোচনা।[২৫] সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রাথমিক যুগে ফারসি ভাষায় তাযকিরাহ লেখার মাধ্যমে উর্দু সাহিত্যের সমালোচনা করা হতো। এই তাযকিরাহগুলোতে কবি-সাহিত্যিকদের জীবনচরিত, তাঁদের রচনাশৈলী, দোষত্রুটি ও বৈশিষ্ট্যাবলীর ওপর বিচার-বিশ্লেষণ করা হতো। এ প্রসঙ্গে তাকীমীরের *নুকাতুশ শুআ'রা* (১৭৫০খ্রি.), মীর হাসানের *তাযকিরা-এ শুআ'রা-এ উর্দু* (১৭৭৩খ্রি.), খাজা এনায়েতুল্লাহ'র *রিয়াজ-এ হুসনী* (১৭৫৩খ্রি.), সৈয়দ ফতেহ আলী হোসাইনীর *রিখতা-এ গুইয়্যা* (১৭৫১ খ্রি.) প্রভৃতি প্রাচীন তাযকিরাহগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৬] ১৮০০ সালে 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হলে ফারসি ভাষার পাশাপাশি উর্দু ভাষায় তাযকিরাহ লেখা শুরু হয়। যা আধুনিককাল পর্যন্ত চালু থাকে। আধুনিক যুগের তাযকিরার মধ্যে লালা শ্রীরাম রচিত *খামখানা-এ জাভীদ* (১৯০৬ খ্রি.), আব্দুল জব্বার খানের *তাযকিরা-এ মাহবুবুয যামান* (১৯১১ খ্রি.), মৌলভী আব্দুল বারী অসীর *তাযকিরাতুল খাওয়াতীন* (১৯৪৬ খ্রি.) প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার।[২৭] তবে প্রাচীন থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত তাযকিরাহ চালু থাকলেও এসময়ের মধ্যে উর্দু সমালোচনা শুধুমাত্র তাযকিরাহ'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে এর পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে।[২৮] যেমন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইনশা (১৭৫৫-১৮১৭ খ্রি.) উর্দু ব্যাকরণের ওপর ফারসি ভাষায় *দরীয়া-এ লতাফৎ* (১৮০৭ খ্রি.) রচনা করে উর্দু সমালোচনার মধ্যযুগের প্রবর্তন করেন। এছাড়া সমসাময়িককালে লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যচর্চার মিলন মেলা বসত। যেখানে আরযু (১৬৮৭-১৭৫৬খ্রি), রঙিন (১৭৫৭-১৮৩৮খ্রি.), নাসেখ

(১৭৫৭-১৮৩৮খ্রি.), গালিব (১৭৯৬-১৮৬৯খ্রি.) এর মতো কবি-সাহিত্যিকগণ ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ করে শীষ্যদের কবিতা সংশোধন করে দিতেন।[২৯] অতঃপর ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কারণে ভারতবর্ষের নাগরিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের ফলে মানুষের চিন্তা-চেতনায় নব-চেতনার উন্মেষ ঘটে। ফলে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি সাহিত্যসংস্কার আন্দোলনও শুরু হয়। এই সাহিত্যসংস্কার আন্দোলনের অংশ হিসেবে উর্দু সাহিত্যকে সহজ-সরল ও বাস্তবধর্মী সাহিত্যে রূপান্তর করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসেন প্রগতিশীল ও মুক্তচিন্তার অধিকারী একদল সাহিত্যিক। তাঁরা পাশ্চাত্য ভাবধারায় সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় সমালোচনা সাহিত্যেও ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। এই পরিবর্তিত সময়ের সমালোচনাকে উর্দু সমালোচনার আধুনিক যুগ বলা হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ খান *তাহযীবুল আখলাক্* (১৮৭০ খ্রি.) পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে আধুনিক সমালোচনামূলক ভাবধারার প্রবর্তন করেন।[৩০] এ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলো আধুনিক সমালোচনার মূলভিত্তি। যে ভিত্তির ওপর ইমারত তৈরী করেন তাঁর অন্যতম সহযোগী মুহাম্মদ হোসাইন আযাদ (১৮৩২-১৯১০ খ্রি.), আলতাফ হোসাইন হালী (১৮৩৭-১৯১৪ খ্রি.) ও শিবলী নু'মানী (১৮৫৭-১৯১৪ খ্রি.)।[৩১] তাঁরা সমালোচনা সাহিত্যে যে ধারার প্রবর্তন করেছেন, মূলত সেই ধারাকে অনুসরণ করে পরবর্তী সময়ের অধিকাংশ সমালোচকগণ এশিল্পকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান। এসমস্ত সমালোচকদের মধ্যে মেহেদী আফাদী (১৮৭৪-১৯২১ খ্রি.), আব্দুস সালাম নদভী (১৮৪৭-১৯২১ খ্রি.), পণ্ডিত ব্রজ নারায়ন চকবসত (১৮৮২-১৯২৬ খ্রি.), ওয়াহিদ উদ্দীন সেলিম (১৮৬৭-১৯৪৮ খ্রি.), প্রফেসর মাহমুদ শিরানী (১৮৮১-১৯৪৬ খ্রি.), সৈয়দ সোলায়মান নদভী (১৮৮৪-১৯৫২ খ্রি.), মৌলভী আব্দুল হক (১৮৭০-১৯৬১ খ্রি.), মাসউদ হাসান রিজভী (১৮৯৪-১৯৭৫ খ্রি.), হামিদ হাসান কাদেরী (১৮৮৪-১৯৪৬ খ্রি.), এজায হোসাইন (১৮৯৯-১৯৭৫ খ্রি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩২] অতঃপর উর্দু সমালোচনাঙ্গনে এমনকিছু লেখকের আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতির ন্যায় উর্দু সমালোচনা পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করে তোলার পাশাপাশি সর্বপ্রথম ইংরেজি ও উর্দু ভাষার কবিদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা আরম্ভ করেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল কাদের সরওয়ারি (১৯০৬-১৯৭১ খ্রি.), সৈয়দ আব্দুল লতিফ (১৯০৮-১৯৭১ খ্রি.), মহীউদ্দীন কাদেরী জোর (১৯০৫-১৯৬২ খ্রি.), আনদালীব শাদানী, কলীমউদ্দীন আহমেদ (১৯০৭-১৯৭২খ্রি.) প্রমুখের নাম অন্যতম।[৩৩] সমালোচনার এ পর্যায়ে কার্ল মার্ক্সের সাম্যবাদী আন্দোলন ও সিগমন্ড ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলনের প্রভাব বেশ লক্ষণীয়। এসমস্ত আন্দোলনের ফলে ১৯৩৫ সালের পর ভারতবর্ষে যখন 'প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলন' শুরু হয়, তখন উর্দু সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় সমালোচনা সাহিত্যও গতিবিধি পরিবর্তন করে নতুন দিকে মোড় নেয়। যার কারণে ছোটগল্পের ন্যায় এ সময়ের সমালোচনাতেও মার্ক্সবাদী ও ফ্রয়েডীয় প্রভাব পড়ে। এ ভাবধারার সমালোচকদের মধ্যে মজনু গৌরখপুরী (১৯০৪-১৯৮৮ খ্রি.), এহতেশাম হোসাইন (১৯১২-১৯৭২ খ্রি.), ওয়াকার আজীম (১৯০৯-১৯৭৬ খ্রি.), আলে আহমদ সুরুর (১৯১২-১৯৮০ খ্রি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৪] আবার উর্দু সমালোচনার ক্রমবিকাশে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক ইতিহাসগ্রন্থ ও সংবাদপত্রের বেশ ভূমিকা রয়েছে। কেননা, এসমস্ত ইতিহাসমূলক গ্রন্থে উর্দু সাহিত্যের বিভিন্ন লেখক ও যুগের ওপর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আর প্রায় লেখকই কোনো না কোনো পত্রিকার সাাথে যুক্ত থাকেন। তাই তাঁদের লিখিত সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলো সর্বপ্রথম পত্রিকার মাধ্যমেই পাঠকের হাতে পৌঁছে। এজন্য আমরা বলতে পারি যে, উর্দু সমালোচনার বিকাশে সাহিত্যবিষয়ক ইতিহাস গ্রন্থ ও সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম।[৩৫] মোটকথা, উর্দু সমালোচনা সাহিত্য সম্পূর্ণ আধুনিক যুগের সৃষ্টি। যার মধ্যে বিশ্ব সাহিত্যের সকল দর্শন বিদ্যমান। ফলে উর্দু সমালোচনা আধুনিক সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে এবং বর্তমানে মানবসমাজের মৌলিক বিষয়াবলীর চিত্রাঙ্কনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

প্রবন্ধ

আধুনিক গদ্যসাহিত্যের সর্বাধিক মননশীল ও বৈচিত্র্যময় শাখা হলো প্রবন্ধ। এ ধরনের রচনার মাধ্যমে লেখক কোনো বিশেষ ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তাধারাকে যুক্তির মাধ্যমে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করে। মূলত কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া লেখক কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে আত্মসচেতনমূলক যে নাতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন, তাকেই প্রবন্ধ বলে।[৩৬] সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে উর্দু প্রবন্ধ সাহিত্যের উৎপত্তি হয়েছে। ১৮৪৫ সালে দিল্লী কলেজে সর্বপ্রথম উর্দু প্রবন্ধের সূত্রপাত হয়। কলেজের সাথে সম্পৃক্ত থেকে যে সমস্ত লেখক প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে মাস্টার রামচন্দ্র, মোতিলাল, মোহাম্মদ হোসাইন, নযীর আহমদ, যাকাউল্লাহ, ভগবান দাস, জিয়া উদ্দিন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৭] কিন্তু উর্দু প্রবন্ধের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে। এ বিদ্রোহের কারণে ভারতবর্ষের শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। বিদ্রোহোত্তর ইংরেজদের দমননীতির কারণে ভারতীয়রা যখন আর্থসামাজিক দিক থেকে লক্ষ্যহীন ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখন জাতির একদল দূরদর্শী চিন্তাবীদ পথভ্রষ্ট স্বদেশীয়দের মধ্যে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি, ঘুমন্ত স্বত্ত্বাকে জাগানো এবং জাগ্রত স্বত্ত্বাকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য জ্ঞান ও শিক্ষার মশাল হাতে নিয়ে এগিয়ে আসেন। আর এ কাজের জন্য তাঁরা প্রবন্ধ সাহিত্যকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। কেননা, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও চিন্তাশক্তি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সে যুগের প্রবন্ধগুলো গ্রন্থের চেয়েও বেশি ফলপ্রসূ প্রমাণিত হতে থাকে।[৩৮] এধারার লেখকদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রবন্ধ লেখার সূত্রপাত করেন। প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য তিনি *তাহযীবুল আখলাক্ব* (১৮৭০ খ্রি.) নামক একটি সাহিত্য পত্রিকাও বের করেন। তাঁর সমসাময়িক প্রবন্ধকারদের মধ্যে নযীর আহমদ (১৮৩৬-১৯২২খ্রি.), হালী (১৮৩৭-১৯১৪খ্রি.), মুহাম্মদ হোসাইন আযাদ (১৮৩০-১৯১০খ্রি.), শিবলী নু'মানী (১৮৫৭-১৯১৪খ্রি.), মুহসিনুল মুলক (১৮৩৭-১৯০৭ খ্রি.) আকবর এলাহাবাদী (১৮৪৬-১৯২১ খ্রি.), চেকবশত (১৮৮২-১৯২৬ খ্রি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্বসমৃদ্ধ, বস্তুনিষ্ঠ, চিন্তামূলক ও বুদ্ধিভিত্তিক। সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তা, জাতীয় ঐক্য-সংহতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জনগণকে সচেতনতা করাই ছিল তাঁদের প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। তাঁদের প্রত্যেকটি প্রবন্ধ শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারমূলক ছিল বলে প্রবন্ধের এ যুগকে সংস্কারের যুগ বলা হয়। এসমস্ত লেখকদের প্রচেষ্টায় ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দানা বাঁধতে আরম্ভ করে।[৩৯]

উপর্যুক্ত লেখকদের এধরনের জ্ঞানভিত্তিক আন্দোলনের ফলে মানুষের জীবনবোধ জাগ্রত হওয়ার পাশাপাশি উর্দু প্রবন্ধ এতবেশি জনপ্রিয়তা পায় যে, অসংখ্য লেখক প্রবন্ধ রচনার দিকে ধাবিত হোন। ফলে প্রবন্ধাঙ্গনে বৈচিত্র্যময় বিষয়স্তুর মিলনমেলা ও নবজাগরণের সঞ্চার ঘটে। এসময়ের প্রবন্ধে গবেষণাধর্মী, ভাষাতত্ত্বভিত্তিক, সমালোচনা, জীবনী, রম্য-ব্যাঙ্গাত্মকসহ জীবন ও সমাজের এমন কোনো দিক নেই, যা ফুঁটে ওঠেনি। সে সমস্ত লেখদের মধ্যে মৌলভী আব্দুল হক (১৮৭০-১৯৬১ খ্রি.), সৈয়দ সোলায়মান নদভী (১৮৮৪-১৯৫৩ খ্রি.), সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারম (১৮৮০-১৯৪৩ খ্রি.), পাতরাস বুখারী (১৮৯৮-১৯৫৮ খ্রি.), শওকত থানভী (মৃঃ ১৯৬৩ খ্রি.), খাজা হাসান নিজামী (১৮৭৪-১৯৫৭ খ্রি.), আব্দুল হালীম শরর (১৮৬০-১৯২৯ খ্রি.), আবুল কালাম আযাদ (১৮৮১-১৯৫৮ খ্রি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪০] অতঃপর মার্ক্সবাদী আন্দোলনের প্রভাবে ১৯৩৫ সালের পর ভারতীয় উপমহাদেশে প্রগতিশীল আন্দোলন শুরু হলে উর্দু প্রবন্ধ প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক সমাজব্যবস্থা, জাতীয়তাবাদ, মুক্তবুদ্ধিচর্চা, উচ্চ-নিম্নশ্রেণির মানুষদের জীবনপরিক্রমা তুলে ধরার পাশাপাশি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সার্বভৌমত্বের দাবী আদায়ের পরিভাষায় পরিণত হয়। তাই এ সময়ের উর্দু প্রবন্ধকে 'রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের যুগ' বলা হয়। কাজী আব্দুল ওয়াদুদ, কনিহালাল কাপুর, মুশতাক আহমদ, মীর্জা আদীব এ যুগের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধকার।[৪১] মোটকথা, উর্দু প্রবন্ধ সম্পূর্ণ আধুনিক কালের সৃষ্টি। আর উপরোক্ত লেখকদের ক্ষুরধার লেখনী ও চিন্তাধারার

ফলে উর্দু প্রবন্ধ সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। বর্তমানে প্রবন্ধ সাহিত্যের এমন কোনো দর্শন নেই, যা উর্দু প্রবন্ধ সাহিত্য আয়ত্ব করতে পারেনি। তাই নিঃসন্দেহে বলতে পারি উর্দু প্রবন্ধ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সংবাদ সাহিত্য

আধুনিক গদ্যের অন্যতম শাখা হলো সংবাদ সাহিত্য। মূলত সংবাদপত্রে পরিবেশিত কোনো সংবাদ যখন সাহিত্যের গুণে গুণান্বিত হয়ে উঠে, তখন তাকে সংবাদ সাহিত্য বলা হয়। সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, উর্দু ভাষায় সংবাদপত্রের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। প্রথম উর্দু সংবাদপত্রের নাম হলো *জামে জাহাঁ নুমা*। যা ১৮২২ সালে মুনশি সদা সুখের সম্পাদনায় কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[৪২] প্রাথমিক অবস্থায় উর্দু ভাষার সকল পত্রিকা ছিল সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক। যে গুলোতে সুনামের সাথে সংবাদ পরিবেশন করা হতো। পত্রিকাগুলোর মধ্যে *দেহলী উর্দু আখবার* (১৮৪৪ খ্রি.), *সাদেকুল আখবার* (১৮৪৪ খ্রি.), *সাইয়েদুল আখবার* (১৮৩৭ খ্রি.), *খায়ের খাঁ হিন্দ* (১৮৪৭ খ্রি.), *মুফিদ-এ হিন্দ* (১৮৪৮ খ্রি.) *মুহিব-এ ওয়াতন* (১৮৪৭ খ্রি.), *কোহেনূর* (১৮৫০ খ্রি.), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাগুলোতে ইংরেজ বিদ্বেষী বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন শুরু হলে সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রি.) পর ইংরেজ সরকার কর্তৃক উক্ত পত্রিকাগুলোর ওপর বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। ফলে বহু পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।[৪৩] বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও উর্দু সংবাদপত্রের এই ক্রান্তিলগ্নে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে *তাহযীবুল আখলাক্ব* (১৮৭৭ খ্রি.), *আখবার-এ সায়েন্টিফিক সোসাইটি* (১৮৬৬ খ্রি.), *আওধ আখবার* (১৮৭৪ খ্রি.), *আহসানুল আখবার* (১৮৬৭ খ্রি.), *আওধ পঞ্চ* (১৮৭৭ খ্রি.), *চেরাগ-এ দেহলী* (১৮৬৭ খ্রি.)-সহ প্রায় পাঁচ শতাধিক পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। যে পত্রিকাগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজসংস্কার, রাজনীতি, ভাষা এবং সাহিত্যবিষয়ক সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করার চেষ্টা করেছে।[৪৪]

১৯০০ সালের পর উর্দু সংবাদপত্রের মধ্য বা স্বর্ণ যুগ আরম্ভ হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠা, দেশ বিভক্তের প্রস্তাব পাশ, এশিয়া ও আফ্রিকায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধসহ নানা ঘটনার পরিক্রমায় ভারতীয় উপমহাদেশে সুরোজ ও খেলাফত আন্দোলনের পথ সুগম করে দেয়। উপরন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতীয় কংগ্রেস জনসাধারণের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির আন্দোলন শুরু করে দেয়। এসব কারণে উর্দু সংবাদপত্র প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়। ফলশ্রুতিতে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নতুন নতুন আরও বহু পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। যে পত্রিকাগুলো ইংরেজ তোষামোদী পরিত্যাগ করে তাদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ম তলোয়ারের মতো গর্জে উঠে। যার কারণে জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের মনোভাব তৈরী হয়। এযুগে যে সমস্ত পত্রিকা নির্ভীকতার সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে প্রশস্ত ও উর্দু সংবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, সেগুলোর মধ্যে *যমিনদার* (১৯০৩ খ্রি.), *উর্দু-এ মুয়াল্লা* (১৯০৩ খ্রি.), *মাখযান* (১৯০১ খ্রি.), *লিসানুচ্ছাদিক* (১৯০৩ খ্রি.), *আল হেলাল* (১৯১২ খ্রি.), *নক্বীব-এ হামদরদ* (১৯১২ খ্রি.), *খেলাফত* (১৯৪৭ খ্রি.), *আযাদ-এ হিন্দ* (১৯৪৭ খ্রি.), *ক্বওমী আযাদ*, *নয়ী দুনিয়া* (১৯১৯ খ্রি.), *ইনকিলাব* (১৯৪৩ খ্রি.), *জঙ্গ* (১৯৪০ খ্রি.), *আনজাম* (১৯৪১ খ্রি.), *গদর-এ হিন্দুস্তান* প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৫] অতঃপর ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে উর্দু সংবাদপত্রের তৃতীয় যুগ আরম্ভ হয়। এ যুগে উর্দু সংবাদপত্র বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। কেননা, দেশ বিভাগের কারণে পুরো ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। ফলে বহু উর্দু সংবাদপত্র ও সাংবাদিক ভারতবর্ষ ছেড়ে পাকিস্তান চলে যায়। এমনকি কয়েকটি প্রদেশে উর্দু শিক্ষা বন্ধ করে দেয়া হয়। যার কারণে উর্দু সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা ও পাঠক ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে পাকিস্তান থেকে পুনরায় কিছু সাংবাদিক ও উর্দু প্রেমিক ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ধ্বংসপ্রায় উর্দু সংবাদপত্র রক্ষার দায়িত্ব নেন। ফলে বন্ধ হয়ে যাওয়া বহু পত্রিকা নতুন করে যাত্রা শুরু করে পুনরায় অতীত ঐতিহ্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।[৪৬] মোটকথা, উর্দু

সংবাদপত্রের ইতিহাস বেশি দিনের না হলেও খুবই সমৃদ্ধ। কেননা, জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা লাভের উদ্দীপনা সৃষ্টিতে একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে উর্দু সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

জীবনী সাহিত্য

আধুনিক গদ্যসাহিত্যের আরও একটি শাখা হলো জীবনী সাহিত্য। যে সাহিত্যে সমসাময়িক পরিবেশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে কোনো খ্যাতিমান ব্যক্তির জীবন পরিক্রমা, চিন্তা-ভাবনা ও কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে জীবনী সাহিত্য বলে।[৪৭] সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, উর্দু জীবনী সাহিত্যের সূচনা হয় কাব্যসাহিত্যের মাধ্যমে। যেমন এর প্রাথমিক নিদর্শন দক্ষিণ ভারতের ঐ সমস্ত মারছিয়া ও মছনভী সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়, যা সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত হয়েছে। শাখা দু'টো এমন ধরনের কবিতা, যার মধ্যে মানবীয় চরিত্র ও গুণাবলীর বিশেষ দিকগুলো ফুঁটে উঠে।[৪৮] উর্দু জীবনী সাহিত্যের সর্বপ্রথম নমুনা পাওয়া যায় ফিরোজ রচিত *মছনভী তাওছীফ নামা* (১৫৭৮ খ্রি.) গ্রন্থে। এছাড়াও যে সমস্ত মছনভী গ্রন্থে জীবনী সাহিত্যের নমুনা পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে আবদালের *ইবরাহীম নামা* (১৬০০ খ্রি.), ওয়াজহীর *কুতুব-এ মুশতারী* (১৬০৮ খ্রি.), নুছরাতীর *আলীনামা* (১৬৫৭ খ্রি.), মুমিনের *আসরার-এ ইশক্* (১৬৫৩ খ্রি.), বাকের আগার *মেহবুবুল কুলুব* (১৭৯৭ খ্রি.) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসমস্ত জীবন-চরিতমূলক চিহ্নগুলো পরবর্তী লেখকদের জন্য মাইল ফলক হিসেবে কাজ করেছে।[৪৯] অতঃপর উর্দু জীবনী সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ শুরু হয়। এযুগে উত্তর ভারতে 'তাযকিরা' রচনা করা হতো। যে তাযকিরাগুলোর মধ্যে মীরের *নুকাতুশ শুআ'রা*, মীর হাসানের *তাযকিরা-এ শুআ'রা-এ উর্দু*, শিফতার *তাযকিরা-এ গুলশানে বেখার*, ছাহাবায়ীর *চার গুলশান*, মুহাম্মদ হোসাইন আযাদের *আব-এ হায়াত* প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগামী দিনের স্বতন্ত্র জীবন-চরিত লেখকদের জন্য এই তাযকিরাগুলো বিশেষকরে *আব-এ হায়াত* আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। কেননা, এ গ্রন্থকে প্রাচীন ও আধুনিক জীবনী সাহিত্যের সোপান মনে করা হয়।[৫০] এছাড়া এযুগে জীবনী সাহিত্যের উন্নতিতে মির্যা গালিবের পত্রাবলীরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেননা, তাঁর পত্রের মাধ্যমে জীবনী সাহিত্যের যে শুভ সূচনা হয়েছিল, পরবর্তীতে তার পূর্ণ রূপ দান করেন আধুনিক উর্দু সাহিত্যের জনক স্যার সৈয়দ আহমদ খান।[৫১]

সিপাহী বিদ্রোহের পর উর্দু জীবনী সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হয়। এযুগে যে সকল লেখকদের হাত ধরে জীবনী সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যের স্বীকৃতি পেয়েছে, তাঁদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তিনি *সীরাত-এ ফরীদীয়্যাহ* (১৮৯৬ খ্রি.), *আচারুচ্ছানাদীদ* (১৮৪৭ খ্রি.) ও *খুতবাত-এ আহমাদীয়্যাহ* (১৮৭০ খ্রি.) এর মতো গ্রন্থ রচনা করে প্রথম জীবন-চরিত লেখার সকল কলাকৌশল দেখিয়ে দিয়েছেন।[৫২] তবে তাঁর দেখানো পথে সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিকভাবে উৎকৃষ্টমানের জীবন-চরিত রচনা করেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী আলতাফ হোসাইন হালী। তিনি পাশ্চাত্য ভাবধারা ও শৈল্পিকতার আলোকে স্যার সৈয়দ, গালিব ও শেখ সাদী'র মতো খ্যাতিমান মনীষীদের নিয়ে *হায়াত-এ জাবীদ* (১৯০১ খ্রি.), *ইয়াদগার-এ গালিব* (১৮৯৭ খ্রি.) ও *হায়াত-এ সাদী* (১৮৮১ খ্রি.) নামক জীবন-চরিত রচনা করে উর্দু জীবনী সাহিত্যের ইতিহাসকে চিরজীবন দান করেছেন।[৫৩] হালী'র পর শিবলী নুমা'নী *আল-গাযযালী*, *আল-ফারুক্*, *আল-মামুন*, *সাওয়ানেহ মৌলানা রোম*, *হায়াত-এ সাদী*, *হায়াত-এ হাফেজ*, *বায়ান-এ খসরু*, *সীরাতুন নবী (সা.)*, *সীরাতুন নোমান* প্রভৃতি জীবন-চরিত রচনা করে উর্দু জীবনী সাহিত্যকে অমরত্ব দান করেছেন।[৫৪] সমসাময়িককালে এবং বিংশ শতাব্দীতে হালী ও শিবলীকে অনুসরণ করে অসংখ্য আধুনিক লেখক বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের উপর জীবন-চরিত রচনা করে উর্দু জীবনী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শৈল্পিকতার বিচারে খুব কম সংখ্যক লেখকই হালী ও শিবলীকে স্পর্শ করতে পেরেছেন। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, উর্দু জীবনী সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে তাঁদের প্রত্যেকেরই অবদান চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।[৫৫]

পত্র সাহিত্য

আধুনিক গদ্যসাহিত্যের যে সকল শাখা সর্বাধিক উন্নতি লাভ করেছে, তার মধ্যে পত্র সাহিত্য অন্যতম। এটি এমন একটি শিল্প, যার মাধ্যমে লেখক তাঁর নিজস্ব ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেন। তাই কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত পত্র কখনো কখনো সর্বজনগ্রাহ্য সাহিত্য পর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠে। আর সেই পত্রসমূহের সমষ্টিগত রূপই হচ্ছে পত্র সাহিত্য।[৫৬] সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, উর্দু সাহিত্যে পত্র লিখন শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। এই শতাব্দীতে আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) সর্বপ্রথম উর্দু ভাষায় পত্র লেখা আরম্ভ করেন। যদিও তাঁর পূর্বে ১৮২৫ সালের দিকে মৌলভী গোলাম ইমাম শহীদ, গোলাম গওছ বেখবর, কাতিল প্রমুখ উর্দু ভাষায় পত্র লেখার চর্চা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু সেগুলো ফারসি পত্র সাহিত্যের অনুকরণে ছন্দময়, উপমাসমৃদ্ধ ও কাঠিন্যতায় ভরপুর ছিল।[৫৭] গালিব প্রথম ব্যক্তি, যিনি ১৮৫০ সালের পর সহজ-সরল উর্দু ভাষায় পত্র লেখা শুরু করেন। এই সহজ-সরলতার কারণে তাঁর পত্রসমূহ আধুনিক সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। তাঁর পত্র সংকলন হলো *অওধ-এ হিন্দ* (১৮৬৮ খ্রি.), *উর্দু-এ মুয়াল্লা* (১৮৬৯ খ্রি.) ও *মাকাতীব-এ গালিব*।[৫৮] পত্রের মাধ্যমে মির্যা গালিব উর্দু সাহিত্যে যে সহজ-সরলতার সূচনা করেছিলেন, স্যার সৈয়দ আহমদ খান তার পূর্ণতা এনে দেন। স্যার সৈয়দ মির্যা গালিব দ্বারা শুধু প্রভাবিতই হননি, বরং উর্দু সাহিত্যে সহজ-সরলতা সৃষ্টির আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে একদল বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মনীষীদের সমন্বয়ে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে বন্ধুদের নিকট লিখিত তাঁর ব্যক্তিগত পত্রের ভূমিকা অপরিসীম। গালিবের পর তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পত্র লিখনের মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিত্বে সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারমূলক চিন্তাধারা ফুঁটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫৯] মির্যা গালিব ও স্যার সৈয়দের পর উর্দু পত্র সাহিত্যের মাধ্যমে যাঁরা তাঁদের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার পাশাপাশি পত্র লিখনীকে শিল্পে রূপান্তরিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শিবলী নুমা'নী, আলতাফ হোসাইন হালী, মুহাম্মদ হোসাইন আযাদ, ডেপুটী নযীর আহমেদ, আল্লামা ইকবাল, আবুল কালাম আযাদ, নয়ায ফতেহপুরী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬০] মোটকথা, গালিবের পত্র সাহিত্যের মাধ্যমেই মূলত উর্দু গদ্যসাহিত্য সহজ-সরলতার সন্ধান পাওয়ার পাশাপাশি আধুনিক সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। বর্তমানে উর্দু পত্র সাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ এবং লেখকদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত করার বাহন হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আধুনিক বিশ্বে যে ক'টি সাহিত্য সমৃদ্ধির শীর্ষস্থানে রয়েছে, উর্দু সাহিত্য সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। কেননা, পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত ভাষা ও সাহিত্যের ন্যায় উর্দু ভাষা ও সাহিত্য নানা টানাপোড়েন এবং প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে সার্বজনীন ও গ্রহণযোগ্যমানে উপনীত হওয়ার পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। বর্তমানে আধুনিক সাহিত্যের প্রতিটি শাখা উর্দু সাহিত্যে সগৌরবে বিদ্যমান। বিশেষকরে সিপাহী বিদ্রোহের পর আধুনিক উর্দু সাহিত্যের জনক স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য সকল প্রকার কাব্য চেতনা ও কাঠিণ্যতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে সহজ-সরল ও জীবনকেন্দ্রীক গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা রূপে আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরই হাতে সৃষ্ট এই সহজ-সরল উর্দু গদ্যসাহিত্য পরবর্তীতে বিভিন্ন নবীন ও দূরদর্শী কবি-সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় জীবন ও সমাজের পরিভাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

তথ্যনির্দেশ

[১]. কবীর চৌধুরী, *সাহিত্য কোষ* (ঢাকা: শিল্পতরু প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৯৯; বদিউর রহমান, *সাহিত্য স্বরূপ* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯), পৃ. ১২৭।

[২]. ড. মুহাম্মদ আহসান ফারুকী ও ড. সৈয়দ নূরুল হাসান হাশেমী, *নভেল কিয়া হেঁ* (লক্ষ্মৌ: নাসীম বুক ডিপো, ১৯৭৬), পৃ. ১৩৮; ড. সালাম সান্দেলভী, *আদব কা তানক্বীদী মুতালেআ* (লক্ষ্মৌ: নাসীম বুক ডিপো, ১৯৮৬), পৃ. ১৭৮-১৮০।

[৩]. ড. আবুল লাইছ ছিদ্দীকী, *আজ কা উর্দু আদব* (আলীগড়: এজুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৮৬), পৃ. ১৬২; ড. মুহাম্মদ আহসান ফারুকী, *উর্দু নভেল কী তানক্বীদী তারীখ* (লক্ষ্মৌ: এদারা-এ ফুরুগ-এ উর্দু, ১৯৬২), পৃ. ১২-১৪।

[৪]. ড. ফরমান ফতেহপুরী, *উর্দু নছর কা ফান্নী এরতেকা* (দেহলী: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯৪), পৃ. ১০৬; খলীলুর রহমান আজমী, *উর্দু মে তারাক্কী পসন্দ আদবী তাররীক* (আলীগড়: এজুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৭৯), পৃ.২০৭।

[৫]. ড. ফরমান ফতেহপুরী, *উর্দু নছর কা ফান্নী এরতেকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮; ড. মুহাম্মদ আহসান ফারুকী, *উর্দু নভেল কী তানক্বীদী তারীখ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১-৭০।

[৬]. ড. আবুল লাইছ ছিদ্দীকী, *আজ কা উর্দু আদব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১; আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত* (করাচী: বুকল্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৯০), পৃ. ২৯।

[৭]. মুজতবা হোসাইন, *আদব ওয়া আগাহী* (করাচী: মাকতাবা-এ আফকার, ১৯৬৪), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৬; ড. ফরমান ফতেহপুরী, *উর্দু নছর কা ফান্নী এরতেকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

[৮]. আলে আহমদ সরওয়ার, *তানক্বীদী ইশারেঁ* (লাহোর: উর্দু একাডেমী সিন্ধ, ১৯৬৩), পৃ. ১৭; রামবাবু সাকসীনা, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, গদ্যাংশ (লক্ষ্মৌ: মাতবা-এ মুনশি তেজ কুমার প্রা. লি. ১৯৮৬), পৃ. ১০১।

[৯]. ড. ফরমান ফতেহপুরী, *উর্দু নছর কা ফান্নী এরতেকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯; মুজতবা হোসাইন, *আদব ওয়া আগাহী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

[১০]. আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; ড. সালাম সান্দেলভী, *আদব কা তানক্বীদী মুতালেআ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫-১৯৬।

[১১]. শাহানশাহ মির্যা, *তানক্বীদী তাজযীয়ে* (লক্ষ্মৌ: নামী প্রেস, ১৯৮৪), পৃ. ১৫-১৬; ড. মুহাম্মদ আহসান ফারুকী, *উর্দু নভেল কী তানক্বীদী তারীখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০-২১১।

[১২]. ড. সেলিম আখতার, *উর্দু আদব কী মুখতছরতেরীন তারীখ* (লাহোর: সংগ-এ মাইল পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭), পৃ. ২৫৭।

[১৩]. ড. আতীয়া নাশ্‌শাত, *উর্দু ড্রামা রেওয়ায়েত আওর তাজরিবাহ* (লক্ষ্মৌ: নুসরাত পাবলিশার্স, ১৯৭৩), পৃ. ৩৬।

[১৪]. *তদেব*, পৃ. ৫৪-৫৮; আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

[১৫]. সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদী, *উর্দু মে ড্রামা নিগারী* (লাহোর: মুলক নযীর আহমদ তাজ বুক ডিপো, ১৯৬২), পৃ. ৯৩-৯৪; আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

[১৬]. আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

[১৭]. ড. সালাম সান্দেলভী, *আদব কা তানক্বীদী মুতালেআ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০-২৬১; সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদী, *উর্দু মে ড্রামা নিগারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১২৬।

[১৮]. ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা তারীখ আওর তানক্বীদ* (আলীগড়: মাকতুবা-এ আলফাজ, ১৯৮৭), পৃ. ২২১-২২২; সৈয়দ ইমতিয়ায আলী তাজ, *আনার কলি* (লক্ষ্মৌ: উর্দু একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ৪-৫।

[১৯]. ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা তারীখ আওর তানক্বীদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২০।

[২০]. গুপীচান্দ নারাংগ (সম্পাদিত), *উর্দু আফসানা রেওয়ায়েত আওর মাসায়েল* (দেহলী: এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউস, ১৯৮১), পৃ. ৯৬।

[২১]. ড. ছাদিক, *তারাক্কী পসন্দ তাহরীক আওর উর্দু আফসানা* (দেহলী: মাকতাবা-এ জামেআ উর্দু বাজার, ১৯৮১), পৃ. ১০১।

[২২]. আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩; ড. ছগীর আফরাহীম, *উর্দু আফসানা তারাক্কী পসন্দ তাহরীক সে ক্বাবল-১৯০১-১৯৩৬* (আলীগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯১), পৃ. ২৯।

[২৩]. ড. ছগীর আফরাহীম, *উর্দু আফসানা তারাক্কী পসন্দ তাহরীক সে ক্বাবল-১৯০১-১৯৩৬*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-১৮৮।

[২৪]. খলীলুর রহমান আজমী, *উর্দু মে তারাক্কী পসন্দ আদবী তাহরীক* (আলীগড়: এজুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৭৯), পৃ. ২৮-৩২; মুজতবা হোসাইন, *আদব ওয়া আগাহী* (করাচী: মাকতাবা-এ আফকার, ১৯৬৪), পৃ. ২৪২-২৪৫।

[২৫]. সেলীম আখতার, *তানক্বীদী দাবিস্তান* (নয়ী দেহলী: এ'জায পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২), পৃ. ২২-২৩; সৈয়দ এহতেশাম হোসাইন, *তানক্বীদী নজরীয়্যাত* (লাহোর: ইশরত পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৫), পৃ. ২০৫।

[২৬]. ড. সালাম সান্দেলভী, *আদব কা তানক্বীদী মুতালেআ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৪-৫২৬।

[২৭]. *তদেব*, পৃ. ৫৩৩।

[২৮]. *তদেব*, পৃ. ৫৩৫।

[২৯]. ড. মসীহুজ্জামান, *উর্দু তানক্বীদ কী তারীখ* (লক্ষ্ণৌ: উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ১২৪-১৪৯।

[৩০]. ইবাদত বিরলভী, *উর্দু তানক্বীদ কা এরতেকা* (আলীগড়: এজুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯৪), পৃ. ১৪৩।

[৩১]. ড. মসীহুজ্জামান, *উর্দু তানক্বীদ কী তারীখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০-১৯৫।

[৩২]. ড. সালাম সান্দেলভী, *আদব কা তানক্বীদী মুতালেআ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৮-৬০৩।

[৩৩]. *তদেব*, পৃ. ৬০৪-৬১৬।

[৩৪]. ইবাদত বিরলভী, *উর্দু তানক্বীদ কা এরতেকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩-৩৯০।

[৩৫]. *তদেব*, পৃ. ৪৩৭-৪৫৭।

[৩৬]. শ্রীশ চন্দ্র দাশ, *সাহিত্য সন্দর্শন* (ঢাকা: একুশ প্রকাশন, ২০০১), পৃ. ১৬৮।

[৩৭]. ড. সৈয়দ জহীর উদ্দীন মাদানী, *উর্দু এসেয* (দিল্লী: মাকতুবায়ে জামেআ, ১৯৮৭), পৃ. ২৩।

[৩৮]. *তদেব*, পৃ. ২৪-২৫।

[৩৯]. ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, *তীফ-এ নছর* (লাহোর: লাহোর একাডেমী, ১৯৬৭), পৃ. ১৭১-১৭২; ড. সৈয়দ শাহ আলী, *আদব আওর তানক্বীদ* (করাচী: মাকতুবা-এ উসলুব, ১৯৬১), পৃ. ৩৭-৩৯; ড. সৈয়দ জহীর উদ্দীন মাদানী, *উর্দু এসেয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮।

[৪০]. ড. সৈয়দ জহীর উদ্দীন মাদানী, *উর্দু এসেয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০।

[৪১]. *তদেব*, পৃ. ৩৭।

[৪২]. আব্দুস সালাম খুরশীদ, *সাহাফাত-এ পাকিস্তান ওয়া হিন্দ মে* (লাহোর: মাজলিসে তারাক্কী-এ আদব, ১৯৬৩), পৃ. ৩৫।

[৪৩]. আনোয়ার আলী দেহলভী, *উর্দু সাহাফাত* (দেহলী: উর্দু একাডেমী, ২০০০), পৃ. ২৪।

[৪৪]. *তদেব*, পৃ. ২৫।

[৪৫]. *তদেব*, পৃ. ৫০-৫৪।

[৪৬]. *তদেব*, পৃ. ৫৬-৫৭।

[৪৭]. শফী আহমদ ছিদ্দীকি, *উর্দু যবান ওয়া কাওয়ায়েদ*, ২য় খণ্ড (নয়ী দেহলী: মাকতুবা-এ জামেআ, ১৯৯৪), পৃ. ৬৪।

[৪৮]. ড. আব্দুল ওয়াসী, *বিহার মে উর্দু সাওয়ানেহ নিগারী কা আগায ওয়া এরতেকা* (পাটনা: লেবেল লেথু প্রেস, ১৯৭৯), পৃ. ৪।

[৪৯]. আনিসা আলতাফ ফাতেমা, *উর্দু মে ফান্নে সাওয়ানেহ নিগারী কা এরতেকা* (করাচী: উর্দু একাডেমী, ১৯৬১), পৃ. ৫১-৫৫।

---

[৫০]. ড. আব্দুল ওয়াসী, *বিহার মে উর্দু সাওয়ানেহ নিগারী কা আগায ওয়া এরতেকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯; আনিসা আলতাফ ফাতেমা, *উর্দু মে ফান্নে সাওয়ানেহ নিগারী কা এরতেকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭২।

[৫১]. ড. আব্দুল ওয়াসী, *বিহার মে উর্দু সাওয়ানেহ নিগারী কা আগায ওয়া এরতেকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩।

[৫২]. *তদেব*, পৃ. ১৩-১৪।

[৫৩]. আনিসা আলতাফ ফাতেমা, *উর্দু মে ফান্নে সাওয়ানেহ নিগারী কা এরতেকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

[৫৪]. ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, *তীফ-এ নছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-২৪০।

[৫৫]. আনিসা আলতাফ ফাতেমা, *উর্দু মে ফান্নে সাওয়ানেহ নিগারী কা এরতেকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২৯৯।

[৫৬]. বদিউর রহমান, *সাহিত্য স্বরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

[৫৭]. শামসুর রহমান, উর্দু খুতুত (লক্ষ্মৌঃ কিতাবী দুনিয়া, ১৯৪৭), পৃ. ২৩।

[৫৮]. ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, *তীফ-এ নছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২; শামসুর রহমান, উর্দু খুতুত, পৃ. ২৯-৩০ ।

[৫৯]. শামসুর রহমান, উর্দু খুতুত, পৃ. ৫৩।

[৬০]. *তদেব*, পৃ. ৫৩-২৪৭।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

ইকবাল সাহিত্যে সূফী মতবাদের প্রভাব : একটি পর্যালোচনা

ড. মো. আতাউর রহমান*

Abstract: Allama Iqbal's Thought is essentially religious, having deep linkage with "SUFism", with very high spiritual values, but with a difference from the age old and traditional approach toward lif : his departure was from "Pantheism" To "Individualism" and from belief in universal life To Individual life. In the early stage of his Thinking at home and abroad till his return from Europe in 1908, he did not altogether discard "Pantheism" which is amply evident from the stray Thcughts in the urdu poems of his early life at home published in "Bang-i-Dara" and monumental research work abroad on "Development of metaphysics in Persia" However a tendency to 'Individualism' was not totally absent. His creative mind was rather slowly working Towards and fromulating ideas in that respect as a normal creative procedure. A revolutionary change in mind actually come after his return from Europe-To put it in his own words: "Europe has made me a real muslim" Reaction To western influence in his case was rather in the reverse direction, which was quite exceptional and unusual. The well known trinity of 'Metaphysics' and of course that of "suefism" as well, in its highest from, God, Man and the universe, Allama Iqbal is mostly concemed with man, as a central and local point of his philosophy.

ভূমিকা:

আল্লামা ইকবাল মহাকবি, আধ্যাত্মবাদী দার্শনিক, উদারপন্থী সংস্কারক– তাঁর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। বিশ্বজনীন আবেদনকুশল এ কবি ১৮৭৭ সালের ৯ নভেম্বর পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে এক সমভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ইতিহাসের চরম অশান্ত সন্ধিক্ষণে। আল্লামা ইকবাল প্রতিভার মূল্যায়নে এযাবত যে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে বিশ্বের অন্য কোন মনীষী সম্পর্কে তেমনটি হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

আল্লামা ইকবাল উপমহাদেশের এক কৃতী সন্তান। বিভাগ পূর্ব ভারতে তাঁর আবির্ভাব ও তিরোধান। বিশ শতকের ইসলামী নবজাগরণের তিনি সিপাহ্সালার এবং কাব্য ও দর্শনের জগতে ছিলেন পূর্বসূরিদের চিন্তাধারার সার্থক রূপকার। ইসলামের শাশ্বত আদর্শ জাতির কাছে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি সুনিপূণ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন, তা ছিল যুগের দাবি ও অতীতের প্রেরণা সঞ্জাত। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন:

سامنے رکھتا ہوں اس دور نشات افزا کو میں
دیکھتا ہوں دوش کی آئنے میں فردا کو میں-[১]

অর্থ:

বিশ্বজোড়া খ্যাতি ভরা অতীত আমার সামনে রাখি,

গতকালের আর্সিতে মোর নতুন দিনের স্বপ্নদেখি।

---

* প্রফেসর, উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশিষ্ট দার্শনিক আল-ফারী বলেছেন– ‘ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর জাতির জ্ঞান মূর্মতায় রূপান্তরিত হয়।’[২]

প্রাচ্যের অসাধারণ প্রতিভাবান দার্শনিক মহাকবি আল্লামা ইকবাল প্রচলিত অর্থে কোন সূফী সাধক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর জীবন ও সাহিত্যে সূফীমতবাদের প্রভাব ছিল গভীর ও অপরিসীম। এভাব আসে প্রধানতঃ দু'ভাবে। প্রথমতঃ তাঁর নিজস্ব পারিবারিক পরিবেশ থেকে, দ্বিতীয়তঃ ইসলামী দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে। আল্লামা ইকবালের পূর্ব-পুরুষগণ কাশমীর থেকে হিযরত করে সিয়ালকোটে বসতি স্থাপন করেন। তারা ছিলেন কাশমীর ব্রাহ্মণদের অতি সম্মানিত সুপরো গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত। এ ব্রাহ্মনগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই সুউচ্চ হিমালয়ের পাদদেশে ‘জপতপে’–‘ভগবানের’ ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশসমূহে মুসলমানদের আগমনের পরেও কাশমীর উপত্যকা শত শত বছর যাবৎ ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। অবশ্য, চৌদ্দশ, শতাব্দীর গোড়ার দিকে সূফীয়ায়ে কেরামদের প্রচারাভিযান সফল হয় এবং হযরত সৈয়দ আব্দুর রহমান বুলবুল শাহ-এর হস্তে কাশমীরের বৌদ্ধ রাজা শিনচন (Rinchan) ৭২০ হিজরী মোতাবেক ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। পরে তাঁর প্রভাবে হাজার হাজার– নর-নারী ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়।[৩]

আল্লামা ইকবালের আদি পিতা ছিলেন সুপরো গোত্রভুক্ত। ইতিহাস থেকে জানা যায়, তাঁর নাম ছিল বাবা লোল হাজ বা লোল হাজী। স্বয়ং ইকবালই এ তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বাবা লোল হাজের নামটি পূর্বে তাঁর পিতার কাছেই শুনেছিলেন। অবশ্য বিস্তারিত তথ্য তখনো জানা ছিল না। পরে বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যান। তিনি তাঁর ফার্সী গ্রন্থ ‘পারামে ‘পাশরিক’-এ বলেন–

تنم گلے ز خیابان جنت کشمیر دلاز حریم حجاز و نواز شیر از است۔[৪]

অর্থ:

আমার দেহ কাশমীর উদ্যানের পদচারণ ভূমি থেকে

মন হেজাযের পবিত্র স্থান থেকে, আর গান পারস্যের শিরায থেকে।

অন্য ফার্সী গ্রন্থঃ ‘যুবরে আজম’-এ বলেন:

مرا بنگر در ہندوستان دیگر نمے بینی

برہمن زادہ، رمز اشنائے روم تبریز است۔[৫]

অর্থ:

আমায় দেখ, কেননা, হিন্দুস্তানে আর কাউকে দেখবেন না

ব্রাহ্মণ সন্তান, রহস্যজ্ঞাত রোম ও তবরিয-এর

উর্দু গ্রন্থ : ‘যরবে কালীম’-এ পাশ্চাত্য দর্শনে প্রভাবান্বিত জনৈক সৈয়দজাদাকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন:

میں اصل کا خاص سومناتی ابا مرے لاتی و مناتی

تو سید ھاشمی کی اولاد میری کف خاک برہمن زاد۔

ہے فلسفہ میرے اب و گل میں پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دل میں۔[৬]

অর্থ:

আমি আসলে খাস সোমনাতি

আমার বাপ-দাদা লাতি ও

মা-নাতি

তুমি হামোমী সৈয়দের আওলাদ আমার মাটির দেহ

ব্রাহ্মণপ্রসূত

দর্শন মজ্জাগত মোর কাদামাটিতে গুপ্ত ধরেছে রন্দ্রে রন্দ্রে।

আল্লামা ইকবালের বংশে তাসাউফের গতিধারা ছিল। প্রথম মহাপুরুষ বাবা লোজ হাজ থেকে শুরু করে ইকবালের পিতা শেখ নূর মুহাম্মদ পর্যন্ত তাসাউফের প্রতি বিশেষ বিশেষ ঝোঁক ও তার অভিরুচিকে অটুট পারিবারিক প্রথা ও রীতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ যেন ইকবাল বংশের এক আলাদা বৈশিষ্ট্য এবং উচ্চতর জীবনের মূল্য বহন করে।[৭]

আল্লামা ইকবালের বাবা শেখ নূর মুহাম্মদ ছিলেন একজন সূফী ব্যক্তিত্ব। তাসাউফের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। নামাজ ও মোরাকাবার মধ্যে তাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাতি হত। আল্লামা ইকবাল তাঁর পিতার আধ্যাত্মিক মানসিকতার বর্ণনা দিয়েছেন কবি বন্ধু আকবর এলাহাবাদীর কাছে লেখা এক চিঠিতে–

> Daybefore gesterday, he was having his evening meals, and the talk turned to a relative who had died recently. During the conversation he remarked : No body knows since when man has been seperated from his cretor; This idea affected him so deeply that he almost fainted and till 11'0 clock at night he remained in a semi conscious condition. Such silent communications one can get only from the sages of the east. One can not get them in Europe.[8]

আল্লামা ইকবালের মাতাও ছিলেন স্বামীর মতই ধার্মিক। তিনি চেয়েছিলেন পুত্র ইকবাল ও ইমানদার মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠুক। জননীর জীবন ছিল আল্লামা ইকবালের আজীবন প্রেরণার উৎস। তাঁর মুত্যুর পর তিনি লিখেছেন–

تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا

دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات۔[৯]

অর্থ:

নক্ষত্রের কিসমতকে পেয়েছি আমি

এতো তোমারই শিক্ষার ফল

অস্তিত্বের ইতিহাসে সোনালী অক্ষরে লেখা

তোমার জীবন।

আল্লামা ইকবাল মূলত কবি এবং দার্শনিক। দর্শনের আন্তঃসলিলা অনুভব চেতনা তাঁর কাব্যের শরীরে একাকার, তিনি চোস্ত গদ্য লেখক, বহুভাষা এবং জীবন পর্যটনকারী। ব্যক্তিগত জীবনে আইন বিশারদ এবং উঁচুমাপের রাজনীতিবিদ। একজন ব্যক্তির মধ্যে এত বিপুল এবং প্রসারমান গুনপনা প্রায়শই বিরল।

বাল্যকালে আধ্যাত্মিকচেতনা সম্পন্ন পারিবারিক আবহে তার মানসভূমি প্রস্তুত হয়, নৈষ্ঠিক জীবনের প্রতি তিনি প্রথমাবধি শ্রদ্ধান্বিত। প্রথম যৌবনে ইউরোপ প্রবাসকালে ভোগচঞ্চল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অতি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক এবং শেষাবধি বিশ্বের সামনে এক সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শের উপস্থাপন প্রক্রিয়া হিসেবে ইসলামী জীবনাদর্শের জগতে প্রত্যাবর্তন ও স্থিতি। অতঃপর এই পূণ্য জীবন প্রবাহিত হল শিল্পের লক্ষ লোকহিত হওয়া উচিত– এমন ধারা বিশ্বাসের কী-করণ আকাঙ্ক্ষার সংক্রমণ শক্তির উপর কালজয়ী সাহিত্যের লক্ষণ–নির্ভরশীল। আকাঙ্ক্ষার দ্বীপাগ্নিতে শিল্পী যদি নিঃশেষ না হতে পারেন তাহলে তার সৃষ্টি কেমন করে মানবিক পৃথিবীকে কল্যাণ দাহনের উৎসবে আমন্ত্রণ জানাবে;[১০] যেমন তিনি বলেন:

ہے ہی میری نماز، ہے ہی میرا وضو

میری نوؤں میں ہے میرے جگر کا لہو!

محبت اہل صفا، نور و حضور و سرور

سرخوش و پر سوز ہے لالہ لب آبجو!۔ [১১]

অর্থ:

এই মোরজু, এই মোর নামায

মোর সঙ্গীতের সূরে আছে মোর হৃদয়-শোনিত

পূন্যাত্মা সূফীর সঙ্গ, সে যে স্বর্গসুখ,

দিব্যজ্যোতিঃ, সাযুজ্যপরম।

নির্ঝরের পাশে ফুল্ললালা যথা জর্ফূতপ্রাণ

আনন্দ-বিহ্বল।

আল্লামা ইকবালের পিতা শেখ নূর মুহাম্মদ একজন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও খোদাভীরু লোক ছিলেন। তাঁর ব্যবহারিক জীবনে ইসলামী তাসাউফের প্রতিফলন ঘটেছিল অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবাল তাঁর শৈশবকালের একটি অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। “একদা গভীর রাত্রে তাঁর মাতা

বিছানা থেকে উঠে পাশের ঘরের দিকে গেলেন। ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় তিনি ও তাঁকে অনুসরণ করলেন। দেখতে পান তাঁর পিতা নামাযরত ও তাঁর চতুর্দিকে একটি স্বর্গীয় জ্যোতি তাঁকে ঘিরে আলোকিত করে রেখেছে। বলা বাহুল্য, ইসলামী তাসাউফের ইতিহাসে এহেন ঘটনার অবতারণা ঘটেছে বহুবার। ওলী-আল্লাহদের বেলায় এটা স্বাভাবিক ও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।[১২]

শেখ নূর মুহাম্মদ ধনী লোক ছিলেন না, তথাপি নিজ এলাকায় তাঁকে অতি সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হত। তাঁর উপর তাসাউফের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি দৈনন্দিন সাংসারিক দায়িত্বসমূহ হতে উদাসীন ছিলেন না। সারাজীবন নিজ হাতে উপার্জন করেছেন। টুপীর ছোট খাট ব্যবসা ছিল তাঁর। অন্তরে খোদা প্রেম ও হাত কর্মব্যস্ত, এই নীতিতে তিনি অবিচল ছিলেন।

খোদা প্রেমে বিভোর একজন কাদেরীয়াপন্থী পীর সাহেবের তাঁর ওখানে আসা-যাওয়া ছিল। তিনি তাঁর মুরীদ ছিলেন। আল্লামা ইকবাল তাঁর পিতার হস্তে বায়'আত নিয়েছিলেন। এই কথার উল্লেখ করে তিনি উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভীর নামে ১২ই নভেম্বর ১৯১৬ সালে এক পত্র লিখেছেন:

"সেলসেলায় কাদেরীয়ার অবস্থাও তাই, যাতে আমি নিজে বায়'আত নিয়েছি।"[১৩]

আল্লামা ইকবাল ছিলেন একজন মুসলিম দার্শনিক, ধর্মপরায়ন তত্ত্ববিদ ও সাহিত্যিক, আল্লাহতে সমর্পিতচিত্ত চিন্তানায়ক, মানবপ্রেমিক ও স্বাধীনচেতা কবি। তিনি মানবকুল শিরোমনি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর প্রতি অগাধ প্রেম পোষণ করতেন। ইসলামের সত্যতাকে তিনি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করতেন এবং সেহেতু নিজ দর্শনের ভিত্তি তিনি ইসলামের অটল ভিত্তির ওপরই স্থাপন করেছেন। বিশ্বমানবকে তিনি আহ্বান করেছেন আত্মশুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে উন্নততর মনুষ্যত্ব অর্জন করতে, যাতে বিশ্বময় শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লামা ইকবাল শুধু যে মুসলিম সুফী সাধকদের গভীর জ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্বাদি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন তা নয়, তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারা ও দর্শন সম্পর্কেও গভীর জ্ঞান রাখতেন। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বাক্যগ্রন্থ 'পয়াম-ই-মাশরিক'-এ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সাথে সাথে নিজের তত্ত্বজ্ঞানমূলক মতাদর্শাবলীও তুলে ধরেছেন।[১৪]

ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "আমি যখন মনে করি যে, আমি আছি তখনই আমি অস্তিত্বশীল।"

আল্লামা ইকবাল দার্শনিক সিদ্ধান্তকে নিজের মতো করে এক আকর্ষণীয় কবিতায় এভাবে প্রকাশ করেছেন–

راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق
ساتھ مرے رہ گئی، ایک مری آرزو!۔
میرا نشیمن نہیں درگہ میر و وزیر!
میرا نشیمن بھی تو، شاخِ نشیمن بھی تو!۔

[১৫]

অর্থ:

প্রেম-সমরণিতে কারো সঙ্গী কেহ নয়;

রয়েছে আমার সাথে শুধু মোর বাসনা উদ্দাম।

নৃপ ফিংবা সামন্তের সিংহাসনে স্থান মোর নহে

তুমি মোর নীড়, মোর নীড়ের আশ্রয়-শাখা তুমি।

প্রকৃত পক্ষে প্রেমই একমাত্র বস্তু যা মানব মানসে আলোড়ন সৃষ্টি করে, কর্তব্য পালনে তাকে সক্রিয় করে তোলে, জীবনের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার জন্যে চেষ্টা ও সাধনার প্রেরণা জোগায় এবং মানুষের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের পথ সুগম করে দেয়। এক কথায়, প্রেমই ইকবাল দর্শনের প্রচ্ছন্ন রূপকার। ইকবালের কাব্যের মাধ্যমে জানা যায়– তিনি দর্শন শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রেমকে আয়ত্ত করেছেন। তার সমস্ত চিন্তাধারা ও কাব্যে প্রেমের ও হৃদয়াবেগের সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষণীয়।

‘পয়াম-ই-মাশরিক’ গ্রন্থে ‘ইশক’ শীর্ষক কবিতায় বলেছেন–

عقلی کہ جہاں سوز و یک جلوہ بیا کش

از عشق بیا سوز و آمین جہاتابی

عشق است کہ در جانت ہر کیفیت یگزو

از تاب و بت رومی تا حیرت فارابی

این حرف نشاط آور می گویم و میر قصم

از عشق دل آسایو با اینم بیتابی

ہر معنی پیچیدہ در صرف نمی گنجد

یک سخظہ بدل در شو شاید کہ تو دریابی-১৬

অর্থ:

যে বদ্ধির একটি নির্ভীক বালক জালিয়ে দেয়া পৃথিবী

প্রেমের কাছেই শিক্ষা নেয় সে বিশ্বজয়ের নিয়ম-বিধি।

প্রেমই তোমার প্রাণে যে কোন ভাবের উন্মেষ ঘটায়

রূমীর উন্মত্ততা হতে ফারাবীর বিস্ময়।

সবকিছুই প্রাণ-সনিজবনী একথাটি বলছি, তাতে আমি আনন্দে উদ্বেলিত

এসব দুঃখ চিন্তা সত্ত্বেও প্রেমের মাঝেই অন্তর শান্তির সন্ধান পায়

সকল জটিল অর্থ ঠাই পায় না ভাষার বকে

ক্ষণিকের জন্যে তান্তরের সাথে একাত্মা হও হয়ত তুমি বুঝবে।

যাবীদনামায় তিনি বলেছেন:

این حرف نشاط آور می گویم میر قھم

از عشق دل آساید بااینمہ بیتابی

ہر معنی پیچیدہ در صرف نمی کنجد

یک لحظ بدل در شوشید کہ تو دریابی۔ [১৭]

অর্থ:

প্রেমের দৃষ্টিতে দেখ, তবে তার (সত্যের) সন্ধান পাবে;

কেননা, জ্ঞানের দৃষ্টিতে দুনিয়াটাকে বৈচিত্র্যময় দেখায়।

প্রেমের কাছে কর্মের দীক্ষা গ্রহণ কর, তারপর যা-ইচ্ছা-তা-ই কর;

কারণ প্রেমই নিহিত বিবেক-বুদ্ধির মূল উপাদান এবং সভ্যতার প্রাণ।

উপরোক্ত কবিতায় আল্লামা ইকবাল ইশ্‌ক বা 'প্রেম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তার আসল তাৎপর্য কি এবং অনুভূতির কোন স্তর-পরমপরা এতে নিহিত। উর্দু শব্দটি হলো 'ইশ্‌ক'; ইকবালের লেখায় অনবরত এ শব্দটির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে এবং নিশ্চয় তাঁর বিশ্বদৃষ্টি অধ্যয়নের চাবিকাঠি এতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তবুও যেহেতু তিনি এ কথাটি এত বেশী করে ব্যবহার করেন, অতএব আমাদের বোঝা উচিত যে, তাঁর আরোপিত এ সামগ্রিক অর্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।[১৮]

এসব থেকে বোঝা যায় যে, আল্লামা ইকবাল ইশ্‌ককে বোঝাতে চেয়েছেন শক্তিধর দুঃসাহসী ক্ষমতা, আল্লাহর নির্দেশের এবং জীবনের স্বাস্থ্য-স্পন্দনের প্রতীকরূপে। সৃষ্টি সর্ব অভিব্যক্তির কার্যকরী জীবনীশক্তি আসে এই ইশ্‌ক্ থেকে। আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিতে এই ইশ্‌ক্ই হলো অনাবিল মানব ব্যক্তিত্বের নিহিত শক্তিমত্তা। অন্য কথায়, যে পর্যন্ত কোন ব্যক্তি আত্মস্বার্থ চিন্তা এবং আত্মচেতনামূলক আশঙ্কাবলী নিয়ে পঙ্গু থাকবে, যে পর্যন্ত সে কোন সৎকার্য সাধন করতে পারবে না। সৃষ্টিধর্মী মানুষ হলো আত্মচেতনামুক্ত মানুষ। সে নিজ পারিবারিক বাইরেকার সত্যকে গ্রহণে সক্ষম এবং সেই বহিরাগত সত্যের চ্যালেঞ্জ বীরদর্পের সাড়া দেয়। মানবীয় ভাষায় ইশ্‌ক্ হলো পঙ্গুত্বসৃষ্টিকারী শঙ্কা ও অস্থির আত্মচেতনার বিপরীত।

রূমীর মসনবীর ছন্দে লেখা ইকবালের দার্শনিক কাব্য 'আসরারে ক্ষুদী' বা আত্মরহস্যে ইকবাল নানাভাবে ব্যক্তিত্বের জয় ঘোষণা করেছেন ও মানুষ তার ব্যক্তিত্বের সফুরণ করে সত্যি আল্লাহতা'য়ালার প্রতিনিধিত্ব কিভাবে করতে পারে, তারো প্রচুর নির্দেশ দিয়েছেন। সূফী দার্শনিকদের আল্লাহর সত্তায় ব্যক্তির সত্তা হারিয়ে ফেলা ফানাফিল্লাহ ও বৌদ্ধ নির্বাণ এই উভয় জীবন-আদর্শকেই আল্লামা ইকবাল তাঁর আত্মরহস্যে ভ্রান্ত বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। ব্যক্তিত্ব বিনাশের ধারণাকে সেখানে তিনি আত্মবিকাশের পথে অনেকটা নেশাগ্রস্তের মত খুইয়ে যাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন।[১৯]

আল্লামা ইকবাল তাঁর আত্মরহস্যে ব্যক্তিত্বহানির দর্শনকে এই উপমহাদেশের তৎকালীন পরাধীনতার একটা সাফাই গাওয়া বলতেও দ্বিধাবোধ করেননি। যে প্লেটোকে সাধারণত পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তার উৎস ও আকর বলে বিবেচিত করা হয়, তাঁর দর্শনের নিষ্ক্রিয় প্রেমতত্ত্বকে আল্লামা ইকবাল ভেড়ার দর্শন আখ্যা দিয়ে তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। অনেকেই তাই মনে করেন, ইকবাল দর্শনের আদিপর্বে সূফী প্রেমতত্ত্বের যে আকৃতি, তাঁর দর্শনের শেষ পর্বে ইকবাল তার বিরোধিতাই করেছেন। ইকবাল দর্শনের এই আদিরূপের বর্ণনা তাঁর তত্ত্ববহুল ও প্রেরণাদায়ক Metaphysics of Persia-তে পাওয়া যায়। ইকবালের দার্শনিক চিন্তার এই দুই পর্বের ভিতর একটা ফাটল আছে মনে করা আমাদের বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত নয়। ইকবালের দার্শনিক চিন্তার সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'Reconstruction of Religious Thought in Islam' নামক ইংরেজি বক্তৃতামালায়।[২০] এ বক্তৃতাগুলোর মাধ্যমে ইকবাল আধুনিক যুগের মনোবৃত্ত ও চাহিদার আলোকে ইসলামের মূল নীতির ব্যাখ্যা করেছেন। এ বক্তৃতাগুলোর প্রধান আলোচ্য বিষয় Religious experience বা ধর্মীয় অনুভূতি। ধর্মীয় অনুভূতি যে এক সামগ্রিক অনুভূতি, এক অখণ্ড সত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ, আল্লামা ইকবাল খুব জোরের সঙ্গে এ কথা তাঁর এই বক্তৃতাগুলোতে বলেছেন। আঠার শতকের শেষার্ধের প্রসিদ্ধ দার্শনিক Emanuel cant ঈশ্বরের প্রচরিত প্রমাণগুলোর যে কঠোর সমালোচনা করেছেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লামা ইকবাল শুধু তার মূল্যায়নই করেননি, তার সদুত্তরের ও সাক্ষাৎকার হয়। তবে উগ্র ব্যক্তিত্ববাদকে তাঁর দর্শনের শেষ কথা বলা চলে না। ইকবালের প্লেটো-বিরোধিতা ও আপেক্ষিক, নিরপেক্ষ নয়। উগ্র ব্যক্তিত্ববাদের প্রেরণা যুগিয়ে ইকবাল বলেছেন, 'মানবের ব্যক্তিত্বের স্ফূরণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ইশ্‌ক বা প্রেম'। তবে এ প্রেম নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয় এবং প্রেম মানুষকে নিম্ন করে না, নানা দ্বন্দ্বের সমাধানের মাধ্যমে তাকে তার ব্যক্তিত্বের স্ফূরণের পথে এগিয়ে দেয়। আগেই বলা হয়েছে যে, এ সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ই ইসলামের গোড়ার কথা তাঁর জীবন দর্শনের মধ্যমণি।[২১] যেমন, সুফীবাদ সম্পর্কে ইকবাল বলেন–

حرم کے درد کا درماں نہیں تو کچھ بھی نہیں
یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور
تی خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں
یہ عقل جو مہ و پرویں کا کھیلتی ہے شکار
شریک شورش پنہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں
خرد نے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلماں نہیں تو کچھ بھی نہیں

عجب نہیں کہ پریشاں ہے گفتگو میری
فروغ صبح پریشاں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔[২২]

অর্থ:

ফেরেস্তা-ভুবনের মরমী তত্ত্ব আর দিব্যজ্ঞান

যদি না পারে করতে চিকিৎসা ইসলামের দরদের, তবে কি লাভ!

রাত দুপুরের যিকির, মুরাকাবা, মনের এই আনন্দ

যদি না পারে করতে হেফাযত তোমার খুদীর, তবে কি লাভ!

এ বুদ্ধি, যা করে শিকার চাঁদ-সেতারা,

না পারে যদি তা মেটাতে স্বাদ গোপন ইশকের, তবে কি লাভ!

বলে দিল বুদ্ধি-বলে কেউ ‘লা-ইলাহা’

আর না হলো তার মন-প্রাণ মুসলমান, তবে কি লাভ!

থাকতে পারে অগোছালতা আমার কথায়;

ভোরের আলোতে যদি না থাকে বিকিরণ, তবে কি লাভ!

সুফীবাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সূফীবাদের এক অগ্রণী মৌলানা রুমীর এক বড় শিষ্য বলে ইকবাল দাবী করেন। রুমীর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েই তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ববাদী দার্শনিক কাব্য আত্মরহস্য রচনা করেছেন। সুতরাং রুমীর দর্শনের যা মূল কথা অর্থাৎ প্রেম, তাকে বাদ দিয়ে ইকবাল শুধু কর্মমুখর জয়গান করেছেন– এ কথা বলা খুব ভূল হবে।

আর আল্লামা ইকবাল নিজেও একজন সূফী। বুদ্ধি ও বুদ্ধির অতীত তত্ত্ব অনুভূতির ভেতরে এক যোগসূত্র বের করাই ইকবালের লক্ষ্য। এখানেই ইকবালের ইমাম গাজ্জলী থেকে পার্থক্য। ইমাম গায্যালী হচ্ছেন শরীয়ত ও মারেফাতের যোগসূত্রের আবিষ্কর্তা, আর আজকের দিনের বুদ্ধিবাদের সমর্থক হয়েও ইকবাল বুদ্ধি ও বুদ্ধি অতীত প্রজ্ঞার মিলনমন্ত্রের এক বড় প্রচারক। যা-ই-হোক, সর্বব্যাপী বিশ্বসত্ত্বার প্রতি যদি ধর্মীয় অনুভূতির শেষ লক্ষ্য হয়, তা হলে উগ্র ব্যক্তিত্ববাদ ইকবাল দর্শনের শেষ কথা হতে পারে না।[২৩]

আল্লামা ইকবাল বিশ্বাস করতেন যে, ভ্রান্ত সূফীবাদের প্রভাবে পড়ে মুসলিম জাতিসমূহ আলস্যের কোলে ঢলে পড়ে। এতে করে তারা পার্থিব জীবন থেকে পলায়নের পথ খোঁজে এবং কর্তব্য ও কর্ম ত্যাগ করে বসে। তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন এই দুর্বলতা ও অলসতার বিরুদ্ধে জাতিকে জেগে তুলতে এবং পুস্তকাদি রচনা করলেন গতির্ধমিতা ও আশার বাণী প্রচার করতেন।

এ উদ্দেশ্যে তিনি অহং বা খুদীর বাণী প্রচার করলেন। তিনি বলেন যে, “জীবনের মূল ভিত্তি হলো ব্যক্তিসত্ত্বা। দার্শনিকেরা যে পরিপূর্ণ সামগ্রিক জীবনের– মতবাদ প্রচার করে থাকেন, তা তিনি অস্বীকার করলেন। তাঁর মতে, আল্লাহ স্বয়ং হলেন একজন (পরম) ব্যক্তিসত্তা। বিশ্বপ্রকৃতি হলো ব্যক্তিসমূহের মধ্যে একটি সম্পর্ক বিশেষ– ম্যাকট্যা গার্টের এ মত ইকবাল সমর্থন করে সাথে সাথে বললেন যে, ম্যাকট্যার্গাটের মতে যে এ সম্পর্ক ব্যক্তি সংঘটিত নয়, বরং একটি স্বভাবজ দ্বন্দ্ব এবং অবিরাম বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মপ্রচেষ্টার ফল তা সত্য নয়। আমরা, মনুষ্য সন্তানেরা, নিজেদের পথ ধরে চলেছি। ইকবাল এ প্রসঙ্গে এ কুরআনীয় উক্তিটি অনেকবার উদ্ধৃত করেছেন: অর্থ (১৩): আল্লাহর মহিমা (গীতহোক) শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিকর্তা তিনি।[২৪]

সূফী বিশ্বাস অনুযায়ী বিশ্বজগত হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ ও একত্বায়িত। ইকবাল দর্শন তা অস্বীকার করে। সূফীদের মতে, মানুষের শেষতম আদর্শ হলো অনন্ত পরম জীবনে আত্মনিমজ্জন। ইকবাল দর্শনে পরিপূর্ণ মানব বা

ইনসান-ই-কামিল হলেন ব্যক্তিত্ব ও আপনত্ববান এবং আল্লাহর নিকট সান্নিধ্যে আসীন। তিনি বিশ্বজগতে হারিয়ে যেতে পারেন না, বরঞ্চ বিশ্বজগত তাঁর আত্মস্থ। জীবন হলো একটি নিরবচ্ছিন্ন গতি, আর মূল অভিব্যক্তি হলো আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের সৃষ্টিতে। জীবন পথের সবচেয়ে বৃহৎ প্রতিবন্ধক হচ্ছে বস্তু ও নিসর্গ প্রকৃতি; কিন্তু এগুলো পাপাত্মক নয়; কেননা, এরা জীবনের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলীর বিকাশে সহায়ক। সব প্রতিবন্ধক যখন পথ থেকে সরিয়ে ফেলা যায় তখন আত্মা মুক্তিলাভ করে, এবং এই আত্মা (খুদী) যখন পরম আত্মন রূপ আল্লাহর সান্নিধ্যে আসে, তখন সে হয় অধিকতর মুক্ত, আরও স্বাধীন। জীবন এই মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের বিরামহীন প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।[২৫]

ইকবালের এই খুদী বা ব্যক্তিত্ব থেকে থিলিনা, ধর্ম ও রীতির একটি মূল্যমান পাওয়া যায়। এ থেকেই সম্ভব হয় ভালোমন্দের বিচার। যা কিছু ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী করে তা ভালো, আর যা কিছু ব্যক্তিত্বকে দুর্বল করে তা মন্দ। তাঁর মতে, খুদীর শক্তি নিহিত রয়েছে প্রেমে– যা অর্থ হলো উদ্যম ও সৃজনেচ্ছা। প্রেমের শ্রেষ্ঠতম মান অভিব্যক্ত হয় মূল্য ও মতবাদ সৃষ্টি এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টায়। প্রেম খুদীকে শক্তি দেয়, আর ভিক্ষাবৃত্তি তার শক্তি হরণ করে। ভিক্ষাবৃত্তি হলো আলস্য, দুর্বলতা ও অকর্মের জন্য নাম।[২৬]

গতানুগতিক জীবন-ধারা ও ভাবনা-চিন্তা তাঁর তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তাঁর সমালোচনার উদ্দেশ্য ছিল মানব্যমত্তের সংস্কার সাধন এবং একটি সাধারণ মানবীয় বাণীর প্রচার। সে বাণী হলো জাগরণের, সজাগতার এবং কর্মের। মানবাত্মাকে তা চেয়েছে উন্নত ও শক্তিমান করে গড়ে তুলতে, চেয়েছে মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাতে এবং সৌন্দর্যবোধও পূর্ণতার মাধ্যমে উন্নততম সম্ভব স্তরে পৌঁছবার প্রেরণা জোগাতে।[২৭]

জীবনদর্শনের আলোকে আল্লামা ইকবাল সূফীতত্ত্ব সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করতেন তা বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয়। সূফীতত্ত্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে দু'টো পরস্পরবিরোধী মতবাদ রয়েছে। অধ্যাপক নিকলসনের মতে সূফী ভাবধারা ইসলামের মৌলশাস্ত্রীয় নীতির পরিপন্থী। তাঁর মতে আল্লাহর সদৃশ আর কিছুই নেই এবং পরম স্রষ্টা আল্লাহ যে তাঁর সব সৃষ্টজীবের একথা কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। সুফীরা যে ঐশী জ্ঞানের কথা বলেন তা কুরআনে যিবৃত আল্লাহ সম্পর্কিত মৌল ধারণাবলীর পরিপন্থী। অপর দিকে অনেক মনীষীগণ সূফী মতবাদের উৎপত্তি খুঁজে পেয়েছেন খোদ ইসলাম ধর্মে।[২৮] তাঁর মতে যেসব ধ্যান-ধারণা নিয়ে ইসলামের ইতিহাসে সূফীমতবাদের আবির্ভাব সেগুলোর মর্ম ও নির্যাস কুরআন ও হাদীসেই নিহিত। কুরআনের সুনিষ্ঠ আবৃত্তি ও অনুশীলন এবং এ নিয়ে গভীর ধ্যান-অনুধ্যান থেকেই হয়েছে ইসলামী মরমীবাদ এবং উদ্ভব ও বিকাশ।

উভয়পক্ষের যুক্তির সার কুরআনের নানাবিধ আয়াতের মধ্যে রয়েছে। তবে, পরবর্তীকালে ইমাম গাজ্জালীর মতো ইসলামী শাস্ত্র ও তত্ত্ববিদের দ্বারা সূফী মতবাদের মর্মবাণী সম্পূর্ণভাবে ইসলামী ভাবধারাজ্জাত বলে স্বীকৃত হওয়ায় সূফীতত্ত্ব ইসলামেরই এক অংগ বলে স্বীকৃত হয়েছে। সূফীতত্ত্বের যে নির্যাস পাওয়া যায় সত্তার একত্ব (অহদাতুল অজুদ) মন্ত্রে। সূফীদের মতে এ নির্যাস কোন ইসলাম বিরোধী ভাব নয়; বরং তা উদ্ভূত আল্লাহর আলহক্ক (সত্য, সত্তা) নামক নাম থেকে।

আল্লাহই একমাত্র পরম সত্তা এবং তাঁর সমকক্ষ আর যে কোন সত্তা নেই, একথা প্রত্যেক মুসলমানকে মেনে নিতে হয় বর্যে, কিন্তু সূফীরা একে শুধু বিশ্বাসের পর্যায়েই সীমিত রাখে না, তাকে নিয়ে যান তার চূড়ান্ত পরিণতির দিকে। তাঁদের মতে, শূন্যতা ও নাস্তিত্বের বিপরীত যে পরম, তা-ই যথার্থ সত্তা ও সত্য এবং তা-ই পরম আরাধ্য আল্লাহ। এ যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত সূফীদের সত্তার একত্ব (অহদাতুল অজুদ) বিষয়ক ধারণা। এই একত্বের অর্থ অবশ্য এই নয় যে, আল্লাহ ইসলাম জগতের বস্তু ও ঘটনারাজি একটা নিছক সমষ্টির। এ কথা বলার অর্থ এই যে, সর্বেশ্বরবাদ-এ বিশ্বাস করা, সূফীবাদের একত্ব নন, বরং সেই পরম

একক (আহাদ) যিনি স্বরূপতঃই একক ও অবিভাজ্য। অভিজ্ঞতার জগতের সব স্বতন্ত্র বস্তু ও ঘটনা তার আঙ্গিক অংশ নয়, বরং তার পরম সত্তায় প্রাতিভাসিক প্রকাশ মাত্র।[২৯]

তবে প্রাথমিক পর্যায়ে সূফীদের মধ্যে কোন কোন মনীষী সে অহদাতুল অজুদকে একমাত্র সত্য বলে গণ্য করে, তার মধ্যে বিরাজমান সবকিছুর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছেন। তাদের মতবাদ অনুসারে যে একক সত্তার অস্তিত্বের বাইরে অন্য কোন সত্তাই নেই তাঁদের মধ্যে শেখ মহীউদ্দীন ইবনে আলী আল আরাবী বলিষ্ঠ যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, পরম সত্তা আল্লাহর সব বাস্তবতার উৎস ও আকার এবং স্বরূপতই এই সত্তা অবিভাজ্য, অনন্ত ও অপরিবর্তনীয়। আল্লাহর লুক্কায়িত দিকটা অজ্ঞের ও অনির্বচনীয়।[৩০] মানুষের এ দিকটাকে জানা কিংবা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। জগতে আল্লাহর অভিব্যক্তি এবং জীবজগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে প্রভুত্বের মাধ্যমে। এখানে তিনি জগতের স্রষ্টা, জীব-জগতের প্রভু ও একমাত্র উপাস্য। একত্বের এ দিকটাতে কোন বহুত্ব কোন বিরোধ ও কোন গুণাগুনের পার্থক্য করা সম্ভবপর নয়। উল্লেখিত দ্বিতীয় দিকটা (প্রভুত্বের) আল্লাহর বৈচিত্র্যের দিক। আর তাই এখানে তাকে দেখা হয়ে থাকে স্রষ্টা ও সৃষ্টজগৎ হিসাবে।

আল্লাহকে বহুত্ব হিসাবে দেখা যায় শুধু তার গুণাবলীর মাধ্যমে। তবে, স্রষ্টা আর সৃষ্টি এক ও বহু, প্রথম ও শেষ, অনন্ত ও শান্ত। আবশ্যিক ও সাপেক্ষ যে পরম আত্মার বিভিন্ন দিক কাল, এরূপ মতবাদ পোষণ করার ফলে কালের ধারার ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। একদিকে আল্লাহর তত্ত্বীয় অস্তিত্ব। অপরদিকে তাঁর গুণাবলী ব্যতীত কোন কিছুই থাকে না।

আল্লামা ইকবাল প্রদর্শিত খুদী তত্ত্বের আলোকে যদি প্রশ্ন করা হয়, কি করে শান্ত খূদী অনন্ত খূদী থেকে দূরে অবস্থান করতে পারে? শান্ত খূদী কি অনন্তের পাশাপাশি নিজের সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে নিশ্চিত? আল্লামা ইকবাল এ সব প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, এক্ষেত্রে অনন্তকে ভুল বুঝা হয়েছে। অনন্ত বলতে একথা বুঝায় না যে, এর কোন সীমা নেই।

শক্তিমান খুদীকে অনন্ত খূদী থেকে পৃথক করে বুঝতে হবে, যদিও সে পার্থক্য স্থান বা কালের নয়। খূদীকে কোন একটা বিশেষ স্থানীয় ঘটনা বা কোন বিশেষ কালে সংঘটিত কতকগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলে মনে করা ঠিক নয়। একে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং বুঝতে হবে এর বিচারবোধ, ইচ্ছাশক্তি, এর আদর্শ এবং এর ইচ্ছাশক্তির পরিপ্রেক্ষিতে। এ জন্য আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিতে আল্লার এই প্রতিভ এবং ইবনুল আরাবীও অন্যান্য সর্বেশ্বরবাদী সূফীদের ব্যাখ্যা পরিপূর্ণ মানব সম্পূর্ণ পৃথক। কেননা, তিনি বলেন, এ মরমবাদীরা কর্মবিমুখতা এবং আত্মবিলোপনের পক্ষপাতী। এঁরা মনে করেন যে, পরিপূর্ণ মানব আল্লাহতে নিমজ্জিত হয়ে যান। এ বিশ্বাস মনসুর হাল্লাজ বর্ণিত হুলুল (অবতারবাদ)-এর সহধর্মী। যেমন হাল্লাজ বলেছেন,

আমি তিনি, যাকে আমি ভালবাসি এবং যাকে আমি ভালবাসি তিনি আমি, একই দেহাবলম্বী দু'টি আত্মা আমরা-তার 'আনাল হক আমিই সত্য বা আল্লাহ ঘোষণা এবং তাঁর বাণী আমার পরিচ্ছেদে আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই নেই, ইত্যাদি হুলুলের একটা দিক। এজন্য মনসুর হাল্লাজ বা হাফিজের মতো সূফীকে তিনি তার ভাষায় নিন্দা করেছেন।[৩১] হাফিজ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে:

অর্থ:

মদ্য ব্যবসায়ী হাফিজ থেকে সাবধান হও তার পাত্রে মারাত্মক বিষ ছাড়া কিছুই নেই,

এই মাতাল্লাদের রাজা আসলে এক মেঘ বটেন তার গানের সূরে রয়েছে মানুষকে সম্মোহিত করার ছলছলা।

তার মদের পেয়ালা ছুঁড়ে ফেলে দাও এতে বিষ ছাড়া আর কিচুই নেই[৩২]–

উপরোক্ত পংক্তিতে হাফিজের চিন্তাধারার প্রতি তার তীব্র বিদ্বেষ ফুটে ওঠেছে। কেননা, তাঁর ধারণা ছিল এজাতীয় সূফীদের মতবাদ গ্রহণ করেই সুমলিম সমাজ একেবারে স্থান ও অথর্ব হয়ে পড়েছে। এজন্য তাঁর বিদ্বেষ কেবল এদের প্রতিই ধুমায়িত হয়নি, তার পূর্ববর্তী দার্শনিকদের প্রতিও বিষিয়ে ওঠেছে। তিনি দেখতে পেলেন খলীফা মামুনের আমলে মুসলিম জগতের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যে হেলেনীয় ভাবধারার আমদানী করা হয়েছিল তা-ই রয়েছে মুসলিমদের বিপথগামী হবার মূলে। প্লেটো প্রমুখ দার্শনিকদের চিন্তাধারার প্রভাবে পড়ে ইসলামের যে রূপান্তর ঘটে, তাতেই তো মুসলমানেরা নিজেদের গতিশীল প্রত্যক্ষবাদ ত্যাগ করে একটা নিষ্ক্রিয় ধ্যানপর জীবনযাপন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তারা নৈরাশ্যবাদ ও অদৃষ্টবাদের জালে জড়িয়ে পড়লো। তিনি প্লাটোকে বৃদ্ধ মেষপালের চালক বলে আঘাত করেন এবং প্লাটো, বেদান্ত নির্ভর অহদাতুল অজুদ (সর্বেশ্বরবাদী বিশ্বাস) মতবাদ পোষক সূফীতত্ত্বকে দৃঢ়স্বরে আক্রমণ করেন।[৩৩]

তবে, এই বাহ্যঃ এতে যদিও তাকে সাধারণভাবে সূফীবাদবিরোধী বলে মনে হয়। তবু, মানুষের অন্তঃস্থলে তিনি সূফীবাদের মৌলিক তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন না। তিনি ব্যক্তি চেতনা লোপকারী সূফীদের বিরুদ্ধেই এসব মন্তব্য করেছেন। বিশেষতঃ মায়াবাদ বা অদৃষ্টবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে মানব জীবনে কর্ম বিমুখতার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, সে সূফী সম্প্রদায়কেই তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। অপরদিকে পরবর্তীকালে ইমাম গাজ্জালী ও মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমীর মনীষায় সূফীতত্ত্ব যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তার সঙ্গে আল্লামা ইকবালের দর্শনের কোন মতবিরোধ নেই, তিনি এ উভয়ের মতবাদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই প্রশংসা করেছেন। তিনি ইমাম গাজ্জালী কর্তৃক গ্রীক দর্শনের বিরোধীতা ও মৌল সত্যের মধ্যে অবিরাম ক্রিয়াশীলতার নীতির সমর্থন করতেন। গ্রীক দর্শনের প্রভাবের ফলে মুসলিমদের চিন্তাশীলতার যে স্থানু ও গতিবিহীনতার ভাব দেখা দিয়েছিল তার প্রতিষেধক হিসাবে ইমাম গাজ্জালীর চিন্তাধারাকে এক মহান অবদান বলেই গণ্য করতেন।[৩৪] অথচ, গাজ্জালীর চিন্তাধারা পরিণত পর্যায়ের মধ্যে সূফীতত্ত্বের মূলনীতির স্বীকৃতি রয়েছে। তার মতবাদে সাধারণ মানুষের পক্ষে তত্ত্বের ব্যাপারে অনুসন্ধান করা উচিত নয়। তাদের পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়ায় রয়েছে সমূহ আশংকা। জ্ঞানের পথে পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম শুধু তারাই–যারা আভ্যন্তরীণ অজ্ঞতা বা আত্মিক অনুভূতির মাধ্যমে নূরে এলাহী বা ঐশী আলোর সন্ধান পেয়েছেন। বস্তুতঃ এরাই হলেন প্রকৃত সূফীসাধক, পীর-দরবেশ বা অলি-আউলিয়া।

জালাল উদ্দীন রূমীকে তিনি তত্ত্ব সাধনার এক মহান পথিকৃত বলেই জ্ঞান করে তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন:

چو رومی در حرم دادم اذان من
ازو اموختم اسرار جان من
به دور فتنهٔ عصر کهن او
به دود فتنهٔ عصر رواں من۔ ৩৫

অর্থ:

রূমীর ন্যায় আমি ধ্বনিয়াছি আযান কাবার সীমায়;

তাঁর কাছে লাভ করিয়াছি জীবন-রহস্য।

তিনি ছিলেন অতীতের দুর্দিনে

আর আমি আছি বর্তমানের দুঃসময়ে।

এতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয়, সূফীদের তত্ত্বীয় জ্ঞানকে বা তাদের মূল লক্ষ্যকে তিনি অবজ্ঞা করেননি বা তাদের জীবনে ভোগ বা বিলাসিতা ত্যাগের যে নীতি রয়েছে তাকে তিনি অবজ্ঞা করেন নি। তাঁর মূল বক্তব্য হচ্ছে জীবনকে অস্বীকার করে নয়, তাকে স্বীকার করে খূদীকে বিকশিত করে সেই পরম সত্তা আল্লাহকে জীবনে রূপায়িত করতে হবে। এজন্য যদিও সর্বেশ্বরবাদী, নিষ্ক্রিয়, ত্যাগবাদী কোন কোন সূফীকে তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন এবং হাফিজকে সে দলের প্রতিনিধি হিসাবে সর্বতোভাবে বর্জন করতে মানবসাধারণকে আহ্বান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সূফীদের নানা শাখার মধ্যে যারা আজ নেতৃত্বস্থানীয় বলে স্বীকৃত তাদের সকলকে অস্বীকার করেন নি।[৩৬]

আল্লামা ইকবাল মুসলিম জাহানের জাগরণের অগ্রদূত হিসাবে এ জাতিকে এই বিশ্বে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় ছিলেন মশগুল। এ জন্য যেসব মতবাদ বা ধ্যান-ধারণার ফলে মানব-জীবনে কর্মচঞ্চলতা লোপ পায় বা তাদের জীবনে স্থবিরতা দেখা দেয়, সেগুলো পরিহার করে যাতে এজাতি পুনরায় এ ধারায় সগৌরবে সে হেলাল শোভিত পতাকা উত্তোলন করতে পারে তা-ই ছিল তাঁর জীবনের মূল আদর্শ। এ জন্য তিনি প্লেটোর বা বৈদান্তিক দর্শনকে সে স্থবিরতার কারণ জ্ঞান করে যেমন তাকে পরিত্যাগ করেছেন, তেমনি সে দর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হাফিজকেও বর্জন করেছেন। তবে, এখানে প্লেটো বা বৈদান্তিক দর্শনের কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। তাঁর দিওয়ানে রয়েছে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতের উল্লেখ। ভাগ্যকে তিনি রুজ-ই-আলস্তে এক নির্ধারিত অবস্থা বলে গণ্য করেছেন।[৩৭] যেমন তিনি এক জায়গায় বলেছেন:

در جو ہے نیک نامی گوزار نند نگر

ترکی پچندی، تگ اور دے قضا زارا۔[৩৮]

অর্থ:

সুনামের গলিতে আমার প্রবেশ নিষেধ, যদি তা তোমার পছন্দ হয় না,

তা হলে (আমার) ভাগ্যকে পরিবর্তন করে দাও।

হাফিজের দিওয়ানের মধ্যে সূফীদের সম্বন্ধে কটূক্তি করেছে। তিনি আপাত দৃষ্টিতে সর্বস্বত্যাগী। তবে, অন্তরের দিক থেকে মনকে তথাকথিত সূফীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছেন। অথচ, ইকবালের কষাঘাত থেকে তিনি রেহাই পাননি।

প্রকৃতপক্ষে কুরআনুল কারীমে যে জীবন-দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় তাতে তকদীর সম্বন্ধে যে ধারণা পেশ করা হয়েছে তা কর্মবিমুখহীনতার কোন স্থান নেই। মানুষ তার কর্মের দ্বারা জীবনকে বিকাশের যে পরিণতিতে নিয়ে যায় তা হচ্ছে তার তকদীর। তকদীরের অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ মানুষের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন– সে কাজ কর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিরত হলেও তার জীবনে তা অনিবার্যভাবেই দেখা দেবে। এরূপ ধারণার ফলেই মুসলিম জীবনে দেখা দিয়েছিল চরম দুর্ভাগ্য। হাফিজ তকদীরকে স্বীকার করলেও অর্থবতাকে প্রশ্রয় দেননি।

উপসংহার

আল্লামা ইকবালের কবিতায় ও লেখায় আমরা তাসাউফ বা সূফী মতবাদের যে প্রভাব দেখতে পাই তা ওজদী বা সর্বেশ্বরবাদী তাসাউফের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এসেছে। তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে উক্ত জীবন দর্শনে মানব জাতির কল্যাণ দেখতে পাননি। তাঁর মতে, ঐ দর্শন মানব জীবনে কর্মস্পৃহা ও

উদ্দীপনা জাগরণ করার পরিবর্তে নিষ্ক্রিয়তা ও কর্মবিমুখতা আনয়ন করে আর তাই তা বর্জনীয়। তিনি তাঁর ফার্সী কাব্য; 'আসরারে খুদীতে' ধারাবাহিকভাবে প্লেটো এবং প্রতীক হিসাবে প্রাচ্যে সর্বেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, পারস্য কবি হাফেজ-এর প্রতি কঠোর ভাষায় সমালোচনা ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তাতে তিনি উপমহাদেশের বহু হাফেজভক্ত কবি-সাহিত্যিকদের বিরাগভাজন হন। ফলে সমকালীন পত্র-পত্রিকায় বিতর্কের এক তুমুল ঝড় বয়ে যায়। অবশেষে পিতা শেখ নূর মুহাম্মদের পরামর্শক্রমে তিনি 'আসরারে খুদী'র পরবর্তী সংস্করণে হাফেজ সংক্রান্ত অধ্যায়টিতে মূল বক্তব্যকে অক্ষুণ্ন রেখে সংশোধিত আনয়ন করেন। তাতে সমালোচকদের রোষাণল বহুলাংশে প্রশমিত হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য, আল্লামা ইকবাল কিন্তু তাঁর কাব্য জীবনের সর্বেশ্বরবাদের প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত ছিলেন না। ঐধরনের ভাবধারার কিছু কিছু নমুনা তাঁর প্রথম উর্দু কাব্যগ্রন্থ 'বাঙ্গেদারা'তে দেখতে পাওয়া যায়। তবে 'আসরারের খুদী' এবং পরে অন্যান্য উর্দু ও ফার্সী গ্রন্থসমূহে তাঁর সমস্ত ভাবধারা সর্বেশ্বরবাদের পরিবর্তে খুদী দর্শনকে কেন্দ্র করেই লিখিত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ ফকীর সায়্যিদ ওয়াহীদুদ্দীন, *রোযেগারে ফকীর*, ১ম খণ্ড (করাচী: লাইন আর্ট প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৪), পৃ. ১৩।

২ *হায়াতে ইকবাল*, (লাহোরঃ ইকবাল একাডেমী, ২০০৬), পৃ. ৫৭।

৩ তদেব, পৃ. ৬৮।

৪ মুহাম্মদ ইকবাল, *কুল্লিয়াতে ইকবাল (ফারসী) পায়েমে মাশরিক*, (লাহোরঃ শাইখ গোলাম আলী এন্ড সন্স পাবলিশার্স, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৫), পৃ. ৩৪৮/১৭৫।

৫ কুল্লিয়াতে ইকবাল (ফারসী), *যবুরে আজম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৫/১৭।

৬ কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু), *যরবে কালীম* (দিল্লিঃ ইতিকাদ পাবলিসিং হাউস, ১৯৮১), পৃ. ১৪।

৭ রফীউদ্দীন হাবোমী, *কিতাবিয়্যাতে ইকবাল*, (লাহোরঃ ইকবাল একাডেমী, ১৯৫৮), পৃ. ৪৬।

৮ Tarreq, A.R. *Iqbal's Speeches and statements,* London, 1949, p. 83.

৯ কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু), *যরবে কালীম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

১০ ড. জাভিদ ইকবাল, *যিন্দা রোদ*, ৩য় খণ্ড (লাহোরঃ ইকবাল একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ৪৭।

১১ কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু), *বালে জিব্রীল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১।

১২ প্রফেসর ড. ইফতেখার আহমদ সিদ্দীকী, *উরুজে ইকবাল* (লাহোরঃ কওমী কুতুবখানা, ১৯১৪), পৃ. ৩৪।

১৩ তদেব, পৃ. ৪২।

১৪ ড. জাভিদ ইকবাল, *যিন্দা রোদ*, ৪র্থ খণ্ড (লাহোরঃ ইকবাল একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ৭৩।

১৫ কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু), *বালে জিব্রীল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১।

১৬ কুল্লিয়াতে ইকবাল (ফারসী), *পায়ামে মাশরিক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৪।

১৭ তদেব, পৃ. ২৮৮।

১৮ প্রফেসর ড. ইফতেখার আহমদ সিদ্দীকী, *উরুজে ইকবাল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

[১৯] ড. জাভিদ ইকবাল, *যিন্দা রোদ*, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩।

[২০] তদেব, পৃ. ৮৮।

[২১] তদেব, পৃ. ৯৪।

[২২] কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু), *যবরে কালীম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

[২৩] ড. খলীফা আবদুল হাকীম, *যিকরে ইকবাল* (লাহোর: ইকবাল একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৫৩।

[২৪] হানিফ শাহেদ, *নসরে ইকবাল* (লাহোর: ইকবাল একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ২৯৪।

[২৫] তদেব, পৃ. ২৯৭।

[২৬] তদেব, পৃ. ৩০৪।

[২৭] তদেব, পৃ. ৩০৫।

[২৮] আবদুল্লাহ কুরাইশী, *বাকিয়াতে ইকবাল* (করাচী: ইকবাল একাডেমী), পৃ. ১৩৫।

[২৯] ড. জাভিদ ইকবাল, *যিন্দা রোদ*, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।

[৩০] তদেব, পৃ. ৯২।

[৩১] তদেব, পৃ. ১০৫।

[৩২] তদেব, পৃ. ১৩৭।

[৩৩] তদেব, পৃ. ১৪৮।

[৩৪] তদেব, পৃ. ১৫২।

[৩৫] কুল্লিয়াতে ইকবাল (ফারসি), *পায়ামে মাশরিক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯।

[৩৬] ড. জাভিদ ইকবাল, *যিন্দা রোদ*, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২

[৩৭] তদেব, পৃ. ১৭৪।

[৩৮] কুল্লিয়াতে ইকবাল (ফারসী), *পায়ামে মাশরিক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

মনুসংহিতায় নারীর সম্পত্তির অধিকার : একটি পর্যালোচনা

ড. জয়শ্রী দাষ*

Abstract: The Manusamhita is a religious book of the Hindus. It is called Smritishastra. The Hindu society is mainly governed by the Manusamhita. Castism, marriage, possession of land and wealth of the Hindu women – are discussed in the Manusamhita. The possession of land and wealth of the Hindu women is now a controversial issue. The Manusamhita does not permit the possession of paternal land of the Hindu women. In this article I have tried to give a picture of the possession of paternal land of the Hindu women what Manu said in his look.

মনুসংহিতা ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ। মনুসংহিতাকে আমরা ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র উভয়রূপেই উল্লেখ করে থাকি। মনুসংহিতায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য পারিবারিক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সম্পর্কে জানা বিশেষ প্রয়োজন। মনুসংহিতায় পারিবারিক জীবনে নারীর সম্পত্তির অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বৈদিক সমাজে নারীরা সম্মানজনক অবস্থানে ছিল। নারী-পুরুষের মধ্যে সমাজগতভাবে আধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য ছিল না। সংসারে নারী ও পুরুষ সংসার ধর্ম পালনে পরস্পরের সহায়ক ছিল। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের যুগে এসে নারীর স্বাধীনতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে এবং মনুর বিধানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় নারীকে দাস শ্রেণীতে পরিণত করে। পুরুষ পরিবারের প্রধানরূপে এবং পারিবারিক সম্পত্তিতে এককভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ধর্মশাস্ত্রের বিধানে নারী ছিল সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তি। বৈদিক ধর্মে তার কোন স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত ছিল না। স্মৃতিশাস্ত্রকার মনু বলেছেন,

“পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।”[১]

স্ত্রীলোককে কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করবে, স্ত্রীলোক কখনও স্বাতন্ত্র্য লাভের যোগ্য নয়।

কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘ধর্ম ও নারী ’ গ্রন্থে বলেছেন, “আর্যদের পিতৃতন্ত্রে স্বাভাবিক ভাবেই পারিবারিক সম্পত্তির মালিক ছিল পুরুষ। আর এই মালিকের মৃত্যুর পর শাস্ত্রের বিধান অনুসারে পুত্রই হত সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কোন ব্যক্তি ইচ্ছে করলে নিজের জীবিতাবস্থাতেই পুত্রদের মধ্যে ধনভাগ করে দিতে পারতেন। ঋগ্বেদেই বলা হয়েছে, “বি ত্বা নরঃ পুরুত্রা সপর্যন্পিতুর্ন জিব্রের্বি বেদো ভরন্ত॥ অর্থাৎ বৃদ্ধ পিতার নিকট হতে পুত্রের ন্যায় তোমার নিকট হতে ধন প্রাপ্ত হয়।” কোন ব্যক্তির পুত্র এবং কন্যা উভয়ই থাকলে পৈত্রিক সম্পত্তিতে সাধারণত কন্যার যে কোন উত্তরাধিকার থাকত না, তার প্রমাণ ঋগ্বেদের অন্যত্র আরও স্পষ্টভাবে আছে। একস্থানে বলা হয়েছে,“না জাময়ে তান্বো রিক্থমারৈক্ চকার গর্ভং সনিতুর্নিধানম্। যদী মাতরো জনয়ন্ত বহ্নিমন্যঃ কর্তা সুকৃতোরণ্য ঋন্ধন্। অর্থাৎ ঔরস পুত্র দুহিতাকে পৈতৃক ধন দেয় না। তিনি তাকে ভর্তার প্রণয়ের আধার করেন। যদি পিতামাতা পুত্রকন্যা উভয়ই উৎপন্ন করেন,তাহলে তাঁদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ক্রিয়াকর্ম করেন এবং অন্যজন সম্মানিত হন।” সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বংশ পরম্পরায়

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পুত্রেরাই পারিবারিক ধনসম্পত্তির অধিকারী হতেন। তবে কন্যার বিবাহের সময় তাকে সম্মানিত করার জন্য পৈতৃক সম্পত্তির কিছু অংশ ব্যয় করার কথা এখানে পরোক্ষভাবে এসে যাচ্ছে।”[২]

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করে নেওয়া হয়েছিল। নারীকে পুরুষের সম্পত্তিতে পরিগণিত করা হতো। এছাড়া নারীকে পশু ও পণ্যদ্রব্যের মতো হস্তান্তরিত করা হতো। ঋগ্বেদের ১ম ও ৬ষ্ঠ মণ্ডলের দুটি মন্ত্র থেকে তার স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

উপ মা শ্যাবাঃ স্বনয়েন দত্তা বধূমন্তো দশ রথাসো অস্থুঃ।
যষ্ঠিঃ সহস্রমনু গব্যমাগাৎ সনৎকক্ষীবা অভিপিত্বে অহ্নাম্ ॥[৩]

স্বনয় কর্তৃক প্রদত্ত ও শ্যামবর্ণ অশ্বযুক্ত বধূসমন্বিত দশখানি রথ আমার নিকট উপস্থিত হল। এক সহস্র ষষ্ঠিসংখ্যক গাভী উপস্থিত করা হল। কক্ষীবান গ্রহণ করে পরদিনেই তা আপনার পিতাকে দান করলেন।

দ্বা অগ্নে রথিনো বিংশতিং গা বধূমন্তো মঘবা মহ্যং সংরাট্।
অভ্যাবর্তী চারমানো দদাতি দূণাশেয়ং দক্ষিণা পার্থবানাম্ ॥[৪]

হে অগ্নি! চয়মানের পুত্র, ঐশ্বর্যশালী সম্রাট অভ্যবর্তী আমাকে রথ ও রমণী সহকারে বিংশতি গোমিথুন প্রদান করেছেন। পৃথুর বংশধরের এ দান অক্ষয় অর্থাৎ কেউ এর বিলোপ করতে সমর্থ নয়।

বৈদিক যুগে অবিবাহিতা কন্যারা পিতৃগৃহে বাস করত। তাছাড়া অনেক নারীর শারীরিক ক্রুটিও থাকত। তাদের বিবাহ হত না। তাদের পিতৃগৃহে বাস করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। এই নারীদের বলা হত অমাজু। পিতৃ সম্পত্তির ওপর তাদের অধিকার ঋগ্বেদ স্বীকার করে নিয়েছিল। ঋগ্বেদের ২য় মণ্ডলের একটি ঋকে বলা হয়েছে,

অমাজুরিব পিত্রোঃ সচা সতী সমানদা মদসস্ত্বামিয়ে ভগমৎ
কৃধি প্রকেতমুপ মাস্যা ভয় দদ্ধি ভাগং তন্বোযেন মামহঃ।[৫]

হে ইন্দ্র! যাবজ্জীবন পিতামাতার সাথে অবস্থিত দুহিতা যেমন আপনার পিতৃকুল হতেই ভাগ প্রার্থনা করে সেরূপ আমি তোমার নিকট ধন যাচঞা করি। সে ধন তুমি সকলের নিকট প্রকাশিত কর ও তা সম্পাদন কর। এ ধনে তুমি স্তোতাগণকে সম্মানিত কর।

অথর্ববেদের সময়ে গ্রামীণ-সভ্যতায় পরিবারের প্রয়োজনীয় দ্রবাদি নারী ও পুরুষ তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিজেরাই উৎপাদন করত। তবে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য অথর্ববেদে পাওয়া যায় না।

মনুসংহিতার যুগে বিধির পর বিধি রচনা করে নারীকে বাইরের জগৎ থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। নারীকে স্বামীর সুখ, সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনে নিবেদিত করতে বাধ্য করা হত। মনু নারীকে সম্পদ সমতুল মনে করত। সম্পদের মতো যে যখন জয় করে নেয় নারী তার। মনু বলেছেন,

রথাশ্বং হস্তিনং ছত্রং ধনং ধান্যং পশূন্ স্ত্রিয়ঃ।
সর্ব্বদ্রব্যাণি কুপ্যঞ্চ যো যজ্জয়তি তস্য তৎ ॥[৬]

অর্থাৎ ধন, ধান্য, পুত্র, অশ্ব, রথ, স্ত্রী, গবাদী পশু, স্বর্ণ, রৌপ্য ভিন্ন খনিজ তাম্রাদি ধাতু এবং ঘৃতাদি দ্রব্য-এই সকলরে মধ্যে যুদ্ধজয়ী হইয়া যে যাহা প্রাপ্ত হয়, সেই তাহাতে অধিকারী হইয়া থাকে।

মনুর সময় নারীর স্বয়ংবরের মাধ্যমে পতি নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিল। এই স্বাধীনতা থাকলেও মনু নারীর প্রাপ্য অধিকারটুকু দেননি। মনুর মতে, স্বয়ংবরা নারী পিতা মাতা ও ভ্রাতা কর্তৃক দত্ত অলংকার গ্রহণ করবে না, করলে সে চোর হবে।

অলঙ্কারং নাদদীত পিত্র্যং কন্যা স্বয়ংবরা।
মাতৃকং ভ্রাতৃদত্তং বা স্তেনা স্যাদ্‌যদি তং হরেৎ ॥[৭]

অর্থাৎ স্বয়ংবরা কন্যা তাহার পিতৃ মাতৃ বা ভ্রাতৃদত্ত ভূষণাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ঐরূপ করিলে তাহা চৌর্য্যবৃত্তি রূপে পরিগণিত হইবে।

মনু পিতার সম্পত্তির উপর পুত্রদের অধিকার দিয়েছেন কিন্তু কন্যাদের কোন অধিকার দেননি। পুত্রের অভাবে পিতা এবং পিতারও অভাবে ভ্রাতা ছিলেন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

ন ভ্রাতরো ন পিতরঃ পুত্র রিক্‌থহরাঃ পিতুঃ।
পিতা হরিদপুত্রস্য রিক্‌থং ভ্রাতর এব চ ॥[৮]

পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে মনু পুত্রদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন। মনুসংহিতার ব্যাখ্যাকারদের মতে, মনু সম্পত্তির উত্তরাধিকারে বিবাহিতা কন্যাদের কথা বলেছেন তবে অবিবাহিতা কন্যাকে বিবাহ সংস্কারার্থে ভ্রাতারা সম্পত্তির এক অংশ দান করবেন।

স্বেভ্যো'ংশেভ্যস্ত কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতারঃ পৃথক্।
স্বাৎ স্বাদংশাচ্চতুর্ভাগং পতিতা ঃ স্যুরদিৎসবঃ ॥[৯]

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও বলা হয়েছে,

দ্রব্যমপুত্রস্য সোদর্যাভ্রাতরঃ সহজীবিনো বা হরেয়ুঃ কন্যাশ্চ।[১০]

অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তি তার সহজীবি অর্থাৎ একান্নভুক্ত সহোদর ভ্রাতারা পারে এবং ঐ অপুত্রক ব্যক্তির কন্যারা বিবাহের জন্য পিতার সম্পদের অংশ বিশেষ লাভ করবে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ভ্রাতৃহীন কন্যার উত্তরাধিকার স্বীকৃত হয়। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, অবিভক্ত পরিবারে মৃত ব্যক্তির পুত্রের অভাবে তার ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্য এবং দৈব এই চারপ্রকার ধর্মমতে বিবাহ থেকে জাত কন্যারা পিতৃধনের অধিকারিণী হবে।

রিক্‌থ পুত্রবতঃ পুত্রা দুহিতরো বা ধর্মিষ্ঠেষু বিবাহেষু জাতাঃ।[১১]
কৌটিল্য আবার বলেছেন, তেন তুল্যঃ পুত্রিকাপুত্রঃ।[১২]

পুত্রিকাপুত্র ঔরস পুত্রের তুল্য বিবেচিত হবে।

শাস্ত্রে কন্যাদের বিবাহ সংস্কারে সম্পত্তির এক অংশ দান করার বিধান না থাকলে অনূঢ়া ভগ্নীদের বিবাহের কোন ব্যবস্থাই করত না ভ্রাতারা। অনূঢ়া ভগিনীরা চিরকাল ভ্রাতাদের আশ্রিত থাকত। অর্থাৎ কন্যাদের কোন অবস্থাতেই স্বাধীনতা দিতে চায়নি মনু। কোন না কোন ভাবে তারা পরাধীন ছিল। পুত্র বর্তমান থাকলে পিতৃ সম্পত্তিতে কন্যার কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু পুত্রহীন হলে সম্পত্তি রক্ষা ও পারলৌকিক কার্যে সমস্যা দেখা দেয়। এই কারণে মনু পুত্রিকা পুত্রের বিধান দিয়েছেন। কন্যার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্র পুত্রের মত ধন সম্পদের অধিকারী হত এবং পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করতে কোন বাধা থাকত না।

পৌত্র দৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নোপদ্যতে।
দৌহিত্রো'পিহ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ ॥[১৩]

স্মৃতিশাস্ত্রকারদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি এবং নারদ পিতৃ সম্পত্তিতে ভ্রাতৃহীন কন্যার উত্তরাধিকার স্বীকার করেছেন। তবে যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি এবং নারদের বিধানের সাথে সাযুজ্য রেখে কোন কোন পণ্ডিতের

মতে[১৪] আনুমানিক খ্রিষ্টপরবর্তী পঞ্চম শতক থেকে ভ্রাতৃহীন বিবাহিতা কন্যারা নিজ কন্যা স্বত্বেই (পুত্রের স্বত্বে নয়) পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী রূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্রিকাপুত্র সম্পর্কে মনুর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন,

যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।
তস্যামাত্মনিতিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ॥ [১৫]

পুত্র আত্মসদৃশ এবং কন্যাও তদ্বৎ, সুতরাং পুত্রিকাকন্যা ছাড়া অন্য কেউ ধনভাগী হতে পারে না।

অর্থাৎ কন্যা পুত্রের মত পিতার "আত্মসদৃশ" হয়েও পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতে পারে না। পুত্রহীন পিতার উত্তরাধিকারী হচ্ছে কন্যার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্র। অনুমান করা যায়, পুত্রের অভাবে দৌহিত্রকে উত্তরাধিকারী রূপে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে ভ্রাতৃহীন কন্যাকে উত্তরাধিকারিণী রূপে স্বীকার করতে হয়েছিল। মনু বলেন,

দৌহিত্রো হ্যখিলং রিক্থমপুত্রস্য পিতুর্হরেৎ।
স এব দদ্যাদ্দৌ পিণ্ডৌপিত্রে মাতামহায় চ ॥
পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে ন বিশেষো'স্তি ধর্মতঃ।
তয়োর্হি মাতাপিতরৌ সম্ভূতৌ তস্য দেহতঃ ॥[১৬]

অপুত্রক মাতামহের ধন পুত্রিকাপুত্র গ্রহণ করবে, এবং দৌহিত্র মাতামহ ও পিতা উভয়ের পিণ্ডদান করবে। ইহলোকে পৌত্র এবং দৌহিত্রের মধ্যে ধর্মত কোন পার্থক্য নেই, কারণ একজন থেকেই পুত্রকন্যা উভয়ই উৎপন্ন হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য হল এই যে পুত্রকন্যা উভয়ই এক পিতা থেকে উৎপন্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে মনুর অনুশাসনে কন্যা পুত্রের মতো পিতৃধনের উত্তরাধিকার পায়নি, উত্তরাধিকার পেয়েছে কন্যার পুত্র। আসলে পিতৃতন্ত্রের ধারাকে সুরক্ষিত করার জন্যই মনুকে এই কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল। মনুর উদ্দেশ্যটি আরও পরিস্কার হয় মনুর আরেকটি বিধানে, যেখানে তিনি বলেছেন,

পুত্রিকায়াং কৃতায়ান্তু যদি পুত্রো'নুজায়তে।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাজ্জে জ্যেষ্ঠতা নাস্তি হি স্ত্রিয়াঃ ॥[১৭]

পুত্রিকা গ্রহণান্তে যদি কোন ব্যক্তির পুত্র জন্মে, তাহলে পুত্র এবং পুত্রিকা পুত্র উভয়ে সমান অংশ ভাগী হবে- যেহেতু স্ত্রীজাতির জ্যেষ্ঠত্ব নেই।

আসলে পুরুষপ্রধান সমাজে শাস্ত্রকারদের বিধানে কোথাও স্ত্রী জাতির জ্যেষ্ঠত্ব ছিল না,ছিল হীনত্ব। আর তাই তত্ত্বগতভাবে মনু মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে পুত্রিকাপুত্র এবং পুত্র উভয়েরই সমান অংশীদারত্ব স্বীকার করলেও বাস্তবে ধর্মশাস্ত্রের যুগে পৈতৃক সম্পত্তিতে ভ্রাতৃহীন বিবাহিতা কন্যার উত্তরাধিকার ছিল না।[১৮] তবে পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার না পেলেও নারীরা তার মাতার স্ত্রীধনের অংশ পেত।

বৈদিক যুগ থেকেই বিবাহের আগে এবং বিবাহের সময় পিতাকর্তৃক কন্যাকে কিছু উপহার দেওয়ার নিয়ম ছিল। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে বলা হয়েছে-

সূর্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎ সবিতা যমবাসৃজৎ।
অঘাসু হন্যন্তে গাবো'র্জুন্যোঃ পর্যুহ্যতে॥।[১৯]

পতিগৃহে গমনকালে সূর্য সূর্যাকে যে উপঢৌকন দিয়েছিলেন, তা অগ্রে অগ্রে চলল। মঘা নক্ষত্রের উদয়কালে সে উপঢৌকন অঙ্গভূত গাভীদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়, অর্জ্জুনী অর্থাৎ ফাল্গুনী নামক দুই নক্ষত্রের উদয়কালে সে উপঢৌকন বয়ে নিয়ে যায়।

সুকিং শুকং শল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম্।
আরোহ সূর্যেঅমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ্ব ॥[২০]

তোমার পতিগৃহে যাবার পথে সুন্দর পলাশ তরু সুন্দর শাল্মীবৃক্ষ আছে অর্থাৎ ঐ কাষ্ঠে নির্মিত এর মূর্তি উৎকৃষ্ঠ সুবর্ণের ন্যায়প্রভা। এ উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত, এর সুন্দরচক্র, এ সুখের আবাসস্থান।

'স্ত্রীধন' বলতে বুঝায় নারীরা যে সব সম্পদের নিরংকুশ অধিকারী। হিন্দুশাস্ত্রে নারীদের পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার দেয়া হয়নি। তবে বিবাহের পর স্বামী বা শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছ থেকে বা কোন নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে বধূকে কিছু উপহার দেওয়ার রীতি ছিল। সংক্ষেপে নারীর বিবাহের আগে ও বিবাহের সময় পিতার কাছ থেকে এবং বিবাহের পর শ্বশুরকুল থেকে পাওয়া মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার ও দ্রব্যসামগ্রীকেই স্ত্রীধন রূপে গণ্য করা হয়। স্ত্রীধনের ওপর নারীদের অধিকার দেওয়া হয়েছে। মনু ছয় প্রকার স্ত্রীধনের কথা বলেছেন-

অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিকর্মণি।
ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়ুবিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম ॥
অন্বাধেয়ঞ্চ যদ্দত্তং পত্যা প্রীতেন চৈব যৎ।
পত্যৌ জীবতি বৃত্তায়াং প্রজায়াস্তদ্ধনং ভবেৎ॥[২১]

স্ত্রীধন ছয় প্রকার; অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, প্রীতিদত্ত, মাতৃদত্ত, পিতৃদত্ত এবং ভ্রাতৃদত্ত। বিবাহ হোমকালে লব্ধ যে ধন, তাকে অধ্যাগ্নি ও পতিগৃহ-নয়ন সময়ে লব্ধ যে ধন তা অধ্যাবাহনিক স্ত্রীধন এবং রতিকালে বা অন্যকালে পতিকর্তৃক প্রীতি সহকারে দত্ত যে ধন তা প্রীতিদত্ত। বিবাহের পর পিতা, মাতা, স্বামী, পিতৃকুল, মাতৃকুল থেকে পাওয়া এবং পতি কর্তৃক প্রীতিপূর্বক দত্ত ধনকে অন্বাধেয় ধন বলে। অন্বাধেয় ধন এবং ছয় প্রকার স্ত্রীধন স্বামীর জীবিত অবস্থায় স্ত্রীর মৃত্যু হলে তার সন্তানেরা পাবে।

মনুর মতো যাজ্ঞবল্ক্যও ছয় প্রকার স্ত্রীধনের কথা বলেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় 'ব্যবহারধ্যায়' নামে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্ত্রীধন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীধনের সাথে আর এক প্রকার ধন যুক্ত করেছেন। তা হল স্বামীর পরবর্তী বিবাহকালে পূর্বের বিবাহিত স্ত্রীকে দেওয়া উপহার বা শুল্ক যাকে আধিবেদনিক ধন বলা হত।

পিতৃমাতৃপতিভ্রাতৃদত্তমধ্যগ্ন্যুপাগতম্।
আধিবেদনিকাদ্যঞ্চ স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
বন্ধুদত্তং তথা শুল্কমন্বাধেয়কমেব বা।
অতীতায়ামপ্রজসি বান্ধবাস্তদবাপ্নুয়ুঃ ॥[২২]

স্ত্রীধন নারীরা আমৃত্যু তাদের নিজস্ব সম্পদরূপে ব্যবহার করতে পারত। স্বামীরও সেই স্ত্রীধনের উপর কোন অধিকার ছিল না। শুধুমাত্র মাতার মৃত্যুর পর পুত্র কন্যারা স্ত্রীধনের অধিকারী হত।

তবে মনু আরও বলেন, স্বামীর জীবিতাবস্থায় স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্ত্রীধনের ওপর সন্তানদের এবং নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হলে স্বামীর অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। আবার বলা হয়েছে, স্বামী বধূকে কোন স্ত্রীধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি মৃত্যুবরণ করেন তবে সেই ধন পুত্রদের মাকে দিতে হবে। অপরার্ক নামে টীকাকার বলেছেন, স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, এমন কী পিতারও স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়া বা দান করার অধিকার নেই। কেবল

মাত্র দুষ্টা ও অপব্যয়ী পত্নী স্ত্রী উপর অধিকার হারাবে। এখানে কৌশলে পত্নীকে স্বামী ও তার পরিবার অপবাদ দিলেই স্ত্রীধন থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারত। পরাশর তাঁর গৃহ্যসূত্রে পরিষ্কার বলেছেন, মাতার মৃত্যুর পর স্ত্রীধন কন্যাদের কাছে যায়, এই কারণে স্ত্রীধন নারীর একমাত্র সম্পত্তি। কাত্যায়ন বলেন, শুল্ক হল মূল্য, যা বর বধূকে দেয়, বিবাহের সময়ে বা তার গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময়ে। কাত্যায়নের মতে, স্ত্রী তার শিল্প দিয়ে যা উপার্জন করে এবং অপরের কাছ থেকে যা পায় তা স্বামীর প্রাপ্য কিন্তু অবশিষ্ট সবই স্ত্রীধন। এতে বধূকে প্রায় সব সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু দেবল বলেন, ভরণপোষণ, শুল্ক এবং সুদ থেকে যে লাভ হয় তা পুরোপুরি স্ত্রীধন যার উপরে বধূর সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে। মনুর প্রখ্যাত টীকাকার মেধাতিথি বলেছেন, অলংকার যদি সাক্ষাৎ ভাবে বধূকে দেওয়া হয়নি কিন্তু সে স্বামীর অনুমতি নিয়ে তা পরে, তাই তাও স্ত্রীধনেরই অন্তর্ভূক্ত।

আর এক ধরনের স্ত্রীধন আছে তাকে সৌদায়িক বলে। স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতি আত্মীয় দ্বারা দান হিসেবে প্রদত্ত ধনকে সৌদায়িক ধন আখ্যা দেওয়া হয়, যা স্ত্রী বিনা অনুমতিতে নিজের ইচ্ছা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দান, বিক্রয় অথবা ভোগ করার অধিকারিণী হয়।[২৩]

অপরার্ক বলেছেন, এই সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে বধুর সে তা দান করতে পারে, বন্ধক রাখতে পারে যদি তা ভূসম্পত্তি হয় তাহলেও। স্ত্রীধনের সীমা সম্পর্কে স্মৃতিচন্দ্রিকায় বলা হয়েছে, সব রকম উৎস এক করলে সে দু হাজার পণ পর্যন্ত পেতে পারে, কিন্তু সে ভূমির অনুদানও পৃথকভাবে পেতে পারে।[২৪]

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে পূর্বাচার্যগণ বলেছেন, অলংকার এবং অন্যান্য যা ধন তার আত্মীয়রা উপহার হিসেবে দেয় তা পত্নীর নিজস্ব।[২৫] বৌধায়নের মতে, কন্যা মায়ের অলংকার এবং অন্যান্য প্রথাগত উত্তরাধিকার পায়।[২৬] মনু স্ত্রীধনের রক্ষণাবেক্ষণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

স্ত্রীধনানি তু যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
নারীযানানি বস্ত্রং বা তে পাপা যান্ত্যধোগতিম্ ॥[২৭]

পিতা প্রভৃতি যে বন্ধুস্থানীয়গণ মোহবশতঃ কন্যা বা ভগিনীর স্ত্রীধন অথবা তৎসম্বন্ধীয় দাসী, বাহন বা বস্ত্রাদি উপভোগ করে, সেই পাপমতি পুরুষেরা অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

অতএব বোঝা যায়, নারীর স্ত্রীধনকে বেআইনি ভাবে তার শ্বশুরবাড়ির লোকদের ব্যবহার করার ঘটনা ঘটত এবং তাকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যে শুধু ধনীলোকের মেয়েদের দাসী রথ ব্যবহার করত তা নয়। যারা দরিদ্র এবং যাদের সম্পত্তি কম তাদের যৎসামান্য সম্পত্তির উপরেও শ্বশুরবাড়ির লোকদের লোভী হস্তক্ষেপে নিঃস্ব হয়ে পড়ত।

মনুসংহিতার যুগে নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। নারীর অর্থ উপার্জনের অধিকার ছিল না। কিন্তু স্বামীর উপার্জিত অর্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও পাই পাই করে করে হিসেব করে ব্যয় করার নির্দেশ ছিল নারীর ওপর। নারীরা অবিবাহিতা অবস্থায় পিতার অধীন, বিবাহিত অবস্থায় যৌবনে স্বামীর অধীন এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের অধীনে ছিলেন।

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেস্বপি।[২৮]

নারীরা কোনো প্রকার সম্পদের অধিকারী ছিলেন বলে জানা যায় না। তারা শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদের অধিকার ভোগ করতেন।

মনুসংহিতা'র সময়ে সমাজে পিতৃতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন সকল সম্পত্তির অধিকার ছিল পিতার। সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠপুত্রের অধিকার ছিল অগ্রগণ্য। অন্যান্য পুত্রদেরও কমবেশি সম্পত্তির অধিকার লাভের যোগ্য ছিল। তাই দেখা যায় অর্থনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে নারীর অধিকার একেবারেই নেই। তবে পিতার অবর্তমানে অবিবাহিত ভগ্নীরা ভাইদের সম্পত্তি থেকে যৎসামান্য বা একাকালীন কিছু সম্পদ পাওয়া যোগ্য।

একাধিকং হরেজ্জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো'ধ্যর্দ্ধং ততো'নুজঃ।
অংশমংশং যবীয়াংশ ইতি ধর্মো ব্যবস্থিতঃ।
স্বেভ্যো'ংশেভ্যস্তু কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতারঃ পৃথক্।
স্বাৎ স্বাদংশাচ্চুতর্ভাগং পতিতাঃ স্যুরদিৎসবঃ[২৯]

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যাদের কোনো অধিকার থাকবে না, যদিও ঐ সম্পত্তিতে পুত্রদের অধিকার থাকবে। অবশ্য মনু মনে করেন, মাতার সম্পদ ও স্ত্রীধনে অবিবাহিত কন্যারই অধিকার থাকবে। যদি পিতার কোনো পুত্র সন্তান না থাকে, তবে সেই স্ব ধনসম্পত্তি কেবল কন্যার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্র পাবেন।

মাতুস্তু যৌতুকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ।
দৌহিত্র এব চ হরেদপুত্রস্যাখিলং ধনম্ ॥[৩০]

মনুসংহিতায় মনু স্ত্রী, পুত্র এবং দাসদের অধম হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন যে, স্ত্রী, পুত্রও দাস যা কিছু অর্জন করবেন তার মালিক যথাক্রমে স্বামী, পিতা এবং দাস প্রভু হবেন। তাহলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, স্ত্রীদের নিজের সম্পদের ওপরও কোন অধিকার নেই। তারা শুধু সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও বলা হয়েছে, পিতামাতার জীবিত কালে পুত্র কুলধনের মালিক হতে পারে না।

অনীশ্বরাঃ পিতৃমন্তঃ স্থিতপিতৃমাতৃকাঃ পুত্রাঃ।[৩১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কৌটিল্যের মতে পিতা এবং তার অবর্তমানে বিধবা মাতা জীবিত থাকা পর্যন্ত পুত্রেরা নিজেরা সেই সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারতেন না।

মনু বলেছেন,

ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমম্।
ভজেরন্ পৈতৃকং রিক্‌থমনীশাস্তে হি জীবতোঃ ॥[৩২]

পিতা ও মাতার মৃত্যুর পরে ভ্রাতৃগণ মিলিত হয়ে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করবে; কারণ তারা জীবিত থাকতে পুত্রগণ অধিকারী নয়।

অনুমান করা হয়, বিধবা মাতার সুবিধার্থেই এই বিধান ছিল। বিধবা মাতার জীবিতকালে পুত্রেরা সম্পত্তি ভাগ করতে না পারলে পুত্ররা মাতার অধীনে থাকত এবং মাতাকে দেখাশোনা করত।

মনুর বিধান অনুসারে আসুর, রাক্ষস পৈশাচ মতে বিবাহিতা স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্ত্রীধনের প্রথম উত্তরাধিকারিণী ছিলেন মৃতার মাতা।

যৎ ত্বস্যাং স্যাদ্ধনং দত্তং বিবাহেম্বাসুরাদিষু।
অপ্রজায়ামতীতায়াঃ নানাপিত্রোস্তদিষ্যতে ॥[৩৩]

তবে মনুসংহিতার প্রভাব এড়িয়ে বৃহস্পতি, প্রজাপতি ও যাজ্ঞবল্ক্য সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের ওপর যুক্তি নির্ভর অনুশাসন দিয়ে গেছেন। বৃহস্পতির অনুশাসন ছিল বিধবা নারীর পক্ষে।

"বেদে এবং স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রী স্বামীর সাথে পরিবারে যৌথরূপে এবং একই শরীরের দুই অংশরূপে স্বীকৃত ছিল। সুতরাং স্ত্রী (বিধবা) জীবিত থাকতে স্বামীর অবর্তমানে অন্য কেউ উত্তরাধিকারিণী হয় কি রূপে?"[৩৪]

বৃহস্পতির যুক্তির সমর্থন এবং আরও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় প্রজাপতির বিধানে। প্রজাপতি বলেছেন,"স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হওয়ার স্বাভাবিক অধিকার বিধবার আছে। এই সম্পত্তির মধ্যে স্বামীর স্থাবর এবং অস্থাবর ধন অন্তর্ভুক্ত। বিধবার কোন বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় জীবিত থাকলেও বিধবার উত্তরাধিকার ক্ষুন্ন হয় না। বিধবা বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়দের সম্মান করবে, কিন্তু সে স্বামীর সম্পত্তি নিজের তত্ত্বাবধানে রাখবে। কোন পুরুষ আত্মীয় যদি বিধবাকে তার সম্পত্তি ভোগ করার পথে বিঘ্ন ঘটায়, তবে রাজা তাকে চোরের দণ্ড দিবে।"[৩৫]

আপস্তব ধর্মসূত্রের মতে, মৃত ব্যক্তির নিচের দিকে সাত প্রজন্মের কোনও পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকলে সে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন গুরু, গুরুর অবর্তমানে শিষ্য কর্তৃক সেই সম্পত্তি দান কার্যে ব্যবহৃত হবে।[৩৬]

মনুসংহিতায় মাতা হিসেবে স্ত্রীদের সম্পদের অধিকার সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। মনু বলেন, সন্তানহীন পুত্রের ধন তার মাতার প্রাপ্য কিন্তু মাতা মারা গেলে ঐ সম্পদ পিতার মাতা অর্থাৎ ঐ পুত্রের পিতামহী উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করবেন।

অন্যপত্যস্য পুত্রস্য মাতা দায়মবাপ্নুয়াৎ।
মাতর্য্যপি চ বৃত্তায়াং পিতুর্মাতা হরেদ্ধ নম্॥[৩৭]

আবার মনু বলেন, যদি কোনো পুত্র তার পুত্র রেখে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তার বিধবা স্ত্রী তার সম্পদ তার পুত্রের অভিভাবক হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। কিন্তু তাঁর (মাতা) জীবিতাবস্থায় সেই সম্পদ ভাগ-বন্টন করা যাবে না। এখানে আরো উল্লেখ যে, মাতা জীবিতাবস্থায় যদি পুত্র সন্তানাদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে মাতা পুত্রসন্তানাদির সম্পদের বৈধ উত্তরাধিকারী হবেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মনুসংহিতায় নারীদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায় সম্পদের কথা উলেখ করা হয়েছে। পিতার অবর্তমানে বা স্বামীর অবর্তমানে কিংবা পিতা স্বামী উভয়ের অবর্তমানে নারীরা যাতে দুঃখকষ্টে দিনাতিপাত না করেন সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মনু নারীদের উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ প্রাপ্তির বিধান রেখেছেন। হয়তো এ সম্পদ নারীর সোপার্জিত নয়, হয়তো তারা এর মালিকও নন, কিংবা তারা এই সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় অধিকারী রয়েছে তা সে অধিকার যতই নগন্য হোক না কেন সেটা একান্তই তাদের। তাই বলা যায়, নারী জাতি সম্পর্কে মনুর নেতিবাচক মনোভাব যতই থাকুক না কেন নারীর জীবনধারণের জন্য বিশেষ করে তৎকালীন সমাজে অসহায় নারীদের জন্য মনু জীবন ধারণেরও কথা বলেছেন। তাই তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রতি মনুর এক ধরনের উদারতা ছিল বলেই মনে করা হয়।

আবার কোন কোন স্থলে মনুর ধর্মশাস্ত্রে নারীর প্রতি যে নির্মম অত্যাচার করা হয়েছে তার কোন তল খুঁজে পাওয়া যায় না। মনুসংহিতায় নারীর স্ত্রীধনের অধিকার থাকলেও তা পরিপূর্ণতা পায়নি। সবকিছু থেকেই নারীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাই অশোক রুদ্র বলেছেন, "সবদেশেই সবকালেই নারীদের পুরুষেরা অনেকভাবেই বঞ্চিত করে এসেছে। কিন্তু নারীজাতি সম্বন্ধে যে সীমাহীন ঘৃণা আমাদের দেশের সমাজ-শাসক পুরুষেরা পোষণ করতেন এবং যে ঘৃণাকে প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করে নারী সম্পর্কিত সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে তার তুলনা অন্য কোন দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আর নারীরা

তাদের এই অবস্থানকে যেভাবে মেনে নিয়ে এসেছেন তাও তুলনাবিহীন।"[৩৮] তবে স্মৃতিশাস্ত্রের যুগ থেকে ক্রমশ নারীর সম্পত্তি বিষয়ে কিছু উদারপন্থী চিন্তার উদ্ভব হয়,যার ফলে নারীর সম্পত্তিগত অধিকার অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এ সব আইনের বর্তমান ত্রুটি- বিচ্যুতি থেকেও মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে। একমাত্র ধর্মহীন, মানবিক এবং সর্বজনীন আইন ব্যবস্থাই পারবে সামগ্রিকভাবে নারী সমাজের সম্পত্তির অধিকারকে তত্ত্বে ও বাস্তবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে।

পরিশেষে বলা যায় যে, নারীদের সম্পত্তির ওপর অধিকার নিয়ে যুগে যুগে নতুন বিধান রচিত হলেও বাস্তবে দেখা যায় নারী সমস্ত অধিকার থেকেই বঞ্চিত হয়। মনুসংহিতায় দু একটি ব্যতিক্রমী বিধান নারীর সম্পত্তির প্রসঙ্গে থাকলেও ব্যাপক অর্থে মনুর বিধানে পিতা, পতি, পুত্র কারও স্থাবর অস্থাবর কোন রকম সম্পত্তিতে নারীর অধিকার নিঃশর্ত ভাবে স্বীকৃত হয়নি।

তথ্যনির্দেশ

১ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত, মনুসংহিতা (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭), ৯/৩, পৃ.২৪৮।

২ কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্ম ও নারী (সেকাল ও একাল), এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা -৭২, পৃ.১৯০।

৩ রমেশচন্দ্র দত্ত অনুদিত, ঋগ্বেদ, ১ম খণ্ড (কলকাতাঃ হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬), ১/২৬/৩, পৃ.২৫২।

৪ তদেব, ঋগ্বেদ, ২য় খণ্ড, ৬/২৭/৮, পৃ.৫১।

৫ তদেব, ১ম খণ্ড, ২/১৭/৭, পৃ.৩৫৬।

৬ তদেব, মনুসংহিতা, ৭/৯৫, পৃ.১৭৯।

৭ তদেব, মনুসংহিতা, ৯/৯২, পৃ.২৫৯।

৮ তদেব, মনুসংহিতা, ৯/১৮৫, পৃ.২৭০।

৯ তদেব, ৯/১১৮, পৃ.২৬২।

১০ ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৪বঙ্গাব্দ, ৩/৫/২, পৃ. ৩৮৪।

১১ তদেব, ৩/৫/২, পৃ.৩৮৪।

১২ তদেব, ৩/৭/১, পৃ. ৩৯২।

১৩ প্রাগুক্ত, মনুসংহিতা, ৯/১৩৯, পৃ.২৬৫।

১৪ A.S. Altekar, The Position of Women in Hindu Civilization, Motilal Banarsidass, Delhi, 1991, p. 238.

১৫ প্রাগুক্ত, মনুসংহিতা, ৯/১৩০, পৃ.২৬৪।

১৬ তদেব, ৯/১৩২-১৩৩, পৃ.২৬৪।

১৭ তদেব, ৯/১৩৪, পৃ.২৬৪।

১৮ প্রাগুক্ত, ধর্ম ও নারী (সেকাল ও একাল), পৃ.১৯২।

১৯ প্রাগুক্ত, ঋগ্বেদ ২য়, খণ্ড, ১০/৮৫/১৩, পৃ. ৫৭১।

২০ তদেব, ১০/৮৫/২০, পৃ. ৫৭১।

২১ প্রাগুক্ত, মনুসংহিতা, ৯/১৯৪-১৯৫, পৃ.২৭২।

---

[২২] পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩১২ বঙ্গাব্দ), ২/১৪৬-১৪৭, পৃ.১৭৭.

[২৩] P.V. Kane, History of Dharmashastra, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1973, Vol.III, ch. XXVII, p. 619.

[২৪] স্মৃতিচন্দ্রিকা, ২/২৮১।

[২৫] আপস্বম্ভ ধর্মসূত্র, ২/৬১৪/৯।

[২৬] বৌধায়ন ধর্মসূত্র, ২.২.৪৯।

[২৭] প্রাগুক্ত, মনুসংহিতা, ৩/৫২, পৃ.৬১।

[২৮] তদেব, ৫/১৪৭, পৃ.১৫০।

[২৯] তদেব, ৯/১১৭-১১৮, পৃ.২৬২।

[৩০] তদেব, ৯/১৩১, পৃ.২৬৪।

[৩১] প্রাগুক্ত, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রম্, ৩/৫/১, পৃ.৩৮৪।

[৩২] প্রাগুক্ত, মনুসংহিতা, ৯/১০৪, পৃ.২৬০।

[৩৩] তদেব, ৯/১৯৭, পৃ. ২৭২।

[৩৪] A. S. Altekar, The Position of Women in Hindu Civilization, Motilal Banarsidass, Delhi, 1991, p.256.

[৩৫] Ibid., p.257.

[৩৬] আপস্তব ধর্মসূত্র ২/১৪।

[৩৭] প্রাগুক্ত, মনুসংহিতা, ৯/২১৭, পৃ.২৭৫।

[৩৮] কঙ্কর সিংহ, মনুসংহিতা ও নারী, কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০১৫, পৃ.৭৯।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

মহাভারত ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ড. সেরিনা সুলতানা*

Abstract: In this article an attempt has been taken to show the characteristics of the Epic *Mahābhārata.* This work has been written in the kā*vya* style. The *Mahābhārata* is not called a kavaya, it is called an Itihāsa and judged by the standard of a kāvya it is unwisely massive and diffuse. It does not also follow any of the canons prescribed for a mahākāvya by later rhetoricians. But it is thoroughly dramatic in its nature, its personages often appear with real characters and the conflict of actions and reactions of passions against passions of ideals and thoughts of diverse nature come into constant conflict and dissolve themselves into a flow of beneficent harmony. It is a criticism of life, manners and customs and of changing ideals. It is free, decisive and the entire life of ancient India is reflected in it as in a mirror. It contains no doubt descriptions of nature, it abounds also in passages of love but its real emphasis is on life and character and the conflict of different culture and ideals and it shows a state of society in a state of transition. Various stereotyped ideals of old are discussed here and dug to the roots as it were for discovering in and through them a certain fundamental principle which could be the basis of all morality and society. To do good to others is regarded in the *Mahābhārata* as the solid foundation of duty. So society, art and literature, morality, architecture all these aspects have been discussed within this short background.

পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকগণ ভারতবর্ষের যে দুটি গ্রন্থকে মহাকাব্য বা এপিক সংজ্ঞায় ভূষিত করে থাকেন, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এদেরই ইতিহাস রূপে অভিহিত করা হতো। *মহাভারত* প্রণেতা স্বয়ং ব্যাসদেবও *মহাভারতকে* সংহিতা আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। *রামায়ণ* এবং *মহাভারতকে* আদি মহাকাব্যরূপে অভিহিত করা যায়। কারণ আদি মহাকাব্য জাতীয় গ্রন্থকে লোকায়ত ঐতিহাসিক মহাকাব্য (Epic of Growth) এবং কালিদাস, মাঘ প্রভৃতি কবিদের রচনাকে আলঙ্কারিক বা সাহিত্যিক মহাকাব্য বলা হয় (Epic of art বা Literary Epic)। কারুর মতে *ঋগ্বেদের* সংবাদসূক্ত, আখ্যানসূক্ত, দানস্তুতি, নারাশংসী এবং *অথর্ববেদের* কুন্তাপসূক্তগুলোতেই মহাকাব্যের বীজ নিহিত আছে।

বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* স্থান অতুলনীয়। পাশ্চাত্য সমালোচকগণ প্রাচীন গ্রীসের হোমার রচিত *ইলিয়াদ* ও *ওদিসির* সঙ্গে এই দুই আর্ষ মহাকাব্যের তুলনা করে থাকেন। পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকগণ যে দুজাতীয় মহাকাব্য বা এপিকের কথা বলে থাকেন তাদের মধ্যে প্রাচীনতর 'লোকায়ত' বা ঐতিহাসিক মহাকাব্য *ইলিয়াদ, ওদিসি* এই শ্রেণিভূক্ত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "কালে কালে একটি সমগ্র জাতি যে কাব্যকে একজন কবির কবিত্বশক্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায়। যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ, আপনার হৃদয়কে, আপন অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।"[১]

***মহাভারতের* সময় :** *রামায়ণের* রামচন্দ্রকে ত্রেতাযুগের অবতার এবং *মহাভারতে* বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণকে দ্বাপর যুগের অবতার রূপে সর্বজনীন স্বীকৃতি দানে *রামায়ণকে* পূর্ববর্তী বলে ধরে নেয়া যায়। *মহাভারতের* একাধিক স্থলে রাম-কাহিনি এবং রামপ্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। *রামায়ণে মহাভারতের* কোন চরিত্র বা প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই। *রামায়ণের* বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষি বৈদিক ঋষি, কিন্তু মহাভারতকার বেদব্যাস অবৈদিক ঋষি।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রামায়ণের সমাজ অনেকটা বৈদিক যুগের আরণ্য সমাজ। *রামায়ণের* আর্যসভ্যতার প্রভাব রয়েছে। *মহাভারতে* অনেকটা নাগরিক সভ্যতার পরিচয় মেলে। *রামায়ণ*প্রণেতা বাল্মীকিকে আদিকবি রূপে কল্পনা করে নিলে *রামায়ণের* প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হয়।

মহাভারতের মূল কাঠামোটি প্রাচীনতর। ভিন্টারনিৎস্ও মনে করেন- "The older nucleus of the *Mahābhārata* however is probably older than the ancient Rāmāyana."[২] মূল *মহাভারত* ছিল ৮৮০০ শ্লোকাত্মক। পরে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪০০০ শ্লোকাত্মক এবং বর্তমানে লক্ষ শ্লোকাত্মক। বিশেষজ্ঞদের মতে *মহাভারতের* 'জয়' নামক মূল অংশ বেদব্যাস কর্তৃক রচিত হয়। মোটামুটি ৮৮০০-১০০০০০ শ্লোকে প্রথম পর্যায়ে (আ.খ্রি. পূ. ১০০০ অব্দে), দ্বিতীয় পর্যায়ে তা বৈশম্পায়ন কর্তৃক পরিবর্ধিত হয় 'ভারত' নামে ২৪০০০ শ্লোকযুক্ত হয়ে (আ.খ্রি.পূ. ৬০০-৫০০ অব্দে) এবং তৃতীয় পর্যায়ে সৌতি কর্তৃক লক্ষ শ্লোকাত্মক *মহাভারতে* রূপান্তরিত হয় (আ. ৪০০ খ্রি.) মহাভারতকার বলেছেন- "ততোঽধ্যায়সহস্রাণাং শতঞ্চক্রে স্ববুদ্ধিজম্।"[৩] বর্তমানে *মহাভারতের* শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার, পরিশিষ্ট বা খিলসহ লক্ষাধিক। প্রসিদ্ধ গ্রীক মহাকাব্যদ্বয় *ইলিয়াদ* ও *ওদিসির* সম্মিলিত আকৃতি অপেক্ষাও এটি আটগুণ বৃহৎ।

***মহাভারত* অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত :** আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, গদা, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মুষল, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ পর্ব। এছাড়াও পরিশিষ্ট বা খিলরূপে রয়েছে হরিবংশ- শ্লোকসংখ্যা ১৬,৩৭৪। অনেকে মনে করেন, ব্যাসদেব স্বয়ং রচনা করেছিলেন ৮,৮৮৪টি শ্লোকবিশিষ্ট-

"অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ।

শ্লোকাশ্চ চতুরাশীতির্মুনিনোক্তা মহাত্মনা ॥"

মূল কাব্য সম্ভবত আখ্যায়িত হতো 'জয়' নামে (ততো জয়মুদীরয়েৎ)। ব্যাসদেব এটি শিক্ষাদান করেন পুত্র শুক এবং বৈশম্পায়ন আদি শিষ্যদের। সম্ভবত ঋষি বৈশম্পায়নের হাতে পরিবর্ধিত হয়ে ২৪০০০ শ্লোকবিশিষ্ট *ভারতসংহিতা* ('চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্') নামে পরিচিত হয়। জনমেজয়ের 'সর্পযজ্ঞে' বৈশম্পায়ন এটি পাঠ করেন এবং সেখানে সৌতি এটি গ্রহণ করেন। পরে নৈমিষারণ্যে শৌনক অনুষ্ঠিত যজ্ঞে সৌতি সম্ভবত লক্ষশ্লোকাত্মক ('শতসাহস্রিকীম্') *মহাভারত* রূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। পণ্ডিতদের অনুমান মূল কাহিনিটি কুরু পাঞ্চালের বিবাদঘটিত ছিল, পাণ্ডবদের কাহিনি পরে সংযোজিত হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, প্রাথমিক স্তরে পাণ্ডবপক্ষই ছিল দুরাচারী ও ধর্মদ্বেষী, পরে গোটা ব্যাপারটিকেই ঘুরিয়ে দেয়া হয়। মূল কাহিনির পরিবর্তন সাধন করতে গিয়ে শুধু যে এই কাহিনি অংশেই পরিবর্তন, পরিবর্ধন ঘটেছে তা নয় এতে এমন অনেক পার্শ্বকাহিনি যুক্ত হয়েছে যাদের সঙ্গে মূলকাহিনির কোন যোগসূত্র খুজে পাওয়া যায় না। বিষয়বস্তুর দিক থেকে কাহিনিগুলোকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা চলে- (১) প্রেম ও বীর্যমূলক উপাখ্যান (২) ধর্মমূলক উপাখ্যান (৩) নীতিমূলক উপাখ্যান।

মহাভারতে ভারতের সমাজজীবনের একটি সামগ্রিক পরিচয় বিবৃত হওয়াতে এটি একটি কোষগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। বাংলার বহু প্রচলিত প্রবাদবাক্যটি 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে' সত্যই যথাযথ। ভিন্টারনিৎসের মতে- "In any case our *Mahābhārata* is not only the heroic poem of the battle of the Bhāratas, but at the same time also a repertory of the whole of the old bard poetry."[৪] *মহাভারতের* তিনরকম সংস্করণ প্রচলিত আছে উত্তর ভারতীয় বা বঙ্গদেশীয়, দক্ষিণ ভারতীয় বা তেলেগু এবং মালাবার বা মুম্বাই সংস্করণ। পণ্ডিতদের মতে মালাবারী সংস্করণ খ্রি.পূ. দ্বিতীয় শতকেই সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল।

আবহমান বিশ্বসাহিত্যে *মহাভারত* এক তুলনাহীন সমগ্রতায় বিরাজমান। এই একটি বিপুল মহাকাব্য ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্মচেতনার সমগ্রতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের যা কিছু তার সমগ্র তত্ত্ব ও তথ্য ঋষি কবি তাঁর এই *ভারত সংহিতাতে* অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বৈশম্পায়ন যথার্থই বলেছেন-

"ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভারতর্ষভ।

যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ ॥"[৫]

মহাভারতের আদিপর্বের প্রথমাংশেই এই ভারতকথা নানা নামে চিহ্নিত হয়েছে। ঋষিরা এর নাম দিলেন ইতিহাস, স্বয়ং ব্যাসদেব বললেন "কাব্যং পরমপূজিতম্"[৬] আরও বলা হয়েছে পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র, এর দ্বারা শ্রুতিরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশিত হয়েছে।[৭] ইতিহাস এবং পুরাণের দ্বারাই বেদার্থের বিস্তার করতে হয়- "ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।"[৮] *মহাভারত* এক অর্থে এমন একটি বিপুল বিস্তৃত বিশ্বকোষ যে এই সব ভিন্ন ভিন্ন নামসত্ত্বেও একে একটি বিশেষ সংজ্ঞার সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। ভারতভূমিতে প্রচলিত সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান, সমস্ত ভাবনা, সাধনা, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের সমস্ত তত্ত্ব, নীতি ও বিধিবিধান, অজস্র ইতিহাস, পুরাণ, কিম্বদন্তী, উপাখ্যান ও উপকথা, বিচিত্র লোকবিদ্যা ও প্রবচন, জীবনের নানা দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংশয় ও সম্ভাবিত সমাধান- এমন বিচিত্র মননধারার সর্বাঙ্গীণ সমাবেশ *মহাভারতে* ঘটেছে। তাই একে বলা হয় পঞ্চমবেদ। স্ত্রীশূদ্রনির্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে এটা জানার ও বোঝার। এর সঙ্গে সূক্ষ্ম যোগসূত্র আজও অক্ষুণ্ণ। ভারতের যুগযুগান্ত চিন্তধারার সবগুলো স্রোতচিহ্ন *মহাভারতেই* বর্তমান। *মহাভারত* সমুদ্রের মতো অনন্ত রত্নের আকর। *মহাভারতেই* তাই বলা হয়েছে-

"যথা সমুদ্রো ভগবান্ যথা মেরুর্মহাগিরিঃ।

উভৌ খ্যাতৌ রত্ননিধী তথা ভারতমুচ্যতে ॥"[৯]

প্রকৃতপক্ষে *মহাভারত* হল এক সামগ্রিক সাহিত্য। Winternitz তাই মন্তব্য করেছেন- "Indeed in a certain sense, the *Mahābhārata* is not one poetic production at all, but rather a whole literature."[১০]

মহাভারতের মূল কাহিনি

মহাভারত ১৮টি পর্বে বিভক্ত একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সংক্ষিপ্তাকারে এই পর্বগুলোর বিষয়বস্তু বর্ণিত হচ্ছে-

আদিপর্ব : *মহাভারত* কাহিনির নায়ক যুধিষ্ঠির এবং প্রতিনায়ক দুর্যোধন উভয়েই কুরুবংশীয় নৃপতি। এই পর্বে চন্দ্রবংশের ইতিহাস কৌরব ও পাণ্ডবদের উৎপত্তির বিবরণ কুরুর বংশে বিচিত্রবীর্যের স্ত্রীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র জন্মে। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন তাই পাণ্ডু রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃশাসন ইত্যাদি শতপুত্র এবং পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব নামে পাঁচপুত্র জন্মগ্রহণ করে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়েই বাস করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁরা নানা বিদ্যা ও বলবিক্রমে ভূষিত হন। কৌরবেরা তাঁদের ঈর্ষ্যা করতে শুরু করেন। দুর্যোধন মাতুল শকুনি এবং বন্ধু কর্ণের পরামর্শে পাণ্ডবদেরকে বারণাবতে পাঠিয়ে জতুগৃহদাহে পুড়িয়ে মেরে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। পঞ্চপাণ্ডব সেই গোপন অভিসন্ধি জানতে পেরে জতুগৃহের সুরঙ্গপথে কুন্তীসহ পালিয়ে যান। তাঁরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বনে বনে ঘুরে দ্রুপদের রাজসভায় উপস্থিত হন। সেখানে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় অর্জুন শরপ্রয়োগে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করেন। ফলে দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডব ভ্রাতৃগণের বিবাহ হয়। যুধিষ্ঠির অর্ধেক রাজ্য পেয়ে ভাইদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থনগরী নির্মাণ করে সেখানে বাস করেন।

সভাপর্ব : শকুনির সঙ্গে পাশা খেলায় আমন্ত্রিত যুধিষ্ঠির রাজ্য, ভাই এমনকি দ্রৌপদীকেও পণ রেখে পরাজিত হন। সভামধ্যে দ্রৌপদীর প্রতি দুর্যোধন ও দুঃশাসন যে নির্যাতন করেন তা কৌরবদের ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায়। অমঙ্গল আশঙ্কায় ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের ছেড়ে দেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রিত যুধিষ্ঠির সেবারও পরাজিত হন এবং পরাজয়ের ফলে পাণ্ডবদের দ্রৌপদীসহ তেরো বৎসর বনগমন করতে হয়।

বনপর্ব : এখানে বনবাসের বিবরণ এবং অর্জুনের দিব্যাস্ত্র সংগ্রহের কাহিনি দৃষ্ট হয়। বনবাসের শেষ বৎসর তাঁরা বিরাট রাজের সভায় ছদ্মবেশে কাটান।

বিরাটপর্ব : গোধন হরণ করার ছলে কৌরবেরা বিরাট রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু কৌরবগণ পরাজিত হন এবং পাণ্ডবদের পরিচয় প্রকাশ পায়।

উদ্যোগপর্ব : বনবাস থেকে ফিরে যুধিষ্ঠির অর্ধরাজ্য এমন কি পাঁচখানা গ্রাম পর্যন্ত চাইলেন। উদ্ধত দুর্যোধন সূচ্যগ্র মেদিনীও দিতে রাজী হলেন না। উভয়পক্ষে যুদ্ধের আয়োজন হলো। এটিই উদ্যোগপর্ব। কুরুক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধের দামামা বাজল। আত্মীয়স্বজনকে সম্মুখে দেখে অর্জুন বিষণ্ন হয়ে গাণ্ডীব ত্যাগ করলেন। সারথি শ্রীকৃষ্ণ *গীতার* উপদেশে অর্জুনকে স্বধর্ম পালনে উৎসাহিত করলেন। ভীষ্মপর্বে ভীষ্মের নেতৃত্বে, দ্রোণপর্বে দ্রোণের নেতৃত্বে এবং কর্ণপর্বে কর্ণের নেতৃত্বে পরপর ঘোর যুদ্ধ হলো। ভীষ্ম শরশয্যায় নিপতিত হলো। দ্রোণাচার্য পুত্রের মৃত্যুর সংবাদে শোকে অস্ত্রত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করলেন। কর্ণের রথচক্র বিকল হলে তিনিও নিহত হলেন। যুদ্ধের শেষ অষ্টাদশ দিবসে যুধিষ্ঠির কর্তৃক শল্য নিহত হন। শেষে ভীমের হাতে গদাযুদ্ধে উরুভঙ্গবশত দুর্যোধন নিহত হন। দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা মধ্যরাতে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করে পিতৃহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে হত্যা করেন। এটি সৌপ্তিক পর্বের বিষয়বস্তু।

স্ত্রীপর্ব : যুদ্ধের অবসানে স্ত্রীপর্বে শ্মশানভূমিতে ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী ও অন্যান্য অগণিত স্ত্রীজনের সমবেত করুণ বিলাপ শোনা যায়। শোকসন্তপ্ত যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনার জন্য ব্যাসদেবের উপস্থিতিতে ভীষ্মের শরশয্যাকালীন উপদেশের কথা শোনান হয়।

শান্তিপর্ব : এই পর্বে রাজধর্ম আলোচিত হয়েছে।

অনুশাসনপর্ব : এই পর্বে ধর্মশাস্ত্রের নীতি ও মোক্ষধর্মের উপদেশ বিবৃত হয়।

আশ্বমেধিক পর্ব : এই পর্বে উত্তরার গর্ভে অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের জন্ম ও যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়।

আশ্রমবাসিক পর্ব : এই পর্বে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বাণপ্রস্থ প্রবেশ এবং তাঁদের মৃত্যুর বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

মৌষলপর্ব : এই পর্বে আত্মঘাতী যুদ্ধে মুষলের মাধ্যমে যদুবংশের ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের আকস্মিক মৃত্যু বর্ণিত হয়।

মহাপ্রস্থানপর্ব : এই পর্বে যুধিষ্ঠির ভাইদের সাথে হিমালয়ের পথে প্রস্থান করেছেন।

স্বর্গারোহণপর্ব : এই পর্বে পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণের বিবরণ দৃষ্ট হয়।

কৌরব ও পাণ্ডবদের বিরোধ, পাণ্ডবদের নানা অবস্থা বিপর্যয়ের পরে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় অষ্টাদশ দিবসব্যাপি মহাযুদ্ধের অবসানে ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবদের জয়লাভ এই মহাকাব্যের মূল ঘটনা। এই মূল ঘটনায় কোন না কোন প্রসঙ্গ ধরে অসংখ্য অবান্তর কাহিনির অনুপ্রবেশ মহাকাব্যের আয়তনকে অনেকাংশে বর্ধিত করেছে। কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাহিনি হল- দুষ্যন্তশকুন্তলার উপাখ্যান, যযাতির উপাখ্যান, নল

দময়ন্তীর কাহিনি, বিদুলার উপাখ্যান, রামোপাখ্যান, শিবিকথা, কদ্রু ও বিনতার উপাখ্যান, মনুমৎস্য উপাখ্যান। এসব কাহিনি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে *মহাভারতের* মূল কলেবরে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

মহাভারতের কয়েকটি মুখ্য চরিত্র

কৃষ্ণ : কৃষ্ণ মুখ্য চরিত্রগুলোর অন্যতম। কৃষ্ণ একবার ঈশ্বরীয় রূপ দেখিয়ে তারপর কৌরবদের ক্রমশ পাপের পথে নিয়ে গিয়েছেন। কৃষ্ণ অপরাজেয় বীর ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। উত্তর ভারতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, তা প্রথমে যুধিষ্ঠিরের দ্যূতান্ধতার ও পরে ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের লোভে ও ভীষ্ম দ্রোণের দুর্যোধনের দাবী অন্যায় জেনেও তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করায় ব্যর্থ হয়। শেষ জীবনে নূতন নীতিমূলক ভক্তিবাদী প্রবৃত্তি লক্ষণ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা দ্বৈপায়ন ঋষি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের চেষ্টায় নষ্ট হয়ে যায়। তথাপি এর থেকে ভারতবর্ষে ক্রমে ভক্তিবাদী ভাগবত ধর্মের বিকাশ হয়।

যুধিষ্ঠির : *মহাভারত* কাহিনির নায়ক ভীম অর্জুনের মতো শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বা ধনুর্ধর নন তিনি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে নয় চরিত্রগুণেও তিনি সকলের মান্য। তিনি উত্তম রথী ছিলেন। রথ যুদ্ধে একাধিকবার যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে পরাজিত করেছেন। শাস্ত্র বিদ্যায় যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কুন্তী একবার বলেছিলেন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের মতো তিনি অধ্যয়ন ও যজ্ঞ নিয়ে থাকতে চান তা ছেড়ে তাকে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম অনুসারে কাজ করতে হবে। হস্তিনাপুরে শিক্ষাকালে তিনি ম্লেচ্ছ ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, বারণাবতে নির্বাসনকালে বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় গৃহদাহ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন তা কেবল যুধিষ্ঠির বুঝেছিলেন।

অর্জুন যখন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন তখন যুধিষ্ঠির প্রথম অর্জুনকে বলেছিলেন তুমি লক্ষ্যভেদ করে কন্যাকে জয় করেছ তুমি একে যথারীতি বিবাহ কর। অর্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ না হলে বিয়েতে রাজী না হলে যুধিষ্ঠির স্থির করলেন দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী হবেন।

যুদ্ধশেষে জ্ঞাতি, পুত্র, বন্ধু, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণ প্রভৃতির মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয়ে যুধিষ্ঠির রাজ্যত্যাগ করে অরণ্যে বাসের কথা বলেছিলেন। এইরূপ সাময়িক প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক নয়।

যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে কলঙ্ক তাঁর মিথ্যাভাষণ নয়, কোন মিথ্যাভাষণ তিনি করেননি। তাঁর কলঙ্ক দ্যূতমত্ততায় শুভবুদ্ধি আচ্ছন্ন হতে দেয়া, তাঁর ভাইদেরকে নিজেকে ও দ্রৌপদীকে দ্যূতের পণ করা। বনপর্বে ৩৪ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির তাঁর মনোভাব বুঝিয়ে বলেছেন দ্যূতকালে পাশার দান প্রতিবারই শকুনির ইচ্ছামতো পড়ে দেখে তিনি অনুমান করেন শকুনি শঠতা করছে। কিন্তু ক্রোধবশত নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি। দ্যূতের জয়ে শঠতা থাকলে সেই দ্যূতের জয়ের শর্ত কার্যকর নয়, সে কথা যুধিষ্ঠির স্বীকার করতে চান নি। যুধিষ্ঠির যদি কৃষ্ণের কথামতো দ্যূতের পণের শর্ত পালনীয় নয় মেনে নিয়ে যুদ্ধে সম্মতি দিতেন তাহলে বোধহয় যুদ্ধ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মতো বিধ্বংসী হতো না।

দুর্যোধন : *মহাভারতের* কাহিনিতে দুর্যোধন প্রতিনায়ক। তাঁর ধারণা ছিল হস্তিনাপুরের সমস্ত রাজ্য তাঁর প্রাপ্য। বাল্যকাল থেকেই দুর্যোধন পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। হস্তিনাপুর রাজ্য ভাগ করা হলো, ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করে পাণ্ডবগণ তাঁদের রাজ্যার্দ্ধ সুসমৃদ্ধ করে তোলেন। দৌত্যকালে দুর্যোধন কৃষ্ণের সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখান করে সভা ছেড়ে গেলে ভীষ্ম বলেন দুর্যোধন দুর্বিনীত, তাঁর কয়েকজন পরামর্শদাতা আছে সে সকলকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। দুর্যোধন দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর অপমান করে তাঁর চরিত্রের হীনতা প্রকাশ করেছিলেন। উদ্যোগপর্বে বলেছেন-

> "যথৈবেশ্বরসৃষ্টোঽস্মি যদ্ ভাবি যা চ মে গতিঃ।
>
> তথা মহর্ষের্বর্তামি কিং প্রলাপঃ করিষ্যতি ॥"[১১]

নিজের ভ্রান্ত সংস্কার বশে জীবন চালিত করে দুর্যোধন নিজেকে ও ক্ষত্রিয় কুলকে বিরাট ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র : ধর্মকথা শোনার ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্রের কোন ক্লান্তি ছিল না। অন্যায় অধর্ম জেনেও অনেক কাজ তিনি করেছেন। পাণ্ডবগণকে বারণাবতে নির্বাসন দিয়ে তাদের মৃত্যুর মুখে ফেলা, দ্যূতক্রীড়া থেকে নানা অমঙ্গল হয় জেনেও দ্যূতক্রীড়ার আহ্বান করা, দ্রৌপদী কৌরবসভায় অপমানিত হচ্ছেন জেনে যথাকালে তার প্রতীকার না করা, দুর্যোধনের পাণ্ডবদেরকে ফিরিয়ে না দেয়ার দুরভিসন্ধি আছে জেনেও সমগ্র রাজ্যভার তার হাতে ছেড়ে দেয়া। কৃষ্ণের সন্ধির প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বুঝেও দুর্যোধনকে সে প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য না করা। রাজ্যভার ও শেষ সিদ্ধান্তের দায়িত্ব দুর্যোধনের বলে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করা সবই তাঁর পক্ষপাতিত্বের নিদর্শন। ধৃতরাষ্ট্র সম্পর্কে বহুল প্রচলিত একটি শ্লোক প্রযোজ্য, যদিও শ্লোকটি *মহাভারতে* স্থান পায় নি-

"জানামি ধর্ম ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম ন চ মে নিবৃত্তিঃ।

কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥"

ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম কি তা জেনেও অবলম্বন করেন নি। তাঁর হৃদয়স্থিত প্রবৃত্তি- লোভ ও পুত্রের প্রতি অন্ধস্নেহই তাঁর দুর্বলতা।

***মহাভারতের* শান্তিপর্বে বর্ণিত রাজধর্ম :** *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে যখন বলবত্তর মানুষের অত্যাচারে লোকেরা এদিক ওদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তখন তাদের সবাইকে রক্ষার জন্য ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করেছিলেন-"রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।"[১২] *মহাভারতে* যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেছেন এই যে রাজা বলে শব্দটি শুনি এই রাজার উৎপত্তি হলো কি করে ? মানুষের মতোই এদের দেখতে, মানুষের মতোই হাত পা, মুখ, পিঠ, অস্থিমজ্জা সবকিছু। সাধারণের মতই এদের জন্ম মৃত্যু সব কিছু আছে। কেমন করে এই রাজা হাজারো বুদ্ধিমান আর মহারথীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেন- "বিশিষ্টবুদ্ধীন্ শূরাংশ্চ কথমেকোধিতিষ্ঠতি ?"[১৩] এই যে একটি মানুষের উপর জগতের সকলের নির্ভরতা তার কারণ খুব অল্প হবে বলে মনে হয় না।

ভীষ্ম বললেন তখন রাজাও ছিল না, দণ্ডও ছিল না, দণ্ডদাতাও ছিল না। সকলে নিজে নিজেই একধরনের শৃঙ্খলা পালন করে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করত। এই অবস্থাকে মহামতি রুশোর Naturalistic Eden এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পরে মানুষের মধ্যে লোভ, মোহ জন্মাল। এক একজনের মধ্যে প্রতিপত্তির নেশা এতই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল যে সমস্ত শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে গেল- "প্রতিপত্তিবিমোহাচ্চ ধর্মস্তেষামনীনশৎ।"[১৪] ভীষ্ম বলেছেন অরাজক রাজ্যে পাপীদের পাপকর্ম করার মধ্যেও শৃঙ্খলা থাকে না বলে তারা সুখে থাকেন। এমন অবস্থায় দুজন মানুষ একজোট হলেই ধনসম্পত্তি লুট হয়ে যায়।

মহাভারতে বলা হয়েছে অরাজকতার মধ্যেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা একজোট হয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন- "সমেত্য তাস্ততশ্চক্রু সময়ানিতি নঃ শ্রুতম্।" সমবেত মানুষেরা তখন পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন আমাদের রক্ষা করার মতো কেউ নেই। আমাদের সর্বনাশ আসন্ন, আপনি আমাদের এমন একজন মানুষ দিন যাকে আমরা সকলে সম্মান করব এবং যিনি আমাদের সকলকে রক্ষা করবেন।

ধর্মশাস্ত্রের দৃষ্টি থেকে রাজার ধর্ম বা তাঁর দণ্ডনীতির উদ্দেশ্য কী হতে পারে তার একটি নমুনা *মহাভারতে* দেয়া আছে। *মহাভারতে* বলা হয়েছে লোভ বা অধর্মের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়ে কখনো ধনলাভের চেষ্টা করো না। আরও বলা হয়েছে অর্থলাভের ইচ্ছা থেকেই হিংসার সৃষ্টি হয়, আর এই অর্থের জন্য রাজা প্রজাদের ওপর শাস্ত্রবহির্ভূত কর চাপিয়ে উৎপীড়ন সৃষ্টি করেন।[১৫]

প্রাচীন রাজনীতিশাস্ত্রে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারটি উপায় যথেষ্ট বিখ্যাত শব্দ। ধৃতরাষ্ট্র যে এই চারটি মোক্ষম উপায়ের কথা জানেন না, তা মোটেই নয়। তিনি এতদিন সিংহাসনে বসে রাজ্য চালাচ্ছেন, বিশেষত অন্ধত্বের দরুন, তাঁর বাস্তববোধ কিছু কম হলেও তাত্ত্বিকতার ক্ষেত্রে তিনি কিছু কম পোক্ত নন।

একমাত্র দণ্ডই পারে বিপথগামী প্রজাদের ঠিক পথে নিয়ে আসতে। দণ্ড প্রজাদের যোগক্ষেম বহন করে ঠিকপথে পরিচালিত করে। *মহাভারতে* বলা হয়েছে আগে রাজা আছে কিনা দেখো, তারপর বিয়ে করো, তারপর টাকা পয়সার কথা ভেবো।[১৬]

মহাভারতের গল্পে দেখা যায় কুন্তীর কাছে বকরাক্ষস অভিযোগ করেছেন এদেশের রাজা কিছুই করেন না। ন্যায় অন্যায়ের বোধ নেই। প্রজারা কী করে সুখে এবং নিশ্চিন্তে থাকবে তারও কোন লক্ষ্য নেই। আমরা এক কুরাজার রাজ্যে বসবাস করছি। কুরাজার রাজ্যে বিয়ে করলে লোকে বউ নিয়ে পালায়, টাকা পয়সা হলেও চোরে নিয়ে পালায়। আমার এটাই হয়েছে। তাই আগে দেখতে হবে রাজা ভালো আছে কি না, তারপর বিয়ে, তারপর টাকা পয়সা। *মহাভারতে* বকরাক্ষসের কাহিনি এক বলবত্তর ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারের কাহিনি। *মহাভারতের* শান্তিপর্বে যেখানে রাজনীতির ক্রমিক উপদেশ দেয়া হয়েছে সেখানেও বলা হয়েছে মানুষ যদি পুত্রপরিবার নিয়ে ভালোভাবে বাঁচতে চায় তাহলে রাজার কথা আগে ভাবতে হবে।[১৭]

মহাভারতের শান্তিপর্বে বসুমনা বৃহস্পতিকে মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সুখ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। এতে মানুষের ঐহিক সমৃদ্ধি এবং সুখই ছিল বড় প্রশ্ন। উত্তরে বৃহস্পতি বার বার অরাজক অবস্থার কথাই বলেছেন। বৃহস্পতি *মহাভারতে* বলেছেন- মানুষের সকল ধর্ম বা সুখের মূলে আছেন রাজা, সেজন্যই প্রজারা একে অপরকে খেয়ে ফেলছে না।[১৮] মহাভারতকারের ভাষায় সেই রাজাকেই সবচেয়ে ভালো বলা যাবে যে রাজার পুরবাসী এবং রাষ্ট্রবাসীরা টাকা-পয়সার সঞ্চয় বা হিসাব চেপে রাখে না, যারা ন্যায়নীতি এবং অন্যায়ের ভেদটুকু জানে, যারা নিজের কাজ ঠিকমতো করে। যারা সংযমী, যাদের সহজে বশে আনা যায়, যারা নিজেদের মধ্যে কখনো ঝগড়াবিবাদ করে না- এইরকম মানুষেরা যে জনপদে থাকে, সেই জনপদের রাজা আসল রাজা।[১৯]

***মহাভারতে* বর্ণিত অধ্যাত্মবাদ ও দর্শন :** সমগ্র *মহাভারতে* নীতি, ধর্ম ও মোক্ষবিষয়ক রচনাসমূহের মধ্যে *শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাই* সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই *গীতা* ৭৫০টি শ্লোকে অষ্টাদশ অধ্যায়ে নিবদ্ধ এবং ভীষ্মপর্বের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধবিমুখ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সকল তত্ত্বোপদেশ দান করেছিলেন তাদের সংকলনই সর্বোপনিষৎসার *শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোপনিষদ্‌* রূপে খ্যাত। এতে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ- এই তিন পথের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। যোগ শব্দটি বিশেষ অর্থবোধক। সর্বতোভাবে কর্মে কুশলতা লাভই যোগের মূল কথা- 'যোগঃ কর্মসু কুশলম্‌'।[২০] আত্মার অবিনশ্বরত্ব, নিষ্কাম কর্মযোগ এবং পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ- এই তিনটি হলো *গীতার* মর্মবাণী। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে উপদেশের মাধ্যমে পৃথিবীর বন্ধনে আবদ্ধ সকল মানুষকে কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ করেছেন। নিষ্কাম কর্ম ব্রহ্মজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। সেই কর্মের ফল ভগবানকে সমর্পণ করলে মনে ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়। এভাবেই ঘটে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিতয় সঙ্গম। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর। তিনি সর্বভূতে বিরাজমান পরম ঈশ্বরস্বরূপ। সেই সচ্চিদানন্দকে আশ্রয় করলেই সকল চিন্তার অবসান। শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে বলেছেন- "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"[২১] *গীতা* ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব। *গীতার* রচয়িতা একাধারে কবি ও দার্শনিক। *গীতা* সম্পর্কে Winternitz তাই বলেছেন- "In India itself there is scarcely any book which is read so much and esteemed so highly as the *Bhagavadgita*."[২২]

***মহাভারতের* সমাজ :** ভারতবর্ষের ধর্ম, কর্ম ও সমাজনীতির চিরাগত আদর্শ আছে যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। *মহাভারতের* বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও সেগুলো স্বকীয় গৌরবে চির ভাস্বর। এই গৌরবমণ্ডিত চরিত্রগুলো আজও ভারতবাসীর আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস।

সাহিত্যে সমাজজীবনের ছায়াপাত ঘটে এটি ধ্রুব সত্য। আদিম জীবনের কিছু সমাজচিত্র যা পরবর্তীকালে অস্বীকৃত হয়েছিল তেমন কিছু পরিচয় চিহ্ন *মহাভারতে* দুর্লভ নয়। রবীন্দ্রনাথ *রামায়ণ*, *মহাভারত* আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন- "ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।"[২৩]

মহাভারতের কালে আর্যদের সমাজব্যবস্থা সুসমঞ্জস রূপ পরিগ্রহ করে। আদিমযুগোচিত কিছু কিছু প্রথার প্রচলন বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এর মধ্যে অন্যতম একটি নিয়োগপ্রথা। নিঃসন্তান অবস্থায় বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হলে মাতা সত্যবতীর আদেশে মুনি বেদব্যাস বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর জন্মদান করেন। *মহাভারতের* যুগে কানীন সন্তানরাও সমাজে যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে স্বীকৃতি পেত তার প্রমাণ স্বয়ং ব্যাসদেব। মহাবীর কর্ণও ছিলেন কুন্তীর কানীন পুত্র। উচ্চশ্রেণির মধ্যেও রাক্ষসবিবাহ প্রচলিত ছিল। দেবব্রত ভীষ্ম তাঁর ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে তিন ভগিনীকে অপহরণ করে নিয়ে এনেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রধানা মহিষী রুক্মিণীকে অপহরণ করে এনে বিবাহ করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে অপহরণ করে বিয়ে করেছিলেন অর্জুন। সতীদাহ প্রথা সে-সময়ে প্রচলিত ছিল। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী মাদ্রী সহমরণ বরণ করেন।

এ যুগে সমাজ ছিল কৃষিনির্ভর। আর্যযুগ বহুপূর্বে অতিক্রান্ত হওয়াতে আর্যদের আর পশুমাংসের উপর নির্ভর করে থাকতে হতো না। মৃগয়া প্রচলিত ছিল। শস্যই ছিল মূল আহার্য। বৈশ্যদের উপর কৃষির উন্নতি নির্ভর করত। বিদেশী বণিকদের সঙ্গেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। মৎস্যাহার নিষিদ্ধ ছিল না। *মহাভারতে* মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে।

মহাভারতকে পঞ্চম বেদ আখ্যা দেয়া হয়। 'অশ্বমেধ', রাজসূয় প্রভৃতি বৈদিক যজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠিত হলেও প্রাচীন বৈদিক দেবতাগণ *মহাভারতের* যুগে গুরুত্বহীন হয়ে ওঠেন। দেবতারাও *মহাভারতে* মানবিক রূপ ধারণ করেছেন। কিরাতবেশী মহাদেবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধের কথা *মহাভারতে* উল্লেখ করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু বা নারায়ণ এবং প্রলয়কর্তা রুদ্র বা শিব এই ত্রিমুর্তির উল্লেখ *মহাভারতে* রয়েছে। *মহাভারতে* সন্নিবিষ্ট ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য, লৌকিক নীতি ও উপদেশ, ধর্ম ও দর্শনের উন্নত চিন্তাধারা আবহমান কাল ধরে ভারতীয়দের সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে আসছে। সাংখ্য এবং যোগ *মহাভারতের* মূল দার্শনিক মতবাদ হলেও বেদান্তমতও দুর্লভ নয়। পাণ্ডবদের পঞ্চ ভ্রাতার দ্রৌপদীকে বিয়ে করাও এক আশ্চর্য ঘটনা। *মহাভারতের* কালে আর্যসমাজে পুরুষ প্রাধান্য ছিল।

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও জাতিভেদ প্রথা ছিল না। *গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন- "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।" সমাজে ব্রাহ্মণের কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। ব্রাহ্মণ শুধু অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিয়েই থাকবেন। তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ ও অর্থসাহায্য করা রাজার ধর্ম। *মহাভারতের* ভীষ্ম, শ্রীকৃষ্ণ ও বিদুর কেউই ব্রাহ্মণ সন্তান নন। ব্রাহ্মণ সন্তান দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য দুজনেই ছিলেন কৌরবদের অস্ত্রগুরু।

মহাভারতের যুগে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু *মহাভারতেই* 'পুরুবংশানুকীর্তন' নামক অধ্যায়ে একজন ধার্মিক লোককে প্রজারা রাজা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন এমন প্রমাণ মিলে। শান্তিপর্বে রাজা কিভাবে রাজ্যশাসন করবেন তার নির্দেশ রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলবান ও শাস্ত্রজ্ঞ ক্ষত্রিয়, ধনবান বৈশ্য ছিল।

সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় *মহাভারতের* প্রভাব : সাহিত্যে *মহাভারতের* প্রভাব সুদূরপ্রসারী। প্রথিতযশা নাট্যকার ভাসের দূতবাক্য, কর্ণভার, পঞ্চরাত্র, উরুভঙ্গ, দূতঘটোৎকচ এবং মধ্যমব্যায়োগ নাটকের কাহিনি *মহাভারত* থেকে গৃহীত। মহাকবি কালিদাস *মহাভারত* থেকে উপাদান গ্রহণ করে স্বকীয় প্রতিভায় *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটক লিখেছেন। *বিক্রমোর্বশীয়* নাটকের কাহিনিও *মহাভারতমূলক*। ভারবির *কিরাতার্জুনীয়*, মাঘের *শিশুপালবধ*, শ্রীহর্ষের *নৈষধচরিত*, ভট্টনারায়ণের *বেণীসংহার*, রাজশেখরের *বালভারত*, ক্ষেমেন্দ্রের *ভারতমঞ্জরী* প্রভৃতি মহাকাব্য ও নাটকের আখ্যানভাগ *মহাভারত* থেকেই গৃহীত। অমরচন্দ্রের *বালভারত*, দেবপ্রভ সূরির *পাণ্ডবচরিত্র*, জৈন কবি শুভচন্দ্রের *পাণ্ডবপুরাণ*, ত্রিবিক্রম ভট্টের *নলচম্পূ* প্রভৃতি গ্রন্থ *মহাভারতের* কাহিনিকে উপজীব্য করেই রচিত হয়েছে। কবিরাজ কবি প্রণীত *রাঘবপাণ্ডবীয়* মহাকাব্যে *রামায়ণ* ও *মহাভারত* এই উভয় মহাকাব্যের কাহিনি দ্ব্যর্থক শ্লোকে একই সঙ্গে গ্রথিত হয়েছে। কেবল আখ্যানভাগে নয় বিভিন্ন বর্ণনীয় বিষয়েও উত্তরকালের কবিরা *মহাভারতের* বর্ণনারীতিতে প্রভাবিত হয়েছে। *মহাভারতের* অমৃতধারা ভারতীয় কবিমানসকে অভিষিক্ত করেছে। ব্যাসদেব ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন- "সর্বেষাং কবিমুখ্যানামুপজীব্যো ভবিষ্যতি" অর্থাৎ তাঁর *মহাভারতকথা* সর্বকালের কবিদের উপজীব্য হবে। মহর্ষির সেই প্রত্যাশা ফলপ্রসু হয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্যেও *মহাভারতের* প্রভাব অসামান্য। বাংলাভাষায় কাশীরাম বিরচিত *মহাভারত* বাঙালীর কাব্যরসপিপাসু হৃদয়কে কাব্যরসে বারিধিতে অবগাহন করিয়েছে। বাংলায় রচিত অন্যান্য *মহাভারতের* মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত *পাণ্ডববিজয়*, শ্রীকর নন্দীর *অশ্বমেধকথা* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও *মহাভারত* রচিত হয়েছে। শ্যাম, যব, বালি প্রভৃতি দ্বীপে একসময়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে *মহাভারত* পাঠ করা হতো।

বাংলাসাহিত্যের উপরও *মহাভারতের* প্রভাব অসামান্য। কবি মধুসূদনের বীরাঙ্গনা ও শর্মিষ্ঠা কাব্যের বিষয়বস্তু *মহাভারতের* আখ্যানভাগের পরিচয় দেয়। *মহাভারতের* প্রভাব নিয়ে তাই কবি মধুসূদন দত্ত বলেছেন-

"মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
হে কাশী কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্ ॥"

হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যের উপাদানও *মহাভারত* থেকে আহৃত। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'পাণ্ডবগৌরব', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'জনা' প্রভৃতি নাটকের কাহিনি *মহাভারতমূলক*।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন', প্রভৃতি বাংলা ভাষার রচনায় *মহাভারতের* প্রভাব সুস্পষ্ট। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে স্বজনহারানো শ্মশানপ্রান্তরে যুধিষ্ঠিরের মনে বৈরাগ্যের যে ব্যাকুলতা দেখা দেয় তা এক উদাস শান্তির সাক্ষ্য বহন করে। রবীন্দ্রনাথ *সোনার তরী* কাব্যের পুরস্কার কবিতায় বলেছেন-

"বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ
সকল আশার বিষাদ মহান
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চির মানবের প্রাণে।"[২৪]

সাম্প্রতিক কালের বাংলা নাটকে এবং যাত্রাপালায় *মহাভারতের* বিভিন্ন কাহিনি নানাভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। সারথি, কর্ণার্জুন, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ, দ্রৌপদী, শকুনি, শকুনির পাশা, দানবীর কর্ণ প্রভৃতি *মহাভারতের* কাহিনি

অবলম্বনে রচিত যাত্রাপালাগুলো বাঙালীর হৃদয়কে আবেগাপ্লুত করেছে। বিষয় বর্ণনায়, চরিত্রচিত্রণে এবং রসপরিবেশনের ক্ষেত্রে বাংলাসাহিত্য বহুলাংশে *মহাভারতের* কাছে ঋণী।

স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যেও *মহাভারতের* প্রভাব সুস্পষ্ট। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে, সৌধ এবং প্রাসাদে *মহাভারতের* বিভিন্ন চিত্র উৎকীর্ণ আছে। অনেক মন্দিরগাত্রে লেখা হয়েছে *গীতার* বিভিন্ন শ্লোক। ভারতীয় চিত্রশিল্পে *রামায়ণ* ঘরানার ছাপ বিদ্যমান। ভারতীয় সমাজ, জীবন, সাহিত্য ও শিল্প *মহাভারত* থেকে যুগে যুগে প্রাণসত্তার অপরিহার্য শক্তি আহরণ করেছে। ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ভারতীয় মানসিকতা ও ভারতবর্ষকে জানতে হলে *মহাভারতকে* জানতে হবে।

উপসংহার : *মহাভারতের* সর্বব্যাপক প্রভাবের কথা মনে করেই অ্যানি বেসান্ত মন্তব্য করেছেন- "The *Mahabharata* is the greatest poem in the whole world. There is no other poem so splendid as this, so full of what we want to know and what it is good for us to study." বস্তুত এতে একাধারে ইতিহাস, কাহিনি, উপকথা, দর্শন, নীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব এবং সাহিত্যের যে সমাবেশ ঘটেছে, তারই সমষ্টিগত ফল *মহাভারতকে* এক অসাধারণ মহত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কেউ কেউ মনে করেন *মহাভারতে* রাজনীতিই প্রাধান্য লাভ করেছে, আবার কারো মতে এতে নীতি, উপদেশ কিংবা আদর্শই এত বেশি প্রতিফলিত হয়েছে যে একে তারা 'নীতিশিক্ষার বিশ্বকোষ' (Encyclopaedia of moral teaching) নামে অভিহিত করে থাকেন।

নীতিকথা প্রচার করলেও *মহাভারতের* কবি কেবল নীতিবাদীই ছিলেন না, ছিলেন একান্তই মানবতাবাদী। তার প্রমাণ শত শত ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। *মহাভারতে* বর্ণিত বিভিন্ন কাহিনিগুলোর স্বতন্ত্র উপাদেয়তা রয়েছে। *মহাভারতের* সাহিত্যিক মূল্য বিচার করতে গিয়ে ভিন্টারনিৎস্ বলেছেন-

"In this jungle of poetry, which scholarship has just began to clear, there shoots forth true and genuine poetry, hidden by the wild under growth. Out of the unshapely mass shine out the most precious blossoms of immortal poetic art and profound wisdom. The very fact the *Mahabharata* represents a whole literature rather than one single and unified work and contains so many and so multifarious things, makes it more suited than any other book to afford us an insight in deepest depths of the soul of the Indian people."[২৫]

একমাত্র *মহাভারতেই* উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ভারতীয় গণজীবনের গভীরতম রূপ।

তথ্যনির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড (কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭১২।

২. M.Winternitz, *A History of Indian Literature,* vol.1 (Calcutta : University of Calcutta, 1927 A.D.), p.312.

৩. বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা., ২য় খণ্ড (কলিকাতা: বঙ্গবাসী মুদ্রণযন্ত্র, ১৮৩০ শকাব্দ), ১২.৫৯.২৯, পৃ. ১৪৩২।

৪. M.Winternitz, *A History of Indian Literature,* vol.1, *op.cit,* p.31.

৫. বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১.৬২.৫৩, প. ৬৯।

৬. *তদেব*, ১.১.৬১, পৃ. ৮।

৭. "পুরাণপূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ।"- *তদেব*, ১.১.৮৬, পৃ. ৯।

৮. *তদেব*, ১.১.২৬৭, পৃ. ১৪।

৯. *তদেব*, ১.৬২.৪৮, পৃ.৬৯।

১০. M.Winternitz, *A History of Indian Literature*, vol.1, *op.cit*, p.316.

১১. বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ৫.১০৫.৪০, পৃ. ৭৩৯।

১২. মনু, *মনুস্মৃতি*, গঙ্গানাথ ঝাঁ সম্পা. ২য় খণ্ড (কলিকাতা : রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৩৯ খ্রি.), ৭.৩, পৃ. ২।

১৩. বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১২.৫৯.৮, পৃ. ১৪৩২।

১৪. *তদেব*, ১৯.৫৯.১৬, পৃ.১৪৩২।

১৫. "অর্থমূলোঽপি হিংসা চ কুরুতে স্বয়মাত্মনঃ।
করৈরশাস্ত্রদৃষ্টৈর্হি মোহাৎ সম্পীড়য়ন্ প্রজাঃ॥"- *তদেব*, ১২.৭১.১৫, পৃ.১৪৪৮।

১৬. "রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ, ততো ভার্যাং ততো ধনম্।"- *তদেব*, ১ম খণ্ড, ১.১৬০.১২, পৃ.১৫৯।

১৭. "এবং যে ভূতিমিচ্ছেয়ুঃ পৃথিব্যাং মানবাঃ কৃচিৎ।
কুর্য্যু রাজানমেবাগ্রে প্রজানুগ্রহকারণাৎ॥"- *তদেব*, ২য় খণ্ড, ১২.৬৭.৩৩, পৃ. ১৪৪৩।

১৮. "রাজমূলো মহাপ্রাজ্ঞ ধর্মো লোকস্য লক্ষ্যতে।
প্রজা রাজভয়াদেব ন খাদন্তি পরস্পরম্॥"- *তদেব*, ১২.৬৮.৮, পৃ. ১৪৪৩।

১৯. "অগূঢ়বিভবা যস্য পৌরা রাষ্টনিবাসিনঃ।
নয়াপনয়বেত্তারঃ স রাজা রাজসত্তমঃ॥
স্বকর্মনিরতা যস্য জনা বিষয়বাসিনঃ।
অসজ্ঘাতরতা দান্তা পাল্যমানা যথাবিধি॥
বশ্যা নেয়া বিধেয়াশ্চ ন চ সজ্ঘর্ষশীলিনঃ।
বিষয়ে দানরুচয়ো নরা যস্য স পার্থিবঃ॥"- *তদেব*, ১২.৫৭. ৩৪-৩৬, পৃ. ১৪৩১।

২০. বেদব্যাস, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সম্পা. (কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ), ২.৫০, পৃ. ৫০

২১. *তদেব*, ১৮.৬৬, পৃ. ২৪০।

২২. M.Winternitz, *A History of Indian Literature*, vol.1, *op.cit*, p.426.

২৩. রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১২।

২৪. *তদেব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪-৯৫।

২৫. M.Winternitz, *A History of Indian Literature*, vol.1, *op.cit*, p.326.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

সংস্কৃত ব্যাকরণে কৃৎ প্রত্যয়: একটি পর্যালোচনা

ড. বেবী বিশ্বাস*

Abstract: The most important and main method of expressing the thaught of human being is language. Only the language can express his/her thinking entirely. And vocabulary helps language in this respect. So for the reason, one can express more respectively in that language which is enriched in its vocabulary. Sanskrit language has some rules and regulations to form word and suffix is one of them. Suffix always creats new words joining to base and in this way it enriches the Sanskrit language. Generally suffix has been divided into three parts— verb inflection, krit and taddhit suffix. Every suffix has different types. Krit suffix has been classified into three parts, such as— potential passive participles, pre-krit suffix and post-krit suffix. Tabya, aniya, yat, nyat, kyap and tabyat belong to potential passive participles. Pre-krit suffix inciudes past participles, present participles, trich, nini and post-krit suffix includes indeclinable past participles, present participles and infinite mood. In this article krit suffix has been discussed elaborately.

সংস্কৃত ভাষাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে— বৈদিক ভাষা ও লৌকিক ভাষা। বৈদিক ভাষা হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যরূপ বা সাধুভাষা; অর্থাৎ ঋগ্বেদসহ পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য বৈদিক ভাষায় রচিত। আর লৌকিক ভাষা হচ্ছে সে কালের শিক্ষিত জনসাধারণের ব্যবহারিক ও লৌকিক কথা, আখ্যায়িকা প্রভৃতির ভাষা। এই ভাষার রূপটি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের মধ্যে কিছু পরিমাণ রয়ে গেছে; একাল পর্যন্ত পৌঁছায়নি। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি লৌকিক ভাষার সংস্কার সাধন করে সাহিত্যের ভাষায় ব্যাকরণকে বেঁধে দেন। তিনি ভাষা ব্যবহারের নিয়ম রচনা করে তাকে সংস্কার করেছিলেন বলে সে ভাষার নাম হল সংস্কৃত ভাষা। সম্-কৃ+ক্ত= সংস্কৃত। অর্থাৎ সংস্কার বা পরিমার্জন করা হয়েছে যে ভাষা তাই সংস্কৃত ভাষা।

বি-আ-কৃ+অনট্ (ল্যুট্)= ব্যাকরণ[১]। বি ও আ উপসর্গযুক্ত কৃ-ধাতুর সাথে অনট্ বা ল্যুট্ প্রত্যয় যোগ করে ব্যাকরণ শব্দটি নিষ্পন্ন। কৃ-ধাতুর অর্থ করা, কিন্তু বি ও আ-পূর্বক কৃ ধাতুর অর্থ বিশ্লেষণ করা। ব্যাক্রিয়ন্তে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি-বিভাগেন শব্দা অনেন ইতি ব্যাকরণম্। অর্থাৎ যে শাস্ত্রে পাণিনি প্রভৃতি মুনিগণ প্রকৃতি-প্রত্যয় প্রভৃতি বিভাগ করে শব্দগুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন তাই ব্যাকরণ। পতঞ্জলি তাঁর *মহাভাষ্য* গ্রন্থে বলেছেন, "ব্যাক্রিয়ন্তে শব্দা অনেন ইতি ব্যাকরণম্"।[২] অর্থাৎ যে শাস্ত্রে শব্দের বিশ্লেষণ করে তার সঠিক প্রয়োগের শিক্ষা বা অনুশাসন দেয় তাকে ব্যাকরণ বলে। তাই পতঞ্জলি ব্যাকরণকে শব্দানুশাসন বলেছেন। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, যে বিদ্যা দ্বারা কোন ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সে ভাষা পঠনে, লিখনে এবং কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তার প্রয়োগ করা যায়, সে বিদ্যাকে সে ভাষার ব্যাকরণ বলে।

প্রত্যয়: প্রতি পূর্বক ই-ধাতু ও অচ্ প্রত্যয় যোগে প্রত্যয় শব্দটি নিষ্পন্ন। যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতুর উত্তর যুক্ত হয়ে শব্দ এবং শব্দের উত্তর যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাদের নাম প্রত্যয়।[৩] যেমন— কৃ+অনট্= করণ। গম্+ক্তিন্= গতি। পৃথিবী+অন্= পার্থিব, শরীর্+ঠক্= শারীরিক। প্রদত্ত উদাহরণগুলোতে কৃ ও গম্ ধাতুর উত্তর যথাক্রমে অনট্ ও ক্তিন্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'করণ' ও 'গতি' শব্দ গঠিত হয়েছে। আবার 'পৃথিবী'

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ও 'শরীর' শব্দের সঙ্গে যথাক্রমে অন্ ও ঠক্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'পার্থিব' ও 'শারীরিক' এ দুটি নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের মতে, প্রকৃতির উত্তর বিহিত সুপ্, তিঙ্, কৃৎ ও তদ্ধিতকে প্রত্যয় বলা হয়। "সুপ্তিঙ্— কৃত্তদ্ধিতাঃ প্রত্যয়াঃ।" আবার বিশ্বরূপ সাহার বেদভাষানির্মিতি ব্যাকরণ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ধাতু বা শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে যে শব্দাংশ সাধারণত বিশেষ অর্থের নির্দেশ করে সে শব্দাংশকে প্রত্যয় বলে। কোন কোন স্থলে এরূপ শব্দাংশ বিশেষ অর্থের নির্দেশ না করে প্রকৃতির নিজের অর্থেরই নির্দেশ করে তখন একে স্বার্থে (নিজের অর্থাৎ প্রকৃতির অর্থে) প্রত্যয় বলে।[৪] যেমন— চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর স্বার্থে 'নিচ্' প্রত্যয়। এরূপ স্বার্থে 'সন্' প্রভৃতি কৃৎ (যেমন— জুগুপ্সতে<গুপ্+সন্+লটতে) এবং 'ক' প্রভৃতি তদ্ধিত (যেমন- গুণক<গুণ+ক) প্রত্যয় হয়। প্রত্যয় সাধারণত তিন প্রকার— বিভক্তি, কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়। এদের প্রত্যেকের আবার ভেদ, উপভেদ (sub-classification) আছে।

কৃৎ প্রত্যয়ঃ সমাপিকা ক্রিয়াবাচক তিঙ্ (তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি ১৮০ টি প্রত্যয়) প্রত্যয় ভিন্ন সাক্ষাৎ (directly) ধাতুর উত্তর (তব্য, অনীয়, যৎ, ণ্যৎ, ক্যপ্, শতৃ, শানচ্, ক্ত, ক্তবতু প্রভৃতি) যে সকল প্রত্যয় হয় তাদেরকে 'কৃৎ' প্রত্যয় বলে।[৫] কৃৎ প্রত্যয়কে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- কৃত্য প্রত্যয়, পূর্ব কৃৎ প্রত্যয় এবং উত্তর কৃৎ প্রত্যয়।

কৃত্য প্রত্যয়ঃ তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ ও ক্যপ্— এই পাঁচটি প্রত্যয়কে কৃত্য প্রত্যয় বলে। পতঞ্জলির ভাষ্যমতে, 'কেলিমর' প্রত্যয়ও কৃত্য প্রত্যয়ের অন্তর্গত। কোন কোন বৈয়াকরণের মতে, তব্যৎ প্রত্যয়ও কৃত্য প্রত্যয়ের অন্তর্গত। অতএব কৃত্য প্রত্যয় সাত প্রকার। ঔচিত্য (এ করা উচিত বা এ হওয়া উচিত) অনুজ্ঞা, আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, যোগ্যতা বা ভবিষ্যৎ কাল[৬] বোঝাতে কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর কৃত্য প্রত্যয়সমূহ ব্যবহৃত হয়।[৭] যেমনঃ ঔচিত্য অর্থে— অসৎসঙ্গঃ পরিহর্তব্যঃ পরিত্যাজ্য বা। দীনেভ্যঃ ধনং দেয়ম্/দাতব্যম্। অনুজ্ঞা অর্থে— সজলেন ইদং কার্যং কর্তব্যম্। ত্বয়া শয়িতব্যম্। উপদেশ অর্থে— সদা সত্যং বদতিব্যম্। দুর্জনৈঃ সহ ন কদাপি স্থাতব্যম্। কদাপি মিথ্যা ন বদিতব্যম্। ভবিষ্যৎ কাল অর্থে— রহিমেন বিশ্ববিদ্যালয়ঃ গন্তব্যঃ (গম্ + তব্য + সু =গন্তব্যঃ), মিতয়া পুস্তকং পঠিতব্য।

কৃত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকর্মক ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে এবং অকর্মক ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে কৃত্য প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।[৮] যেমন— সকর্মক ধাতুর ক্ষেত্রে কর্মবাচ্যে— শিশুনা শিশোঃ বা চন্দ্রঃ দ্রষ্টব্যঃ (দৃশ+তব্য= দ্রষ্টব্য)। বালিকয়া বালিকায়াঃ বা পুষ্পং চেয়ম্। অকর্মক ধাতুর ক্ষেত্রে ভাববাচ্যে— শিশুনা শয়িতব্যম্; বালিকয়া স্থাতব্যম্। কৃত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গে নর শব্দের মত, স্ত্রীলিঙ্গে লতা শব্দের মত এবং ক্লীবলিঙ্গে ফল শব্দের রূপ হবে। যেমন: পুংলিঙ্গে— গন্তব্য, গন্তব্যৌ, গন্তব্যাঃ; স্ত্রীলিঙ্গে— গন্তব্যা, গন্তব্যে, গন্তব্যাঃ; ক্লীবলিঙ্গে–– গন্তব্যম্, গন্তব্যে, গন্তব্যানি ইত্যাদি।

সমাপিকা ক্রিয়া, বিশেষ্য ও বিশেষণ তিন রূপেই কৃত্য প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ হয়। 'ণ্যৎ' প্রত্যয়ের ণ্ এবং ৎ, 'যৎ' প্রত্যয়ের ৎ, 'ক্যপ্' প্রত্যয়ের ক্ এবং প্ ইৎ যায়, য থাকে, 'তব' ও 'অনীয়' প্রত্যয়ের কিছুই ইৎ যায় না। যেমন— কৃ+ণ্যৎ= কার্য, ভুজ্+ণ্যৎ= ভুজ্য; জি+যৎ= জেয়, পা+যৎ= পেয়; কৃ+ক্যপ্= কৃত্য, ভৃ+ক্যপ্= ভৃত্য; কৃ+তব্য= কর্তব্য, পঠ্+তব্য= পঠিতব্য; দা+অনীয়= দানীয় ইত্যাদি। কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দসমূহ যখন ক্রিয়ার ন্যায় ব্যবহৃত হয় তখন কর্মবাচ্যে কর্মের বিশেষণ হয়, অর্থাৎ কর্মের যে লিঙ্গ, যে বিভক্তি এবং যে বচন, কৃত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দেরও সেই লিঙ্গ, সেই বিভক্তি এবং সেই বচন হয়। কর্মবাচ্যে কৃত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দের কর্তায় তৃতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।[৯] আর ভাববাচ্যে কৃত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহ সর্বদা ক্লীবলিঙ্গের প্রথমার এক বচনান্ত হয় এবং ভাববাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়।[১০] যেমন: কর্মবাচ্য—

মিতয়া মিতায়াঃ বা এতৎ করণীয়ম্। ময়া মম বা চন্দ্রঃ দ্রষ্টব্যঃ । ভাববাচ্যে— শিশুনা শয়িতব্যম্। ময়ী স্থাতব্যম্ ।

ণ্যৎ

(১) ঋ-বর্ণান্ত ধাতু ও ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ণ্যৎ প্রত্যয় হয়।[১১] ণ্যৎ হলে ধাতুর ঋ-কারের স্থানে আর্, ই-কারের স্থানে এ, উ-কারের স্থানে ও এবং আ-কারের স্থানে আ আদেশ হয়। ণ্যৎ প্রত্যয়ের ণ্ ও ৎ ইৎ যায়, য থাকে। যথা— পরি-ত্যজ+ণ্যৎ=পরিত্যাজ্য, পঠ্ + ণ্যৎ = পাঠ্যম্ ।

বাক্যে প্রয়োগ: কুসঙ্গঃ সর্বৈঃ সর্বেষাম্ বা পরিত্যজ্যঃ। পাঠ্যমিদং পুস্তকং। ময়া এতৎ কার্যম্। ব্যতিক্রম— নিন্দ্+ণ্যৎ= নিন্দ্য, ভক্ষ্+ণ্যৎ= ভক্ষ্য, দৃশ্+ণ্যৎ= দৃশ্য।

(২) ণ্যৎ পরে থাকলে পচ্, রুজ্ প্রভৃতি ধাতুর চ্ স্থানে ক্ ও জ্ স্থানে গ্ হয়।[১২] যথা— পচ্+ণ্যৎ= পাক্য, রুজ্+ণ্যৎ= রোগ্য।

(৩) আবশ্যক অর্থে ণ্যৎ প্রত্যয়ের চ-বর্গ স্থানে ক-বর্গ হয় না।[১৩] যথা— অবশ্যং পাচ্যম্ (পচ্+ণ্যৎ= পাচ্যম্), অবশ্যং যোজ্যম্ (যুজ্+ণ্যৎ= যোজ্যম্), অবশ্যং ভাজ্যম্ (ভুজ্+ণ্যৎ= ভাজ্যম্)। অন্যত্র ণ্যৎ প্রত্যয়ের চ-বর্গ স্থানে ক-বর্গ হয়। যেমন— পাক্যম্, যোগ্যম্ ইত্যাদি।

(৪) অবশ্য করতে হবে এরূপ অর্থে উবর্ণান্ত ধাতুর উত্তর ণ্যৎ হয়।[১৪] যথা— অবশ্যং ভাব্যম্, অবশ্যং স্তাব্যম্। অন্যত্র ভাব্যম্ ।

(৫) অর্থ বিশেষে ণ্যৎ প্রত্যয় পরে থাকলে বচ্, ভুজ্, যুজ্ প্রভৃতি ধাতুর চ্ স্থানে ক্ ও জ্ স্থানে গ্ হয়।[১৫] যথা— বচ্ 'শব্দ' পদসমূহ অর্থে বাক্য (sentence); যুজ্ উপযুক্ত অর্থে যোগ্য (fit); ভুজ্— ভোগ অর্থে ভোগ্য (fit to be enjoyed), উদাহরণ— বচ্- বাক্য অর্থে— বাক্যমিদং মনোহরম্ ; যুজ্- যোগ্য অর্থে–– যোগ্যং তে বচনম্ ; ভুজ্- ভোগ্য অর্থে— বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। ভক্ষ্য অর্থাৎ খাওয়া অর্থে ণ্যৎ পরে থাকলে ভুজ্ ধাতুর জ্ স্থানে গ্ হয় না।[১৬] উদাহরণ— অদ্যং মহদ্ ভোজ্যং মে সমুপস্থিতম্ (ভুজ্ + ণ্যৎ = ভোজ্য)। কিন্তু শক্য অর্থে ণ্যৎ পরে থাকলে প্র-যুজ্ ও নি-যুজ্ ধাতুর জ্ স্থানে গ্ আদেশ হয় না।[১৭] যথা— প্র-যুজ্+ণ্যৎ= প্রযোজ্যঃ (প্রযোক্তুং শক্যঃ) প্রয়োগ করতে সমর্থ, প্রয়োগ্য প্রযোক্তুং যোগ্যঃ, নি-যুজ্+ণ্যৎ= নিযোজ্যঃ (নিযোক্তু শক্যঃ—— a servet) নিয়োগ করতে সমর্থ। বাক্যে প্রয়োগ: নিযোজ্যঃ কার্যং করোতি। বাক্যে প্রয়োগঃ নিয়োগ্যঃ অয়ং জনঃ।

(৬) ণ্যৎ পরে থাকলে যজ্, যাচ্, রুচ্, প্র-বচ্, ঋচ্ ও ত্যজ্ ধাতুর চ্ স্থানে ক্ ও জ্ স্থানে গ্ আদেশ হয় না।[১৮] যথা— যজ্>যাজ্য, যাচ্>যাচ্য, রুচ্>রোচ্য, প্র-বচ্>প্রবাচ্য, ঋচ্>অর্চ্য (শব্দটি নিপাতনে সিদ্ধ), ত্যজ্>ত্যাজ্য, সিচ্>সচ্য, ভজ্>ভাজ্য।

(৭) আঙ্-পূর্বক চর্ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় হলে গুরু অর্থ প্রকাশ পায়।[১৯] যথা— আ-চর্+ণৎ>আচার্য (গুরু)।

(৮) যাওয়া অর্থে বঞ্চ্ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ হলে চ্ স্থানে ক্ হয় না।[২০] যথা— বঞ্চং বঞ্চতি বণিজ্যঃ, কিন্তু বঞ্চ্ (bend)+ণ্যৎ>বঙ্কং (কুটিলং) কাষ্ঠম্।

যৎ

(১)কর্ম ও ভাববাচ্যে স্বরান্ত ধাতু, প-বর্গান্ত অ-কার-উপধ ধাতু, শক্ ও সহ্ ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়।[২১] যৎ প্রত্যয়ের ৎ ইৎ যায়, য থাকে। যৎ প্রত্যয় হলে ধাতুর অন্তস্থিত আকার স্থানে একার, ধাতুর ইবর্ণ স্থানে এ এবং উবর্ণ স্থানে ও হয়। যথা— স্বরান্ত ধাতু: দা+যৎ= দেয়, চি+যৎ= চেয়, নী+যৎ= নেয়। প-বর্গান্ত অকার-উপধ ধাতু: শপ্+যৎ= শপ্য, রভ্+যৎ= রভ্য, লভ্+যৎ= লভ্য; রম্+যৎ= রম্য, নম্+যৎ= নম্য, গম্+যৎ= গম্য; শক্ ও সহ্ ধাতু: শক্+যৎ= শক্য, সহ্+যৎ= সহ্য।

(২) কর্ম ও ভাববাচ্যে উপসর্গহীন গদ্, মদ্, চর্ ও যম্ ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়।[২২] যথা— গদ্+যৎ= গদ্য, মদ্+যৎ= মদ্য, যম্+যৎ= যম্য।

(৩) গুরু অর্থ না বুঝালে আঙ্-পূর্বক চর্ ধাতু কর্ম ও ভাববাচ্যে যৎ প্রত্যয় হয়।[২৩] যথা— আচর্যঃ দেশঃ (গন্তব্যঃ), আচর্যো নিয়মঃ ।

(৪) নিন্দনীয় অর্থে অবদ্য, বিক্রয় অর্থে পণ্য ও নিরোধ বা অব্যাহত প্রবৃত্তি অর্থে বর্য শব্দে নিপাতনে যৎ প্রত্যয় হয়।[২৪] যথা— নঞ্-বদ্+যৎ= অবদ্যং পাপম্ (নিন্দনীয়ম্); অন্য অর্থে ক্যপ্ হয়। যথা— নঞ্–বদ্+ক্যপ্= অনুদ্যম্ (অনুচ্চার্যম্)। প্রয়োগঃ অনুদ্যং গুরোর্নাম। পণ্+যৎ= পণ্যম্ ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার একবচন (বিক্রেয়ং দ্রব্যম্)। বাক্যে প্রয়োগ: দুর্লভং পণ্যমিদম্। অন্য অর্থে পাণ্যম্ স্তত্যম্। বৃ+যৎ+স্ত্রীয়াম্ আপ্= বর্যা (বরণীয়া)। বাক্যে প্রয়োগ: বর্যা ইয়ং ষোড়শী কন্যা। অন্য অর্থে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। যথা— বৃ+ক্যপ+স্ত্রীয়াম্ আপ্= বৃত্যা (বরণীয়া)। বাক্যে প্রয়োগ: বৃত্যা ইয়মনূঢ়া।

(৫) করণ কারক অর্থে 'বহ্য' এই যৎ-প্রত্যয়ান্ত পদটি নিপাতনে সিদ্ধ হয়।[২৫] যথা— বচ্+য্যৎ= বহ্যম্ (বহন্তি অনেন ইতি)। বাক্যে প্রয়োগ: বহ্যং শকটম্। করণ কারকের অর্থ না বুঝালে বহ্ ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় না হয়ে ণ্যৎ প্রত্যয় হয়। যথা— বহ্–ণ্যৎ= বাহ্যম্ (বহনযোগ্যম্)। বাক্যে প্রয়োগ: বাহ্যং পণ্যমিদম্। বহ্+তব্য= বাঢ়ব্যম্।

(৬) স্বামী (প্রভু) বা বৈশ্য অর্থে গমনার্থক ঋ-ধাতুর যৎ প্রত্যয়ে অর্য শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।[২৬] যথা— ঋ+য্যৎ= অর্যঃ (স্বামী বৈশ্য বা)। অন্যত্র ঋ+ণ্যৎ= আর্যঃ (ব্রাহ্মণঃ)।

(৭) ভব্য প্রভৃতি সাতটি শব্দ কর্তৃবাচ্যে নিপাতনে কৃত্য প্রত্যয়ে সিদ্ধ। পক্ষে এই সকল ধাতুর সকর্মের ক্ষেত্রে কর্মবাচ্যে এবং অকর্মের ক্ষেত্রে ভাববাচ্যে কৃত্য প্রত্যয় হয়।[২৭] যথা— ভবতীতি ভব্যঃ (ভূ+যৎ= ভব্য), গায়তীতি গেয়ঃ (গে+যৎ=গেয়) গানকারী। যথা— গেয়ঃ সাম্নাম্ অয়ম্। প্রবক্তীতি-প্রবচনীয়ঃ (প্র-বচ্+অনীয়=প্রবচ্যনীয়), কর্ম= (ক্রিয়াং) প্রাক্তবন্তঃ ইতি কর্মপ্রবচনীয়াঃ। উপতিষ্ঠতে ইতি উপস্থানীয়ঃ (উপ-স্থা+অনীয়র্= উপস্থানীয়ঃ), শিষ্যো গুরোঃ উপস্থানীয়ঃ (=পূজাকর্তা)। জায়তে যঃ সঃ জন্যঃ (জন্+যৎ= জন্য)। আপ্লবতে যঃ সঃ আপ্লাব্যঃ (=স্নানকর্তা) <আ-প্লু+ণ্যৎ= আপ্লাব্যঃ। আপততি যঃসঃ আপাত্যঃ (=আকস্মিক) <আ-পত্+ণ্যৎ= আপাত্য।

(৮) উপ উপসর্গে সৃ-ধাতুর উত্তর গর্ভাধানকাল (being conceived) বুঝাতে যৎ প্রত্যয় হয়। অর্থাৎ যদি কোন স্ত্রী পশুর গর্ভ গ্রহণের উপযুক্ত কাল সমাগত বোঝায় তাহলে 'উপসর্যা' এই যৎ প্রত্যয়ান্ত পদটি নিপাতনে সিদ্ধ হয়।[২৮] যথা— উপ-সৃ+যৎ+স্ত্রিয়াম্ আপ্= উপসর্যা (গর্ভাধানার্থং বৃষভেণ উপগন্তুং যোগ্যা) গৌঃ। অন্যত্র উপ-সৃ+ণ্যৎ+স্ত্রিয়াম্ আপ্= উপসার্যা (প্রাপ্তব্যা) কাশী।

(৯) সঙ্গত (=মিত্রতা friendship) অর্থে নঞ্‌-পূর্বক জৃ-ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়।[২৯] যথা— নঞ্‌-জৃ+যৎ= অজর্য্যম্ (নজর্য্যম্); যা জীর্ণ হয় না= অজর্য্য। বাক্যে প্রয়োগ: তেন সঙ্গতমার্যেণ রামাজর্যং কুরু দ্রুতম্ (ভট্টি ৬/৫৩)।

ক্যপ্

(১) কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ই, স্তু, শাস্, বৃ, দৃ, জুষ্, খন্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ক্যপ্ হয়। ক্যপ্ প্রত্যয়ের ক্ ও প্ ইৎ যায়; য থাকে। ক্যপ্ প্রত্যয়ের প্ ইৎ হয়, হ্রস্ব স্বরান্ত প্রকৃতির উত্তর তকার (তুক্) আসে।[৩০] যথা— ই+ক্যপ্= ইত্য, স্তু+ক্যপ্= স্তুত্য, শাস্+ক্যপ্= শিষ্য, বৃ+ক্যপ্= বৃত্য, দৃ+ক্যপ্= দৃত্য, জুষ্+ক্যপ্= জুষ্য, খন্+ক্যপ্= খেয় ইত্যাদি। বাক্যে প্রয়োগ: বাগ্দেবী ত্বয়া সর্বদা স্তুত্যা।

(২) সুবন্ত পদের পরবর্তী হন্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্যপ্ হয় এবং ন্ স্থানে ত্ ও স্ত্রীলিঙ্গ হয়।[৩১] যথা— ভ্রাতৃ+হন্+ক্যপ্+স্ত্রিয়াম্ টাপ্= ভ্রাতৃহত্যা, ব্রহ্ম+হন্+ক্যপ্+স্ত্রিয়াম্ টাপ্= ব্রহ্মহত্যা।

(৩) ভাববাচ্যে সুবন্ত পদের পরবর্তী ভূ-ধাতুর উত্তর ক্যপ্ হয়।[৩২] যথা— ব্রহ্মন্-ভূ+ক্যপ্= ব্রহ্মভূয় (ব্রাহ্মণ ভাবঃ), দেব-ভূ+ক্যপ্= দেবভূয় (দেবস্য ভাবঃ)।

(৪) ক্লৃপ্ ও চৃৎ ধাতু ভিন্ন ঋ-কার উপধ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ হয়।[৩৩] যথা— বৃ+ক্যপ্= বৃত্য, স্পৃশ্+ক্যপ্ = স্পৃশ্য, কৃষ্+ক্যপ্= কৃষ্য, বৃধ্+ক্যপ্= বৃধ্য ইত্যাদি।

(৫) কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে সুবন্ত পদের পরবর্তী ধাতুর উত্তর ক্যপ্ ও যৎ হয়।[৩৪] যথা— ব্রহ্ম-বদ্+ক্যপ্= ব্রহ্মোদ্যম্, ব্রহ্ম-বদ্+যৎ= ব্রহ্মবদ্যম্ ।

(৬) সংজ্ঞা বুঝালে ভ্বাদি ভৃ-ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় হয়।[৩৫] যথা— ভৃ+ক্যপ্= ভৃত্য।

(৭) রাজসূয় প্রভৃতি ক্যপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ।[৩৬] যথা— রাজন্-সু+ক্যপ্ =রাজসূয়, সৃ+ক্যপ =সূর্য, মৃষা-বদ্+ক্যপ্= মৃষোদ্যম্, রুচ্+ক্যপ্= রুচ্য, কুপ্+ক্যপ্= কুপ্যম্, কৃষ্ট-পচ্+ক্যপ্= কৃষ্টপচ্য, নঞ্‌-ব্যথ্+ক্যপ্= অব্যথ্য ইত্যাদি।

(৮) খন্ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় হয় এবং ধাতুর ন্ স্থানে ঈ হয়। ঈ এর গুণ হয়।[৩৭] অর্থাৎ ঈ স্থানে এ হয়। যথা— খন্+ক্যপ্= খেয়।

(৯) মৃজ্ ধাতুর বিকল্পে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়।[৩৮] যথা— মৃজ্+ক্যপ্= মৃজ্য।

(১০) পদ, অস্বৈরী, বাহ্য ও পক্ষ অর্থে গ্রহ্-ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় হয়।[৩৯] যথা— অব-গ্রহ্+ক্যপ্= অবগৃহ্যম্, প্র-গ্রহ্+ক্যপ্= প্রগৃহ্যম্ (পদম্); গ্রাম-গ্রহ্+ক্যপ্+স্ত্রিয়াম্ আপ্= গ্রামগ্রহ্যা (গ্রামবাহ্যা); গুণ— গ্রহ্+ক্যপ্+স্ত্রিয়াম্ আপ্= গুণগৃহ্যাঃ (গুণপক্ষ্যাঃ) ইত্যাদি।

(১১) কৃ ও বৃষ্ ধাতুর উত্তর বিকল্পে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়।[৪০] যথা— কৃ+ক্যপ্= কৃত্য, বৃষ্+ক্যপ্= বৃষ্য।

তব্য ও অনীয়

ভবিষ্যৎ কালে বা ঔচিত্য অর্থে কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে সকল ধাতুর উত্তর তব্য ও অনীয় প্রত্যয় হয়।[৪১] যথা–– কৃ+তব্য= কর্তব্য, কৃ+অনীয়= করণীয়, গম্+তব্য= গন্তব্য, গম্+অনীয়= গমনীয়, পা+তব্য= পাতব্য, পা+অনীয়= পানীয় ইত্যাদি। বাক্যে প্রয়োগ: সজলেন সজলস্য বা এতৎ কর্তব্যম্/করণীয়ম্।

কেলিমর্

তব্য ও অনীয় প্রত্যয়ের মত কেলিমর্ প্রত্যয়ও কর্মবাচ্যে ধাতুর উত্তর হয়ে থাকে। কেলিমর্ প্রত্যয়ের ক্ ইৎ যায়; এলিম্ থাকে।[৪২] যথা— পচ্+কেলিমর্= পচেলিম, ভিদ্+কেলিমর্= ভিদেলিম, ছিদ+কেলিমর= ছিদেলিম ইত্যাদি। বাক্যে প্রয়োগঃ দদর্শ মালূরফলং পচেলিমম্ (নৈ.১/৯৪)।

তব্যৎ

বচ্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে তব্যৎ প্রত্যয় হয় এবং তখন বস্ ধাতুর অকার (নিজন্তের ন্যায়) বৃদ্ধি হয়।[৪৩] 'তব্য' এর সঙ্গে তব্যৎ প্রত্যয়ের রূপের কোন ভেদ নেই। যথা— বস্+তব্যৎ= বাস্তব্য। বাক্যে প্রয়োগঃ আসীৎ কল্যাণকটকবাস্তব্যো ভৈরবো নাম ব্যাধঃ।

পূর্ব কৃৎ প্রত্যয়ঃ ক্ত, ক্তবতু, শতৃ, শানচ্, তৃচ্, ণিনি, ক্বসু ও কানচ্ প্রত্যয়কে পূর্বকৃৎ প্রত্যয় বলে।

'ক্ত' ও 'ক্তবতু': 'ক্ত' ও 'ক্তবতু' প্রত্যয়কে নিষ্ঠা প্রত্যয় বলা হয়।[৪৪] ক্ত প্রত্যয়ের ক্ ইৎ যায়; ত থাকে এবং ক্তবতু প্রত্যয়ের ক্ ও উ ইৎ যায়; তবৎ থাকে। অতীতকালে ধাতু-উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয় হয়। ক্ত প্রত্যয় তিন বাচ্যেই হয়। কিন্তু ক্তবতু প্রত্যয় কেবল কর্তৃবাচ্যে হয়।[৪৫] যথা— গম্+ক্ত= গত, কৃ+ক্ত= কৃত, কৃ+ক্তবতু= কৃতবৎ, শ্রু+ক্ত= শ্রুত, শ্রু+ক্তবতু= শ্রুতবৎ ইত্যাদি। অতীতকালে অকর্মক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় হয়।[৪৬] ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাপিকা ক্রিয়ার কাজ করে অথচ কর্তৃবাচ্যে কর্তার বিশেষণ হয় অর্থাৎ কর্তার লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন প্রাপ্ত হয়। ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের পুংলিঙ্গে নর, স্ত্রীলিঙ্গে লতা এবং ক্লীবলিঙ্গে ফল শব্দের মত হয়। যেমন: পুংলিঙ্গে— ভীতঃ, ভীতৌ, ভীতাঃ; ভীতম্, ভীতৌ, ভীতান্ ইত্যাদি। স্ত্রীলিঙ্গে— ভীতা, ভীতে, ভীতাঃ;ভীতাম্, ভীতে, ভীতাঃ ইত্যাদি। ক্লীবলিঙ্গে— ভীতম্, ভীতে, ভীতানি; ভীতম্, ভীতে, ভীতানি ইত্যাদি। বাক্যে প্রয়োগ: মিতা ভীতা; রামঃ ভীতঃ। গমনার্থক ধাতু সকর্মক হলেও তার উত্তর ক্ত প্রত্যয় হয়।[৪৭] যথা— রমেশঃ গ্রামং গতঃ; মিতা বিদ্যালয়ং যাতঃ।

শী, স্থা, আস্, বস্, শ্লিষ, জন্, রুহ্ ও জৃ— এই সকল ধাতু উপসর্গযোগে সকর্মক হলেও এদের উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়।[৪৮] যথা— শিশুঃ শয্যাম্ অধিশয়িতঃ; শিবঃ হিমালয়ম্ অধিষ্ঠিতঃ; জনক চন্দ্রদ্বীপং অধ্যুষিতঃ; বিপ্রঃ আসনং সমাসীনঃ; লক্ষ্মণঃ রামমনুজাতঃ; বালকঃ বৃক্ষম্ আরূঢ়; বিষ্ণুঃ বিশ্বমনুজীর্ণঃ। অতীতকালে সকর্মক ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়।[৪৯] কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে কর্তায় তৃতীয়া ও কর্মে প্রথমা বিভক্তি হয়। অর্থাৎ কর্মের লিঙ্গ, বিভক্তি এবং বচন অনুসারে ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন প্রাপ্ত হয়। যথা— ময়া গীতং শ্রুতম্; তেন মহাকাব্যং পঠিতম্।

সকর্মক ও অকর্মক সকল প্রকার ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়। ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাপিকা ক্রিয়ার মত প্রযুক্ত হয়। এরা ক্লীবলিঙ্গ এবং প্রথমার এক বচনান্ত হয়। অর্থাৎ কেবল ম্ যুক্ত হয় এবং কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়।[৫০] যথা— তেন রুদিতম্; ত্বয়া স্নাতম্; শিশোঃ শয়িতম্; ময়া জ্ঞাতম্।

ইচ্ছার্থক, জ্ঞানার্থক ও পূজার্থক ধাতুর উত্তর বর্তমানকালে ক্ত প্রত্যয় হয়। তখন কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।[৫১] যথা— রাজ্ঞাং মতঃ; রাজ্ঞাং বুদ্ধঃ; বিদুষাং সর্বেষাং পূজিতঃ; তস্য ইষ্টম্।

অতীতকালে কর্তৃবাচ্যে সকর্মক ও অকর্মক উভয় প্রকার ধাতুর উত্তর 'ক্তবতু' প্রত্যয়।[৫২] 'ক্তবতু' প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাপিকা ক্রিয়ার কাজ করে অথচ কর্তার বিশেষণ হয়। অর্থাৎ কর্তার লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন অনুসারে ক্তবতু প্রত্যয়ান্ত শব্দের লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন প্রাপ্ত হয়। 'ক্তবতু' প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গে শ্রীমৎ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ যোগে নদী এবং ক্লীবলিঙ্গে শ্রীমৎ (ক্লীব) শব্দের তুল্য। যেমন: পুংলিঙ্গে— দৃষ্টবান্, দৃষ্টবন্তৌ, দৃষ্টবন্তঃ ইত্যাদি। স্ত্রীলিঙ্গে— দৃষ্টবতী, দৃষ্টবতৌ, দৃষ্টবত্যঃ ইত্যাদি। ক্লীবলিঙ্গে— দৃষ্টবৎ, দৃষ্টবতী, দৃষ্টবন্তি ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ— সকর্মক ধাতুর উত্তর: বালকঃ চন্দ্রং দৃষ্টবান্; বালকৌ চন্দ্রং দৃষ্টবন্তৌ; বালকাঃ চন্দ্রং দৃষ্টবন্তঃ। বালিকা গীতং শ্রুতবতী; বালিকে গীতং শ্রুতবত্যৌ; বালিকাঃ গীতং শ্রুতবত্যঃ। অকর্মক ধাতুর উত্তর: ছাত্রঃ হসিতবান্; ছাত্রৌ হসিতবন্তৌ; ছাত্রাঃ হসিতবন্তঃ। অহং বিদ্যালয়ং গতবান; আবাং বিদ্যালয়ং গতবন্তৌ; বয়ং বিদ্যালয়ং গতবন্তঃ। মিত্রং ধনং দত্তবৎ; পত্রানি বৃক্ষাৎ পতিতবন্তি।

শতৃ ও শানচ্

ইংরেজিতে Present parrticiples এবং বাংলায় যেতে যেতে, খেতে খেতে, করতে করতে, নাচতে নাচতে, খাওয়ার সময়, পড়ার সময়, পড়তে ছিল, পান করতে ছিল এরূপ অবস্থা বোঝাতে কর্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর 'শতৃ' এবং আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর 'শানচ্' প্রত্যয় হয়। আর উভয়পদী ধাতুর উত্তর 'শতৃ' ও শানচ্ দুটিই হয়। বর্তমান কালে কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয় হয়।[৫৩] শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ অসমাপিকা ক্রিয়া এবং এরা ক্রিয়াবাচক বিশেষণ। এজন্য এদের লিঙ্গ, বিভক্তি, বচন বিশেষ্যের অনুযায়ী হয়। অর্থাৎ বিশেষ্যের যে লিঙ্গ, যে বচন, যে বিভক্তি হয় শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের সেই বচন, সেই লিঙ্গ, সেই বিভক্তি হয়। যথা— গম্+শতৃ>গচ্ছৎ, গচ্ছন্তী; পা+শতৃ= পিবৎ, পিবন্তী; বদ্+শতৃ= বদৎ, বদন্তী ইত্যাদি। বাক্যে প্রয়োগ: শতৃ প্রত্যয়: বালকঃ নৃত্যন্ আগচ্ছতি; বালকৌ নৃত্যন্তৌ আগচ্ছতঃ; বালকাঃ নৃত্যন্তঃ আগচ্ছন্তি। বালিকা গায়ন্তী আগচ্ছতি; বালিকে গায়ন্তৌ আগচ্ছতঃ; বালিকাঃ গায়ন্ত্যঃ আগচ্ছন্তি। তম্ গৃহং গচ্ছন্ অপৃচ্ছম্। শানচ্— সেব্+শানচ্= সেবমান, শী+শানচ্= শয়ান, বৃধ+শানচ্= বর্ধমান ইত্যাদি। শানচ্— সেবমানঃ গুরুঃ; শয়ানাঃ লতাঃ; উভয়পদী ধাতু— শ্রি- শ্রয়ৎ, শ্রয়মাণ; বহ্— বহৎ, বহমান; হৃ— হরৎ, হরমাণ ইত্যাদি। শানচ্ প্রত্যয়ের বাক্যে প্রয়োগ: অহং তস্করং কম্পমানম্ অপশ্যম্; মিতা চিড়িয়াখানায়াং ব্যঘ্রং কম্পমানম্ অপশ্যম্; কৃষ্ণঃ অর্জুনং স্বর্জনেঃ সহ যুদ্ধমানং দদর্শ; অহং বিজনং যুদ্ধমনং দদর্শ; অহং অশ্বং ধাবনমানম্ অপশ্যম্। ধাতুর লট্ অন্তি যোগে যে পদ হয় (ধাবন্তি, গচ্ছন্তি, ভবন্তি, পশ্যন্তি, নিত্যন্তি) তার ন ও ই বাদ দিলে যা থাকে তাই শতৃ প্রত্যয়ান্ত শব্দ। যথা— গম- গচ্ছন্তি>গচ্ছৎ; ভূ— ভবন্তি>ভবৎ; দৃশ্— পশ্যন্তি>পশ্যৎ; নৃত্— নৃত্যন্তি>নৃত্যৎ ইত্যাদি। এরূপ শতৃ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গে ধাবৎ, স্ত্রীলিঙ্গে নদী এবং ক্লীবলিঙ্গে গচ্ছৎ (ক্লীব) শব্দের তুল্যরূপ হবে। যেমন— পুংলিঙ্গে— নৃত্যন্, নৃত্যন্তৌ, নৃত্যন্তঃ ইত্যাদি। স্ত্রীলিঙ্গে— নৃত্যন্তী, নৃত্যন্তৌ, নৃত্যন্ত্যঃ ইত্যাদি। ক্লীবলিঙ্গে— নৃত্যৎ, নৃত্যন্তী, নৃত্যন্তি ইত্যাদি। কিন্তু লট্ অন্তি যোগে ধাতুর শেষে 'ন্তি' না হয়ে যদি 'তি' হয় (জাগ্রতি, দদতি, শাসতি, বিভুতি, বিভ্যতি ইত্যাদি) তাহলে তার ই বাদ দিলে যা থাকে তাই শতৃ প্রত্যয়ান্ত। যেমন: জাগৃ— জাগৃতি>জাগ্রৎ; শাস্— শাসতি>শাসৎ; দা— দদতি>দদৎ; ভৃ— বিভৃতি>বিভৃৎ; ভী— বিভ্যতি>বিভ্যৎ ইত্যাদি। এরূপ শতৃ প্রত্যয়ান্ত শব্দের রূপ পুংলিঙ্গে 'ভূভৃৎ' স্ত্রীলিঙ্গে ঈ (ঙীপ্) যোগ করে নদী শব্দের মত হয়। যেমন— পুংলিঙ্গে জাগ্রৎ, জাগ্রতৌ, জাগ্রতঃ; শাসৎ, শাসতৌ, শাসতঃ; দদৎ, দদতৌ, দদতঃ; বিভৃৎ, বিভৃতৌ, বিভৃতঃ; বিভ্যৎ, বিভ্যতৌ, বিভ্যতঃ ইত্যাদি। স্ত্রীলিঙ্গে— জাগ্রতী, জাগ্রত্যৌ, জাগ্রত্যঃ; শাসতী, শাসত্যৌ, শাসত্যঃ; দদতী, দদতৌ, দদত্যঃ; বিভৃতী, বিভৃত্যৌ, বিভৃত্যঃ; বিভ্যতী, বিভ্যত্যৌ, বিভ্যত্যঃ ইত্যাদি। বাক্যে প্রয়োগ: তস্কর বিভ্যৎ পলায়তে। গাবং দদৎ দিবং যাতি।

শতৃ-প্রত্যয়ান্ত ভ্বাদি, দিবাদি, চুরাদিগণীয় এবং নিজন্ত ধাতুর স্ত্রীলিঙ্গে সর্বদা 'ন্' এর আগম হয়।[৫৪] অর্থাৎ এসব ধাতুতে 'লট্' অন্তি যোগে যে পদ হয় তার শেষের ই-কারের স্থানে ঈ-কার লিখলে শতৃ প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পাওয়া যায়। যেমন: গম্— গচ্ছন্তি>গচ্ছন্তী (গচ্ছৎ); হস্— হসন্তি>হসন্তী (হসৎ); পঠ্— পঠন্তি>পঠন্তী (পঠৎ); দিবাদি— নৃত্- নৃত্যন্তি>নৃত্যন্তী (নৃত্যৎ); নশ্— নশ্যন্তি>নশ্যন্তী (নশ্যৎ); দিব্— দিব্যন্তি>দিব্যন্তী (দিব্যৎ); কুপ্— কুপ্যন্তি>কুপ্যন্তী (কুপ্যৎ); চুরাদি: অর্চ— অর্চয়ন্তি>অর্চয়ন্তী (অর্চৎ); চিন্ত্— চিন্তয়ন্তি>চিন্তয়ন্তী (চিন্তয়ৎ); গণ্— গণয়ন্তি>গণয়ন্তী (গণয়ৎ); নিজন্ত— শ্রাবি—

শ্রাবয়ন্তি>শ্রাবয়ন্তী (শ্রাবয়ৎ);দর্শি— দর্শয়ন্তি>দর্শয়ন্তী (দর্শয়ৎ); গমি— গময়ন্তি>গময়ন্তী (গময়ৎ); কারি–– কারয়ন্তি>কারয়ন্তী (কারয়ৎ)। বাক্যে প্রয়োগঃ নৃত্যন্তী বালিকা আগতা; নৃত্যন্ত্যৌ বালিকে আগতে; নৃত্যন্ত্যঃ বালিকাঃ আগতাঃ; হস্যন্তঃ ছাত্র্যঃ গতাঃ। শতৃ প্রত্যয়ান্ত তুদাদি ও অদাদিগণীয় আ-কারান্ত ধাতুর উত্তর বিকল্পে ন্ এর আগম হয়।[৫৫] অর্থাৎ একবার 'ন্তী' আর একবার 'তী' হয়। যেমন— ইষ্–ইচ্ছৎ–ইচ্ছন্তী, ইচ্ছতী; প্রচ্ছ্— পৃচ্ছৎ— পৃচ্ছন্তী, পৃচ্ছতী। সিচ্— সিঞ্চৎ– সিঞ্চন্তী, সিঞ্চতী; অদাদি–– ভা–ভাৎ— ভান্তী, ভাতী; মা— মাৎ–মান্তী— মাতী; বা— বাৎ–বন্তী— বাতী; যা-যাৎ— যান্তী, যাতী। এতদ্ ব্যতীত অন্য সকল প্রকার ধাতুর উত্তর শতৃযোগে স্ত্রীলিঙ্গে ন্ এর আগম হয় না। অর্থাৎ 'ন্তী' না হয়ে 'তী' হবে।[৫৬] যেমন: দা— দদৎ— দদতী; কৃ— কুর্বৎ— কুর্বতী; রুদ— রুদৎ— রুদতী; শ্রু— শৃণ্বৎ— শৃণ্বতী ইত্যাদি।

আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর 'শানচ্' প্রত্যয় হয়।[৫৭] আত্মনেপদী ধাতুর লট্ 'আতে' বিভক্তিতে যে পদ হয়, তা হতে 'আতে' তুলে নিয়ে 'আন' যোগ করলে ধাতুর শানচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ হয়।[৫৮] যথা— কৃ+শানচ্= কুর্বাণ (কুর্বাতে-আতে= কুর্ব, কুর্ব+আন =কুর্বাণ); শী+শানচ্= শয়ান (শী+লট্ আতে= শয়াতে; শয়াতে–আতে=শয়; শয়+আন= শয়ান)। কিন্তু যদি 'আতে' স্থানে 'এতে' হয় তাহলে 'এতে' তুলে নিয়ে 'অমান' যোগ করলেই 'শানচ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দ হয়। অর্থাৎ ভ্বাদি, তুদাদি ও চুরাদিগণীয় ধাতুর আগমের অ এবং দিবাদিগণীয় ধাতুর য-বর্ণের পরস্থিত 'শান' স্থানে মান হয়।[৫৯] শানচ্ প্রত্যয়ে ণ-ত্ব বিধি অনুসরণ করতে হয়। যথা— ভ্বাদি— সেব্+আতে= সেবেতে>সেব্+শানচ্= সেবমান; কম্প+আতে= কম্পেতে> কম্প+শানচ্= কম্পমান। তুদাদি— লস্‌জ্+শানচ্= লজ্জমান, বিজ্+শানচ্= বিজমান, মৃ+শানচ্= ম্রিয়মান ইত্যাদি; চুরাদিঃ মন্ত্র+শানচ্= মন্ত্রমান; দিবাদিঃ দীপ্+শানচ্= দীপ্যমান, বিদ্+শানচ্= বিদ্যমান, জন্+শানচ্= জায়মান, যুধ্+শানচ্= যুদ্ধমান ইত্যাদি। কর্মবাচ্যে ধাতুর উত্তর বর্তমান কালে 'শানচ্' প্রত্যয় হয়। শানচ্ প্রত্যয়ের শান স্থানে মান হয় এবং ধাতুর পরে য আগম হয়।[৬০] যথা— কৃ+শানচ্= ক্রিয়মান, দা+শানচ্= দীয়মান, দৃশ্+শানচ্=দৃশ্যমান, পা+শানচ্= পীয়মান, সেব্+শানচ্= সেব্যমান, গ্রহ্+শানচ্= গৃহ্যমান ইত্যাদি। বাক্যে প্রয়োগঃ ক্রিয়মাণং কার্যম্ শেখরঃ গায়তি; পীয়মাণং জলং স আগতঃ; ময়া গম্যমানাং নগরীং সা গচ্ছতি; শিশুনা ভুজ্যমানং ফলং ত্বং গৃহ্লাসি; দৃশ্যমানা নদী। শানচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গে নর শব্দের মত, স্ত্রীলিঙ্গে লতা এবং ক্লীবলিঙ্গে ফল শব্দের মত। পুংলিঙ্গ— শয়ানঃ, শয়ানৌ, শয়ানাঃ; স্ত্রীলিঙ্গ— শয়ানা, শয়ানে, শয়ানাঃ; ক্লীবলিঙ্গ— শয়ানম্, শয়ানে, শয়ানানি; সেবমানম্, সেবমানে, সেবমাননি ইত্যাদি।

ণিনি

গ্রহ্, স্থা, মন্ত্র, সহ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ণিনি প্রত্যয় হয়।[৬১] ণিনি প্রত্যয়ের 'ণ্' এবং অন্ত ই ইৎ যায়; ইন্ ধাতুর সাথে যুক্ত হয়। যথা— গ্রহ্+ণিনি= গ্রাহিন্ (গ্রাহী), মন্ত্র+ণিনি= মন্ত্রিন্ (মন্ত্রী), স্থা+ণিনি= স্থয়িন্ (স্থায়ী) ইত্যাদি। উপসর্গের ও সুবন্ত পদের পরবর্তী শীল প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ণিনি প্রত্যয় হয়। যথা–– সত্য-বদ্+ণিনি= সত্যবাদিন্ (সত্যবাদী)। (সত্যং বদিতুং শীলম্ তস্য); প্রিয়-বদ্+ণিনি= প্রিয়বাদিন্ (প্রিয়বাদী) (প্রিয়ং বাদিতুং শীলম্ অস্য); তদ্রূপঃ মিথ্যা বদতি— মিথ্যাবাদী, মদ্যং পিবতি মদ্যপায়ী। কর্মবাচক পদের পরবর্তী হন্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অতীতকালে ণিনি প্রত্যয় হয় এবং হন্ ধাতুর হ্ স্থানে ঘ্, ও ন্ স্থানে ত্ হয়। যথা— পিতৃ-হন্+ণিনি= পিতৃঘাতিন্ (পিতৃঘাতী), মাতৃ-হন্+ণিনি= মাতৃঘাতিন্ (মাতৃঘাতী) ইত্যাদি। বাক্যে প্রয়োগঃ মাতরং জঘান— মাতৃঘাতী, পিতরং জঘান— পিতৃঘাতী ইত্যাদি। ভবিষ্যৎকাল বুঝালে কর্তৃবাচ্যে ভূ, স্থা, গম্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ণিনি প্রত্যয় হয়। যথা— ভূ+ণিনি= ভাবী, স্থা+ণিনি= স্থায়ী, গম্+ণিনি= গামী ইত্যাদি। ণিনি প্রত্যয়ান্ত শব্দের রূপ পুংলিঙ্গে গুণিন্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-যোগে

নদী এবং ক্লীবলিঙ্গে স্থায়িন্ (ক্লীব) শব্দের তুল্য। যেমন— গ্রহ্+ণিনি= গ্রাহীন্, পুংলিঙ্গে; প্রথমার একবচন–– গ্রাহী, স্ত্রীলিঙ্গে— গ্রাহিণী; ক্লীবলিঙ্গে— গ্রাহি। তদ্রূপ— স্থা–স্থায়ী (পুংলিঙ্গে); স্থায়িনী (স্ত্রীলিঙ্গ), স্থায়ি (ক্লীবলিঙ্গ)।

তৃচ্

কর্তৃবাচ্যে ধাতুর তৃচ্ প্রত্যয় হয়।[৬২] 'তৃচ্' প্রত্যয়ের চ্ ইৎ যায়; তৃ থাকে। তৃ ধাতুর সাথে যুক্ত হয়। যথা— দা+তৃচ্= দাতৃ (দাতা), কৃ+তৃচ্= কর্তৃ (কর্তা), নী+তৃচ্= নেতৃ (নেতা), জি+তৃচ্= জেতৃ (জেতা), ভৃ+তৃচ্= ভর্তৃ (ভর্তা), সৃজ্+তৃচ্= স্রষ্টৃ (স্রষ্টা), ক্রী+তৃচ্= ক্রেতৃ (ক্রেতা) ইত্যাদি। তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের রূপ পুংলিঙ্গে দাতৃ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ যোগে নদী এবং ক্লীবলিঙ্গে ধাতৃ শব্দের মত হয়। যেমন— দাতৃ— দাতা (পুংলিঙ্গ), দাত্রী (স্ত্রীলিঙ্গ), দাতৃ (ক্লীবলিঙ্গ)।

ক্বসু/কানচ্

অতীতকালে লিটের স্থানে পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর ক্বসু প্রত্যয় হয়। ক্বসু প্রত্যয়ের ক্ ও উ ইৎ যায়; বস্ থাকে এবং বস্ ধাতুর সাথে যুক্ত হয়।[৬৩] যথা— হন্+ক্বসু= জঘ্নিবস্ (জঘ্নিবান্); গম্+ক্বসু= জঘ্নিবস্ (জঘ্নিবান্), গম্+ক্ত= জঘ্নিবস্ (জঘ্নিবান্) ইত্যাদি।

অতীতকালে লিটের স্থানে আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর কানচ্ প্রত্যয় হয়।[৬৪] কানচ্ প্রত্যয়ের ক্ ও চ্ ইৎ যায়; আন থাকে এবং আন ধাতুর সাথে যুক্ত হয়। যথা— যুধ্+কানচ্= যুযুধান, রুচ্+কানচ্= রুরুচান। ক্বসু ও কানচ্ প্রত্যয় দ্বারা যে সকল শব্দ নিষ্পন্ন হয় সেগুলো বিশেষণ। সুতরাং তারা বিশেষ্যের লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন প্রাপ্ত হয়। যথা: ক্বস— শ্রু+ক্বসু= শুশ্রুবস্ (শুশ্রুবান্)। বাক্যে প্রয়োগ: শুশ্রুবান্ পুরুষঃ; শুশ্রুবাংসং পুরুষম্; শুশ্রুবুষা পুরুষেণ; কানচ্— যুধ+কানচ্= যুযুধান। বাক্যে প্রয়োগ: যুযুধানঃ নৃপঃ, যুযুধানস্য নৃপস্য।

উত্তরকৃৎ প্রত্যয়: ক্ত্বাচ্, ল্যপ্, তুমুন্, ঘঞ্, অচ্, ক্তিন্ ও ল্যুট্ প্রত্যয়কে উত্তরকৃৎ প্রত্যয় বলে।

ক্ত্বাচ্, ল্যপ্: একাধিক ক্রিয়ার এক কর্তা হলে পূর্বকালীন ক্রিয়াবোধক ধাতুর উত্তর 'ক্ত্বাচ্' প্রত্যয় হয়। অর্থাৎ সমাপিকা ও অসমাপিকা উভয় ক্রিয়ার একই কর্তা হলে পূর্বকালীন অসমাপিকা ক্রিয়াবোধক ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হয়।[৬৫] ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ের ক্ ও চ্ ইৎ যায়; ত্বা থাকে। ত্বা ধাতুর সাথে যুক্ত হয়। যথা— কৃ+ক্ত্বাচ্= কৃত্বা, দা+ক্ত্বাচ্= দাত্বা, গম্+ক্ত্বাচ্= গত্বা ইত্যাদি। বাক্যে প্রয়োগ: অহং কার্যং কৃত্বা গৃহং গমিষ্যামি ।

এখানে কৃত্বা অসমাপিকা ক্রিয়া এবং গমিষ্যামি সমাপিকা ক্রিয়া। উভয় ক্রিয়ার কর্তা অহং এবং পূর্বকালীন অসমাপিকা ক্রিয়াবোধক কৃ-ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হয়ে কৃত্বা হয়েছে। তদ্রূপ— ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। অহং অন্নং খাদিত্বা বিশ্ববিদ্যালয়ং গমিষ্যামি। অহং ব্যাকরণং পঠিত্বা গীতং করিষ্যামি। নিষেধ অর্থ বুঝালে 'অলম্' ও 'খলু' শব্দের যোগে ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হয়।[৬৬] এরূপ ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ের অন্য কোন সমাপিকা ক্রিয়ার দরকার হয় না। যথা— অলং রুদ্ধিত্বা; অলং গত্বা; খলু পীত্বা, অলং ভুক্ত্বা। ধাতুর পূর্বে নঞ্ অব্যয় থাকলে সেক্ষেত্রে ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হয়; ল্যপ্ প্রত্যয় হয় না।[৬৭] যথা— ত্বাম্ অগৃহীত্বা ণ যাস্যামি। অকৃত্ব— না করে; অগত্বা— না গিয়ে। অনন্তর অর্থে ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হয়। যেমন— গমনস্য অনন্তরম্— গত্বা, ভোজনস্য অনন্তরম্— ভুক্ত্বা ইত্যাদি। নঞ্ ভিন্ন অব্যয় পদের সাথে অথবা অব্যয় ভিন্ন অন্য যেকোনো পদের/শব্দের সাথে সমাস হলে এবং উভয় ক্রিয়ার কর্তা একই ব্যক্তি হলে পূর্বকালীন অসমাপিকা ক্রিয়াবাচক ধাতুর ক্তাচ্ প্রত্যয় না হয়ে ল্যপ্ প্রত্যয় হয়। ল্যপ্ প্রত্যয়ের ল্ ও প্ ইৎ যায়, য থাকে এবং য ধাতুর সাথে যুক্ত হয়।[৬৮] যথা— নমস্-কৃ+ল্যপ্= নমস্কৃত্য, অনু-কৃ+ল্যপ্= অনুকৃত্য, আ-গম্+ল্যপ্= আগম্য, প্র-নম্+ল্যপ্= প্রণম্য,

বি-জ্ঞা+ল্যপ্= বিজ্ঞায় ইত্যাদি। বাক্যে প্রয়োগ: শেখরঃ পিতরৌ প্রণম্য বিদেশং গতঃ। রহিমঃ গৃহম্ আগম্য মৃতাং মাতরম্ অপশ্যৎ। তব অভিপ্রায়ং বিজ্ঞায় অহং বদিষ্যামি। বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে করিয়া (করে), খাইয়া (খেয়ে), শুনিয়া (শুনে) প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার অনুবাদ করতে হলে ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় করতে হয়। কিন্তু ধাতুটির পূর্বে যদি কোন উপসর্গ থাকে তাহলে ল্যপ্ প্রত্যয় হয়।

তুমুন্

বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে 'ইতে' 'এতে' প্রত্যয় থাকলে অর্থাৎ পান করতে বা পান করার নিমিত্তে, দিতে বা দেবার জন্য, যেতে, খেতে প্রভৃতি নিমিত্তার্থে বোঝালে এবং সমাপিকা ও অসমাপিকা উভয় ক্রিয়ার একজন কর্তা হলে নিমিত্তবোধক ধাতুর উত্তর 'তুমুন্' প্রত্যয় হয়।[৬৯] তুমুন্ এর উ এবং ন্ ইৎ যায়; তুম্ থাকে এবং তুম্ ধাতুর সাথে যুক্ত হয়। যথা— পা+তুমুন্= পাতুম্, দা+তুমুন্= দাতুম্।

'তুমুন্' প্রত্যয়ান্ত শব্দ অসমাপিকা ক্রিয়া এবং অব্যয়। যথা— স সমুদ্রং দ্রষ্টুং যাতি। অহং সংস্কৃতং পঠিতুম্ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ং/রাজশাহী বিশ্বাবিদ্যালয় ইতি স্থানম্ আগতঃ/আগচ্ছামি স্ম। ইচ্ছার্থক ধাতুর সঙ্গে এক কর্তৃপদবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর তুমুন্ প্রত্যয় হয়।[৭০] যথা— সজল জলং পাতুম্ ইচ্ছতি; অহং ধনং দাতুমিচ্ছামি; জীবিতুং বাঞ্ছতি; আপ্তুম্ অভিলষতি। সমার্থক শব্দের যোগে অর্থাৎ সমর্থ, অলম্, পটু, নিপুণ, কুশল, সক্ষম, ক্ষম, পর্যাপ্ত প্রভৃতি শব্দের যোগে নিমিত্ত অর্থ না বুঝালেও ধাতুর উত্তর তুমুন্ প্রত্যয় হয়।[৭১] যথা— অহং গন্তুং সমর্থঃ পটুঃ অলং বা; সঃ অস্মিন্ সিংহাসনে উপবেষ্টুং সক্ষমঃ ক্ষমঃ বা; পর্যাপ্তো ২পি প্রজাঃ পাতুম্।

শক, ইষ্, ধৃষ্, জ্ঞা, গৈ, ঘট্, রভ্, লভ্, ক্রম্, সহ্, অর্হ্, অস্ প্রভৃতি ধাতু এবং এগুলোর সমার্থক অন্যান্য ধাতু সমাপিকা ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হলে নিমিত্তার্থক না বোঝালেও 'তুমুন্' প্রত্যয় হয়।[৭২] যথা— অহং কর্তুং শক্নোমি; সঃ গাতুং শক্নোতি; স কার্যং কর্তুমারভতে; রাজা রাজ্যং পালয়িতুম্ অর্হতি; রাজা যুদ্ধম্ অলম্; ত্বং ভোক্তুং পটুঃ/কুশলঃ/প্রবীণঃ; অস্তি ভোক্তুম্ অন্নম্। কাল, বেলা, সময় ও অবসর প্রভৃতি কালবাচক শব্দের যোগে ধাতুর উত্তর 'তুমুন্' প্রত্যয় হয়।[৭৩] যথা—বিদ্যালয়ং গন্তুং কালঃ অয়ম্; ভোক্তুং ইয়ং বেলা; পঠিতুং অয়ম্ সময়ঃ। কাম ও মনস্ শব্দ পরে থাকলে 'তুমুন্' প্রত্যয়ের ন্ লোপ পায়।[৭৪] যথা— গন্তুকামঃ, হন্তুকামঃ, দ্রষ্টুমনসঃ ইত্যাদি।

ঘঞ্

ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় হয়।[৭৫] ঘঞ্ প্রত্যয়ের ঘ্ ও ঞ্ ইৎ যায়; অ থাকে। 'ঘঞ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও পুংলিঙ্গ এবং রূপ নর শব্দের মত। যেমন— পঠ্+ঘঞ্= পাঠঃ, পচ্+ঘঞ্= পাকঃ, বস্+ঘঞ্= বাসঃ, লভ্+ঘঞ্= লাভঃ ইত্যাদি।

উপসর্গহীন শ্রি, নী ও ভূ-ধাতুর উত্তর ঘঞ্ হয়।[৭৬] যথা— শ্রি+ঘঞ্= শ্রায়ঃ, নী+ঘঞ্= নায়ঃ, ভূ+ঘঞ্= ভাবঃ ইত্যাদি।

উপসর্গ পূর্বে থাকলে রু-ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়।[৭৭] যথা— সম্+রু+ঘঞ্= সংরাব। পদ্, রুজ্, বিশ্ ও স্পৃশ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়।[৭৮] যথা— পদ্+ঘঞ্= পাদঃ, বিশ্+ঘঞ্= বেশঃ, রুজ্+ঘঞ্= রোগঃ, স্পৃশ্+ঘঞ্= স্পর্শঃ ইত্যাদি।

অবজ্ঞা অর্থে পরি-পূর্বক ভূ-ধাতুর উত্তর ঘঞ্ ও অপ্ প্রত্যয় হয়।[৭৯] যথা— পরি-ভূ+ঘঞ্= পরিভাবঃ, পরি-ভূ+অচ্= পরিভবঃ। বাক্যে প্রয়োগঃ দরিদ্রং প্রতি পরিভাবো না কার্যঃ।

অচ্ ও অপ্

ভাববাচ্যে ও কর্মবাচ্যে ই-কারান্ত ও ঈ-কারান্ত ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয় এবং উ-কারান্ত ও ঊ-কারান্ত ধাতুর উত্তর অপ্ (অল্) প্রত্যয় হয়।[৮০] 'অচ্' ও অপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এবং পুংলিঙ্গ। কিন্তু ভয়, মুখ প্রভৃতি শব্দ অচ্ প্রত্যয়ান্ত হলেও ক্লীবলিঙ্গ এবং বর্ষ শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। 'অচ্' ও 'অপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের রূপ পুংলিঙ্গে নর এবং ক্লীবলিঙ্গে ফল শব্দের তুল্য। যথা— চি+অচ্= চয়ঃ, জি+অচ্= জয়ঃ, ক্ষি+অচ্= ক্ষয়ঃ, নী+অচ্= নয়ঃ, রু+অপ্= রবঃ, স্তু+অপ্= স্তবঃ, ভূ+অপ্= ভবঃ ইত্যাদি। কর্ম উপপদ হলে অহ্ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়।[৮১] যথা— অর্হ+অচ্+স্ত্রিয়াম্ আপ্= পূজার্হ (পূজাম্ অহর্তি যা) প্রশংসা— অর্হ+অচ্+স্ত্রিয়ামাপ্= প্রশংসার্হ (প্রশংসাম্ অর্হতি যঃ) ইত্যাদি। স্বন্ ও হস্ ধাতুর উত্তর বিকল্পে অপ্ প্রত্যয় হয়।[৮২] যথা— হস্+অপ্= হসঃ, হস্+ঘঞ্= হাসঃ, স্বন্+অপ্= স্বনঃ, স্বন্+ঘঞ্= স্বানঃ ইত্যাদি। উপসর্গ যুক্ত না হলে মদ্-ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় হয়।[৮৩] যথা— ধন-মদ্+অপ্= ধনমদঃ।

ক্তিন্ (ক্তি)

ভাববাচ্যে স্ত্রীলিঙ্গ ধাতুর উত্তর ক্তিন্ (ক্তি) প্রত্যয় হয়।[৮৪] ক্তিন্ প্রত্যয়ের ক্ ও ন্ ইৎ যায়; তি থাকে। ক্তিন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এবং স্ত্রীলিঙ্গ এর রূপ মতি শব্দের মত। যথা— কৃ+ক্তিন্= কৃতিঃ,চি+ক্তিন্= চিতিঃ, স্তু+ক্তিন্= স্তুতিঃ, স্থা+ক্তিন্= স্থিতিঃ, স্মৃ+ক্তিন্= স্মৃতিঃ, ধৃ+ক্তিন্= ধৃতিঃ ইত্যাদি।

(ল্যুট্) অনট্

ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় হয়।[৮৫] ল্যুট্ প্রত্যয়ের ল্ ও ট্ ইৎ যায়; যু থাকে এবং যু স্থানে অন হয়।[৮৬] ল্যুট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এবং ক্লীবলিঙ্গ হয়। ল্যুট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের রূপ ফল শব্দের মত। যথা— গম্+ল্যুট্= গমনম্, ভুজ্+ল্যুট্= ভোজনম্, শী+ল্যুট্= শয়নম্, দ+ল্যুট্= দানম্, অপা+ল্যুট্= পানম্, কৃ+ল্যুট্= করণম্ ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, প্রত্যয় হলো শব্দ গঠনের একটি প্রক্রিয়া। বিশেষ করে কৃৎ প্রত্যয়ের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠন করতে হলে এর প্রত্যেকটি শ্রেণি— কৃত্য প্রত্যয়, পূর্বকৃৎ প্রত্যয় ও উত্তরকৃৎ প্রত্যয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ এবং নামপদ দুই-ই গঠিত হতে পারে। অধিকাংশ নামশব্দের মূলে রয়েছে ধাতু এবং ধাতুর সাথে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নাম-শব্দ গঠিত হয়। কোন ধাতুর সাথে কোন প্রত্যয় বসে এবং প্রত্যয়গুলো কোন প্রক্রিয়ায় শব্দগুলোকে গঠন করে তা যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা দরকার তেমনি একই ধাতুর সাথে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হয়ে কোন প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠন করে এবং শব্দগুলোর অর্থইবা কোন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয় তাও কৃৎ প্রত্যয়ের স্বরূপ উদ্ঘাটনের মাধ্যমে জানা সম্ভব।

তথ্যনির্দেশ

১. "যুবোরানাকৌ..." পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী দেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন সম্পা. সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা সম্বলিত (কলকাতা: বিবেকানন্দ রোড, সদেশ প্রকাশনী, পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ২০০৩), ৭/১/১।

২. পতঞ্জলি, মহাভাষ্যম্, পৃ. (১) ৫৭।

৩. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য, *সিদ্ধান্তকৌমুদীর আলোকে কৃৎপ্রত্যয় বিচার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৫), পৃ. ৩২।

৪. বিশ্বরূপ সাহা, *বেদভাষানির্মিতি* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৭), পৃ. ৭০।

৫. ধাতোঃ (পা. ৩/১/৯), কৃদতিঙ্ (পা. ৩/১/৯৩)।

৬. প্রৈষাতিসর্গপ্রাপ্তকালেষু কৃত্যাশ্চ (পা. ৩/৩/১৬৩), অর্হে কৃত্যতৃচশ্চ (পা. ৩/৩/১৬৯), কৃত্যাশ্চ (পা. ৩/৩/১৭১)।

৭. তয়োরেব কৃত্যক্তখলর্থাঃ (পা. ৩/৪/৭০), তবত্তব্যানীয়রঃ (পা. ৩/১/৯৬)।

৮. 'লঃ কর্মণি চ ভাবে চাকর্মকেভ্যঃ (পা.'৩/৪/৬৯), 'তয়োরেব কৃত্যক্তখলার্থাঃ' (পা.৩/৪/৭০)।

৯. কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া (পা. ২/৩/১৮), কৃত্যানাং কর্তরি বা (পা. ২/৩/৭১)।

১০. *প্রাগুক্ত*, কর্তৃ......... স্তৃতীয়া (পা. ২/৩/১৮)।

১১. ঋহলোর্ণ্যৎ (পা. ৩/১/১২৪)।

১২. চজোঃ কু ঘিণ্ণ্যতোঃ (পা. ৭/৩/৫২)।

১৩. ণ্য আবশ্যকে (পা. ৭/৩/৬৫)।

১৪. ওরাবশ্যকে (পা. ৩/১/১২৫)।

১৫. বচোঽশব্দসংজ্ঞায়াম্ (পা. ৭/৩/৬৭)।

১৬. ভোজ্যং ভক্ষ্যে (পা. ৭/৩/৬৯)।

১৭. প্রযোজ্যনিযোজ্যৌ শক্যার্থে (পা. ৭/৩/৬৮), ত্যজেশ্চ (বা)।

১৮. যজযাচরুচপ্রবচর্চশ্চ (পা. ৭/৩/৬৬)।

১৯. চরেরাঙিচাগুরৌ সুক্ চ বা (বা)।

২০. বঞ্চেগর্তৌ (পা. ৭/৩/৬৩)।

২১. অচো যৎ, পোরদুপধাৎ, শকিসহোশ্চ (পা. ৩/১/৯৭–৯৯)।

২২. গদমদচরযমশ্চানুপসর্গে (পা. ৩/১/১০০)।

২৩. *প্রাগুক্ত*, চরেরাঙিচাগুরৌ সুক্ চ বা (বা)।

২৪. অবদ্যপণ্যবর্যা গর্হ্যপণিতব্যানিরোধেষু (পা. ৩/১/১০১)।

২৫. বহ্যং করণে (পা. ৩/১/১০২)।

২৬. অর্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ (পা. ৩/১/১০৩)।

২৭. ভব্যগেয়প্রবচনীয়োপস্থানীয়জন্যাপ্লাব্যাপাত্যা বা (পা. ৩/৪/৬৮)।

২৮. উপসর্যা কাল্যা প্রজনে (পা. ৩/১/১০৪)।

২৯. অজর্যং সঙ্গতম্ (পা. ৩/১/১০৫)।

৩০. এতিস্তুশাস্বৃদৃজুষঃ ক্যপ্ (পা. ৩/১/১০৯),হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্ (পা. ৬/১/৭১)।

৩১. হনস্ত চ (পা. ৩/১/১০৮)।

৩২. ভুবো ভাবে (পা. ৩/১/১০৭)।

৩৩. ঋদুপধাচ্চাক্লৃপিচৃতেঃ (পা. ৩/১/১১০)।

৩৪. বদঃ সুপি ক্যপ্ চ (পা. ৩/১/১০৬)।

৩৫. ভৃঞোঽসংজ্ঞায়াম (পা. ৩/১/১১২)।

৩৬. রাজসূয়সূর্যমৃষোদ্যরুচ্যকুপ্যকৃষ্টপচ্যাব্যথ্যাঃ (পা. ৩/১/১১৪)।

৩৭. ঈ চ খনঃ (পা. ৩/১/১১১)।
৩৮. মৃজের্বিভাষা (পা. ৩/১/১১৩)।
৩৯. পদাস্বৈরিবাহ্যাপক্ষ্যেষু চ (পা. ৩/১/১১৯)।
৪০. বিভাষা কৃবৃষোঃ (পা. ৩/১/১২০)।
৪১. তব্যত্তব্যানীয়রঃ (পা. ৩/১/৯৬)।
৪২. কেলিমর উপসংখ্যানম্ (বা)।
৪৩. তব্যত্তব্যানীয়রঃ (পা. ৩/১/৯৬), বসেস্তব্যৎ কর্তরি ণিচ্চ (বা)।
৪৪. ক্তক্তবতূ নিষ্ঠা (পা. ১/১/২৬)।
৪৫. নিষ্ঠা (পা. ৩/২/১০২)।
৪৬. "অকর্মকাৎ কর্তরি ক্তঃ"।
৪৭. গত্যর্থাকর্মকশ্লিষশীঙ্স্থাসবসজনরুহজীর্যতিভ্যশ্চ (পা. ৩/৪/৭২)।
৪৮. *প্রাগুক্ত*, গত্যর্থ.......... রুহজীর্যতিভ্যশ্চ (পা. ৩/৪/৭২)।
৪৯. "সকর্মকাৎ কর্মণি"।
৫০. নপুংসকে ভাবে ক্তঃ (পা. ৩/৩/১১৪)।
৫১. মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যশ্চ (পা. ৩/২/১৮৮), ক্তস্য চ বর্তমানে (পা. ২/৩/৬৭)।
৫২. "কর্তরি ক্তবতুরতীতে"।
৫৩. লটঃ শতৃশানচাবপ্রথমাসমানাধিকরণে (পা. ৩/২/১২৪)।
৫৪. শপ্শ্যনোর্নিত্যম্ (পা. ৭/১/৮১)।
৫৫. আচ্ছীনদ্যোর্নুম্ (পা. ৭/১/৮০)।
৫৬. উগিতশ্চ (পা. ৬/৩/৪৫)।
৫৭. *প্রাগুক্ত*, লটঃ........... সমানাধিকরণে (পা. ৩/২/১২৪)।
৫৮. তঙানাবাত্মনেপদম্ (পা. ১/৪/১০০)।
৫৯. আনে মুক্ (পা. ৭/২/৮২)।
৬০. *প্রাগুক্ত*, লটঃ........... সমানাধিকরণে (পা. ৩/২/১২৪)।
৬১. নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ (পা. ৩/১/১৩৪)।
৬২. ণ্বুল্তৃচৌ (পা. ৩/১/১৩৩)।
৬৩. ক্বসুশ্চ (পা. ৩/২/১০৭)।
৬৪. লিটঃ কানজ্বা (পা. ৩/২/১০৩)।
৬৫. সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে (পা. ৩/৪/২১)।
৬৬. অলংখল্বোঃ প্রতিষেধয়োঃ প্রাচাং ক্ত্বা (পা. ৩/৪/১৮)।
৬৭. সমাসেঽনঞ্পূর্বে ক্ত্বো ল্যপ্ (পা. ৭/১/৩৭)।
৬৮. *প্রাগুক্ত*, সমাসে.........ল্যপ্ (পা. ৭/১/৩৭)।
৬৯. তুমুন্ণ্বুলৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্ (পা. ৩/৩/১০)।
৭০. সমানকর্তৃকেষু তুমুন্ (পা. ৩/৩/১৫৮)।
৭১. পর্যাপ্তিবচনেষ্বলমর্থেষু (পা. ৩/৪/৬৬)।

৭২. শকধৃষজ্ঞাগ্লাঘটরভলভক্রমসহার্হস্ত্যর্থেষু তুমুন্ (পা. ৩/৪/৬৫)।
৭৩. কালসময়বেলাসু তুমুন্ (পা. ৩/৩/১৬৭)।
৭৪. "তুং কামমনসোরপি"।
৭৫. ভাবে (পা. ৩/৩/১৮), অকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্ (পা. ৩/৩/১৯)।
৭৬. শ্রিণীভুবোঽনুপসর্গে (পা. ৩/৩/২৪)।
৭৭. উপসর্গে রুবঃ (পা. ৩/৩/২২)।
৭৮. পদরুজবিশস্পৃশো ঘঞ্ (পা. ৩/৩/১৬)।
৭৯. পরৌ ভুবোঽবজ্ঞানে (পা. ৩/৩/৫৫)।
৮০. এরচ্ (পা. ৩/৩/৫৬), ঋদোরপ্ (পা. ৩/৩/৫৭)।
৮১. অর্হঃ (পা. ৩/২/১২)।
৮২. স্বনহসোর্বা (পা. ৩/৩/৬২)।
৮৩. মদোঽনুপসর্গে (পা. ৩/৩/৬৭)।
৮৪. স্ত্রিয়াং ক্তিন্ (পা. ৩/৩/৬৪)।
৮৫. ল্যুট্ চ (পা. ৩/৩/১৫)।
৮৬. *প্রাগুক্ত* "যুবোরানাকৌ..." *অষ্টাধ্যায়ী* ৭/১/১।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

মুদ্রারাক্ষস নাটকে গৌণচরিত্রের ভূমিকা

ড. হোসনে আরা আরজু*

ড. মোহাম্মদ আলী**

Abstract: Mudrarakshasa, a political drama by Vishakhadatta shows Chanakya's achievement of persuasive dipolmacy in bringing Rakshasa, the minister of the royal court of the Nandas, to favour Chandragupta in his conquest. The defeat of the ancient despotic rule on one hand, and the rise of the new regal power with the talents and brilliance of a man like Chanakya backing on the other hand add a different dimension to the play's overall appeal. The minor characters in the play are Chandanadasa, Sakatadasa, Bhagurayana, Jivasidhi, Nipunaka, Sidharthaka, Purusa etc. Of the minor characters Chandanadasa is remarkable for his outstanding instance of friendship. A devoted faithfullness to their master marks the other minor characters. They subordinate the consideration of right or wrong to the cause of their chief and adhere to it with a singular tenacity. They neither betray trust nor grow remiss in the discharge of their duty, although treated with indignity or subjected to physical punishment. For this reason in this article an attempt has been taken to draw the minor Characters of this drama. Alongwith major characters minor characters also play vital roles in the advancement of the plot of this remarkable work.

মুদ্রারাক্ষস নাট্যসাহিত্যে এক অত্যুত্তম এবং অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। বস্তু উপস্থাপনায় ও প্রকৃতিতে নাটকটি সম্পূর্ণ ভিন্নরীতির। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্পর্কের তীক্ষ্ণতা এবং বৃহত্তরসন্দর্ভের রাজনৈতিক সম্বন্ধের তীক্ষ্ণতা। সংকট অপেক্ষা বৃহত্তর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সম্বন্ধের তীক্ষ্ণতা ও যোজনা এখানে পরিলক্ষিত হয়েছে। *মুদ্রারাক্ষস* এক কালজয়ী কৃতিত্ব, এর কালজয়ী কৃতিত্ব সমাজে নাটকটির উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল।

সংস্কৃত নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাটকের বস্তু বা প্লট আহৃত হতে হবে খ্যাতবৃত্ত থেকে যেমন *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *পুরাণ* থেকে। গতানুগতিক সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় রাজা-নায়ক নায়িকার প্রণয়, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে নাটকের চূড়ান্ত পরিণতি। কিন্তু এই গতানুগতিক বৃত্তান্ত থেকে *মুদ্রারাক্ষস* নাটক ব্যতিক্রমধর্মী। বিশাখদত্ত বিরচিত *মুদ্রারাক্ষস* স্ত্রীচরিত্র বর্জিত প্রণয়গন্ধহীন ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিরচিত রাজনৈতিক নাটক। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অমাত্য চাণক্য এবং নন্দরাজ ও মলয়কেতুর অমাত্য রাক্ষস এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত *মুদ্রারাক্ষস* নাটকের উপজীব্য বস্তু। এই দুই রাজনীতিবিদের কূটনৈতিক চালে ঘটনাস্রোত টানটান উত্তেজনার মধ্যে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। অবশেষে নন্দবংশের একান্ত অনুগত মন্ত্রী রাক্ষস তীক্ষ্ণধী ধুরন্ধর চাণক্যের বুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়ে নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন। রাক্ষসের নামাঙ্কিত মুদ্রা কৌশলে হস্তগত করে চাণক্য রাক্ষসকে বশীভূত করে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেছেন– এই হলো নাটকের মূল উপজীব্য।

রাজারা সর্বদাই কূটবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই মন্ত্রীপদে বসাতেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে রাজ্যপরিচালনা করতেন। রাজ্যপরিচালনা ছাড়াও কোন রাজ্য আক্রমণ করবেন, কোন রাজ্য ধ্বংস করবেন এবং কোন রাজ্য

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

** প্রফেসর, গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প ও শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রাস করবেন সে বিষয়েও মন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া চলতেন না। মন্ত্রী খবরাখবর সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করতেন। গুপ্তচরদের ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সংবাদের ওপর নির্ভর করেই রাজা এবং মন্ত্রী কর্মপদ্ধতি, রণকৌশল, রণনীতি স্থির করতেন। প্রয়োজন হলে বিপক্ষদলের ক্ষমতাবান প্রতিপত্তিশালী মন্ত্রী বা সেনাপতিকে নিজ দলে টানতেন। *মুদ্রারাক্ষস* নাটকে দেখি নন্দবংশের উচ্ছেদ এবং তার স্থলে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা। নন্দবংশের অনুগত মন্ত্রী মৌর্যবংশের রাজা চন্দ্রগুপ্তকে সরাবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

মূলত নাটকে কাহিনির পরেই দ্বিতীয় স্থান চরিত্রচিত্রণের। পাত্রপাত্রীর চারিত্র্যই হচ্ছে চরিত্রচিত্রণের মূল কথা। কোনো ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ প্রদর্শন করে তার নৈতিক প্রয়োজন ব্যক্ত করাই চরিত্রবর্ণন। এই চরিত্রে ব্যক্তির নৈতিক গুণ দোষের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। পরিভাষার মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিত্ব দ্যোতিত হয়। *মুদ্রারাক্ষস নাটকের* ঘটনাপ্রবাহে বহুসংখ্যক চরিত্র এসেছে। এই নাটকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে নাটকটি মুখ্য স্ত্রীচরিত্রবর্জিত। চন্দনদাস পত্নী ধূতার উপস্থিতি ব্যতিক্রমস্বরূপ। এছাড়াও রয়েছে রাজলক্ষ্মীরূপ অমূর্ত নায়িকা।

চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য বিপক্ষদলের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে বদ্ধপরিকর। শুধু তাই নয়, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীও চক্রান্তের নায়ককে স্বপক্ষে আনতে সমর্থ হয়েছে এবং তার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়েছে। চক্রান্ত ও প্রতিচক্রান্তে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে উভয় দলের গুপ্তচরগণ। কিন্তু চাণক্যের নিয়োজিত এই গুপ্তচরগণ একজন আরেকজনকে চিনত না। এই নীতি অনুসরণ করেই চাণক্য তাঁর শিষ্য এবং নিয়োজিত চরদের হুকুম দিয়ে তাদের মাধ্যমেই বুদ্ধি দিয়ে রাক্ষসকে বশে আনতে সক্ষম হয়েছেন এবং এই নাটকের চাণক্যের পরেই চন্দনদাস, শকটদাস, জীবসিদ্ধি, সিদ্ধার্থক, ভাগুরায়ণ, নিপুণক, পুরুষ এরা সবাই গৌণচরিত্র হলেও নাটকের গতি আনয়নে এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গৌণচরিত্রগুলির কর্মদক্ষতার কারণে চাণক্য রাক্ষসকে বশে আনতে পেরেছেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এভাবেই সমকালীন যুগের অর্থাৎ রাজতন্ত্রের রাজা এবং তার মন্ত্রীদের প্রকৃতস্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নাটকের মধ্যে। এখন আমরা অপ্রধান চরিত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

অপ্রধান চরিত্র (Subordinate Characters)

অপ্রধান চরিত্রসমূহ (চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের সাহায্যকারী)

চন্দনদাস	: রাক্ষসের অন্তরঙ্গ বন্ধু
শকটদাস	: রাক্ষসের অন্তরঙ্গ বন্ধু
ভাগুরায়ণ	: মলয়কেতুর সখা এবং সচিব, কিন্তু বস্তুত : চাণক্যের চর
জীবসিদ্ধি, ক্ষপণক	: চাণক্যের চর এবং গুপ্ত প্রণিধি
নিপুণক	: চাণক্যনিযুক্ত যমপটধারী গুপ্তচর
সূত্রধার	: যিনি নাটকের প্রারম্ভকর্তা
পুরুষ	: চাণক্যের গুপ্তচর (৬ষ্ঠ অঙ্ক)
সমিদ্ধার্থক	: চাণক্যের চর ও সিদ্ধার্থকের অন্তরঙ্গ বন্ধু (৭ম অঙ্ক)
সিদ্ধার্থক	: শকটদাসের বন্ধু, চাণক্যের বিশ্বস্ত গুপ্তচর (১,৪,৫,৭ম অঙ্ক)

শার্ঙ্গরব	: চাণক্যের শিষ্য ও ব্যক্তিগত সহচর
বৈহীনরী	: চন্দ্রগুপ্তের কঞ্চুকী
	অপ্রধান চরিত্রসমূহ (রাক্ষস ও মলয়কেতুর সাহায্যকারী)
জাজলি	: মলয়কেতুর জন্য নিয়োজিত কঞ্চুকী
বিরাধগুপ্ত	: রাক্ষসের একজন গুপ্তচর
করভক	: দ্বিতীয় অঙ্কে অবতীর্ণ রাক্ষসের বার্তাবহ
প্রিয়ংবদক	: রাক্ষসের পরিচারক
চন্দনদাস পুত্র	: চন্দনদাসের পুত্র
দৌবারিক	: রাক্ষসের দ্বাররক্ষক
	অপ্রধান বা গৌণ নারী চরিত্র
নটী	: সূত্রধারের পত্নী
কুটুম্বিনী	: চন্দনদাসের পত্নী
শোণোত্তরা	: স্ত্রী-দ্বাররক্ষী (৩য় অঙ্ক)
বিজয়া	: মলয়কেতুর নিযুক্ত স্ত্রী-দ্বাররক্ষী (৫ম অঙ্কে দৃশ্যমান)

চন্দনদাস

অমাত্য রাক্ষসের অভিন্নহৃদয় বন্ধু চন্দনদাস। নিজ আবাসে তিনি রাক্ষসকে আপৎকালে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রাক্ষসের অবর্তমানে তাঁর স্ত্রীপুত্রদের রক্ষা করেছেন। তাঁর চরিত্রের উজ্জ্বলতম দিক হচ্ছে বন্ধুবাৎসল্য। তাঁর চরিত্রের নির্ভীক মনোবৃত্তি ও দৃঢ়তা সকলের মনে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

প্রথম অঙ্কে চাণক্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দৃশ্যে চন্দনদাস এক মহনীয় ব্যক্তিত্ব। অমাত্য রাক্ষসের পরিবারকে চাণক্যের হাতে সমর্পণ না করলে স্ত্রীপুত্রসহ তাঁকে নির্যাতিত হতে হবে —চাণক্য এই ভয় দেখালে তিনি এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে বলেছেন–"আর্য কিং মে ভয়ং দর্শয়সি। সন্তমপি গেহে অমাত্যরাক্ষসস্য গৃহজনং ন সমর্পয়ামি কিং পুনরসন্তম্।" চন্দনদাস চাণক্যের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন: (বাঢ়ম্। এষ মে নিশ্চয়ঃ)। চাণক্য প্রাণদণ্ডের ভয় দেখালে উত্তরে তিনি বলেছেন যে বন্ধুর উপকার করতে গিয়ে তাঁকে প্রাণত্যাগ করতে হলেও সেটাকে তিনি সৌভাগ্য বলে মনে করবেন। বধ্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার পরও তিনি অবিচল। স্ত্রীর হাহাকার, পুত্রের আকুল ক্রন্দন কোনো কিছুই তাঁকে সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। অন্তরঙ্গ মিত্রের প্রাণরক্ষার জন্য অবশেষে রাক্ষস যখন চাণক্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তখন চন্দনদাস বলেছেন–"অমাত্য সর্বমপীমং প্রয়াসং নিষ্ফলং কুর্বতা ত্বয়া কিমনুষ্ঠিতম্।" বন্ধুর জন্য আত্মত্যাগ করা চন্দনদাসের কুলধর্ম। তাঁর বালকপুত্রও তাই যথার্থই বলেছে "কুলধর্মঃ খল্বেষো'স্মাকম্।" কুটিলমতি চাণক্যও তার বন্ধুবাৎসল্যে মুগ্ধ হয়ে স্বগতোক্তি করেছেন–"সাধু চন্দনদাস! সাধু!" অমাত্য রাক্ষসও তাঁর উদ্দেশ্যে বলেছেন–

"সুলভেস্বর্থলাভেষু পরসংবেদনে জনে।
ক ইদং দুষ্করং কুর্যাদিদানীং শিবিনা বিনা ॥"[১]

অমাত্য রাক্ষসের মতে সুকৃতিতে তিনি বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের কৃতিত্বকেও হার মানিয়েছেন। রাক্ষস তাই বলেছেন-

"দুষ্কালে'পি কলাবসজ্জনরুচৌ প্রাণৈঃ পরং রক্ষতা
নীতং যেন যশস্বিনাতিলঘুতামৌশীনরীয়ং যশঃ।
বুদ্ধানামপি চেষ্টিতং সুচরিতৈঃ ক্লিষ্টং বিশুদ্ধাত্মনা
পূজার্হো'পি স যৎকৃতে তব গতো বধ্যত্বমেষো'স্মি সঃ॥"[২]

অর্থাৎ, ঘোর কলিকালে শিষ্টজনরুচি বিরল, সেই দুঃসময়েও যে যশস্বী পুরুষ নিজের প্রাণের বিনিময়ে পরের প্রাণ রক্ষা ক'রে শিবি রাজার যশকেও ম্লান করে দিয়েছেন, যে বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ নিজের সংস্কৃতিতে বৌদ্ধদের উদার চেষ্টাকেও তুচ্ছ করে দিয়েছেন, পূজার্হ হয়েও যার জন্য সেই পুরুষ তোমার কাছে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয়, সেই আমি এসে গেছি।

চন্দনদাসের চরিত্রের দৃঢ়তা সপ্তম অঙ্কে রাক্ষসের উদ্দেশে তাঁর তিরস্কারে পরিস্ফুট হয়েছে। রাক্ষস যে চন্দনদাসকে বিশুদ্ধাত্মা বিশেষণে সম্বোধন করেছেন তা তাঁর পক্ষে উপযুক্ত। চাণক্য 'সবনগর-শ্রেষ্ঠী'র পদে তাঁকে বসিয়ে তাঁর যোগ্য মর্যাদাই দিয়েছেন। আদর্শ স্বামী হিসেবেও চন্দনদাস প্রশংসার দাবিদার। তাঁর সহধর্মিণী স্বামীর আসন্ন মৃত্যুর কথা শুনে তাঁর অনুগামিনী হতে চেয়েছেন– "ভর্তুশ্চরণাবনুগচ্ছন্ত্যা আত্মানুগ্রহো ভবত্বিতি।" পুত্রবৎসল পিতা হিসেবেও তিনি ছিলেন স্বমহিমায় ভাস্বর। অকৃত্রিম বন্ধুবাৎসল্যই তাঁর চরিত্রকে মহান করে তুলেছে। চাণক্য ও রাক্ষস উভয়েই তাঁর কৃতকর্মের প্রশংসাই করেছেন। এ প্রসঙ্গে এম.আর. কালে যথার্থই মন্তব্য করেছেন:

"Of the minor characters Chandanadasa stands out as a noble example of friendly affection. He would rather lose all than be treacherous to a trusting friend. Even Chanakya is impressed by this trait of his character and admires him inwardly."[৩]

শকটদাস

চন্দনদাসের অকৃত্রিম বন্ধু রাক্ষসের বন্ধু। তিনি কেবল রাক্ষসের বন্ধু নন, বিশ্বস্ত কর্মচারীও বটে। রাক্ষস তাই অনেক টাকা দিয়ে গুপ্তচরদের অর্থ সাহায্য করার কাজে শকটদাসকে কুসুমপুরে নিয়োগ করেছেন। চাণক্য ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে অভিযুক্ত করে তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। কায়স্থকুলজাত শকটদাস কৌশলে কৌটিল্যের কবল থেকে মুক্ত হয়েছেন। মূলত চাণক্যের গুপ্তচর সিদ্ধার্থকের দ্বারা বধ্যস্থান থেকে নীত হয়েছেন। রাক্ষস অবশ্যই এটা না জেনে বলেছেন 'কৌটিল্যগোচরগতো'পি ত্বং দৃষ্টো'সি॥'

শকটদাসের হৃদয় অত্যন্ত সরল। ঘাতকরূপী চণ্ডালবেশধারী সিদ্ধার্থক তাঁকে বধ্যস্থান থেকে উদ্ধার করে এনেছে। এর পেছনে ছিল চাণক্যের বিশেষ উদ্দেশ্য। তাঁর সরলতার সুযোগে চাণক্য স্বাক্ষরবিহীন শিরোনামছাড়া এক চিঠি লিখিয়ে নেন। শকটদাস বুঝতে পারেননি যে, তাঁর উদ্ধারকর্তা সিদ্ধার্থক প্রকৃতপক্ষে চাণক্যের গুপ্তচর। তিনি এতটাই অকৃত্রিম হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন যে বন্ধু রাক্ষসের পরিবর্তে তিনি চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। রাক্ষসও তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে মেনে নিতে পারেননি। অকৃত্রিম বন্ধু রাক্ষসের উপকার করার পরিবর্তে সরলমনা এই শকটদাস প্রথম থেকেই রাক্ষসকে বিব্রত করেছেন। তথাপি তাঁর সারল্যের জন্য পাঠকসমাজের কাছে তিনি আদৃত হয়েছেন।

ভাগুরায়ণ

ভাগুরায়ণ মলয়কেতুর সখা এবং সচিবরূপে নাটকে উপস্থাপিত হলেও প্রকৃতপক্ষে চাণক্যেরই গুপ্তচর। চাণক্যচরো মলয়কেতোঃ কপটবন্ধুশ্চ। এম.আর. কালের ভাষায় : "Malayaketu's secretary and friend, but really an agent of Chanakya." অর্থাৎ চতুর্থ অঙ্কের আগে তাঁর চরিত্র এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠক বা দর্শকবৃন্দের মনে কোনো প্রকার ধারণা জন্মে না। চাণক্যের চর হলেও তিনি অনায়াসে মলয়কেতুর বিশ্বাসভাজন এবং প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছেন। তাঁরই পরামর্শে ভাগুরায়ণ চাণক্যের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য কুসুমপুর পরিত্যাগ করেছিলেন। ভাগুরায়ণের কুমন্ত্রণায় রাক্ষসের বিরুদ্ধে মলয়কেতুর মনে বিদ্বেষ জাগে এবং উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের পথও প্রশস্ত হয়। ক্ষপণকের সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত উক্তি সকলকে মুগ্ধ করে। নিয়োগকর্তা চাণক্যের নির্দেশে মলয়কেতুকে বঞ্চনা করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, মলয়কেতুতুল্য একজন সজ্জন ব্যক্তিকে তিনি প্রতারণা করে চলেছেন এই বিবেকবোধ অহর্নিশ তার অন্তরকে পীড়িত করেছে। তাঁর উক্তিই তার প্রমাণস্বরূপ "কষ্টমেবময়মস্মাসু স্নেহবান্ কুমারো মলয়কেতুরধিসন্ধাতব্য ইত্যহো দুষ্করম্।"[৪] এছাড়াও তাঁর স্বগতোক্তিতে আক্ষেপও ফুটে উঠেছে–

> "তদাজ্ঞাং কুর্বাণো হিতমহিতমিত্যেতদধুনা।
> বিচারাতিক্রান্তঃ কিমিতি পরতন্ত্রো বিমৃশতি।"[৫]

তাঁর মতে রাক্ষসের কার্যকলাপে দোষ নেই। ভাগুরায়ণ মলয়কেতুকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : "কুমার মতিমাংশ্চাণক্যো ন নিষ্প্রয়োজনমেব চন্দ্রগুপ্তং কোপয়িষ্যতি ন চ কৃতবেদী চন্দ্রগুপ্ত এতাবতা গৌরবমুল্লঙ্ঘয়িষ্যতি। সর্বথা চাণক্যচন্দ্রগুপ্তয়ো পুষ্কলাৎ কারণাদ্যো বিশ্লেষ উৎপদ্যেত স আত্যন্তিকো ভবিষ্যতীতি।"[৬] আজ্ঞাবহ ভৃত্যের কাছে অন্তরের সংবেদনশীলতা যে পরিহারের বস্তু, ন্যায় অন্যায় বিচার তার মানায় না এই সরল সিদ্ধান্তে, আসতে তার বিলম্ব হয়নি। মলয়কেতুর উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন: "ইহ খল্বর্থশাস্ত্রব্যবহারিণামর্থবশাদরিমিত্রোদাসীনব্যবস্থা ন লৌকিকানামিব স্বেচ্ছাবশাৎ।"[৭]

সিদ্ধার্থক

চাণক্যের অপর এক চর। 'Agents and emissaries of' চাণক্য। সিদ্ধার্থক রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করতে গিয়ে রাজপুরুষ হয়েও বধ্যস্থানের ঘাতকরূপে চণ্ডালের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে।

চাণক্যের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার কাজে সহায়ক হলেন গুপ্তচর সিদ্ধার্থক। শকটদাসের লিখিত পত্র প্রথমেই তার হস্তগত হয়, রাক্ষসের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক কৌশলে তিনি শকটদাসের দৃষ্টিতে নিয়ে আসেন এবং রাক্ষসের আস্থা অর্জনের জন্য রাক্ষসের হাতেই সমর্পণ করে, পঞ্চম অঙ্কে মলয়কেতু এবং রাক্ষসের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে।

চাণক্য ও তাঁর প্রয়োগকৃত নীতি সম্পর্কে সিদ্ধার্থকের মিশ্র প্রতিক্রিয়া অনায়াসলক্ষ। অসামান্য প্রভুভক্তির কারণেই বিপদসঙ্কুল কাজেও তিনি অনায়াসে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আনুগত্য, কর্তব্যপরায়ণতা এবং বুদ্ধিমত্তা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সিদ্ধার্থক সম্পর্কে তাই জগদীশ চন্দ্র মিশ্র যথার্থই বলেছেন: "রাক্ষসকো গুপ্তপ্রণিধিকে রূপ মে প্রতিনিযুক্ত শকটদাস কোণ গতিবিধি কে পরীক্ষণার্থং চাণক্য নে সিদ্ধার্থককো প্রতিনিয়োজিত কিয়া গয়া।... ইসকে জীবন মে আউর ন কৈ চিন্তা হৈ আউর ন কিসী কাম মে ইসে ভ্রম হো জাতা হ্যায়। চাণক্য কী আজ্ঞা সে চাণ্ডালকে রূপ মে হমারে সামনে উপস্থিত হোতা হ্যায়।"[৮] "তদেহি চাণ্ডালবেষধারিণো ভূত্বা চন্দনদাসং বধ্যস্থানং নয়ামঃ" ইত্যাদি উক্তি থেকে সিদ্ধার্থকের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে।

সমিদ্ধার্থক

সিদ্ধার্থকের মতো সমিদ্ধার্থকও চাণক্যের চর এবং গুপ্ত প্রতিনিধি। সিদ্ধার্থকের মতই চাণক্যের আজ্ঞাবহ। এ প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেনঃ "They are all devoted to him. Even at their personal risk and danger they do not shirk the duty with which they are entrusted. Once of course সিদ্ধার্থক clearly says that life is not safe if Chankya be disobeyed."[৯]

ষষ্ঠ অঙ্কের প্রবেশকে সিদ্ধার্থক ও সমিদ্ধার্থকের কথোপকথনের মাধ্যমে নাট্যকার কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত করেছেন। যেমন সমিদ্ধার্থক প্রবেশ করেই বলেছেন : "যে মিত্রের কথা সর্বদা মনে হয়, যে দুঃখের সময় চন্দ্রের মত আহ্লাদকর ও বাড়িতে উৎসব হলে নিজে আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তার বিরহে ঐশ্বর্য থেকে আনন্দ না হয়ে দুঃখই হয়।"[১০] সমিদ্ধার্থক সুখের সংবাদটি কি জানতে চাইলে সিদ্ধার্থক জানান হতভাগ্য মলয়কেতু চাণক্যের নীতিতে হতবুদ্ধি হয়ে রাক্ষসকে তাড়িয়ে দিল ও চিত্রবর্মা প্রভৃতি পাঁচটি রাজাকে মেরে ফেলল। তারপর মিত্ররাজারা বুঝল, এ দুরাচার অগ্র পশ্চাৎ না দেখে কাজ করে। তখন তারা ভয় পেয়ে মলয়কেতুর রাজ্য ছেড়ে চলে গেল। সামন্ত রাজাদের সকলের হৃদয় অবসন্ন হলো। অবশিষ্ট সৈনিক পরিবার ভয়ে আকুল হয়ে গেল। এ অবসরে ভদ্রভট, পুরুষদত্ত প্রভৃতি রাজারা মলয়কেতুকে ধরে বেঁধে ফেলল। সমিদ্ধার্থক বলেন কুকবির করা নাটকের মতো আরম্ভে এক আর শেষে আরেক, এ কেন?

সমিদ্ধার্থক আরও জানতে চাইলেন আর্য চাণক্য ওরকম করে সকল লোকের সাক্ষাতে গিয়ে বসে রইলেন আর এখন সেই মন্ত্রী পদেই গিয়ে আবার বসলেন কেন?[১১] সিদ্ধার্থক প্রত্যুত্তরে বলেছেন– তুমি দেখছি অতি ছেলে মানুষ। চাণক্য চরিত্র অমাত্য রাক্ষসও বুঝতে পারেননি তাই তুমি এখন বুঝতে চাইছ। "তথা সর্বলোকপ্রত্যক্ষমুজ্ঝিতাধিকারঃ স্থিত্বা আর্য্যচাণক্যঃ কিং পুনরপি তদেব মন্ত্রিপদমারূঢ়ঃ" সমিদ্ধার্থক আরও জানতে চেয়েছেন আর্য চাণক্যের কি আর কোনো ঘাতকজন নেই যে এমন একটা নৃশংস কাজে আমাদেরকে নিযুক্ত করলেন। সিদ্ধার্থকও প্রত্যুত্তরে জানিয়েছেন, বয়স্য! সংসারে এমন কে আছে যে প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়ে আর্য চাণক্যের আজ্ঞার বিরোধী হবে? তাই চণ্ডালের ছদ্মবেশে চন্দনদাসকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। এই কথোপকথন থেকে প্রমাণিত হয় দুজনই চাণক্যের আজ্ঞাবহ ও গুপ্তচর বৃত্তির উপযুক্ত। তবে চণ্ডালের বেশে চন্দনদাসকে হত্যা করার উদ্যোগে তারা অসম্মতই ছিলেন।

বিরাধগুপ্ত

বিরাধগুপ্ত সাঁপুড়ের ছদ্মবেশে এক গুপ্তচর। নাট্যকার বিরাধগুপ্তের মাধ্যমে রাক্ষসপ্রযুক্ত নীতির ব্যর্থতার কথা দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন। সাঁপুড়ের নাম জীর্ণবিষ। তিনি রাক্ষসের কাছে কিছু বলতে উৎসুক। তাঁর দর্শনপ্রার্থী প্রিয়ংবদক নামক রাজপুরুষ সাঁপুড়েকে জানান অমাত্য রাক্ষস সর্পদর্শনে উৎসুক নন। পারিতোষিক দিয়ে পাঠিয়েছেন গ্রহণ করুন। সাঁপুড়ে জানান তিনি শুধু সাঁপুড়ে নন, প্রাকৃত কবিও বটে। তাই অমাত্য দর্শনে সম্মত না হলে তাঁর কাছে গচ্ছিত পত্রটি অমাত্যকে পড়তে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। পত্রে লেখা ছিল ভ্রমর নিজের নৈপুণ্যে কুসুমের রস নিঃশেষ করে যা উদ্‌গিরণ করে তাতে অন্যের কাজ হয়। অমাত্য রাক্ষস কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারলেন, অর্থাৎ "আমি তোমার চর, কুসুমপুরের বৃত্তান্ত জানি।" এ নিশ্চয় বিরাধগুপ্ত সাঁপুড়ের সাজে এসেছে– এরূপ ধারণা থেকে প্রিয়ংবদককে জানান যে এ সুকবি, এর কাছ থেকে মিষ্ট কথা জানতে হবে। বিরাধগুপ্ত আহিতুণ্ডক নামে নাটকে পরিচিত। অহিতুণ্ডেন দিব্যতীতি অহি-তুণ্ড্ + ইক। তাই চর হিসেবে বিরাধগুপ্ত যথেষ্ট সফল বলতেই হয়। সাঁপুড়ের ছদ্মবেশে বিরাধগুপ্তের চরিত্রটি দর্শক চিত্তে আমোদ এবং আনন্দ সঞ্চার করেছে।

প্রভুর পাদপদ্মের সেবকদের এই করুণ দশা দেখে যখন বিহ্বল রাক্ষস, তখন বিরাধগুপ্ত জানায় অচিরেই রাক্ষস পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবেন। চাণক্যের পরামর্শে সাগর যেমন উচ্ছল হয়ে ওঠে তখন

পর্বতেশ্বরের শক, যবন ইত্যাদি সৈন্যেরা চারদিক থেকে কুসুমপুর ঘিরে নিয়েছিল। বিরাধগুপ্ত অমাত্য রাক্ষসকে ব্যস্ত হতে নিষেধ করলেন। বিরাধগুপ্ত আরও জানান চাণক্য পর্বতকের ভাই বৈরোচককে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে এক আসনে বসিয়ে পৃথিবীর রাজ্য বিভাগ করে দিয়েছিলেন। বৈরোচক ও বর্বরকের মৃত্যুর খবরও বিরাধগুপ্ত জানালেন।

শার্ঙ্গরব

চাণক্যের শিষ্য। প্রথম অঙ্কে তাঁর দেখা মেলে। চাণক্য পত্র লেখার অভিনয় করে শার্ঙ্গরবকে ডাকেন। শিষ্য প্রবেশ করে গুরুদেব আজ্ঞা করুন বলে জানায়। চাণক্যের নির্দেশেই শিষ্য শকটদাসকে দিয়ে কপটপত্র লেখান। পরবর্তীতে সিদ্ধার্থক শকটদাসের হাতে লেখা পত্র নিয়ে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়। চাণক্য সকল কাজেই প্রিয়শিষ্য শার্ঙ্গরবকে আহ্বান করেন।

শিষ্য শার্ঙ্গরবকে নির্দেশ দেন শকটদাস নামে কায়স্থ যে রাক্ষসের পরামর্শে চাণক্যের প্রাণনাশে সদা তৎপর তাঁকে তাঁর দোষ ঘোষণা করে শূলে চড়ানোর ও পরিবারবর্গকে কারাগারে পাঠানোর জন্য। এই শিষ্যের মাধ্যমেই চাণক্য জানেন যে কালপাশিক ও দণ্ডপাশিক দেব চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা পালন করছেন। শিষ্যই চন্দনদাসকে চন্দ্রগুপ্তের কাছে নিয়ে আসেন এবং চাণক্য তাঁর বসার আসন দেখিয়ে দেন। শিষ্য শার্ঙ্গরবই চাণক্যকে এই সংবাদ জানান যে শকটদাসকে আর্য চাণক্য মেরে ফেলবেন এই আশঙ্কায় সিদ্ধার্থক তাঁকে বধ্যস্থান থেকে নিয়ে পালিয়েছেন। ভাগুরায়ণের পলায়নদৃশ্যও শার্ঙ্গরব চাণক্যের কাছে নিবেদন করেন।

প্রিয়ম্বদক

জীর্ণবিষ নামে আহিতুণ্ডক রাক্ষসকে জানান সাঁপুড়ের সাপ দেখানোতে রাক্ষসের অভিরুচি নেই। তাই পারিতোষিক দিয়ে সাঁপুড়েকে বিদায় দেওয়ার কথা জানান। সাঁপুড়ে প্রিয়ম্বদককে ভদ্রমুখ সম্বোধন করে অমাত্যের কাছে একটি পত্র দিতে বলেন। অমাত্যকে আর্য সম্বোধন করে প্রিয়ম্বদক জানায় সাঁপুড়ে একজন প্রাকৃত কবিও। এরপর অমাত্যের নির্দেশে প্রিয়ংবদক পরিজনসহ নিষ্ক্রান্ত হন। অমাত্য রাক্ষসের প্রিয় অনুচর ও আজ্ঞাবহ ভৃত্য ছিলেন প্রিয়ম্বদক একথা অনুমিত হয়।

বৈহীনরী

চন্দ্রগুপ্তের কঞ্চুকী। কঞ্চুকীর সংজ্ঞা নির্দেশ করে *নাট্যশাস্ত্রে* বলা হয়েছে-

> "যে বিদ্যাসত্যসম্পান্নাঃ কামদোষবিবর্জিতাঃ।
> জ্ঞানবিজ্ঞানকুশলাঃ কঞ্চুকীয়াশ্চ তে স্মৃতাঃ"[১২]

যাঁরা বিদ্বান, সত্যনিষ্ঠ ও যৌনব্যসনমুক্ত তাঁরাই কঞ্চুকীয়। যৌনক্রিয়ারহিত নপুংসকদের রাজা অন্তঃপুর রক্ষার কাজে নিয়োজিত করবেন। দুরাত্মা রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত বসন্তে কুসুমপুরে কৌমুদীমহোৎসব শুরু হয়নি দেখে চন্দ্রগুপ্ত কঞ্চুকীকে আর্য্য বৈহীনরীকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করেন কুসুমপুরে কৌমুদী মহোৎসবের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল কিনা?

কঞ্চুকী জানান প্রভুর আদেশ পৃথিবীতে এ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করা হয়নি। পৌরজন কিরূপে অগ্রাহ্য করবে? পরবর্তীতে কঞ্চুকী জানান আর্য চাণক্যের নির্দেশে কৌমুদী মহোৎসব নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। কঞ্চুকীর মতে প্রাণের আশা রেখে প্রভুর আদেশ লজ্ঘন করে, এমন আর কে আছে? নৃপতি আর্য চাণক্যের দর্শনে ইচ্ছুক বৈহীনরীকে একথা জানালে কঞ্চুকী প্রভুর আজ্ঞা পালনে তৎপর হয়েছেন। চাণক্যের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হলে চাণক্য প্রশ্ন করেছেন 'বৈহীনরে কিমাগমনপ্রয়োজনম্' কঞ্চুকীর মুখেই আর্য চাণক্যের ভগ্নদশাপ্রাপ্ত গৃহের বর্ণনা পাই–

"উপলশকলমেতচ্ছেদকং গোময়ানাং
বটুভিরুপহৃতানাং বর্হিষাং স্তূপমেতৎ।
শরণমপি সমিদ্ভিঃ শূষ্যমাণাভিরাভি
র্বিনমিতপটলান্তং দৃশ্যতে জীর্ণকুড্যম্ ॥"[১৩]

অর্থাৎ, ঘুটে গুঁড়ো করার জন্য একখানি ভাঙা পাথর, শিষ্যদের জড়ো করা কুশের রাশি! দেয়াল পচে পড়ছে, হোমের কাঠ শুকাতে দেওয়া হয়েছে, তাই চালের এক কোণ নেমে পড়েছে। কঞ্চুকীর মতে প্রভু চন্দ্রগুপ্ত যে এঁর কাছে বৃষলমাত্র তা ঠিকই।

"যো নন্দমৌর্যনৃপয়োঃ পরিভূয় লোক
মস্তোদয়ৌ প্রতিদিশন্নবিভিন্নকালম্।
পর্যায়পাতিতহিমোষ্ণমসর্বগামি
ধাম্নাতিশায়য়তি ধামসহস্রধাম্নঃ ॥"[১৪]

অর্থাৎ, সূর্যদেবের কিরণ একসঙ্গে সর্বত্র যায় না, কাজেই সংসারে শীত ও গ্রীষ্ম পর পর হয়ে থাকে, একসঙ্গে হয় না। ইনি সংসারকে অগ্রাহ্য করে রাজা নন্দ ও রাজা মৌর্য্যের একের অস্ত ও অন্যের উদয় এক সঙ্গেই ব্যবস্থা করলেন, অতএব এর তেজ সূর্য্যেরও অধিক বৈহীনরীর এই উক্তি তার বাস্তবজীবনে দক্ষতা ও আলংকারিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক অনুপম দৃষ্টান্ত। চাণক্য বৈহীনরীর আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান আর্যের ক্রিয়ার বিঘ্ন যদি না হয় তাহলে আর্য্যকে একবার দেখতে ইচ্ছে করি। চাণক্য বৈহীনরীকে জিজ্ঞাসা করেন কৌমুদীমহোৎসব নিষিদ্ধ করা হয়েছে একথা বৃষলের কানে গিয়েছে কিনা? কে তাঁকে এ সংবাদ জানাল? কঞ্চুকী জানান স্বয়ংদেব চন্দ্রগুপ্তই সুগাঙ্গ প্রাসাদে উঠে দেখেছেন কৌমুদীমহোৎসব আরম্ভ হয়নি। চাণক্য বলেন রাজপরিজনের চাণক্যের উপর কি বিদ্বেষ তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। কঞ্চুকীকে সুগাঙ্গের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে বলেন। রাজা চাণক্যের প্রশ্নের উত্তরে জানান আর্যের দর্শনে অনুগৃহীত হওয়ার জন্যই তাঁর এ আহ্বান। ইতোমধ্যে দুইজন বৈতালিক রাজস্তুতি করলে রাজা কঞ্চুকীকে তাঁদের স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিতে বলেন। চাণক্য বৈহীনরীকে এ কাজে নিবৃত্ত করেন। রাজা যখন নিজেই রাজ্য পরিচালনা করবেন বলে ঘোষণা দিলেন তখন কঞ্চুকী দেব চন্দ্রগুপ্ত 'আর্য চাণক্য' না বলে শুধু 'চাণক্য' সম্বোধন করাটাও লক্ষ করেছেন। তিনি তাই বলেছেন রাজা যদি অসম্মান করেন তা মন্ত্রীরই দোষ। মাহুতের দোষেই হাতী ক্ষেপা হাতী হয়।[১৫] কঞ্চুকীও সানন্দে বলেন মহারাজ। প্রভু এখন প্রভু হয়েছেন, এ আমাদের সৌভাগ্য– 'দিষ্ট্যা দেব ইদানীং দেবঃ সংবৃত্তঃ।'

জাজলি

ময়লকেতুর প্রাসাদের কঞ্চুকী। দ্বিতীয় অঙ্কে কঞ্চুকীর আবির্ভাব। আকাশের দিকে তাকিয়ে সজল নেত্রে তিনি বলেছেন, হে ভগবতি! কমলালয়ে, তুমি নিতান্তই গুণের আদর জানো না। কারণ হিসেবে জানিয়েছেন প্রভু নন্দের আনন্দ বিধান করলেও তাঁকে ছেড়ে মুরার গর্ভে যে শক্রপুত্র জন্মেছিল তাঁকে লক্ষ্মী আশ্রয় করেছে। তিনি সত্যসত্যই চপলা।

রাক্ষস আক্ষেপ করে আরও বলেছেন, হে পাপিষ্ঠা! মুরার পুত্রের কুল নেই তথাপি তাঁকে বরণ করেছো, সংসারে মহাকুলীন সকল রাজাই কি চাণক্যের কোপানলে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল? কঞ্চুকীর মতে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি স্বভাবত কাশফুলের আগার মতো চঞ্চল, পুরুষের গুণ দেখতে চায় না। এরপর কঞ্চুকীর প্রবেশ। তাঁর উক্তি ও অভিমত এই যে চাণক্যের নীতি যেমন নন্দকে মেরে কুসুমপুরে মৌর্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তদ্রূপ জরা তার অন্তরে ক্রমে তাকে বিনাশ করে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছে। রাক্ষস যেমন মৌর্যকে জয় করতে তৎপর তদ্রূপ

লোভও তার ধর্মের উচ্ছেদে যত্নবান; কিন্তু কৃতকার্য হচ্ছে না। কঞ্চুকী মলয়কেতুর বার্তা ও আভরণালংকার ধারণ করার জন্য কুমারের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। রাক্ষসও জাজলিকে বলেন, কুমারকে আমার জবানীতে বলুন, আপনার গুণের পক্ষপাতী হয়ে পূর্ব প্রভুর গুণ যথার্থই বিস্মৃত হয়েছি। শত্রুদের নিঃশেষ করে পুরুষসিংহের স্বর্ণসিংহাসন পাটলিপুত্রে সুগাঙ্গ প্রাসাদে না বসানো পর্যন্ত কোনো প্রকার অলংকার ধারণ না করার অঙ্গীকার করেন। তখন কঞ্চুকী জাজলি বলেন অমাত্যের নেতা থাকতে কুমারের পক্ষে এ কাজ সুলভ। অতএব কুমারের প্রথম অনুরোধ রক্ষা করার জন্য রাক্ষসকে অনুরোধ করেন। রাক্ষস প্রত্যুত্তরে কুমারের মতোই আর্য জাজলির কথাও ফেলার নয় বলে জানান। অতঃপর কঞ্চুকী ভূষণবিন্যাসের অভিনয় করেন এবং প্রত্যাবর্তন করেন। রাক্ষস জাজলিকে আর্য সম্বোধন করেছেন এবং তাঁর অনুরোধ যে ফেলতে পারেন না একথাও জানান।

চতুর্থ অঙ্কে আবার জাজলির ভূমিকা লক্ষ করা যায়। মলয়কেতু পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে তৎপর; তাই তিনি প্রকাশ্যে জাজলিকে বলেছেন, আর্য জাজলি যে রাজারা পিছনে আসছেন তাঁদেরকে আমার কথা জানান- 'আমি একাই বিনা সংবাদে গিয়ে অমাত্য রাক্ষসের আনন্দ বিধান করতে চাই। আপনারা অনুগমন করে কষ্ট করবেন না।'

কঞ্চুকীও কুমারের আদেশে বলেন, ওগো রাজগণ! কুমারের আদেশ কেউ যেন তাঁর অনুগমন না করেন। কুমারের আদেশ শোনামাত্র রাজারা সকলে থেমে যান। মলয়কেতু কঞ্চুকীকেও অনুগমনে নিষিদ্ধ করেন এবং কেবলমাত্র ভাগুরায়ণ তাঁকে অনুসরণ করুক এই ইচ্ছে জানান। কঞ্চুকী তাঁর আদেশ শিরোধার্য করেন।

করভক

অমাত্য রাক্ষসের বার্তাবহ দূত। অমাত্য রাক্ষসের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দ্বারীদের আহ্বান করে জানান প্রভু অমাত্য রাক্ষসের কাছে বল যে করভক পাটলিপুত্র থেকে ছুটে এসেছে। দৌবারিক উচ্চস্বরে কথা বলতে করভককে নিষেধ করেন। কারণ অমাত্য রাক্ষসের শিরোবেদনা উপস্থিত। অবসর বুঝে করভকের কথা জানানো হবে। করভকও এতে সম্মতি জানালেন। এরপর স্বয়ং রাক্ষস শয়নগৃহ থেকে বেরিয়ে এলে দৌবারিক জানান অমাত্য, করভক দ্বারে উপস্থিত। 'অমচ্চ করভও দুআরে চিঠ্ঠাদি।' রাক্ষস তাঁকে শীঘ্র উপস্থিত হতে বলল।

করভক সম্মুখে গিয়ে অমাত্যের জয় হোক এই বলে ভূমিতে উপবেশন করলেন। করভক চন্দ্রগুপ্তের ক্রোধের কারণ হিসেবে জানিয়েছেন চাণক্য মলয়কেতু ও অমাত্য রাক্ষসকে সরে যেতে দিয়েছেন "অস্ত্যন্যদপি চন্দ্রগুপ্তস্য কোপকারণম্ উপেক্ষিতো' নেনাপক্রামম্মলয়কেতুঃ অমাত্যরাক্ষসশ্চেতি।"[১৬] করভক চাণক্যের পাটলিপুত্রে অবস্থান ও চাণক্য তপোবনে যেতে পারেন এ কথাও শোনা যাচ্ছে বলে জানান। এ থেকে করভক যে শত্রুর গোপনসংবাদ সংগ্রহে সদা তৎপর এবং মলয়কেতুর বিশ্বস্ত জন সহজেই একথা অনুধাবন করা যায়।

ক্ষপণক

একজন জৈন ভিক্ষু। যাত্রাকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুর দর্শনকে সাধারণত লোক অশুভজনক বলে মনে করত। জৈন ক্ষপণকের দর্শন অশুভসূচক বলে পরিগণিত হতো। সম্ভবত ক্ষপণকের বীভৎস দর্শন জনমানসে কুসংস্কার সৃষ্টি করেছিল। ক্ষপণক প্রবেশ করে অর্হৎ-দের উদ্দেশে প্রণাম জানান। এরা গভীর বুদ্ধির বলে সৃষ্টিছাড়া উপায়ে সংসার লাভ করে। সিদ্ধার্থকও সন্ন্যাসী ঠাকুর প্রণাম করি বলে তাঁকে সম্মান দেখিয়েছেন। ক্ষপণক সিদ্ধার্থককে ধর্মলাভের আশীর্বাদ করলেন। তাঁর হাতে চিঠি তাই তাঁর গন্তব্য সম্পর্কে ক্ষপণক জিজ্ঞাসা করেন। সন্ন্যাসী হলেও তিনি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, চিঠি যার হাতে সে দূরান্তে অবস্থিত সেই ব্যক্তির পত্রবাহক

হবে–এ ধারণা জন্মেছিল। দেশান্তরে যাচ্ছি, বলুন দেখি ঠাকুর আজ দিনটা কেমন। ক্ষপণক হেসে শ্রাবক, মাথাটি মুড়িয়ে নক্ষত্রটি কেমন জিজ্ঞাসা করছ? ক্ষপণক জানান যা সিদ্ধার্থকের অনুকূল সেটি মলয়কেতুর শিবিরে মিলবে। ক্ষপণক তখন সিদ্ধার্থককে মলয়কেতুর শিবিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে বলেন। ক্ষপণক আরও জানান এতদিন এ শিবিরে লোকের যাওয়া আসার বারণ ছিল না, এখন শিবির থেকে কুসুমপুর কাছে হয়েছে বলে মোহর করা চিঠি ছাড়া কাউকেও যেতে আসতে দেওয়া হয় না। অতএব যদি ভাগুরায়ণের ছাপ পেয়ে থাক, স্বচ্ছন্দে যাও। না হলে তোমাকে হাতে পায়ে বেঁধে রাজার তাঁবুতে নিতে হবে।

ক্ষপণক আরও জানালেন রাক্ষসেরই হোক আর পিশাচেরই হোক মোহর ছাড়া এখন থেকে তোমার বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। ক্ষপণক তখন সিদ্ধার্থককে যাওয়ার অনুমতি দিলেন এবং কার্যসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করলেন। ক্ষপণক বললেন শ্রাবকের ধর্মলাভ হোক। ভাগুরায়ণও বুঝতে পারলেন সেই ক্ষপণক রাক্ষসের মিত্র জীবসিদ্ধি। তখন তিনি প্রকাশ্যে রাক্ষসের কাজে যাওয়া হচ্ছে কিনা প্রশ্ন করেন। ক্ষপণক জানালেন যেখানে রাক্ষস বা পিশাচের নামও শোনা যায় না তেমন জায়গায় যাব। ক্ষপণক বললেন, শ্রাবক! রাক্ষস আমার উপর কোনো অত্যাচার করেনি। আমি হতভাগ্য নিজেই নিজের উপর অত্যাচার করছি। ক্ষপণক একথা শুনবার মতো নয়, শুনে কি হবে? ক্ষপণক বললেন, শ্রাবক বিষয়টি গোপনীয়, কিন্তু বড়ই নিষ্ঠুর। ভাগুরায়ণ বলেন যদি গোপনীয় নয়, তবে বলুন।

ক্ষপণক তখন জানান, শ্রাবক শোনো, আমি যখন পাটলিপুত্রে ছিলাম তখন রাক্ষসের সঙ্গে মৈত্রী হয়। রাক্ষস গোপনে বিষকন্যা প্রয়োগ করে পর্বতেশ্বরকে মেরে ফেলে। মলয়কেতু তখন অবাক বিস্ময়ে বলেন বাবাকে রাক্ষস মেরেছে, চাণক্য নয়।

এরপর রাক্ষসের মিত্র বলে চাণক্য আমাকে অপমান করে নগর থেকে তাড়িয়ে দেয়। ক্ষপণক হতভাগ্য চাণক্যের ইচ্ছে ছিল না রাজ্যার্ধ দেয়। ক্ষপণক তখন জানান চাণক্য বিষকন্যার নামও শোনেননি। মলয়কেতু বললেন, বাবার মৃত্যুরূপ বিপদ এতদিন পরেও দ্বিগুণ বলে আমাকে অভিভূত করছে। ক্ষপণক স্বগত উক্তি করে বললেন হতভাগা মলয়কেতু শুনেছে, যা আমার কাজ হয়েছে। বলি নামেও যেমন কাজেও তেমন, রাক্ষসই বটে। ক্ষপণক জ্যোতিষশাস্ত্র নিষ্ণাত ছিলেন। তাই তিনি স্বয়ং যাত্রার উপযুক্ত ক্ষণ নির্দেশ করেছেন।[১৭]

পঞ্চম অঙ্কে ক্ষপণক সত্য ঘটনা উন্মোচন করলে মলয়কেতুর ভ্রান্তি দূর হয়েছে। জৈন সন্ন্যাসী হলেও রাজার আশ্রয়ে তাঁকেও রাজনৈতিক অভিসন্ধিৎসার প্রতীক হতে হয়েছে।

চন্দনদাসপুত্র

চন্দনদাসের শিশুপুত্রের পিতৃভক্তি সামান্য কয়েকটি উক্তির মাধ্যমে অনবদ্য কাব্যসুষমা লাভ করেছে। পরার্থে প্রাণ উৎসর্গ করাকে নিজেদের কুলব্রত বলে মনে করে চন্দনদাসের পুত্র পিতার গৌরবকে অনেকাংশে বৃদ্ধি করে চলেছে। চন্দনদাস বধ্যভূমিতে গিয়ে পুত্রকে আলিঙ্গন করেন, কুটুম্বিনী পুত্রকে পিতার চরণে প্রণতি জানাতে বললে পিতার পায়ে পড়ে বলে বাবা তুমি ছেড়ে গেলে আমি কি করব? চন্দনদাস নির্দেশ দেন যেখানে চাণক্য নেই সেখানে গিয়ে বাস করবে। 'পুত্র চাণক্যবিরহিতে দেশে বস্তব্যম্।'[১৮] চন্দনদাস শেষ মুহূর্তে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছেন। পুত্রের মস্তকে আঘ্রাণ করে মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী, মিত্রের কাজ করে মরছি। পুত্র জানায় বাবা এও কি আমাকে বলে দিতে হবে। এ যে আমাদের বংশের ধর্ম।[১৯]

দৌবারিক

দ্বারে নিযুক্ত রক্ষক, অন্তঃপুর ও রাজার সমস্ত পরিচারক ও বহিরাগতদের রক্ষা করেন। করভক নামক বার্তাবাহকের আগমন বার্তা দেওয়ার জন্য দৌবারিককে বলা হলে কর্তব্যে নিয়োজিত দৌবারিক উচ্চস্বরে

কথা বলতে নিষেধ করেন। তিনি জানান অমাত্য রাক্ষস এখনও শয্যাত্যাগ করেননি, কাজের চিন্তায় রাতে ঘুম হয়নি। তাই তিনি শিরোবেদনায় আক্রান্ত। অবসর বুঝে তার আগমনবার্তা জানানো হবে। পরবর্তীতে দৌবারিক করভক দ্বারে অবস্থানরত, রাক্ষসকে এ সংবাদ জানান।

পুরুষ

এই নাটকের ষষ্ঠ অংকে পুরুষ চরিত্র দেখা যায়। যিনি নাটকের গতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিজে আত্মহত্যার অভিনয় করে রাক্ষসকে তাঁর বন্ধুপ্রীতি স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এই চরিত্র থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে রাক্ষস তার মিত্র চন্দনদাসকে বাঁচানোর জন্য চাণক্যে ও চন্দ্রগুপ্তের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন।

সূত্রধার

সূত্রধারের লক্ষণ সম্পর্কে ভরত *নাট্যশাস্ত্রে* বলেছেন-

> "চতুরাতোদ্যকুশলঃ নানাকর্মসু নিষ্ঠিতঃ।
> নানাপাষণ্ডকার্যজ্ঞঃ নীতিশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
> বেশ্যোপচারনিপুণঃ কামশাস্ত্রবিচক্ষণঃ।
> নানাগতিপ্রচারজ্ঞো রসভাববিশারদঃ
> নাট্যপ্রয়োগকুশলো নানাশিল্পসমন্বিতঃ।"[২০]

অর্থাৎ, চতুর্বিধ বাদ্যে বিশেষজ্ঞ, বিবিধ বাস্তব অবিজ্ঞতা সম্পন্ন, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারে অভিজ্ঞ, রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্রজ্ঞ বৈশিক কলা ও কাম কলায় অভিজ্ঞ চিরাচরিত বিবিধ গতি ও সঞ্চার সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পন্ন, সকল রস ও ভাব সম্বন্ধে বোধযুক্ত, নাট্য প্রয়োগে নিপুণ, সকল শিল্প কলায় অভিজ্ঞ যিনি তিনিই সূত্রাধার।

নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ। তিনি প্রথমেই জানিয়েছেন সামন্ত বটেশ্বর দত্তের পৌত্র, মহারাজ উপাধিতে সম্মানিত, পৃথুর পুত্র কবি বিশাখদত্তের নূতন নাটক আজ অভিনয় করতে হবে। কোন কাব্য ভালো, কোন কাব্য মন্দ তা পরিষদ বুঝতে পারবেন। সূত্রধারের জ্ঞানগর্ভ উক্তিও লক্ষণীয় "যে কিছুই জানে না। তারও কৃষি, যদি জমি ভালো হয় তবে ফল দেয়। ধান যে গোঁছা বাধে, সে চাষার গুণে নয়।"[২১] নিজ গৃহে প্রবেশ করে মহোৎসবের আয়োজন দেখে নিজ স্ত্রীর গুণগান করে মহোৎসবের আয়োজনের উপলক্ষ জিজ্ঞাসা করেন। উপলক্ষ চন্দ্রগ্রহণ জেনে সূত্রধার জানান, চন্দ্রগ্রহণের সংবাদ ভুল। কারণ, কেতু অতি কুটিল গ্রহ, এখনও পূর্ণ হয়নি। তথাপি তাকে আক্রমণ করতে ইচ্ছা করছে বটে। কিন্তু বুধের সঙ্গে যোগ আছে তাই রক্ষা।[২২] নেপথ্যে আমি থাকতে কে চন্দ্রগুপ্তকে জয় করতে চায় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সূত্রধার কৌটিল্যের কণ্ঠস্বর বুঝতে পেরে বলেন:

> "কৌটিল্যঃ কুটিলমতিঃ স এষ যেন
> ক্রোধাগ্নৌ প্রসভমদাহি নন্দবংশঃ।
> চন্দ্রস্য গ্রহণমিতি শ্রুতেঃ সনাম্নো
> মৌর্যেন্দোর্দ্বিষদভিযোগ ইত্যবৈতি ॥"[২৩]

অর্থাৎ, এই সেই কুটিলমতি কৌটিল্য যাঁর ক্রোধাগ্নিতে নন্দ বংশ তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়েছে, আমি চন্দ্রকে আক্রমণ করার কথা বলেছি। চন্দ্রগুপ্ত নামের সঙ্গে চন্দ্র শব্দের মিল আছে, তাই শুনে মনে হচ্ছে কোনো শত্রু রাজা মৌর্যের আক্রমণে উদ্যত হয়েছে। এই বলে দুজনেই সেস্থান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

সূত্রধার ও নটীর কথোপকথনে সূত্রধারের জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান, ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান, কৌটিল্যের চরিত্রের সম্যক জ্ঞান তাঁর প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সূত্রধার নাটকের সূত্র উপস্থাপন করেন। এই অংশেই প্রস্তাবনা অংশে নাটকের মূল বিষয়বস্তু অনুধাবন করা যায়। তাই সূত্রধারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

নিপুণক

চাণক্যের চর যমপটধারী নিপুণক গুপ্তচরবৃত্তিতে অত্যন্ত নিপুণ। তাই তার নাম সার্থক। যমের পট নিয়ে চর প্রবেশ করেন। (ততঃ প্রবিশতি যমপটেন চরঃ)। তাঁর মুখে শুনি:

"প্রণমত যমস্য চরণৌ কিং কার্যং দৈবতৈরন্যৈঃ।
এষ খল্বন্যভক্তানাং হরতি জীবং পরিস্ফুরন্তম্ ॥"[২৪]

অর্থাৎ, যমের চরণে প্রণাম, অন্যদেবতায় কাজ কি? অন্য দেবতার ভক্তের প্রাণ ধড়ফড় করছে, ইনি হরণ করে নিচ্ছেন। নিপুণক যমদেবতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

"পুরুষস্য জীবিতব্যং বিষমাদ্ভবতি ভক্তিগৃহীতাৎ।
মারয়তি সর্বলোকং হস্তেন যমেন জীবয়ামঃ ॥"[২৫]

অর্থাৎ, অতি বিষম ব্যবসাও যদি ভক্তি পূর্বক করা যায় তবে তা থেকে লোকের জীবিকা চলে। যম সকল লোককে মারেন, সেই যম থেকে আমি করে খাচ্ছি। নিপুণক আর্য চাণক্যের গৃহের সন্ধান তাঁরই শিষ্যের কাছে পান। চর নিপুণক কলে এটি তাঁর ধর্ম ভাইয়ের বাড়ি। যমের পট খুলে শিষ্যের উপাধ্যায়কে কিছু উপদেশ দেওয়ার কথা বলেন। তখন শিষ্য তাঁর গুরু অপেক্ষা চর বেশি জানতে পারে না বলে তাঁকে ধিক্কার দেন। তখন নিপুণক জানান, সকলে সব জানে না – 'ন হি সর্বঃ সর্বং জানাতি'। কাজেই কোনটি শিষ্যের গুরু জানেন আর কোনটি চরের মতো লোকেরা জানেন বলা কঠিন। চর শিষ্যের গুরুভক্তিতে বিস্মিত হয়ে বলেন ও ঠাকুর, তোমার গুরু যদি সবই জানেন তবে বলুন দেখি, কে চাঁদকে পছন্দ করে না। শিষ্য বলেন, মূর্খ এটা জেনেই কি না জেনেই বা কি? চর বলেন, তুমি জান যে, পদ্ম চন্দ্রকে পছন্দ করে না। কারণ-

"কমলানাং মনোহরাণামপি রূপাদ্বিসংবদতি শীলম্।
সম্পূর্ণমণ্ডলে'পি যানি চন্দ্রে বিরুদ্ধানি ॥"[২৬]

অর্থাৎ, পদ্মফুল সুন্দর ঠিকই, কিন্তু তার রূপের সঙ্গে স্বভাবের মিল নেই। কারণ, পরিপূর্ণ মণ্ডলের শ্রীমণ্ডিত হলেও চন্দ্রের প্রতি পদ্ম বিরূপ।

এরপর চর বলেন, এই বাড়িতে প্রবেশ করে যমের পট দেখিয়ে গীত গাই। শিষ্য বাড়িটি তাঁর গুরু আর্য চাণক্যের তাই ভিতরে যেতে নিষেধ করেন। যমের পট খুলে গুরুকে ধর্মোপদেশ দেওয়ার কথা বলায় শিষ্য বিরক্ত হয়ে বলেন, তাঁর গুরুর চেয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি বেশি জানতে পারে না। চাণক্য শিষ্য ও যমপটধারী চরের কথোপকথন শুনে উপলব্ধি করেন চন্দ্রগুপ্তের প্রতি কে কে বিরক্ত তা তিনি জানেন। শিষ্য অসংলগ্ন কথা বলায় নিপুণককে ধিক্কার দেন। চাণক্য তখন চরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করো, শ্রোতা ও বোদ্ধা উভয়কেই পাবে। প্রবেশ করে চর বলেন, 'আর্য্যের জয় হোক'। চাণক্য স্বগত উক্তি করে বলেন এ যে, দেখছি নিপুণক, যাকে প্রজাদের মন বোঝার জন্য পাঠানো হয়েছিল। প্রকাশেও বলেন, ভদ্র! তোমার আগমন শুভ হোক। এরপর তাঁর কাছ থেকে প্রজারা বৃষলে অনুরক্ত কিনা জিজ্ঞেস করেন। চর জানান প্রজাদের বিরাগের কারণগুলো এক একেকটি করে দূর হচ্ছে দেব চন্দ্রগুপ্ত যাঁর নাম নিলে পুণ্য হয়– তাঁর প্রতি প্রজারা অনুরক্ত। কিন্তু নগরের এক ব্যক্তি অমাত্য রাক্ষসের প্রতি অনুরক্ত। চাণক্য এই ব্যক্তিদের নাম জানতে চাইলে চর প্রথমে আর্যের শত্রুবর্গের পক্ষপাতী জীবসিদ্ধির কথা জানান। আমার শত্রুবর্গে নিত্য

পক্ষপাতী সন্ন্যাসী হচ্ছেন জীবসিদ্ধি। এ জীবসিদ্ধি চাণক্যেরই চর। দ্বিতীয়জন হচ্ছে অমাত্যের প্রিয় বয়স্য কায়স্থ শকটদাস। চাণক্য জানান সামান্য রিপুকেও অবজ্ঞা করা অনুচিত। তৃতীয়জন পুষ্পপুরবাসী মণিকার মহাজন চন্দনদাস। তাঁর ঘরেই স্ত্রীকে রেখে অমাত্য রাক্ষস নগর থেকে বহির্গত হয়েছেন। চর তখন ছাপের আংটি দেখান।

ছাপ দেখে হাতে নিয়ে রাক্ষসের নাম পাঠ করেন ও সহাস্যে স্বগতোক্তি করেন: বল না রাক্ষসই আমার আঙুলের মুঠোর ভিতর এসেছে। তখন প্রকাশ্যে চরের কাছে আংটি পাওয়ার কথা সবিস্তারে শুনতে চান। চর জানান তাঁকে পুরবাসীদের চালচলন লক্ষ করার নির্দেশ দেওয়ায় পরের ঘরে ঢোকার জন্য যমপট নিয়ে ঘুরতে হতো। কেউ সন্দেহ করেনি। ঘুরতে ঘুরতে একদিন মণিকার মহাজন চন্দনদাসের গৃহে প্রবেশ করে পট খুলে গীত গাইতে শুরু করলে পাঁচ বছর বয়সী সুন্দর বালক শৈশবসুলভ কৌতূহলে উৎফুল্ললোচন হয়ে ক্ষুদ্র গৃহ থেকে বাইরে আসতে চায়। অন্দরমহলের চিৎকারে বোঝা গেল বালকটির বাইরে আসা নিষিদ্ধ। তখন একজন নারী দরজার বাইরে মুখ বের করলে তাঁর হাত থেকে এই ছাপের আংটিটি খুলে নিপুণকের পায়ের কাছে পড়ে যায়। অমাত্য রাক্ষসের নাম মুদ্রিত এই আংটি তাই অমাত্য চাণক্যকে দেওয়ার জন্য এখানে তাঁর আগমন। চাণক্য তাঁকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় দিলেন।

এই চরিত্রটি থেকে অনুমিত হয় 'চারচক্ষুষো রাজানঃ' এই উক্তি কতটা সার্থক। শিষ্যের বাধাবিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে স্বয়ং চাণক্যের হাতে রাক্ষসের নামমুদ্রাঙ্কিত আংটি পৌঁছে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর দূরদর্শিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় মেলে।

গৌণ নারীচরিত্র

নটী : সূত্রধারপত্নী নাটকের প্রারম্ভে নটীরূপে চিত্রিত হয়েছে। সূত্রধার পরিজনের সঙ্গে সংগীতের অনুষ্ঠানে ইচ্ছুক হয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে দেখেন পরিজনেরা সকলেই ব্যস্ত, গৃহে মহোৎসব। নটীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভরত বলেছেন:

"ভাণ্ডকবাদ্যজ্ঞা যা লয়তালজ্ঞা রমানুবিদ্ধা চ।
সর্বাঙ্গসুন্দরী চৈব কর্তব্যা নাটকীয়া সা তু ॥"[২৭]

অর্থাৎ, যে নারী ঢাকবাদ্য, লয়, তাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং রসবোধসম্পন্ন ও সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সুন্দরী তাকে নটী করতে হবে।

এরপর সূত্রধার তাঁর স্ত্রীকে গুণবতী, নানা উপায় চিন্তাকারী, ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের প্রদাত্রী, বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণে নীতিশাস্ত্রজ্ঞ বলে নটীকে নিজের সম্মুখে আসতে বলেন। নটীর বিবিধ গুণাবলি সূত্রধারের মুখেই উচ্চারিত হয়েছে।

নটীকে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে নটী চন্দ্রগ্রহণের বিষয়ে বলেন। সূত্রধার জ্যোতিষবিদ্যায় অভিজ্ঞ, তাই চন্দ্রগ্রহণের কথা বলায় নটীর ধারণা যে ভ্রান্ত সে ভুল ভাঙিয়ে দেন। বুধের সঙ্গে যোগ আছে তাই রক্ষা। নটী প্রত্যুত্তরে বলেন, আর্য! কে এই পৃথিবীতে থেকে চন্দ্রকে গ্রহের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চায়, কৌটিল্যের কণ্ঠস্বর শুনে নটী ভীত হয়ে পড়েন। দুজনেই সে স্থান থেকে পলায়ন করেন। এই প্রসঙ্গে নটীর অতিথিবাৎসল্য, ব্রাহ্মণদের সম্মানপ্রদর্শন, জ্যোতিষবিদ্যায় অনভিজ্ঞতার পরিচয় মেলে।

প্রতীহারী : "সন্ধিবিগ্রহসংবদ্ধনানাকার্যসমুত্থিতম্।
নিবেদয়ন্তি কার্যং যাঃ প্রতীহার্যস্তু তাঃ স্মৃতাঃ ॥"[২৮]

অর্থাৎ, যে সকল নারী সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি বিবিধ রাজকীয় কার্য রাজার নিকট উপস্থাপিত করে, তাকে প্রতীহারী বলা হয়। এই নাটকে প্রতিহারী দুজন। একজন বিজয়া আরেকজন শোণোত্তরা।

বিজয়া

কুমার ময়লকেতুর স্ত্রী-দ্বাররক্ষী। ভাগুরায়ণের ঠিকানা জানার জন্য মলয়কেতু প্রকাশ্যে প্রতীহারী বিজয়াকে প্রশ্ন করেন। প্রতীহারী আরও জানান যারা শিবিরের বাইরে যেতে চায় তাদের ছাড়চিঠি দিচ্ছেন ভাগুরায়ণ। মলয়কেতু প্রতীহারী বিজয়াকে ডেকে বলেন শকটদাসকে দেখতে চাই। প্রতীহারী বলেন কুমারের যে আদেশ। তখনই ভাগুরায়ণ বলেন, কুমার! শকটদাসের অন্য আরেকটা লেখা আনা হলেই বোঝা যাবে শকটদাসের লেখা কোনটি। মলয়কেতু বিজয়াকে তা করার জন্যই নির্দেশ দিলেন। প্রতীহারী মুদ্রাও আনবেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে মলয়কেতু উভয়ই সঙ্গে আনতে বলেন। প্রতীহারী বাইরে এসে আবার অন্তঃপুরে ঢুকে বলেন কুমার এই একখানি শকটদাসের নিজ হাতে লেখা পত্র আর মুদ্রা। প্রতীহারী বিজয়াকে অলংকারগুলো চিনতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করায় বিজয়া জানায়, এখানি পর্বতেশ্বরের, যার নাম নিলে পুণ্য হয়, তিনি এগুলো পরতেন। এই উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে মলয়কেতুর প্রতীহারী বিজয়ার চরিত্রের দৃঢ়তা, সত্যকে স্বীকার করার প্রবৃত্তি প্রমাণিত হয়।

শোণোত্তরা

রাজা চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রী-দ্বাররক্ষী। ৩য় অঙ্কে কৃতককলহ সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর শিরোবেদনা দেখা দিলে রাজা চন্দ্রগুপ্ত শোণোত্তরে এই শুষ্ককলহে আমার মাথা ধরেছে। শয্যা গৃহের পথ দেখিয়ে চল। প্রতীহারী রাজাকে আসুন প্রভু আসুন বলে শয্যা গৃহের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন। শোণোত্তরার প্রভুভক্তি, শয্যাগৃহে অসুস্থ রাজাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া সবই নাট্যকারের কল্পিত ঘটনা। কৃতক শব্দটিই তো কৃত্রিম।

কুটুম্বিনী

অপর এক নারীচরিত্র চন্দনদাসপত্নী। তাঁর ভাষায়–দেবতারা প্রসন্ন হয়ে এর সহায় হবে। পুত্র! যাদু আমার পিতার চরণে এই শেষবার প্রণাম করো। কুটুম্বিনী সম্মুখে উপস্থিত জনদের চন্দনদাসকে রক্ষা করার জন্য আকুল আবেদন জানান। চন্দনদাস কুটুম্বিনীকে মিত্রের স্বার্থে মৃত্যুবরণ করায় চন্দনদাসের মৃত্যুতে শোক করা অনুচিত বলেই মন্তব্য করেছেন। চণ্ডালদ্বয় শূলে চড়ানোর প্রস্তুতি নেয়ায় কুটুম্বিনী বুকে করাঘাত করে রক্ষা করুন মহাশয়েরা রক্ষা করুন বলে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠেন। চন্দনদাসের পত্নীর পতিপ্রেম এবং তাঁর শিশুপুত্রের পিতৃভক্তি লক্ষণীয়। চন্দনদাসের পত্নীর কাতর আর্তনাদ, স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য সনির্বন্ধ প্রার্থনা, সহমরণের প্রস্তুতি, পতির পদাঙ্ক অনুসরণ করার বাসনা তাকে যথাযথ পতিপ্রাণা আর্যরমণীর মর্যাদা দিয়েছে। পরার্থে প্রাণ উৎসর্গ করাকে নিজেদের কুলব্রত বলে মনে করেন চন্দনদাস–পত্নী ও পুত্র।

উপসংহার

ধনীর পাশে দরিদ্র, বৃহৎ এর পাশে ক্ষুদ্র, সমুদ্রের পাশে জলাশয়, মুখ্যের পাশে গৌণ––এ জাতীয় প্রধানের পাশে অপ্রধান না থাকলে প্রধান বা মুখ্যের অবস্থান উপলব্ধ হয় না। তাই অপ্রধান বা গৌণ চরিত্রগুলো আপন কার্যকলাপ ও প্রতিভায় নিজেকে পরিস্ফুট করে মাত্র। তখন প্রধান চরিত্র হয় দীপ্ত, অপ্রধান হয় নিষ্প্রভ। কিন্তু এদের অস্তিত্বই সমগ্র নাটককে সপ্রভ করে তোলে।

বিরাধগুপ্ত, সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি, রাক্ষসের ভৃত্য প্রিয়ংবদক, বৈহীনরি ও জাজলি নামক দুই কঞ্চুকী, শোণোত্তরা ও বিজয়া নামে দুই প্রতীহারী, চাণক্যের শিষ্য শার্ঙ্গরব– এই গৌণ চরিত্রগুলোর গুরুত্ব নাটকে কম নয়। এই সকল গৌণ চরিত্রের যৌথ প্রচেষ্টায় নাটকের মুখ্য চরিত্রগুলো দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। জগদীশ মিশ্রের ভাষায় :

"চন্দনদাস রাক্ষস কা অনন্য সহযোগী হ্যায় আউর স্বার্থরহিত হোকর উসকী সহায়তা করনা চাহ্‌তা হ্যায়। ইনকে ছোটে ছোটে পাত্র ভি সশক্ত হ্যায়– বিরুদ্ধক, নিপুণক, আহিতুণ্ডিতক, শকটদাস প্রভৃতি সভী পাত্র চাহে সূক্ষ্ম হো কিন্তু বিশাখদত্ত কী অঙ্গুলীয়া মে উনমে ভী জীবন বস ভর দিয়া হ্যায়।"[২৯]

মুখ্য চরিত্রসমূহের মত গৌণ চরিত্রচিত্রণেও *মুদ্রারাক্ষস* নাটকের প্রণেতা বিশাখদত্তের দক্ষতা প্রশংসনীয়। গৌণ চরিত্রগুলোকে নাট্যকার কল্পনাবৈভবে বাস্তব ও জীবন্ত রূপে অংকণ করেছেন নাট্যকাহিনির গতিবৃদ্ধিতে এই চরিত্রগুলো বিশেষ ভূমিকা রেখেছে, এদের মধ্যে চাণক্যের তিন গুপ্তচর ভাগুরায়ণ, সিদ্ধার্থক ও সমিদ্ধার্থক বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।কাহিনি পরিকল্পনা, চরিত্রচিত্রণ এবং রচনাশৈলী এবং সমকালীন যুগের সমাজ-সত্য নাটকটিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটকরূপে চিহ্নিত করেছে। এ নাটকের প্লট নাট্যকারের নূতন আবিষ্কার নয়। সাধারণত নাট্যকারেরা যেসব উৎস বা আধার থেকে তাদের প্লট আহরণ করেন এ নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকার সেই চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। প্লট পরিকল্পনায় এবং বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় এ নাটক এক নূতন দিগন্তের দিশারী। নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতির কুটিল ঘূর্ণাবর্ত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা। রাজনীতির মধ্যে Pathos এর যেমন কোনো স্থান নেই তেমনি নীতিরও কোনো বালাই নেই। নাট্যকার সত্য ও অবিকৃত তথ্য তুলে ধরেছেন। অকারণ ভাবোচ্ছ্বাস নাটককে ভারাক্রান্ত করে তোলেননি। নাটকের ঘটনা রাজনীতিমূলক। রাজনীতিতে যতরকম ছলাকলা আছে তার সবই নাট্যকার নির্বিকার, নিরাসক্ত ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। *মুদ্রারাক্ষস* নাটকে প্রণয়ের নামগন্ধ নেই। এর কাহিনি পরিকল্পনা এবং রচনাশৈলী সংস্কৃত নাট্যধারায় স্বতন্ত্র। নানা দিক থেকে *মুদ্রারাক্ষস* নাটক এক অদ্বিতীয় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

তথ্যনির্দেশ

[১] বিশাখদত্ত, *মুদ্রারাক্ষস*, এম.আর কালে সম্পা. (দিল্লি : এম এল বি ডি ১৯৯১, পুনর্মুদ্রণ), ১.২৩, পৃ. ৪৩

[২] *তদেব*, ৭.৫, পৃ. ১৫৮।

[৩] *তদেব*, p. xxxiv.

[৪] *তদেব*, ৪র্থ অঙ্ক, পৃ. ১১৮।

[৫] *তদেব*, ৫.৪. পৃ, ১১৯।

[৬] *তদেব*, ৪র্থ অঙ্ক, পৃ. ১০৫।

[৭] *তদেব*, ৫ অঙ্ক, পৃ. ১২৩।

[৮] বিশাখদত্ত, *মুদ্রারাক্ষসম্*, জগদীশ চন্দ্র মিশ্র সম্পা. (বারণসী : চৌখম্বা বিদ্যা ভবন, ২০২৯ বিক্রমসম্বৎ) পৃ. ৪৫।

[৯] বিশাখদত্ত, *মুদ্রারাক্ষস*, শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পা. (কলকাতা : সদেশ প্রকাশনী, ২০১১) পৃ. ১৭।

[১০] বিশাখদত্ত, *মুদ্রারাক্ষস*, এম.আর. কালে সম্পা., *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ অঙ্ক, পৃ. ১৩৯।

[১১] *তদেব*, ৬ষ্ঠ অঙ্ক, পৃ. ১৪০।

[১২] ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংস্করণ, সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. (কলিকাতা: নরপত্র প্রকাশন ১৯৮৫) ৩৪.৭৫, পৃ. ২১৮।

[১৩] বিশাখদত্ত, *মুদ্রারাক্ষস*, এম.আর.কালে সম্পা., *প্রাগুক্ত*, ৩.১৫, পৃ. ৮১।

[১৪] *তদেব*, ৩.১৭, পৃ. ৮২।

[১৫] "স দোষঃ সচিবস্যৈব যদসৎকুরুতে নৃপঃ।

যাতি যন্তঃ প্রমাদেন গজো ব্যালত্ববাচ্যতাম্ ॥" *তদেব*, ৩.৩২, পৃ. ৯৬।

[১৬] *তদেব*, ৪র্থ অঙ্ক, পৃ. ১০৫।

[১৭] "অস্তাভিমুখে সূর্যে উদিতে সম্পূর্ণমণ্ডলে চন্দ্রে।
গমনং বুধস্য লগ্নে উদিতাস্তমিতে চ কেতৌ ॥" *তদেব*, ৪.১৯, পৃ. ১১২।

[১৮] *তদেব*, ৭ম অঙ্ক, পৃ. ১৫৬।

[১৯] "তাত কিমিদমপি ভণিতব্যম্। কুলধর্মঃ খল্বেষো'স্মাকম্ ইতি পাদয়োঃ পততি ॥" *তদেব*, ৭ম অঙ্ক, পৃ. ১৫৭।

[২০] ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. *প্রাগুক্ত*, ৩৫.৬৬-৬৭, পৃ. ২৩১।

[২১] "চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ।
ন শালেঃ স্তম্বকরিতা বপ্তুর্গুণমপেক্ষতে ॥" বিশাখদত্ত, *মুদ্রারাক্ষস*, এম.আর. কালে সম্পা. *প্রাগুক্ত*,, ১.৩, পৃ. ১৩।

[২২] "ক্রুরগ্রহঃ স কেতুশ্চন্দ্রং সম্পূর্ণমণ্ডলমিদানীম্
অভিভবিতুমিচ্ছতি বলাৎ ॥" *তদেব*, ১ম অঙ্ক, পৃ. ১৬।

[২৩] *তদেব*, ১.৭, পৃ.১৮।

[২৪] *তদেব*, ১.১৭, পৃ. ২৬।

[২৫] *তদেব*, ১.১৮, পৃ. ২৬।

[২৬] *তদেব*, ১.১৯, পৃ. ২৬।

[২৭] ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, *প্রাগুক্ত*, ৩৫.১০১, পৃ. ২৩৭।

[২৮] *তদেব*, ৩৪.৬১, পৃ. ২১৬।

[২৯] বিশাখদত্ত, *মুদ্রারাক্ষসম্*, জগদীশ চন্দ্র মিশ্র সম্পা., *প্রাগুক্ত*, ভূমিকাংশ, পৃ. ৪৬।